সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৩য় খন্ড

কোরআনের অনুবাদ
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন



সাইয়েদ কুতুব শহীদ

তাফসীর
ফী যিলালিল কোরআন

৩য় খন্ড

সূরা আলে ইমরান

কোরআনের অনুবাদ ও
তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনের অনুবাদ সম্পাদনা
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ

এ খণ্ডের অনুবাদ
মাওলানা সোলায়মান ফারুকী
হাফেজ আকরাম ফারুক
হাফেজ গোলাম সোবাহান সিদ্দিকী



আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একদিন যে মানুষটিকে
স্বয়ং আরশের মালিক
আল্লাহ জাল্লা জালা'লুহু
কোরআনের তোহফা দিয়ে মহিমান্বিত করেছিলেন,
আমাদের মতো নগণ্য বান্দার পক্ষে
তাঁকে কোনো উপহার দেয়ার ধৃষ্টতা
সত্যিই বড়ো বেমানান!

আসমান যমীন, চাঁদ সুরুজ, মহাদেশ মহাসাগর
তথা সারে জাহানের সবটুকু রহমত
যার পবিত্র নামে উৎসর্গিত
তাঁর নামে আবার কার উৎসর্গ প্রয়োজন?

কোরআনের মহান বাহককে
কোরআনের এই তাফসীরের নিবেদন
কোনো নিয়মতান্ত্রিক উৎসর্গ নয়
এ হচ্ছে কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়ার
আমাদের হৃদয়ে লালিত স্বপ্নের একটা বহিপ্রকাশ মাত্র।

মানবতার মুক্তিদূত
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ
রাহমাতুললিল আলামীন
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার হাজার শোকর, এক সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এই শতকের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। ৫ বছরের চাইতে কিছুটা কম সময়ের ভেতর আল্লাহ তায়ালা যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ (সর্বমোট ২২ খন্ডে সমাপ্ত) এই তাফসীরের অনুবাদ প্রকাশনার কাজ শেষ করার যে তাওফীক আমাদের দান করেছেন তার জন্যে আমরা একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা জানাই। (প্রথম প্রকাশনা অনুষ্ঠান ৬ জানুয়ারী ৯৫ ও সমাপনী অনুষ্ঠান ১২ই মে ২০০০)

'ফী যিলালিল কোরআন' ও তার প্রণেতা সাইয়েদ কুতুব শহীদ-এর পরিচয় আজকের ইসলামী বিশ্বে নতুন করে দেয়ার অবকাশ নেই। আমরা শুধু এটুকুই বলতে পারি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার মহান সংগ্রামে শহীদ কুতুবের নাম যেমনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, তেমনি তাঁর রচিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'ও অনন্তকাল ধরে কোরআন অনুধাবনের ক্ষেত্রে একটি 'মাইলফলক' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পৃথিবীর ২৫ কোটির বেশী লোক যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষার স্থান বিশ্ব ভাষার দরবারে পঞ্চম, সে ভাষায় কোরআনের এই সেরা তাফসীর গ্রন্থটির অনুবাদ বহু আগেই প্রকাশ হওয়া উচিত ছিলো। বিগত দু'-তিন দশকে অনেক উৎসাহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই দুরূহ কাজের একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কোনো উদ্যোগই বাস্তবায়িত হতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের মতো কতিপয় গুনাহগার বান্দাকে যে তাঁর এ মহান খেদমতের জন্যে নির্বাচিত করেছেন সে জন্যে তাঁর দরবারে আবারও গভীর কৃতজ্ঞতা আদায় করি।

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর কঠিন অনুবাদ, জটিল সম্পাদনা সর্বোপরি ব্যয়বহুল প্রকাশনা নিসন্দেহে আমাদের জন্যে ছিলো একটি সাহসী পদক্ষেপ, বলতে গেলে এর সবটুকুই ছিলো একটি আবেগ তাড়িত সিদ্ধান্ত। কিন্তু কোনো দ্বীনি 'জোশের' পেছনে যে কিছু দুনিয়াবী 'হুশ'ও প্রয়োজন, তা আমরা প্রথম দিকে টেরই করতে পারিনি। টের যখন পেলাম তখন আমাদের পথ চলা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর, যাত্রার শুরুতে তিনি যদি এর বাণিজ্যিক ঝুঁকির কথাটি আমাকে ভুলিয়ে না রাখতেন তাহলে এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশনার এই উদ্যোগটি কোনোদিনই সফল হতে পারতো না।

তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীমহল ও ওলামায়ে কেরাম তথা কোরআনের পাঠকদের মাঝে যে পরিমাণ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে, তা দেখে আমরা সত্যিই আনন্দে অভিভূত হয়ে গেছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদরা এই তাফসীরটির ব্যাপারে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার প্রতিটি বাক্যই উল্লেখ করার মতো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসসেরে কোরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মনীষী বুদ্ধিজীবী জাতীয় অধ্যাপক মরহুম সৈয়দ আলী আহসান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর চেয়ারম্যান, সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নান, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক—এ দেশবরেণ্য চিন্তাবিদদের সবাই আমাদের উদ্বোধনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়েছেন। অনেকেই আবার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বাংলাদেশ অফিসে এসে আমাদের এই প্রকল্পের জন্যে দোয়া করে গেছেন। আমি তাদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, এই মহান গ্রন্থের কোথাও যদি কখনো কোনো ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নযরে পড়ে তাহলে কোরআনের স্বার্থেই তা মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরামের কাছেও আমাদের বিনীত নিবেদন, এই কেতাব আপনার-আমার কারোর নয়– হেদায়াতের এ মহান উৎসটির একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তায়ালা, তাই একে যথাসম্ভব নির্ভুল করার প্রচেষ্টায় আপনি আপনার মূল্যবান পরামর্শ দিলে আমরা আনন্দের সাথেই তা গ্রহণ করবো এবং সেই আলোকে আগামী সংস্করণগুলোকে আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত করার প্রয়াস পাবো।

৯৫ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত– এই ৯ টি বছর যারা সর্বাবস্থায় আমাদের সাথিত্য দিয়েছেন গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে লক্ষ মানুষের প্রিয় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'কে নতুন সাজে সাজানোর সুখবরটুকু আমরা তাদের দিতে চাই। আসলে এ কাজটি আমাদের নয় বছর আগেই করা উচিৎ ছিলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্যে ক্ষমা করুন।

'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'–এর গায়ে এখন থেকে আমরা যে নতুন সাজ পরাতে চাই, তাহচ্ছে গোটা তাফসীর জুড়ে এর সূচীপত্র জুড়ে দেয়া। গত নয় বছরে বহুবার আমরা একথাটি অনুভব করেছি, যে এই মহান তাফসীরটি থেকে আরো বেশী উপকার পাবার জন্যে এই তাফসীরে একটা পূর্ণাংগ সূচীপত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখন থেকে কোন্ বিষয় কোন্ খন্ডের কোথায় পাওয়া যাবে এটা জানার জন্যে একজন সন্ধিৎসু পাঠককে সারা তাফসীরের আট হাজার পৃষ্ঠা চষে বেড়াতে হবেনা। এখন প্রতিটি খন্ডের সূচীপত্র দেখে পাঠক সহজেই নিজের প্রয়োজনীয় অংশ বেছে নিতে পারবেন। দ্বিতীয় দিকটি ছিলো এই তাফসীরে ব্যবহৃত মূল কোরআনের অংশকে নতুন করে বিন্যাস সাধন করা। এই পূনর্বিন্যাসের ফলে তাফসীরের পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে আসায় স্বাভাবিকভাবেই এর দামও কমে আসবে। যারা আমাদের কালের শ্রেষ্ঠ এই তাফসীরটিকে আরো সুন্দর দেখতে চান তাদের আমরা আর মাত্র কয়েকটি মাস সময় ধৈর্য্য ধরার আবেদন জানাবো। আল্লাহর তায়ালার ওপর ভরসা করে আমরা এ মাস থেকেই এই পুর্নবিন্যাস প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আপনার হাতে এখন যে কপিটি আছে তা আমাদের এ নতুন প্রক্রিয়ারই অংশ।

বিদায়ের আগে উর্ধাকাশের দিকে গুনাহর হাত বাড়িয়ে বলি ঃ 'রাব্বানা লা তুয়াআখেযনা ইন নাসীনা আও আখতা'না'–'হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কোথাও কিছু ভুলে গিয়ে থাকি কিংবা কোথাও যদি আমরা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে বসি–তুমি তার কোনোটার জন্যেই আমাদের পাকড়াও করো না। তুমি আমাদের শাস্তি দিয়ো না।' আমীন! ছুম্মা আমীন!!

খাদিজা আখতার রেজায়ী

লন্ডন

জানুয়ারী ২০০৩

সম্পাদকের নিবেদন

আহনাফ বিন কায়েস নামক একজন আরব সর্দারের কথা বলছি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তার সাহস ও শৌর্য ছিলো অপরিসীম। তার তলোয়ারে ছিলো লক্ষ যোদ্ধার জোর। ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহর নবী (সা.)-কে দেখার সৌভাগ্য তার হয়নি, তবে নবীর বহু সাথীকেই তিনি দেখেছেন। এদের মধ্যে হযরত আলীর (রা.) প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিলো অপরিসীম।

একদিন তার সামনে এক ব্যক্তি কোরআনের এই আয়াতটি পড়লেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন একটি কেতাব নাযিল করেছি, যাতে 'তোমাদের কথা' আছে, অথচ তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না।' (সূরা আল আম্বিয়া, ১০)

আহনাফ ছিলেন আরবী সাহিত্যে গভীর পারদর্শী ব্যক্তি। তিনি ভালো করেই বুঝতেন 'যাতে শুধু তোমাদের কথাই আছে' এই কথার অর্থ কি? তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, কেউ বুঝি তাকে আজ নতুন কিছু শোনালো! মনে মনে বললেন, 'আমাদের কথা' আছে, কই কোরআন নিয়ে আসো তো? দেখি এতে 'আমার' কথা কী আছে? তার সামনে কোরআন শরীফ আনা হলো, একে একে বিভিন্ন দল উপদলের পরিচিতি এতে পেশ করা হচ্ছে–

একদল লোক এলো, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো যে, 'এরা রাতের বেলায় খুব কম ঘুমায়, শেষ রাতে তারা আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহখাতার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে।' (সূরা আয যারিয়াত, ১৭-১৯)

আবার একদল লোক এলো, যাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'তাদের পিঠ রাতের বেলায় বিছানা থেকে আলাদা থাকে, তারা নিজেদের প্রতিপালককে ডাকে ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, তারা অকাতরে আমার দেয়া রেযেক থেকে খরচ করে।' (সূরা হা-মীম সাজদা-১৬)

কিছু দূর এগিয়ে যেতেই তার পরিচয় হলো আরেক দল লোকের সাথে। তাদের সম্পর্কে বলা হলো, 'রাতগুলো তারা নিজেদের মালিকের সেজদা ও দাঁড়িয়ে থাকার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়।' (সূরা আল ফোরকান-৬৪)

অতপর এলো আরেক দল মানুষ, এদের সম্পর্কে বলা হলো, 'এরা দারিদ্র ও সাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় (আল্লাহর নামে) অর্থ ব্যয় করে, এরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, এরা মানুষদের ক্ষমা করে, বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এসব নেককার লোকদের ভালোবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

এলো আরেকটি দল, তাদের পরিচয় এভাবে পেশ করা হলো সে, 'এরা (বৈষয়িক প্রয়োজনের সময়) অন্যদেরকে নিজেদেরই ওপর প্রাধান্য দেয়, যদিও তাঁদের নিজেদের রয়েছে প্রচুর অভাব ও ক্ষুধার তাড়না। যারা নিজেদেরকে কার্পণ্য থেকে দূরে রাখতে পারে তারা বড়ই সফলকাম।' (সূরা আল হাশর-৯)

একে একে এদের সবার কথা ভাবছেন আহনাফ। এবার কোরআন তার সামনে আরেক দল লোকের কথা পেশ করলো, 'এরা বড়ো বড়ো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে, যখন এরা রাগান্বিত হয় তখন (প্রতিপক্ষকে) মাফ করে দেয়, এরা আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলে, এরা নামাজের প্রতিষ্ঠা করে, এরা নিজেদের মধ্যকার কাজকর্মগুলোকে পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়। আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে তারা অকাতরে ব্যয় করে।' (সূরা আশ্-শুরা, ৩৭-৩৮)

হযরত আহনাফ নিজেকে নিজে ভালো করেই জানতেন। আল্লাহর কেতাবে বর্ণিত এ লোকদের কথাবার্তা দেখে তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তো এই বইয়ের কোথাও

'আমাকে' খুঁজে পেলাম না। আমার কথা কই? আমার ছবি তো এর কোথায়ও আমি দেখলাম না, অথচ এ কেতাবে নাকি তুমি সবার কথাই বলেছো।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে কোরআনে নিজের ছবি খুঁজতে শুরু করলেন। এ পথেও তার সাথে বিভিন্ন দল উপদলের সাক্ষাত হলো। প্রথমত, তিনি পেলেন এমন একটি দল, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তখন তারা গর্ব ও অহংকার করে এবং বলে, আমরা কি একটি পাগল ও কবিয়ালের জন্যে আমাদের মাবুদদের পরিত্যাগ করবো?' (সূরা আছ ছাফফাত ৩৫-৩৬) তিনি আরো সামনে এগুলেন, দেখলেন আরেক দল লোক। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যখন এদের সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন এদের অন্তর অত্যন্ত নাখোশ হয়ে পড়ে, অথচ যখন এদের সামনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্যদের কথা বলা হয় তখন এদের মন আনন্দে নেচে ওঠে।' (সূরা আয্ যুমার, ৪৫)

তিনি আরো দেখলেন, কতিপয় হতভাগ্য লোককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'তোমাদের কিসে জাহান্নামের এই আগুনে নিক্ষেপ করলো? তারা বলবে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠা করতাম না, আমরা গরীব মেসকীনদের খাবার দিতাম না, কথা বানানো যাদের কাজ–আমরা তাদের সাথে মিশে সে কাজে লেগে যেতাম। আমরা শেষ বিচারের দিনটিকে অস্বীকার করতাম, এভাবেই একদিন মৃত্যু আমাদের সামনে এসে হাযির হয়ে গেলো।' (সূরা আল মোদ্দাসসের, ৪২-৪৬)

হযরত আহনাফ কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন চেহারা ছবি ও তাদের 'কথা' দেখলেন। বিশেষ করে এই শেষোক্ত লোকদের অবস্থা দেখে মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, এ ধরনের লোকদের ওপর আমি তো ভয়ানক অসন্তুষ্ট। আমি এদের ব্যাপারে তোমার আশ্রয় চাই। এ ধরনের লোকদের সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই।

তিনি নিজেকে নিজে ভালো করেই চিনতেন, তিনি কোনো অবস্থায়ই নিজেকে এই শেষের লোকদের দলে শামিল বলে ধরে নিতে পারলেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে প্রথম শ্রেণীর লোকদের কাতারেও শামিল করতে পারছেন না। তিনি জানতেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমানের দৌলত দান করেছেন। তার স্থান যদিও প্রথম দিকের সম্মানিত লোকদের মধ্যে নয় কিন্তু তাই বলে তার স্থান মুসলমানদের বাইরেও তো নয়!

তার মনে নিজের ঈমানের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, তেমনি নিজের গুনাহখাতার স্বীকৃতিও সেখানে সমানভাবে মজুদ ছিলো। কোরআনের পাতায় তাই এমন একটি ছবির সন্ধান তিনি করছিলেন, যাকে তিনি একান্ত 'নিজের' বলতে পারেন। তার সাথে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা ও দয়ার প্রতিও তিনি ছিলেন গভীর আস্থাশীল। তিনি নিজের নেক কাজগুলোর ব্যাপারে যেমন খুব বেশী অহংকারী ও আশাবাদী ছিলেন না, তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকেও তিনি নিরাশ ছিলেন না। কোরআনের পাতায় তিনি এমনি একটি ভালো-মন্দ মেশানো মানুষের ছবিই খুঁজছিলেন এবং তার একান্ত বিশ্বাস ছিলো এমনি একটি মানুষের ছবি অবশ্যই তিনি এই জীবন্ত পুস্তকের কোথাও না কোথাও পেয়ে যাবেন।

কেন, তারা কি আল্লাহর বান্দা নয় যারা ঈমানের 'দৌলত' পাওয়া সত্তেও নিজেদের গুনাহর ব্যাপারে থাকে একান্ত অনুতপ্ত। কেন, আল্লাহ তায়ালা কি এদের সত্যিই নিজের অপরিসীম রহমত থেকে মাহরূম রাখবেন? এই কেতাবে যদি সবার কথা থাকতে পারে তাহলে এ ধরনের লোকের কথা থাকবে না কেন? এই কেতাব যেহেতু সবার, তাই এখানে তার ছবি কোথাও থাকবে না–এমন তো হতেই পারে না। তিনি হাল ছাড়লেন না। এ পুস্তকে নিজের ছবি খুঁজতে লাগলেন। আবার তিনি কেতাব খুললেন।

কোরআনের পাতা উল্টাতে উল্টাতে এক জায়গায় সত্যিই হযরত আহনাফ 'নিজেকে' উদ্ধার করলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠলো, আজ তিনি কোরআনে নিজের ছবি খুঁজে পেয়েছেন, সাথে সাথেই বলে উঠলেন, হ্যাঁ, এই তো আমি!

'হ্যাঁ এমন ধরনের কিছু লোকও আছে যারা নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে। এরা ভালো মন্দ মিশিয়ে কাজকর্ম করে-কিছু ভালো কিছু মন্দ। আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা এদের ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা বড়ো দয়ালু বড়ো ক্ষমাশীল। (সূরা আত্ তাওবা ১০২)

হযরত আহনাফ আল্লাহর কেতাবে নিজের ছবি খুঁজে পেয়ে গেলেন, বললেন, হাঁ, এতোক্ষণ পর আমি আমাকে উদ্ধার করেছি। আমি আমার গুনাহর কথা অকপটে স্বীকার করি, আমি যা কিছু ভালো কাজ করি তাও আমি অস্বীকার করি না। এটা যে আল্লাহর একান্ত দয়া তাও আমি জানি। আমি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ নই। কেননা এই কেতাবই অন্যত্র বলছে, 'আল্লাহর দয়া থেকে তারাই নিরাশ হয় যারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।' (সূরা আল হেজর ৫৬)

হযরত আহনাফ দেখলেন, এসব কিছুকে একত্রে রাখলে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে তার 'ছবি'। কোরআনের মালিক আল্লাহ তায়ালা নিজের এ গুনাহগার বান্দার কথা তাঁর কেতাবে বর্ণনা করতে সত্যি ভুলেননি!

হযরত আহনাফ কোরআনের পাঠকের কথার সত্যতা অনুধাবন করে নীরবে বলে উঠলেন হে মালিক, তুমি মহান, তোমার কেতাব মহান, সত্যিই তোমার এই কেতাবে দুনিয়ার গুণী-জ্ঞানী, পাপী-তাপী, ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, সবার কথাই আছে। তোমার কেতাব সত্যিই অনুপম!

❑ ভারতীয় উপমহাদেশের মহান ইসলামী চিন্তানায়ক মওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) তার এক রচনায় হযরত আহনাফ বিন কায়েসের এ ঐতিহাসিক গল্পটি বর্ণনা করেছেন। হযরত আহনাফের এই গল্পটি পড়ার পর এক সময় আমিও তার মতো কোরআনের পাতায় পাতায় নিজের ছবি খুঁজেছি। খুঁজতে গিয়ে একেকবার হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি, চিন্তায় ডুবে গেছি বহুবার। সন্ধান করেছি কোরআনের এমন একটি তাফসীরের যা 'আমাকে' আমার চোখে আরো পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধরবে।

❑ আমার আজো সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের ঢাকার রাজপথ। প্রচন্ড রোদ মাথায় নিয়ে পুরানা পল্টন দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে চলেছে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার দিকে। মিছিলের গগনবিদারী শ্লোগানঃ মানবতার দুশমন ইসলামের দুশমন নাসের নিপাত যাক, ইখওয়ানকে বেআইনী করা চলবে না, ইখওয়ান নেতা সাইয়েদ কুতুবের মুক্তি চাই। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুল কলেজ মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ইসলামের পতাকাবাহী একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার এই মিছিলে সেদিন আমিও অংশ গ্রহণ করেছিলাম।

মাত্র এক বছর আগে আমি ম্যাট্রিক পাস করেছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানী শহরে এসেছি মাত্র দু'বছর আগে। দেশীয় রাজনীতির কিছুই যেখানে বুঝি না, সেখানে হাজার হাজার মাইলের দূরবর্তী দেশ মিসরে কি হচ্ছে তা জানবো কি করে? আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই, এই মিছিলে অংশ গ্রহণের আগে অনেকের মতো আমিও 'ইখওয়ানুল মুসলেমুন'-এর নেতা সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানতাম না।

এরপর এলো সেই ৬৬ সালের ২৯ আগস্টের কালো রাত্রি। শুনলাম হযরত মুসার পুন্যভূমি মিসরে ফেরআউনের প্রেতাত্মা জামাল নাসের ইখওয়ানুল মুসলেমুনের বরেণ্য নেতা মুসলিম জাহানের ক্ষণজন্মা ইসলামী চিন্তানায়ক সাইয়েদ কুতুবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়েছে। শুনে বিশ্বাসই

হচ্ছিলো না, ফেরাউন স্বয়ং বেঁচে থাকলে সে যে কাজ করতো আজ তার এই নিকৃষ্ট অনুসারী তাই-ই করতে উদ্যত হলো! ফেরাউনও এই হুংকার দিয়েছিলোঃ 'অবশ্যই আমি কেটে দেবো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলীতে চড়িয়ে দেবো।' (সূরা আল আরাফ, ১২৪)

আর এই নরাধম সেই মুসা, ঈসা ও মোহাম্মদের (আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক তাদের সবার ওপর) অনুসারী কতিপয় বান্দাকে সত্যিই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিলো! সারা দুনিয়ার মুসলিম জনতার ব্যাপক দাবী দাওয়ার প্রতি যামানার নব্য ফেরাউন কোনো সম্মানই প্রদর্শন করলোনা!

সাইয়েদ কুতুবের ফাঁসির এ হৃদয়বিদারক ঘটনা দুনিয়ার হাজার হাজার মুসলমানের মতো আমার মনেও তার সম্পর্কে জানার এক ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়ে গেলো। এই মহাপুরুষের জীবন সংগ্রাম, তার সাহিত্য সাধনা, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আমার এ ব্যাকুলতাই একদিন আমাকে এই অমর চিন্তানায়কের তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো।

কিভাবে কোন সূত্রে এই গ্রন্থ আমি প্রথম দেখেছি তা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে আমি ঢাকার একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক থাকা কালে একবার এই পত্রিকার জন্যে শহীদ কুতুবের ওপর কিছু লিখতে গিয়েই সর্বপ্রথম 'ফী যিলালিল কোরআন' এর খোঁজ পাই।

৬৯ সালে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। তাও আবার আমি ছিলাম বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। বাংলা-শহীদ কুতুবের তাফসীরে ব্যবহৃত ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাষা। আল্লাহ তায়ালা আমার মরহুম আব্বা হযরত মাওলানা মানসুর আহমদ ও আমার মারহুমা আম্মা মোসাম্মত জামিলা খাতুনকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন, তাদের চেষ্টা ও সান্নিধ্যে জীবনের প্রথম দিকে কোরআনের ভাষা শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বলে তার ওপর ভিত্তি করেই এক সময় শহীদ কুতুবের সেই কালজয়ী তাফসীরটি পড়তে শুরু করলাম। কিন্তু অচিরেই এটা আমি অনুভব করলাম যে, আমার জানা যে আরবীর দৌড় কোরআন হাদীস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, তা মোটেই এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়।

'ফী যিলালীল কোরআন'-এর আরবীতে প্রচুর পরিমাণ আধুনিকতার মিশ্রণ থাকায় তার মর্মোদ্ধারের জন্যে বুঝতে পারলাম আমার আরবীর গন্ডিকেও একটু বিস্তৃত করতে হবে। সুযোগ সুবিধের সীমাবদ্ধতার কারণে 'ফী যিলালিল কোরআনের' গহীন সাগরে ডুব দিয়ে এর মুক্তা আহরণের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা কোনোদিনই আমার হয়ে ওঠেনি। তবু আমি কখনো আমার মনে সে আগ্রহের মৃত্যু হতে দেইনি।

অতপর ১৯৭৯ সালে লন্ডনে এসে আমি আরবী সাহিত্যের একটা বিস্তৃত পরিসরে পা রাখার সুযোগ পেলাম। আবার সেই লালিত আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো, তবে এবার কিছুটা ভিন্ন আকৃতিতে, ভিন্ন ধরনে। 'ফী যিলালিল কোরআন' পড়ে এর মর্মোদ্ধার করাই এখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, এবার আমার স্বপ্ন এই অমূল্য সৃষ্টিকে বাংলা ভাষায় রূপান্তর করা।

১৯৯৪ সালের প্রথম দিককার কথা।

১০ই জানুয়ারী সোমবার সারাদিনের কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কিছু পড়তে, কিছু লিখতে বসলাম। প্রসংগক্রমে 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তরজমার কথা এলো, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার কথা জীবন সাথী খাদিজা আখতার রেজায়ীকেই সবার আগে বললাম। সব নেক কাজের মতো এখানেও সে আমাকে সাহস যোগালো, এমনকি শুরুর দিকে

নিজের 'সেভিংস' ব্যবহার করার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে সে গভীর কৃতজ্ঞতাপাশেও আবদ্ধ করে নিলো। কোরআনের মালিকের দরবারে আজ আমি দোয়া করি, জীবনভর 'কোরআনের ছায়াতলে' দেয়া তাঁর অগুনতি সহযোগিতার বিনিময়ে তুমিও তাকে 'আরশের ছায়াতলে' তোমার একান্ত সান্নিধ্যে রেখো!

সেদিনের সেই মুহূর্তটি ছিলো আমার জীবনের এক স্মরণীয় সন্ধ্যা। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়লাম। সাথে সাথেই আমি মূল তাফসীর খুলে এর ভূমিকাটা তরজমা করতে শুরু করলাম। কেন যেন নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম এই মহান গ্রন্থটিকে বাংলায় রূপান্তরের জন্যে।

সে রাতটি ছিলো 'লায়লাতুল মেরাজ'। এই রাতেই আল্লাহর আদেশে আল্লাহরই এক নবী আল্লাহর আরশে গমন করলেন এবং বিশ্ব মানবের জন্যে মুক্তির মিশন নিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এলেন। মুক্তির সেই মিশনের পথ প্রদর্শক হচ্ছে আল কোরআন। জানি না এর তরজমার দিনক্ষণটির সাথে এই সম্মানিত রাতের কোনো সম্পর্ক আছে কি না–না এটা নিছক একটি ঘটনামাত্র!

'ফী যিলালিল কোরআন' এর ব্যতিক্রমধর্মী নাম দিয়েই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে। (এর মানে হচ্ছে 'কোরআনের ছায়াতলে')। ইসলামী জীবন দর্শনের একজন একনিষ্ঠ সাধক তার জীবনের যে দিনগুলো কোরআনের ছায়াতলে কাটিয়েছেন তারই জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা হচ্ছে, 'ফী যিলালিল কোরআন'। তিনি তার মূল ভূমিকায় এই তাফসীরের প্রতিপাদ্য নিজেই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। লেখকের এই মূল ভূমিকা 'কোরআনের ছায়াতলে' সহ আরো কিছু প্রবন্ধ আমরা এই তাফসীরের প্রথম খন্ডে প্রকাশ করেছি। আশাকরি এর সাথে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগুলোও আপনার কাজে লাগবে। এক, শহীদের সংগ্রামী জীবনালেখ্য 'সাইয়েদ কুতুব শহীদ একজন মহান মোফাসসের' দুই, তারই একটি মূল্যবান প্রবন্ধের বাংলা রূপান্তর 'আল কোরআনের সাথে আমার সম্পর্ক', সর্বশেষে যে গ্রন্থটি লেখার জন্যে তাঁকে ফাসির কাষ্টে ঝুলতে হয়েছিলো সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'মায়ালেম ফিত তারীক'-এর ভূমিকা। যে নামে আমরা এর অনুবাদ পেশ করেছি তা হচ্ছে, 'কোরআনের উপস্থাপিত আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র'। মূল তাফসীর পড়ার আগে এই লেখাগুলো একবার পড়ার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাবো।

আল কোরআন একটি জীবন্ত গ্রন্থের নাম, আল কোরআন একটি চালিকা শক্তির নাম, সর্বোপরি আল কোরআন একটি জীবন্ত আন্দোলনের নাম। জাহেলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত একদল মানুষের জীবনকে আলোকমালায় উদ্ভাসিত করার জন্যেই আল্লাহর এক সাহসী বান্দার ওপর এই কেতাব অবতীর্ণ হয়েছিলো, সুতরাং এই পুস্তক থেকে হেদায়াত পেতে হলে এই কেতাবের প্রদর্শিত সেই সাহসী বান্দার সংগ্রামের পথ ধরেই আমাদের এগুতে হবে।

আরেকটি কথা,

'ফী যিলালিল কোরআন' আরবী কোরআনের আরবী তাফসীর, তাই মূল লেখকের এতে কোরআনের কোনো তরজমা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি; কিন্তু আমাদের বাংলাভাষীদের তো সে প্রয়োজন রয়েছে। এই তাফসীরে কোরআনের যে বাংলা অনুবাদ দেয়া হয়েছে তা একান্ত আমার নিজস্ব। এর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতির দায়িত্বও আমার একার। বাজারে প্রচলিত কোনো 'অনুবাদ' গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগিতে কথ্য ভাষার এক নতুন 'স্টাইল' এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। একজন কোরআনের পাঠক শুধু তরজমা পড়েই যেন কোরআনের বক্তব্য বুঝতে পারেন সেটাই হচ্ছে এই নতুন ধারার লক্ষ্য। অনুবাদের এই নতুন স্টাইলে আমি যদি সফল হই তবে তা হবে একান্তভাবে আমার মালিকেরই দয়া, আর ব্যর্থ হলে তা হবে আমারই অযোগ্যতা ও অক্ষমতা।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমি 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' সমাপ্ত করার সীমাহীন তাগাদায় দিন কাটাচ্ছিলাম তখন এই নতুন ধারার অনুবাদটিকে আলাদা গ্রন্থাকারে পেশ করার স্বপ্ন বহুবারই আমার মনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালার হাজার শোকর এখন সে প্রতিক্ষীত স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশেষে ২০০২-এর মার্চ মাসে ঢাকায় 'কোরআন শরীফ ঃ সহজ সরল বাংলা অনুবাদ' গ্রন্থটির উদ্বোধনী উৎসব সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী পরিষদের বিশিষ্ট সদস্যরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভাইস চ্যান্সেলর, কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকসহ দেশের বহু জ্ঞানীগুনী ব্যক্তি এতে উপস্থিত ছিলেন। সেই থেকে শুরু করে গত কয়েক মাসে এই গ্রন্থটির আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা কোরআন পিপাসু অনেকের মনেই নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। আল্লাহ তায়ালার অগনিত বান্দার কাছে এখন কোরআন বুঝা যেন আগের চেয়ে কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে। এই কেতাবের পাতায় তারা এখন দেখতে পেলো, আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আসলেই বান্দার জন্যে সহজ করে নাযিল করেছেন। নিযুত কোটী সাজদা আল্লাহ তায়ালার দরবারে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর একজন নিবেদিত কোরআন কর্মীর দিবস রজনীর পরিশ্রমকে কবুল করেছেন। হে আল্লাহ! মহা বিচারের দিনে এই ওসীলায় আমি তোমার শুধু ক্ষমাটুকুই চাই।

আমি আর বেশীক্ষণ আপনাদের এই অশান্ত বিয়াবানে অপেক্ষা করাবো না। আমরা সবাই এখন এক সাথে আশ্রয় নেবো 'ফী যিলালিল কোরআন' তথা- কোরআনের ছায়াতলে। কোরআনের এই সুনিবিড় ছায়াতল আমাদের দুনিয়া আখেরাতে সার্বিক প্রশান্তি আনয়ন করুক, এর ছায়াতলে এসে যেন আমরা সবাই এই কেতাবে নিজের ছবিকে আরো পরিষ্কার করে দেখি এবং সে মোতাবেক নিজেকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারি, এই মহান গ্রন্থটির প্রকাশনার মুহূর্তে গ্রন্থের মালিকের দরবারে এই হোক আমাদের ঐকান্তিক দোয়া।

আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত,
হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ
সম্পাদক 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'
অনুবাদ ও প্রকাশনা প্রকল্প ও
ডাইরেক্টর জেনারেল আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
জানুয়ারী ১৯৯৫

এই খন্ডে যা আছে

সূরা আলে ইমরান

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আল কোরআন মূলত আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও আন্দোলনের দিক নির্দেশক এক মহান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হচ্ছে দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রাণ ও উৎস। এই গ্রন্থ দাওয়াত ও আন্দোলনের ধারক ও বাহক, প্রহরী ও রক্ষক, ব্যাখ্যাতা ও বিশ্লেষক। এই গ্রন্থ ইসলামী আন্দোলনের গঠনতন্ত্র ও নীতিনির্ধারক। আর সর্বশেষে এই গ্রন্থটি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের শক্তির উৎস। অনুরূপভাবে ইসলামের আহ্বায়কদের কর্মের উপকরণ, আন্দোলনের পদ্ধতি ও প্রেরণার উৎস।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের ও কোরআনের মাঝে গভীর একটা শূন্যতা থেকে যাবে যদি আমরা এ কথা উপলব্ধি না করি যে, কোরআন একটি জীবন্ত জাতিকে সম্বোধন করছিলো, পৃথিবীতে বাস্তব জাতিসত্ত্বা নিয়ে বিরাজমান একটি জনগোষ্ঠীর সাথে কোরআন কথা বলছিলো। এই জাতির জীবনে সংঘটিত বাস্তব ঘটনাবলীর মোকাবেলা করা হয় এই কোরআনের দিক-নির্দেশনা নিয়ে। এ দিক-নির্দেশনা দিয়েই পরে মানবজাতির গোটা পার্থিব জীবন পরিচালিত হয়েছিলো। এই কোরআনকে সম্বল করেই মানুষের মানসজগতে এবং পৃথিবীর একটি ভূখন্ডে এক বিরাট যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো। সে যুদ্ধ গোটা বিশ্বব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন করেছিলো।

কোরআনের ও আমাদের মাঝে একটি বিরাট অন্তরায় থেকে যাবে যদি আমরা একে নিছক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে তেলাওয়াত ও শ্রবণ করতে থাকি। যদি মনে করি যে, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের ঘটনাবলীর সাথে কোরআনের কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই কোরআন মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব ঘটনাবলীর মোকাবেলা করা ও তাদের পথ-নির্দেশ দেয়ার জন্যই নাযিল হয়েছিলো এবং একসময় তা তাদের যথার্থই পথনির্দেশ দিয়েছিলো। ফলে তা থেকে মানুষের জীবনে সাধারণভাবে এবং মুসলিম জাতির জীবনে বিশেষভাবে এক বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন সত্ত্বার আবির্ভাব ঘটেছিলো।

বস্তুত কোরআনের অলৌকিকত্ব এখানেই নিহিত। একটি সুনির্দিষ্ট জাতির ওপর সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে একটি সুনির্দিষ্ট যুগে নাযিল হয়ে মুসলিম জাতিকে সাথে নিয়ে এক যুগান্তকারী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কোরআন তাদের ও গোটা মানবজাতির ইতিহাসের ধারা আমুল পাল্টে দিয়েছিলো– এটাই হচ্ছে কোরআনের মোজেযা। কিন্তু ইতিহাসের এই ধারা সেই নির্দিষ্ট যুগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে ইতিহাসের ধারা প্রত্যেক যুগের চলমান জীবনধারার পাশাপাশি অবস্থান করা, চলমান জীবনধারার মোকাবেলা করা ও তাকে নির্দেশনা দিয়ে পরিচালনা করতেও সক্ষম। এক্ষেত্রে কোরআনের পথনির্দেশ এতোটা কার্যকর ও বাস্তবানুগ, যেন তা চলমান মুসলিম জাতির জীবন ধারার মোকাবেলা করতে তাৎক্ষণিকভাবেই নাযিল হয়েছে। চারপাশে বিরাজমান জাহেলিয়াতের সাথে ও মানুষের ব্যক্তি সত্ত্বার অভ্যন্তরে বিরাজমান প্রকৃতির সাথে লড়াই করার জন্য তা যেন এইমাত্র অবতীর্ণ হয়েছে! আর সে আরবের সেই ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ প্রান্তরে সেই দিনগুলোতে যে তীব্রতা, তেজস্বিতা ও বাস্তবতার সাথে এই লড়াই পরিচালনা করেছিলো সেই একই তেজস্বিতা ও তীব্রতা নিয়ে এখনো সে লড়াই পরিচালনা করতে সক্ষম।

কোরআন থেকে তার যথার্থ কার্যকর প্রেরণা যদি আমরা অর্জন করতে চাই, কোরআনের মধ্যে যে প্রচন্ড জীবনীশক্তি নিহিত রয়েছে, তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই এবং প্রত্যেক যুগের মুসলিম জাতি ও দলের জন্য এতে যে চালিকাশক্তি লুকিয়ে আছে তা যদি আমরা লাভ করতে চাই, তাহলে কোরআন যেভাবে প্রথম মুসলিম দলটিকে সম্বোধন করেছিলো তা আমাদের মনে রাখতে হবে। সেই দলটি জীবনের বাস্তব অংগনে কিভাবে কর্মরত ছিলো, কিভাবে সে মদীনায় ও গোটা আরব উপদ্বীপের ঘটনাবলীর মোকাবেলা করেছিল, কিভাবে সে তার শত্রু ও

মিত্রদের সাথে আচরণ করেছিলো এবং কিভাবে সেই জাতির ইচ্ছা আকাংখার মোকাবেলা করেছিলো, সেই ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। কিভাবে কোরআন সেসব ঘটনার মোকাবেলা করেছিলো এবং সেই মুসলিম জাতির প্রতিটি পদক্ষেপকে সেই উত্তপ্ত রণাংগনে কিভাবে পরিচালিত করেছিলো, কিভাবে প্রবৃত্তির কূ-প্ররোচনা, মক্কা, মদীনা এবং বহির্বিশ্বের সকল শত্রুর চক্রান্তকে কিভাবে প্রতিহত করেছিলো তাও জানতে হবে।

বস্তুত মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সেই প্রথম ইসলামী সংগঠনের অনুকরণ আমাদের জন্য অপরিহার্য। সেই সংগঠন কিভাবে যথার্থ মানবীয় সংগঠন হিসেবে কাজ করেছে, বাস্তব জীবনে এবং মানবীয় সমস্যাবলীতে কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, তা আমাদের জানতে ও অনুসরণ করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে কোরআন তাদের যাবতীয় বিষয়ে এবং তার সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কিভাবে প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছে। আমাদের দেখতে হবে কিভাবে কোরআন সেই সংগঠনকে হাত ধরে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই অগ্রযাত্রায় সেই সংগঠন কখনো আছাড় খেয়েছে, আবার কখনো উঠে দাঁড়িয়েছে। কখনো একটু বাঁকা পথে, আবার কখনো সোজা পথ ধরে চলেছে। কখনো দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে, আবার কখনো প্রচন্ড শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। কখনো আঘাত খেয়ে বেদনাহত হয়ে মুষড়ে পড়েছে, আবার পরক্ষণেই ধৈর্য ধরে তা সামাল দিয়েছে। ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে ধীরে ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়েছে। আর এভাবে প্রতিটি স্তরে তার মধ্যে মানবীয় স্বভাব প্রকৃতিরই স্ফুরণ ঘটেছে। মানবীয় দুর্বলতা অথবা সবলতারও প্রকাশ পেয়েছে।

এভাবে সে সংগঠনটির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, যে বিষয়ে কোরআনের প্রত্যক্ষ সম্বোধনের পাত্র হতো, একং বিষয়ে আমরাও কোরআনের প্রত্যক্ষ সংলাপ ও সম্বোধনের পাত্র। মানুষ হিসেবে আমাদের যা কিছু ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট রয়েছে, যেগুলো আমরা জানি, চিনি ও প্রত্যক্ষ করি, তা কোরআনের আহ্বান ও নির্দেশ গ্রহণ করতে, মেনে চলতে এবং জীবনপথে চলার ব্যাপারে তার নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হতে পুরোপুরি সক্ষম।

এভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা কোরআনকে এমন এক জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে দেখতে পাবো, যা প্রথম মুসলিম সংগঠনের জীবনকে যেমন পরিচালনা করেছে, তেমনি আমাদের জীবনকেও পরিচালনা করতে সক্ষম। আমরা বুঝতে পারবো যে, কোরআন আজ যেমন আমাদের সাথে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা এও অনুধাবন করবো যে, কোরআন আমাদের বাস্তব সমস্যাবলীর ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোন আবৃত্তিসর্বস্ব বন্দনার শ্লোকমালা নয়, কিংবা তা অতীতে ঘটে যাওয়া মানবজীবনের সাথে সম্পর্কচ্যুত ও প্রভাবহীন কোনো ইতিহাস নয়।

বস্তুত আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান এই প্রাকৃতিক জগতের মতোই কোরআন এক চিরঞ্জীব সত্য। বিশ্বপ্রকৃতি হচ্ছে আল্লাহর দৃশ্যমান গ্রন্থ, আর কোরআন হচ্ছে পাঠ্যগ্রন্থ। এই উভয় গ্রন্থ তাদের প্রণেতা আল্লাহর অস্তিত্বের জীবন্ত সাক্ষী। উভয়ে সুনির্দিষ্ট কর্মের জন্যই সৃজিত। প্রকৃতি তার সমস্ত গুণবৈশিষ্ট সহকারে সচল এবং নিজের জন্য নির্ধারিত কাজে তৎপর রয়েছে। সূর্য তার নির্ধারিত কক্ষপথে পরিভ্রমণরত এবং নিজস্ব ভূমিকায় কর্মরত। চন্দ্র, পৃথিবী এবং সকল গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্র সৃষ্টির আদি থেকেই আপন দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত। সার্বক্ষিণিক তারা তাদের এই ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে মানুষ আগের মতোই রয়েছে, তাই এই মানুষকে সম্বোধনকারী কোরআনও অপরবর্তিত রয়েছে। মানুষের পরিবেশে ও প্রতিবেশে যতো পরিবর্তনই আসুক না কেন সে নিজে পরিবেশকে যতোই প্রভাবিত করুক বা পরিবেশ দ্বারা যতোই প্রভাবিত হোক, তার জন্মগত ও প্রকৃতিগত স্বভাব-বৈশিষ্টে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আর কোরআন তাকে তার এই অপরিবর্তনীয় স্বভাব প্রকৃতি সহকারেই সম্বোধন করে।

কোরআনকে মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবনকে পরিচালিত করার ক্ষমতা দিয়েই রচনা করা হয়েছে। কারণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহর সর্বশেষ কেতাব এবং তার স্বভাব প্রকৃতি মহবিশ্বের প্রকৃতির মতোই চিরস্থায়ী, চির সচল ও অপরিবর্তনীয়।

সূর্য সম্পর্কে কেউ যদি বলে যে, এটা একটা প্রাচীন 'রক্ষণশীল' তারকা এবং তার স্থলে একটা নতুন 'প্রগতিশীল' নক্ষত্র প্রয়োজন অথবা মানুষ একটা প্রাচীন ও রক্ষণশীল প্রাণী এবং তার পরিবর্তে পৃথিবীকে গড়ার জন্য নতুন একটা 'প্রগতিশীল' সৃষ্টির প্রয়োজন, তবে এ দু'টো কথা যেমন হাস্যকর, তেমনি আল্লাহর সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআন সম্পর্কেও অনুরূপ কথা বলা হাস্যকর ব্যাপার।

আলোচ্য সূরাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পর থেকে নিয়ে হিজরী তৃতীয় বর্ষে সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধের সময় পর্যন্ত মদীনার মুসলিম সমাজ জীবনের একটি কর্মচঞ্চল অংশের দৃশ্য তুলে ধরেছে। এই সময়ে তাদের জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী এবং সে ক্ষেত্রে কোরআনের গৃহীত পদক্ষেপ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার সাথে কোরআনের সম্পর্কের বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে।

সূরাটির ভাষা এতো শক্তিমান ও বলিষ্ঠ যে, তা যুগের গোটা চালচিত্র, মুসলিম সমাজের জীবনচিত্র এবং এই সময়ে সংঘটিত সমস্ত সংঘাত-সংঘর্ষের দৃশ্যকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সেই সাথে তৎকালীন প্রচ্ছন্ন বিষয়গুলো ও বিভিন্ন রকমের চেতনা ও অনুভূতির গোপনীয়তার বিষয়টিও সযত্নে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এভাবে এই সময়ের সমগ্র পরিস্থিতিটাকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, পাঠকের কাছে মনে হতে থাকে যেন সে নিজেই সেই ঘটনাবলী ও তৎকালীন মুসলিম সমাজের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। পাঠক যদি চোখ বন্ধ করে, তাহলে আমার ন্যায় তার হৃদয়পটেও ভেসে উঠবে তৎকালীন মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ভেসে উঠবে তাদের চোখ-মুখের বিশেষ অভিব্যক্তি এবং বিবেক ও মনে লুক্কায়িত অনুভূতি, ভেসে উঠবে তাদের চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকা শত্রুদের চতুর্মুখী অপতৎপরতার দৃশ্য। কখনো তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আঁটছে কখনো তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাচ্ছে, কখনো হিংসা ও বিদ্বেষে জলছে, কখনো বিপুল সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করে তাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। ওহুদের ময়দানে প্রথমে পরাজিত হয়ে পুনরায় পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। এসব কিছু এবং যুদ্ধকালের অন্য সকল প্রকাশ্য তৎপরতা ও গোপন প্রতিক্রিয়া তার মনের অলিন্দে ভেসে উঠবে। যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রতিহত করতে, সকল অপবাদ ও সংশয় ঘুচাতে, মোমেনদের হৃদয় ও কদমকে শক্ত ও অটল করতে তাদের চিন্তাধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করা ও তা থেকে শিক্ষা তুলে ধরার দৃশ্য ভেসে উঠবে। আবার তারই ভিত্তিতে সঠিক ও অনাবিল দৃষ্টিভংগী গড়ে তোলা, কুচক্রী ও বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা, কন্টকময় ও পিচ্ছিল পথে তাদেরকে সঠিকভাবে এবং স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও অন্তর্যামী আল্লাহর নির্ভুল জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত করাই যে কোরআন অবতারণার লক্ষ্য সে কথা সবার জানা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও এ সূরার সকল নির্দেশ ও শিক্ষা স্থান কালের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত, নাযিল হওয়াকালীন পরিস্থিতি ও পরিবেশের বাধ্যবাধকতা থেকেও মুক্ত। এ সব নির্দেশ ও শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিসত্ত্বা, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুসলিম সমাজ সংগঠন তথা সমগ্র মানবজাতিকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। তাই প্রত্যেক যুগেই মনে হয় তা মানবজাতির চলমান ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিকভাবে নাযিল হয়েছে। আসলে, ভূত ভবিষ্যত ও গোপন-প্রকাশ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত মহান আল্লাহর সূক্ষ্ম ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতেই কোরআন নাযিল হয়েছে বলে সর্বকালেই তা সমকালীন ও চির আধুনিক বলে প্রতীয়মান হয়।

এই কোরআন হচ্ছে সর্বকালের ও সকল স্থানের জন্য উপযোগী ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের গ্রন্থ। সকল প্রজন্মের মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরস্থায়ী সংবিধান এবং মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সর্বশেষ পথপ্রদর্শক।

এই সময়ে মুসলিম সমাজ মদীনায় কিছুটা স্থিতিশীলতা লাভ করেছিলো। সূরা বাকারার ভূমিকায় আমরা যে পরিস্থিতির চিত্র এঁকেছি, মুসলমানরা তার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিলো।

এ সময়ে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং মুসলমানদেরক আল্লাহ তায়ালা কোরায়শদের ওপর বিজয়ী করেছেন। যে পরিবেশে ও প্রক্রিয়ায় এই বিজয় অর্জিত হয়েছিলো, তাতে এটা একটি অলৌকিক ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হচ্ছিলো। এ কারণে মদীনার খাযরাজ গোত্রের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলকে পর্যন্ত সকল অহমিকা ও অহংকার ভুলে ইসলাম ও তার নবীর প্রতি নমনীয় হতে দেখা গিয়েছিল। সকল ঘৃণা ও উন্নাসিকতা ঝেড়ে ফেলে, সকল হিংসা ও বিদ্বেষ গোপন করে মুসলিম সমাজের সাথে বর্ণচোরা মুসলমান হিসেবে যোগ দিতে বাধ্য হতে হয়েছিলো। সে বলেছিল, ইসলাম এখন দুর্বার ও অপ্রতিরোধ্য।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুলের মুসলমানদের সাথে যোগদানের মধ্য দিয়ে মদীনায় মোনাফেকীর বীজ বপিত হয়; বরং মোনাফেকীর বীজ থেকে চারা গজাতে শুরু করে। কেননা, বদরের যুদ্ধের আগেই মদীনায় যখন ইসলামের বিস্তার ঘটে, তখন অনেকে নিজের পরিবার পরিজনদের ইসলাম গ্রহণের কারণে প্রকাশ্যে ইসলামের বিরোধিতা করতে অপারগ হয়ে মোনাফেক অর্থাৎ কপট ও ভন্ড মুসলমান বনে গিয়েছিলো। ক্রমে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ বেশ কিছু লোক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। তারা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে জাহির করতে বাধ্য হয়। অথচ ভেতরে ভেতরে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি চরম বৈরিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতো। মুসলমানদের ওপর বিপদ আপদ নেমে আসুক এটা তারা মনে প্রাণে কামনা করতো। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে তারা অনৈক্য ও কোন্দল সৃষ্টি করতো। তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয় এবং শক্তি খর্ব হয়, এমন ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করতো। এভাবে তারা তাদের অন্তরের চাপা ক্ষোভ প্রকাশ করতো এবং সাধ্যমতো মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকতো।

এই মোনাফে তথা ভন্ড মুসলমানরা ইহুদীদেরকে স্বাভাবিকভাবেই মিত্র হিসেবে পেয়েছিলো। ইসলাম, মুসলিম জাতি ও রসূল (স.)-এর প্রতি ইহুদীরা ছিলো মোনাফেকদের চেয়েও বেশী বিদ্বেষী। মদীনার নিরক্ষর আরবদের ওপর তাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, ইসলামের আবির্ভাবের ফলে তা বিপন্ন হয়ে উঠেছিলো। তারা মদীনার 'আওস' ও 'খাযরাজ' গোত্রের মধ্যে কলহ-কোন্দল বাঁধিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতো। আল্লাহর অনুগ্রহে এই দু'টি গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে যায় এবং তাদের ঐক্য ইস্পাতের প্রাচীরের মতো অটুট হয়ে যায়। ফলে সেই নোংরা খেল খেলার সুযোগ আর ইহুদীদের হাতে থাকলো না।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ে ইহুদীরা প্রমাদ গুনলো। মুসলমানদের ওপর হিংসায় তারা তেলে বেগুনে জ্বলতে লাগলো। তারা সকল রকমের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টায় লাগলো। তারা যাতে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নিজেদের আকীদা আদর্শ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে জন্য তারা কুটিল চক্রান্তে মেতে উঠলো।

ইতিমধ্যে বনু কাইনুকার ঘটনার মধ্য দিয়ে ইহুদীদের বৈরিতা একেবারেই স্পষ্ট হয়ে পড়লো। রসূল (স.)-এর মদীনা আগমনের পর তার সাথে তারা যে সব চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল তার কোনো তোয়াক্কা না করেই ইহুদী গোত্র বনু কাইনুকা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে।

বদরের পরাজয়ের কারণে মোশরেকদের অবস্থাও ছিলো এই রকম বেসামাল। উত্তেজনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। তারা হিসাব কষে দেখতে লাগলো মোহাম্মদ (স.) ও মুসলিম শিবিরের বিজয়ের ফলাফল কী হতে পারে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, মান-মর্যাদা এমনকি তাদের অস্তিত্বের ওপর এ বিজয় কী ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। এসব বিষয় হিসাব করে দেখার পর তারা এই ধ্বংসাত্মক হুমকি প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তারা ভাবলো যে, এই মুহূর্তেই তা প্রতিহত না করলে পরে হয়তো তার গতি কখনো রোধ করা যাবে না।

মুসলিম শিবিরের শত্রুরা একদিকে যেমন দুর্জয় শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিলো, তেমনি মুসলমানদের ওপর তাদের আক্রোশের মাত্রাও ছিলো তুংগে। পক্ষান্তরে মদীনায় মুসলমানদের প্রস্তুতি ছিলো একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের। তাদের মাঝে এমন কিছু লোকও ছিলো, যারা তখনো পরিপক্কতা অর্জন করেনি। তাছাড়া মুসলিম শিবির তখনো এতটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, যা দ্বারা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বাইরের আগ্রাসন প্রতিহত করা যায়, ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য ও সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি ও পরিবেশ উপলব্ধি করা যায়, সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনের বাস্তব কর্মপদ্ধতি ও তার দায় দায়িত্ব অনুধাবন করা যায়।

একদিকে মোনাফেক তথা নামধারী মুসলমানরা সমাজে প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে জেঁকে বসেছিলো। তাদের মধ্যে সবার শীর্ষে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। তাদের গোত্রীয় বন্ধন তখনো অটুট। এরা মুসলমানদের সমাজে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ায় মুসলিম সমাজে খানিকটা ফাটল বিরাজ করছিলো এবং তা তাদের মূল্যবোধেও প্রভাব বিস্তার করছিলো। আলোচ্য সূরায় ওহুদ যুদ্ধসংক্রান্ত উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করলে এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুরূপভাবে মদীনায় ইহুদীদেরও যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিলো। মদীনার অধিবাসীদের সাথে তাদের আর্থিক লেনদেন ছিলো এবং তাদের সাথে তারা বিভিন্ন রকমের চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। তাদের বৈরিতা তেমন স্পষ্ট ছিল না। আর মুসলমানদের মনে এই উপলব্ধি তেমন পরিপক্ক ছিলো না যে, তাদের আকীদা-বিশ্বাসই তাদের সকল চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি, বাসস্থান ও লেনদেনের মূল ভিত্তি। আদর্শের বাইরে কোনো সম্পর্ক ও বন্ধনের যে কোনোই স্থায়িত্ব নেই সে কথাও মুসলমানরা তখনো ভালোমতো বুঝে উঠতে পারেনি। এ কারণেই ইহুদীরা মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে নানাভাবে নাক গলানো, সন্দেহ-সংশয় ও অনৈক্য সৃষ্টি এবং প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাচ্ছিলো। মুসলমানদের কেউ কেউ সরলতার দরুণ ইহুদীদের কথাবার্তা শুনতো ও তা দ্বারা মাঝে মাঝে প্রভাবিত হতো। এমনকি রসূল (স.) ইহুদীদের ষড়যন্ত্র থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার জন্য কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তাঁকে তা থেকে বিরত রাখতেও কেউ কেউ এগিয়ে আসতে কুণ্ঠাবোধ করতো না। (যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই স্বয়ং নিজে বনু কাইনুকার ব্যাপারে রসূল (স.)-এর কাছে প্রবলভাবে সুপারিশ করেছিল।)

অপরদিকে মুসলমানরা বদর যুদ্ধে সহজতম উপায়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে একটি পরিপূর্ণ ও গৌরবজনক বিজয় অর্জন করেছিলো। মুসলমানরা সংখ্যায় ছিলো মুষ্টিমেয় এবং তাদের সাজ সরঞ্জামেরও ছিল প্রচন্ড অভাব। তা সত্ত্বেও বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত বিশাল কোরায়শ বাহিনীর সাথে তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে তারা বিজয়ী হয়।

মোশরেক বাহিনীর সাথে আল্লাহর বাহিনীর প্রথম দফা যুদ্ধে এ বিজয় ছিল মহান আল্লাহর এক পরিকল্পিত অনুগ্রহের ফল। এর পেছনে যে কী গভীর প্রজ্ঞাময় রহস্য লুক্কায়িত ছিলো, আজ তার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। সম্ভবত উদীয়মান ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনকে সেদিনকার সেই ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের মুখে টিকিয়ে রাখা, উপরন্তু তার সক্রিয় অস্তিত্ব প্রমাণ করা ও তাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়াই ছিলো এই বিজয় দানের উদ্দেশ্য।

কিন্তু মুসলমানদের মনে এই ব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত নীতি এত সহজ ও সরল নয়, আল্লাহর এই নীতি অনুসারে বিজয় কঠোর শর্ত সাপেক্ষ। লোক তৈরী, আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি রক্ষা, প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ, ইসলামের নীতিমালার অণুসরণ, নেতার আনুগত্য ও শৃংখলা, মনের কূ-প্ররোচনা ও রণাংগনের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি– এ সবই বিজয়ের জন্য অপরিহার্য। ওহুদ যুদ্ধের পরাজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে মুসলমানদেরকে এই বিষয়গুলো শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে। অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও জীবন্তভংগীতে বিষয়টি এ সূরায় তুলে ধরা হয়েছে। কোন কোন কাজ এই পরাজয়ের কারণ হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপদেশ দেয়া হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, এই শিক্ষাটুকু মুসলমানদেরকে অনেক মূল্য দিয়ে অর্জন করতে হয়েছে। তাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, হযরত হামযা (রা.)-এর মতো মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বকে হারাতে হয়েছে। এর চেয়েও কঠিন ও মর্মন্তুদ ব্যাপার এই যে, তাদের প্রাণপ্রিয় নবী (স.)-কে পর্যন্ত আহত ও দাঁতভাংগা অবস্থায় পড়ে থাকার মতো হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে হয়েছে। রসূল (স.)-এর চোয়ালের ভেতরে শিরোস্ত্রাণের ভাংগা লৌহখন্ড ঢুকে গিয়েছিলো। মুসলমানদের জন্যে এর চেয়ে মর্মস্পর্শী ও মর্মঘাতী ব্যাপার আর কিছুই ছিলো না!

ওহুদ যুদ্ধ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর পর্যালোচনা এই সূরার বিরাট অংশ জুড়ে বিস্তৃত। ইসলামী জীবনাদর্শের সাথে বাতিলের যাতে লেশমাত্রও মিশ্রণ না থাকে, তাওহীদের বিষয়টি যাতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের উস্কে দেয়া সন্দেহ-সংশয় যাতে বিদূরিত হয়– চাই সে উস্কানি আহলে কেতাব গোষ্ঠীর নিজস্ব আদর্শিক বিভ্রান্তির কারণে হোক অথবা মুসলমানদের মধ্যে আদর্শিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির কূ-মতলবে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানি হোক– সে জন্য নানাবিধ নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

একাধিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, ১ থেকে ৮৩ নং আয়াত পর্যন্ত অংশ ইয়ামেনের নাজরান প্রদেশ থেকে আগত খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিলো। এই প্রতিনিধি দলটি এসেছিল ৯ম হিজরীতে। তবে আমার কাছে এই আয়াতগুলোর নাযিল হওয়ার সময়কাল নবম হিজরীতে হওয়ার মতটি মেনে নেয়া কষ্টকর। কেননা এ সূরার বর্ণনাভংগী থেকে স্পষ্টতই মনে হয় যে, এটি হিজরতের পরের প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছে। যখন মুসলমানদের সমাজ ছিল শৈশবাবস্থায় এবং ইহুদী ও অন্যান্য বাতিল শক্তির প্রভাব তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের ওপর ছিলো অত্যন্ত প্রবল।

তবে এই আয়াতগুলোর নাজরানী প্রতিনিধি দল উপলক্ষে নাযিল হওয়ার পক্ষের বর্ণনাটি সঠিক হোক বা ভুল হোক, সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, খৃষ্টানদের সন্দেহ সংশয় বিশেষত হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত দ্বিধা-সংশয় নিরসন ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামের খালেস তাওহীদের তত্ত্বটি এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া এ সূরায় খৃষ্টানরা যে আকীদাগত ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাদেরকে সেই তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, যা তাদের কাছে রক্ষিত অবিকৃত কেতাবে বিধৃত হয়েছে।

সূরার এই অংশটিতে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে কিছু সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং মদীনার আহলে কেতাবদের চক্রান্ত থেকে মুসলমানদের সাবধান করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা এই যে, সূরার প্রায় অর্ধেক জুড়ে বিস্তৃত এই অধ্যায়টি (আয়াত ১-৮৭ আয়াত) ইসলামী আদর্শ এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপে প্রচলিত সমকালীন অন্যান্য বাতিল মতাদর্শের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একটি দিক তুলে ধরেছে। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেহাৎ তাত্তিক ও মতাদর্শগত

দ্বন্দ্ব-সংঘাত নয়, বরং এটা হচ্ছে সদ্যপ্রসূত মুসলিম সমাজ ও তার বিরুদ্ধে ওঁৎপাতা শত্রুদের মাঝে বেধে যাওয়া সর্বাত্মক যুদ্ধের একটি দিকমাত্র। ইসলামের এই দুশমনরা চতুর্দিক থেকে আসকারা পেয়ে আসছিল। যুদ্ধে তারা সব রকমের অস্ত্র ও ব্যবহার করতো, আর এ ক্ষেত্রে তাদের সর্ব প্রধান অস্ত্র ছিল মুসলমানদেরকে আদর্শিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত করার চেষ্টা। এই আদর্শিক যুদ্ধ মূলত এক চিরস্থায়ী যুদ্ধ, যা আজ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ ও তার শত্রুদের মধ্যে বিরাজমান রয়েছে। নাস্তিক কাফের গোষ্ঠী, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ, এরা সবাই চিন্তা-চেতনায় ও চরিত্রে আগে যেমনটি ছিলো, এখনও তেমনি আছে এবং চিরকাল তারা তেমনি থাকবে।

সূরার মূল বক্তব্য অধ্যয়ন করলে বুঝা যায় যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আগে যেমন ছিলো, এখনও তেমনি আছে এবং কোরআনই ইসলামী আন্দোলনের শক্তি ও প্রেরণার উৎস এবং তার চালিকাশক্তি, কোরআনই মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন পথপ্রদর্শক। হক ও বাতিলের চলমান সংগ্রামে পরম হিতাকাংখী কোরআনকে উপেক্ষা করা একমাত্র সেই উন্মাদ ও হতচ্ছাড়া ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব, যে যুদ্ধের সময়ে বিজয় অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকে। নিজেকে অথবা জাতিকে প্রতারিত করে চরম শৈথিল্য অথবা অবিমৃশ্যকারিতা দ্বারা মুসলমানদের চিরন্তন ও প্রাচীনতম দুশমনদের সেবাদাসের ভূমিকা পালন করে।

সূরার প্রথম অধ্যায়ে যে আলোচনা ও নির্দেশনাসমূহ রয়েছে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আসমানী কেতাব অমান্যকারী ইহুদী ও খৃষ্টানরা মুসলমান ও ইসলামের প্রতি কী মনোভাব পোষণ করতো। বিশেষত নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাদের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

'তিনিই তোমার প্রতি কেতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কেতাবের আসল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে, তারা বিভ্রান্তি ছড়ানো ও মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে রূপকগুলোর অনুসরণ করে। অথচ সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না।' (আয়াত, ৭)

'তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যারা কেতাবের কিছু অংশ পেয়েছে। আল্লাহর কেতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল, যাতে তাদের মধ্যে মীমাংসা করা যায়। অতপর তাদের একদল তা অমান্য করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।' (আয়াত, ২৩) 'হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা ইবরাহীমের ব্যাপারে বাদানুবাদ করো অথচ তাওরাত ও ইনজীল তার পরেই নাযিল হয়েছে।' (আয়াত, ৬৫) 'কেতাবধারীদের কোনো কোনো দলের আকাংখা, যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে পারে।' (আয়াত, ৬৯) হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা আল্লাহর কালামকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরাই তার প্রবক্তা।' (আয়াত, ৭০) 'হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যার ভেজাল করছো এবং সত্যকে গোপন করছো? অথচ তোমরা তা জানো।' (আয়াত, ৭১)

'কেতাবধারীদের একদল বললো, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথমভাগে মেনে নাও, আর দিনের শেষভাগে অস্বীকার করো, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। .... ' (আয়াত, ৭২-৭৩)

'কেতাবধারীদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যার কাছে একটি দিনার গচ্ছিত রাখলেও তা সে ফেরত দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এটা এ জন্য যে, তারা বলেছে, নিরক্ষরদের অধিকার বিনষ্ট করতে আমাদের কোনো দোষ নেই.....।' (আয়াত, ৭৫)

'তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কেতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে করো যে, তারা কেতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে, তা

মোটেই কেতাবের অংশ নয়। তারা বলে যে, এ সব কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নয়। ......' (আয়াত, ৭৮)

'তুমি বলো, হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা আল্লাহর কেতাব অমান্য করছো, অথচ তোমরা যা কিছু করো, তা আল্লাহর জানা আছে।' (আয়াত, ৯৮)

'বলো, হে কেতাবধারীরা! কেন তোমরা আল্লাহর পথে ঈমানদারদেরকে বাধা দান করো? তোমরা তাদের দ্বীনের মধ্যে বক্রতা অনুপ্রবেশ করানোর পন্থা অনুসন্ধান করো, অথচ তোমরা এ পথের সত্যতা প্রত্যক্ষ করছো।' (আয়াত, ৯৯)

'দেখো, তোমরা তাদেরকে ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কেতাবই বিশ্বাস করো। যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তারা বলে হাঁ আমরা তোমাদের কেতাবকে মানি পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের ওপর রোষ বশত আংগুল কামড়ায়।' (আয়াত, ১১৯)

'তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা খুশী হয়।' (আয়াত, ১২০)

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলমানদের শত্রুরা তাদের সাথে শুধু যে রণাংগণে তরবারি ও বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করতো– তাই নয় এবং তারা শুধু যে তাদের অন্যদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি দিয়ে লড়াই করতে প্ররোচিত করতো তাও নয়, বরং তাদের সাথে আকীদা বিশ্বাস ও আদর্শ নিয়েও লড়াই করতা। তাদের মনে নানা রকমের সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতো।

মূলত আজকের মতো সেকালেও তারা বুঝতো যে, এই মুসলমান জাতিকে আঘাত করতে হলে এভাবেই আঘাত করতে হবে। কেননা, এ জাতি আকীদা ও আদর্শের ব্যাপারে দুর্বল না হলে আর কোনো কিছুতে দুর্বল হবে না! তার আত্মা পরাজিত না হলে সে কখনো পরাজিত হয় না। এ জাতির ঈমান যতক্ষণ মযবুত থাকে, ততক্ষণ তার শত্রুরা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলিম জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, যে তাদের ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসকে শিথিল ও নড়বড়ে করে দেয়, তাদেরকে আল্লাহর পথ ও জীবন পদ্ধতি থেকে হটিয়ে দেয় এবং তাদের শত্রুদের ব্যাপারে প্রতারণা করে এবং শত্রুদের সূক্ষ্ম চক্রান্ত সম্পর্কে তাদের উদাসীন ও বিভ্রান্ত করে।

মুসলিম জাতি ও তার শত্রুদের মধ্যকার প্রথম লড়াই হচ্ছে এই আকীদা বিশ্বাসের লড়াই। এমনকি মুসলমানদের শত্রুরা যখন তাদের অর্থসম্পদ, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায়, তখনও তারা সর্বপ্রথম তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে বিনষ্ট করার চেষ্টা চালায়। কেননা, তারা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে যে, মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস যতোদিন অটল ও অবিকৃত থাকে, ততোদিন তাদের পরাজিত করা যায় না। যতোক্ষণ তারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের ওপর অবিচল থাকে, ততোদিন তারা তাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বুঝতে পারে। এ জন্য মুসলিম জাতির শত্রুরা, তাদের ক্রীড়নক ও দালালরা সকল শক্তি দিয়ে চেষ্টা করে তাদেরকে লড়াইর প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখতে। তারা জানে যে, এ কাজটি করতে পারলে এরপর ইচ্ছামতো তাদের শোষণ করা যাবে এবং গোলামীর নিগড়ে আবদ্ধ করা যাবে। কেননা, তাদের আকীদা-বিশ্বাসের দৃঢ়তা তখন আর তাদের পথ আগলে রাখতে পারবে না।

এরপর এই আকীদা ও আদর্শের বিরুদ্ধে শত্রুদের চক্রান্ত ক্রমেই শানিত হবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের আকীদা-আদর্শের ব্যাপারে সন্দেহে ফেলে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্যকে শিথিল করে দেবে। এ কথাই এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে,

'কেতাবধারীদের একটি গোষ্ঠী তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিতে আগ্রহী'। বস্তুত এটা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের স্থায়ী গোপন দুরভিসন্ধি।

এ কারণে কোরআন এই বিষাক্ত অস্ত্রটি ধ্বংস করতে চেয়েছে সবার আগে। সে মুসলিম জাতিকে তার আকীদা ও আদর্শের ওপর দৃঢ় ও অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেতাবধারীরা তাদের মনে যেসব সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করতো তা দূর করেছে, ইসলামের মহাসত্য তত্ত্বকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে এবং মুসলিম জাতিকে বুঝিয়েছে এই পৃথিবীতে তাদের পরিচয় কী এবং তাদের গুরুত্ব কতোটুকু, আর মানব জাতির ইতিহাসে তাদের আদর্শের ভূমিকা কী। কোরআন তাদেরকে ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করেছে, শত্রুদের গোপন উদ্দেশ্য এবং নোংরা ফন্দি-ফিকিরের মুখোশ তাদের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ফাঁস করে দিয়েছে। এই বিদ্বেষ ও দুরভিসন্ধির কারণ এই যে, আল্লাহর কাছে মানব ইতিহাসে মুসলিম জাতির অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ।

কোরআন মুসলমানদের কাছে এ সত্যও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, সৃষ্টিজগতে শক্তির ভারসাম্য আসলে কিভাবে নির্ণীত হয়। সে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ইসলামের শত্রুরা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুর্বল ও তুচ্ছ। কেননা, আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে এবং নবীদেরকে হত্যা করে তারা গোমরাহ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অতপর আল্লাহ তায়ালা যে মুসলমানদের পক্ষে আছেন, তিনি যে সমগ্র বিশ্ব জগতের শরীকবিহীন নিরংকুশ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজাধিরাজ এবং তিনি সম্প্রতি বদরের ময়দানে কাফেরদের যেমন ধ্বংস করেছেন, তেমনি এই কেতাবধারীরা কাফেরদেরকেও অচিরেই চরম শাস্তি দেবেন। এই হুমকি, হুশিয়ারী ও নির্দেশাবলী নিম্নের আয়াতগুলোতে লক্ষণীয় ঃ

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তিনি তোমার প্রতি কেতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে, যা পূর্ববর্তী কেতাবসমূহকে সমর্থন করে। ইতিপূর্বে নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল, মানুষের হেদায়াতের জন্য এবং নাযিল করেছেন হক বাতিল বাছাই করার মাপকাঠি ....।' (আয়াত, ২-৫)

'যারা কুফরীতে লিপ্ত, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি কখনো তাদের কাজে আসবে না। আর তারা দোযখের কাষ্ট হবে।......কাফেরদেরকে বলে দাও, খুব শিগগিরই তোমরা পরাভূত হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। সেটা কতোই না নিকৃষ্ট স্থান! নিশ্চয় দু'টো দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা নিজেদের চোখে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিলো। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি যোগান........।' (আয়াত, ১০-১৩)

'নিসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে একমাত্র ইসলাম। যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতভেদে লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র বিদ্বেষবশত। ....।' (আয়াত, ১৯)

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন বিধান তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।' (আয়াত, ৮৫)

'বলো, হে আল্লাহ তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দাও, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশক্তিমান।' (আয়াত, ২৮)

'মানুষদের মধ্যে ইবরাহীমের নিকটতম সম্পর্কের অধিকারী হলো এই নবী, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তার যথার্থ অনুসরণ করেছে ....।'(আয়াত, ৬৮)

'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত .....।' (আয়াত, ৮৩)

'হে মোমেনরা! তোমরা যদি কেতাবধারীদের কোনো ফেরকার কথা মানো, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফেরে পরিণত করবে। তোমরা কেমন করে কাফের হতে পারো, অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়া হয় এবং তোমাদের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর রসূল বিদ্যমান। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তারা সরল পথের সন্ধান পাবে। .... এভাবেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলো বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও।' (আয়াত, ১০০-১০৩)

'তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী থাকবে। কিতাবধারীরা যদি ঈমান আনতো, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। তাদের মধ্যে কতক মোমেন আছে ঠিকই, তবে অধিকাংশই ফাসেক। ..... ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমালংঘন করেছে।' (আয়াত, ১১০-১১৩)

'হে মোমেনরা! তোমরা মোমেনদেরকে ছাড়া আর কাউকে অন্তরংগরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাকলেই তারা খুশী। শত্রুতাজনিত বিদ্বেষ তাদের মুখে ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে আছে তা আরো জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করলাম, যদি তোমরা তা অনুধবন করতে পারো। দেখো, তোমরাই তাদেরকে ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। .... আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের চক্রান্তে তোমাদের কোনোই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তাদের সকল কর্মকান্ড আল্লাহর আয়ত্বাধীন।' (আয়াত, ১১৮-১২০)

এই দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ অভিযান, যার কতিপয় আয়াত এখানে উদ্ধৃত করলাম, তা থেকে এবং এর অন্যান্য নির্দেশাবলী থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা ঃ

১. মদীনার কেতাবধারীরা মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসকে শিথিল করে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কূ-মতলবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো। এ জন্য তারা যাবতীয় উপায় উপকরণ কাজে লাগাচ্ছিলো।

২. তাদের এই ষড়যন্ত্র মুসলমানদের ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এ কারণেই সূরার এই অংশটিতে এ বিষয়ে এতো দীর্ঘ ও বিচিত্র ভাষণের অবতারণা করা হয়েছে।

৩. বহু শতাব্দী পরে আজও আমরা লক্ষ্য করছি যে, সে একই শত্রুগোষ্ঠী ইসলামের দাওয়াত ও দাওয়াতকারীদের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীতে আগ্রাসী তৎপরতায় নিয়োজিত রয়েছে। সে কেতাবধারী তথা ইহুদী, খৃষ্টান ও তাদের ক্রীড়নকরা সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত। এ কারণেই পরম প্রজ্ঞাময় ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা উক্ত শত্রুদের ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত এই জ্ঞানকেই চিরস্থায়ী আলোকবর্তিকা হিসেবে জ্বালিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে পরবর্তী মুসলিম প্রজন্মগুলো তাদের শত্রুদেরকে চিনতে ও তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে পারে।

সূরার দ্বিতীয় অংশটি ওহুদ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট। সেই সাথে ইসলামী আকীদা ও আদর্শ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য এবং সেই সব তথ্যের ভিত্তিতে মুসলিম সংগঠনকে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এই অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি ও মানসিক অবস্থাকে এখানে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা এবং তাদের সামষ্টিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দৃশ্য এখানে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সূরার প্রথমোক্ত অংশের সাথে এই অংশের সম্পর্ক সুবিদিত ও সুস্পষ্ট। বস্তুত এ দ্বিতীয় অংশটি ইসলামী আদর্শের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের কাজটিও সম্পন্ন করে। বিশেষত যুদ্ধ বিগ্রহ উপলক্ষে এ কাজটি অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠভাবে আঞ্জাম দেয়া যায়। কেননা এই সময়ে আদর্শিক শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী মানসিক অবস্থা বেশী বিরাজ করে। অনুরূপভাবে পৃথিবীতে সত্যের দাওয়াত দানকারী সংগঠনকে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার দৃঢ়তা অর্জনে সাহায্য করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাস্তব ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে তাকে জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর চিরস্থায়ী নীতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী সংগঠনকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে সূরার এই অংশের আলোচনা ও বক্তব্যের অবদান ও গুরুত্ব কতোখানি, সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা এখানে দুরূহ। যেহেতু সে অংশটি চতুর্থ পারায় অবস্থিত, তাই বাদবাকি আলোচনা যথাস্থানে করবো ইনশাআল্লাহ।

ওহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়ের পরে সূরার যে পরিশিষ্ট রয়েছে, সেই অংশটির প্রতি এবার একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। এ অংশটিকে গোটা সূরার সংক্ষিপ্তসার বলা চলে। এ অংশটির শুরুতে রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি দেখে শিক্ষা গ্রহণ এবং মোমেনদের হৃদয়ে তা কী অনুভূতি জাগায় সে সংক্রান্ত আলোচনা। এই অনুভূতির ফলে মন থেকে যে দোয়া বেরিয়ে আসে, তা সে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের ক্রমাবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। যারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সকল অবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করে ও বলেঃ হে আমাদের প্রভু, তুমি এই বিশ্ব জগতকে অর্থহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি। অতএব, তুমি আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি দাও।....... হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বায়ককে ঈমানের জন্য আহ্বান জানাতে শুনেছিলাম যে, তোমাদের প্রভুর ওপর ঈমান আনো। অতপর আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে প্রভু! আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদের সমস্ত গুনাহের কাফফারার ব্যবস্থা করে দাও এবং সৎলোকদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও...... ।' (আয়াত, ১৯০-৯১)

এ দোয়া আদর্শিক নিষ্ঠা, সরলতা এবং অন্তরের একাগ্রতা ও আল্লাহভীতি ফুটিয়ে তুলেছে।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দোয়া কবুলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সেই সাথে মোমেনদের হিজরত, জেহাদ ও আল্লাহর পথে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্ট স্বীকার করার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে,

'অতপর তাদের প্রতিপালক তাদের দোয়া কবুল করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তির কোনো কাজই নষ্ট করি না, চাই সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী হোক। তোমাদের একজন অপরজনের আপন। যারা হিজরত করেছে, আপন বাড়িঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতন ভোগ করেছে, লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে, তাদের সমস্ত গুনাহ আমি অবশ্যই ক্ষমা করবো এবং এমন বেহেশতে আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এটা হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান।'

এখানে ওহুদ যুদ্ধ, তার ঘটনাবলী ও প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইংগীত দেয়া হয়েছে।

এর পরবর্তী আয়াতে কেতাবধারীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। সূরার প্রথমাংশ জুড়ে তাদের বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছিলো। এখানে তাদের প্রসংগের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা যে সত্যের অনুসারী তা সকল কেতাবধারী কিন্তু অস্বীকার করে না। তাদের মধ্যে অনেকে এ সত্য স্বীকার করে এবং তার সাক্ষ্যও দেয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'কেতাবধারীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা আল্লাহর প্রতি, তোমাদের প্রতি ও তাদের প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনে, তারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং আয়াতগুলোকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে না।'

সূরার শেষে মুসলমানদেরকে ঈমান সহকারে ধৈর্য, তাকওয়া, প্রতিরক্ষা ও একাত্মতার আহ্বান জানানো হয়েছে,

'হে ঈমানদাররা! ধৈর্য ধারণ করো, একাত্মতা প্রদর্শন করো এবং প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হও। আল্লাহকে ভয় করো। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।'

এ উপসংহার সূরার সামগ্রিক কাঠামো ও বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ সূরার আরো তিনটি বিষয় এমন রয়েছে, যার আলোচনা ছাড়া সূরাটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পন্ন হয় না। এ তিনটি বিষয় সমগ্র সূরায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। প্রথমটি হচ্ছে 'আদ্-দ্বীন' ও 'আল ইসলাম'-এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ।

'আদ্-দ্বীন' এর যে সংজ্ঞা আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন এবং যে রূপ তাঁর ইপ্সিত ও মনোনীত, তা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের সামগ্রিক রূপ নয় বরং এটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বহু পন্থার একটি পন্থা। এটি হচ্ছে সর্বাত্মক ও পূর্ণাংগ তাওহীদের পন্থা। বিশ্ব প্রকৃতিতে বিরাজমান যাবতীয় সৃষ্টি যেমন তার স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তেমনি মানুষও স্বভাবগতভাবেই স্রষ্টার প্রতি বশ্যতা প্রকাশ করে। এই স্রষ্টা ইলাহ বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ও রক্ষক যে একই সত্ত্বা এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালা, সে কথাই এই সূরায় এবং কোরআনের সর্বত্র ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর সৃজন ব্যতীত কোন বস্তু সৃজিত হয় না, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সৃষ্টিজগতকে কেউ নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে না। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার যে 'দ্বীন' গ্রহণ করেন তা হচ্ছে একমাত্র 'ইসলাম'। অর্থাৎ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের কাছে পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ এবং জীবনের সকল বিভাগ ও অংগনের জন্য একমাত্র এই উৎস থেকে নির্দেশনা গ্রহণ। আল্লাহর কেতাবের কাছ থেকে যে কোনো সমস্যার সমাধান গ্রহণ করা এবং যে সব রসূলের কাছে আল্লাহর কেতাব নাযিল হয়েছে, তাদেরকে অনুসরণ করা। বস্তুত আল্লাহর দ্বীন মূলত একই দ্বীন এবং এই দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। মনমগযে ও বাস্তব কর্মকান্ডে ইসলামের বাস্তব রূপ ও তাৎপর্য এটাই। এই অর্থে মুসলিম জাতি সর্বযুগের সকল নবীর অনুসারী– যদি তাদের ইসলামের অর্থ হয় আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করে তাঁর দেয়া জীবনবিধানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করা।

বস্তুত উক্ত তাওহীদ সম্বলিত ইসলাম এই সূরার একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। এটি সূরার ৩০টিরও বেশী জায়গায় সুস্পষ্ট ভাষায় আলোচিত হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে এ বিষয়ের আলোচনার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি,

আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।' (আয়াত ২) 'আল্লাহ, ফেরেশতারা ও জ্ঞানীরা ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই'...... (আয়াত ৮) 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র ধর্ম' (আয়াত ১৯) তারা যদি তোমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসারীরা একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করলাম ....' (আয়াত ২০)।

'তুমি কি দেখোনি, যারা কেতাবের কিছু অংশ পেয়েছে, তাদেরকে নিজেদের সমস্যার মীমাংসা করার জন্য ডাকা হয়। অতপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় ও উপেক্ষা করে।' (আয়াত ২৩) 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসলে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসেন।' (আয়াত ৩১)

'বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করো! .....' (আয়াত ৩২)

'হাওয়ারীরা বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, ...(আয়াত ৫২-৫৩)

'বলো, হে আহলে কেতাব, এসো আমাদের ও তোমাদের অভিন্ন একটি অভিন্ন কালেমার দিকে। তাহলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো গোলামী করবো না, ... ' (আয়াত ৬৪)

'ইবরাহীম ইহুদীও ছিলো না, খৃষ্টানও ছিল না, তবে সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম। সে মোশরেক ছিল না।' (আয়াত ৬৭)

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।' (আয়াত ৮৫) ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ আরো বহু আয়াত রয়েছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এ সূরায় আলোচিত হয়েছে, তা হলো, আপন প্রতিপালকের সাথে মুসলমানদের অবস্থান, তাঁর কাছে তাদের আত্মসমর্পণ এবং আল্লাহর প্রতিটি নির্দেশকে গ্রহণ, অনুসরণ ও হুবহু আনুগত্য। এ বিষয়েরও কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি,

'যারা জ্ঞানে পরিপক্ক তারা বলে, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি। সব কিছুই আমদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। .....' (আয়াত ৭, ৮, ৯) 'যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও .....' (আয়াত ১৬-১৭) 'হাওয়ারীরা বললো; আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, তুমি সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।' (আয়াত ৫২-৫৩) 'তোমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আবির্ভূত করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্য .....' (আয়াত ১১০) 'আহলে কেতাবের মধ্যে অনেকে এমনও আছে, যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং গভীর রাতে সেজদা করে। ......' (আয়াত ১১৩-১১৪) এমন অনেক নবী ছিলো, যার সাথে বহু সংখ্যক সাথী যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আল্লাহর পথে দুঃখকষ্ট ভোগ করার কারণে তারা কখনো দুর্বল হয়নি। মনোবল হারায়নি, হতোদ্যমও হয়নি। ....' (আয়াত ১৪৬-১৪৭)

'যারা আঘাত পেয়েও আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্য থেকে নিষ্ঠাবান ও মোত্তাকীদের জন্য রয়েছে বিরাট পুরস্কার।' (আয়াত ১৭১-১৭২) যারা ওঠা, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে বলে, হে আমাদের প্রভু, তুমি এই সব কিছুকে বৃথা সৃষ্টি করনি। ......' (আয়াত ১৯১-১৯৪)

'কেতাবধারীদের মধ্যে এমনও অনেকে আছে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে, তাদের ওপর ও তোমাদের ওপর যে বিধান নাযিল হয়েছে তার ওপরও ঈমান আনে এবং আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকে ....' (আয়াত ১৯) ইত্যাকার আরো বহু আয়াত।

তৃতীয় যে বিষয়টি এ সূরায় অনেকখানি স্থান জুড়ে অবস্থান করছে তাহলো, অমুসলিমদের বন্ধুত্ব থেকে সতর্কীকরণ। কাফেরদের হীনতা ও নীচতা তুলে ধরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, যারা জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করে না, সেই কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও মৈত্রী রেখে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়টির প্রতি আমি ইতিপূর্বেও আভাস দিয়েছি, তবে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে কিছু নমুনা তুলে ধরছি,

'মোমেনদের পক্ষে উচিত নয় মোমেদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা। ....।' (আয়াত ২৮-২৯) 'কেতাবধারীদের একটি গোষ্ঠী তোমাদের বিপথগামী করতে ভালোবাসে ....।' (আয়াত ৬৯) 'হে মোমেনরা! তোমরা যদি আহলে কেতাবের অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর তোমাদেরকে পুনরায় কাফেরে পরিণত করবে .....।' (আয়াত ১০০-১০৪)

'হে মোমেনরা! তোমরা কাফেরদের অনসরণ করলে তারা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ......।' (আয়াত ১৪৯-১৫১) 'দেশে দেশে কাফেরদের পরিভ্রমণ তোমাকে যেন প্রতারিত না করে ......।' (আয়াত ১৯৬-১৯৭)

'আহলে কেতাব গোষ্ঠী তোমাদেরকে কিছু উত্যক্ত করা ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এলে নিজেরাই পরাভূত হবে, অতপর তাদেরকে আর সাহায্য করা হবে না। তারা যেখানেই থাকুক, তাদের জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে।' (আয়াত ১১১-১১২)

'হে মোমেনরা! তোমরা মোমেনদেরকে ছাড়া আর কাউকে ঘনিষ্ঠভাগে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অনিষ্ট করার কোন সুযোগই হাতছাড়া করে না। তোমরা দুঃখ কষ্টে জর্জরিত থাক এটাই তারা পছন্দ করে। .....' (আয়াত ১৮)

এই তিনটি আলোচিত বিষয় পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পরের সাথে সমন্বিত। ইসলামী আদর্শ, তাওহীদ-তত্ত্ব, মানব জীবনে তাওহীদ-তত্ত্বের দাবী ও চাহিদা, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মানুষের চেতনা ও অনুভূতি জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে তার অবদান এবং সর্বশেষে আল্লাহর দুশমনদের প্রতি মানুষের একমাত্র সমুচিত ভূমিকার বিশ্লেষণে এই তিনটি বক্তব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সূরার মূল পাঠ যে আরো বেশী জীবন্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ তা যথাস্থানে দেখা যাবে। মনে রাখতে হবে, এ সূরা একটা যুদ্ধের পরিবেশে নাযিল হয়েছে। এই যুদ্ধ যেমন চলছিল বদরের রণাংগণে, তেমনি চলছিল আদর্শের অংগনে, মানুষের হৃদয়-জগতে। এ কারণেই এর প্রভাব আন্দোলনে, চেতনার জাগৃতিতে এবং উদ্বুদ্ধকরণে এত বেশী জীবন্ত ও বিস্ময়কর।

এবার আসুন আমরা সূরার জীবন্ত, শক্তিমান ও সুন্দর মূল পাঠের দিকে এগিয়ে যাই।

وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا
تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ ۙ
كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا لَا
تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ
إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٨﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا
رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۖ
وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿١٠﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ۙ وَٱلَّذِينَ

কিছু হচ্ছে (সুস্পষ্ট) দ্ব্যর্থহীন আয়াত, সেগুলোই হচ্ছে কেতাবের মৌলিক অংশ, (এ ছাড়া) বাকী আয়াতগুলো হচ্ছে রূপক (বর্ণনায় বর্ণিত, মানুষের মাঝে) যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা (এগুলোকে কেন্দ্র করেই নানা ধরনের) ফেতনা ফাসাদ (সৃষ্টি করে) এবং আল্লাহর কেতাবের (অপ-) ব্যাখ্যা করার উদ্দেশে এসব (রূপক) আয়াত থেকে কিছু অংশের অনুসরণ করে, (মূলত) এসব (রূপক) বিষয়ের ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউই জানে না। (এ কারণেই) যাদের মধ্যে জ্ঞানের গভীরতা আছে তারা (এসব আয়াত সম্পর্কে) বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি, এগুলো সবই তো আমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (আমাদের দেয়া হয়েছে। সত্য কথা হচ্ছে, আল্লাহর হেদায়াতে) প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ৮. (তারা আরো বলে,) হে আমাদের মালিক, (একবার যখন) তুমি আমাদের (সঠিক) পথের দিশা দিয়েছো, (তখন আর) তুমি আমাদের মনকে বাঁকা করে দিয়ো না, একান্ত তোমার কাছ থেকে আমাদের প্রতি দয়া করো, কেননা যাবতীয় দয়ার মালিক তো তুমিই। ৯. হে আমাদের মালিক, তুমি অবশ্যই সমগ্র মানব জাতিকে তোমার সামনে (হিসাব-নিকাশের জন্যে) একদিন একত্রিত করবে, এতে কোন রকম সন্দেহ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা (কখনোই) ওয়াদা ভংগ করেন না।

রুকু ২

১০. যারা (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধান) অস্বীকার করেছে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর (আযাব) থেকে (তাদের বাঁচানোর ব্যাপারে) কোনোই উপকারে আসবে না; (প্রকারান্তরে) তারাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। ১১. (তাদের পরিণতি হবে) ফেরাউন ও

مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۚ

وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ

وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ

فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۚ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى

كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ

مَنْ يَّشَآءُ ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زُيِّنَ

لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ

الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ

وَالْحَرْثِ ۚ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ

الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ

তাদের পূর্ববর্তী (না-ফরমান) জাতিসমূহের মতো; তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলো, অতএব তাদের অপরাধের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের (শক্ত করে) পাকড়াও করলেন; (বস্তুত) শাস্তি প্রয়োগে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত কঠোর। ১২. (হে নবী,) যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে সেসব (বিদ্রোহী) কাফেরদের তুমি বলে দাও, অচিরেই তোমরা (এ দুনিয়ায় লাঞ্ছিত) পরাজিত হবে এবং (পরকালে) তোমাদের জাহান্নামের (আগুনের) কাছে জড়ো করা হবে; (আর জাহান্নাম!) তা তো হচ্ছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট অবস্থান! ১৩. সে দল দু'টোর মধ্যে তোমাদের জন্যে (শিক্ষণীয়) কিছু নিদর্শন (মজুদ) ছিলো, যারা (বদরের) সম্মুখসমরে একে অপরের সামনাসামনি হয়েছিলো; (এদের মধ্যে) এক বাহিনী লড়ছিলো আল্লাহর (দ্বীনের) পথে, আর অপর বাহিনীটি ছিলো (অবিশ্বাসী) কাফেরদের, (এ সম্মুখসমরে) তারা চর্মচক্ষু দিয়ে তাদের (প্রতিপক্ষকে) তাদের দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিলো, (তারপরও) আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে সাহায্য (ও বিজয়) দান করেন; এ (সব ঘটনার) মাঝে সেসব লোকের জন্যে অনেক কিছু শেখার আছে যারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। ১৪. নারী জাতির প্রতি ভালোবাসা, সন্তান সন্ততি, কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা রূপা, পছন্দসই ঘোড়া, গৃহপালিত জন্তু ও যমীনের ফসল (সব সময়ই) মানব সন্তানের জন্যে লোভনীয় করে রাখা হয়েছে; (অথচ) এ সব হচ্ছে পার্থিব জীবনের কিছু ভোগের সামগ্রী (মাত্র! স্থায়ী জীবনের) উৎকৃষ্ট আশ্রয় তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে। ১৫. (হে নবী,) তুমি

رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا
وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ
وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لا
وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف وَمَا
اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ

(তাদের) বলো, আমি কি তোমাদের এগুলোর চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো বস্তুর কথা বলবো? (হ্যাঁ, সে উৎকৃষ্ট বস্তু হচ্ছে তাদের জন্যে,) যারা আল্লাহকে ভয় করে এমন সব লোকদের জন্যে তাদের মালিকের কাছে রয়েছে (মনোরম) জান্নাত, যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহমান থাকবে (অগণিত) ঝর্ণাধারা এবং তারা সেখানে অনাদিকাল থাকবে, আরো থাকবে (তাদের) পূত পবিত্র সংগী ও সংগিনীরা– (সর্বোপরি) থাকবে আল্লাহ তায়ালার (অনাবিল) সন্তুষ্টি; আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (কার্যকলাপের) ওপর সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। ১৬. যারা বলে, হে আমাদের মালিক, আমরা অবশ্যই তোমার ওপর ঈমান এনেছি, অতপর আমাদের (যা) গুনাহখাতা (আছে তা) তুমি মাফ করে দাও এবং (শেষ বিচারের দিন) তুমি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো। ১৭. এরা হচ্ছে ধৈর্যশীল এবং সত্যাশ্রয়ী, (এরা) অনুগত এবং দানশীল, (সর্বোপরি) এরা হচ্ছে শেষরাতে কিংবা উষালগ্নের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। ১৮. আল্লাহ তায়ালা (স্বয়ং) সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মা'বুদ নেই, ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান মানুষরাও (এই একই সাক্ষ্য দিচ্ছে), আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়। ১৯. নিসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ তায়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। যাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারা (এ জীবন বিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে (বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে) মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, (তাও আবার) তাদের কাছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান

سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَاِنْ حَاجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ
وَمَنِ اتَّبَعَنِ ط وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ
ءَاَسْلَمْتُمْ ط فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ لا وَّيَقْتُلُوْنَ
الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
اَلِيْمٍ ﴿٢١﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ ز وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٢﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ
اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ

আসার পর। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান অস্বীকার করবে (তার জানা উচিত), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ২০. যদি এরা তোমার সাথে (এ ব্যাপারে) কোনোরূপ বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে (তুমি তাদের) বলে দাও, আমি এবং আমার অনুসারীরা (সবাই) আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিয়েছি; অতপর যাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কিতাব দেয়া হয়েছে এবং যারা (কোনো কিতাব না পেয়ে) মূর্খ (থেকে গেছে), তাদের (সবাইকেই) জিজ্ঞেস করো, তোমরা কি সবাই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছো? (হ্যাঁ,) তারা যদি (জীবনের সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেয় তাহলে তারা তো সঠিক পথ পেয়েই গেলো, কিন্তু তারা যদি (ঈমান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে মনে রেখো, তোমার দায়িত্ব হচ্ছে কেবল (আমার কথা) পৌঁছে দেয়া; আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের (কর্মকান্ড নিজেই) পর্যবেক্ষণ করছেন।

রুকু ৩

২১. নিসন্দেহে যারা আল্লাহর (নাযিল করা) নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে, যারা অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করে- হত্যা করে মানব জাতিকে যারা ন্যায় ও ইনসাফ মেনে চলার আদেশ দেয় তাদেরও, এদের তুমি এক কঠোর শাস্তির সুসংবাদ দাও। ২২. (এদের অবস্থা হচ্ছে,) দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই এদের কর্ম ব্যর্থ (ও নিষ্ফল) হয়ে গেছে, (আর এ কারণেই) এদের কোথাও কোনো সাহায্যকারী নাই। ২৩. (হে নবী,) তুমি তাদের সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছো কি, যাদের আমার কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছিলো, অতপর তাদের যখন আল্লাহর কিতাবের (সে অংশের) দিকে ডাকা হলো যা তাদের মধ্যকার

بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ
فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ
لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ
تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ
اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۖ وَتَرْزُقُ

অমীমাংসিত বিষয়সমূহের মীমাংসা করে দেবে, তখন তাদের একদল লোক (এ হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো, (মূলত) এরাই হচ্ছে সেসব লোক যারা (আল্লাহর ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে রাখে। ২৪. এটা এ কারণে যে, এ (নির্বোধ) লোকেরা বলে, (দোযখের) আগুন আমাদের (শরীর) কখনো স্পর্শ করবে না, (আর যদি একান্ত করেও তা হবে) হাতেগনা কয়েকটি দিনের ব্যাপার মাত্র, (মূলত) তাদের নিজেদের ধর্ম বিশ্বাসের মাঝে নিজেদের মনগড়া ধারণাই তাদের প্রতারিত করে রেখেছে। ২৫. অতপর (সেদিন) অবস্থাটা হবে, যেদিন আমি সমগ্র মানব সন্তানকে একত্রিত করবো, যেদিন সম্পর্কে কোনো দ্বিধা সন্দেহের অবকাশ নেই– সেদিন প্রত্যেক মানব সন্তানকেই তার নিজস্ব অর্জিত বিনিময় পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হবে এবং (সেদিন) তাদের ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুম করা হবে না। ২৬. (হে নবী), তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ), তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়েও নিয়ে যাও, যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো; সব রকমের কল্যাণ তো তোমার হাতেই নিবদ্ধ; নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান। ২৭. তুমিই রাতকে দিনের মাঝে শামিল করো, আবার দিনকে রাতের ভেতর শামিল করো; প্রাণহীন (বস্তু) থেকে তুমি (যেমন) প্রাণের আবির্ভাব ঘটাও, (আবার) প্রাণহীন (অসাড়) বস্তু বের করে আনো

مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰفِرِيْنَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ
اللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ
نَفْسَهٗ ۗ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ
أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ
مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ
أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗ أَمَدًا ۢ بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۗ
وَاللّٰهُ رَءُوفٌ ۢ بِالْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ

প্রাণসর্বস্ব (জীব) থেকে এবং যাকে ইচ্ছা তুমি বিনা হিসেবে রেযেক দান করো। ২৮. ঈমানদার ব্যক্তিরা কখনো ঈমানদারদের বদলে অবিশ্বাসী কাফেরদের নিজেদের বন্ধু বানাবে না, যদি তোমাদের কেউ তা করে তবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না, হাঁ তাদের কাছ থেকে কোনো আশংকা (থাকলে) তোমরা নিজেদের বাঁচানোর প্রয়োজন হলে তা ভিন্ন কথা; আল্লাহ তায়ালা তো বরং তাঁর নিজের ব্যাপারেই তোমাদের ভয় দেখাচ্ছেন (বেশী, কারণ তোমাদের) আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ২৯. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা তোমাদের মনের ভেতর কিছু গোপন করে রাখো, কিংবা তা (সবার সামনে) প্রকাশ করে দাও, তা আল্লাহ তায়ালা (ভালোভাবে) অবগত হন; আসমান যমীন ও এর (আভ্যন্তরীণ) সবকিছুও তিনি জানেন, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালা (সৃষ্টিলোকের) সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান, তিনিই সকল শক্তির আধার। ৩০. যেদিন প্রত্যেকেই তার ভালো কাজ সামনে হাযির দেখতে পাবে, যে ব্যক্তির কৃতকর্ম খারাপ থাকবে সে সেদিন কামনা করতে থাকবে যে, তার এবং তার (কাজের) মাঝে যদি দুস্তর একটা তফাৎ থাকতো! আল্লাহ তায়ালা তো তোমাদের তাঁর (ক্ষমতা ও শাস্তি) থেকে ভয় দেখাচ্ছেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সাথে অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

রুকু ৪

৩১. (হে নবী,) তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসো, তাহলে আমার

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

কথা মেনে চলো, (আমাকে ভালোবাসলে) আল্লাহ তায়ালাও তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তিনি তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান। ৩২. তুমি (আরো) বলো, (তোমরা) আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের কথা মেনে চলো, (এ আহ্বান সত্ত্বেও) তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় (তাহলে তুমি জেনে রেখো), আল্লাহ তায়ালা কখনো কাফেরদের পছন্দ করেন না।

তাফসীর

আয়াত ১-৩২

যে সব বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এই সূরার ১ম আয়াত থেকে শুরু করে ৮৩তম আয়াত পর্যন্ত সমগ্র অংশটি ইয়েমেনের নাজরান থেকে আগত খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিষয়ে রসূল (স.)-এর বিতর্ক অনুষ্ঠান উপলক্ষে নাযিল হয়েছিলো, তা যদি সঠিক মেনে নেয়া হয়, তাহলে এই সমগ্র অংশটি এই ঘটনার সাথেই সংশ্লিষ্ট বলে ধরে নিতে হয়। এই বর্ণনাগুলো নাযরানের সে খৃষ্টান দলটির আগমনের বছর নির্দেশ করে ৯ম হিজরীকে, যখন আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল এসে রসূল (স.)-এর সাথে দেখা করে। প্রতিনিধি দলগুলোর কোনো কোনোটি রসূল (স.)-এর সহৃদয়তা ও ভালোবাসা কামনা করে। কোনোটি তাঁর সাথে চুক্তি ও তত্ত্বকথা জানতে চায়। ৯ম হিজরী ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল ওফুদ' অর্থাৎ 'প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর' হিসাবে পরিচিত। এ সময় ইসলাম সমগ্র আরব উপদ্বীপেই শুধু নয় বরং তার বাইরেও যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করে।

আমি অবশ্য আগেই বলেছি যে, এই আয়াতগুলোর বিষয়বস্তু ও বাচনভংগি উভয়ই উপরোক্ত মতের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয় বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। আমার মনে হয় যে, এ আয়াতগুলো হিজরতের পরবর্তী প্রাথমিক বছরগুলোতেই নাযিল হয়েছে। এ সূরায় আহলে কেতাবের সাথে বিতর্ক ও বাকযুদ্ধের বিবরণ রয়েছে, তাদের বিকৃত আকীদা বিশ্বাস ও সন্দেহ সংশয় নিরসনের প্রচেষ্টা এতে বিধৃত হয়েছে, রসূল (স.)-এর রেসালাত ও ইসলামের তাওহীদ তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টার উল্লেখ এখানে রয়েছে এবং এই গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের প্রতি সতর্কবাণী ও প্রবোধ বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় কেবল ৯ম হিজরীর নাজরানী প্রতিনিধি দলের আগমনের ঘটনার সাথেই যুক্ত নয়। আমার বিশ্বাস, সূরাটির এ অংশ হিজরতের প্রাথমিক বছরগুলোতে সংঘটিত অন্যান্য বহু ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছিলো।

আমি মনে করি এ আয়াতগুলোকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র নাযরানী প্রতিনিধি দলের সাথে এটি সংশ্লিষ্ট নয় আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি পরবর্তীতে এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবো।(১)

সূরার ভূমিকায় আমি বলে এসেছি যে, এই আয়াতগুলো মুসলিম জাতি ও তার আদর্শের সাথে মোশরেক ও আহলে কেতাবদের আকীদাগত চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব সংঘাতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। ইসলামের অভ্যুদয় বিশেষত মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব সংঘাত থামেনি। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মোশরেক ও ইহুদীরা কী সাংঘাতিকভাবে জড়িত ছিলো, কোরআনে তার পুংখানুপুংখ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলের খৃষ্টানরাও এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলো এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো দল রসূল (স.)-এর সাথে বিবদমান বিষয়ে বিশেষত হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্যে এসেছিলো।

সূরার এ অংশটিতে তাওহীদ এবং কুফরীর মাঝে সুস্পষ্ট বিভেদ রেখা টেনে দেয়া হয়েছে, তাওহীদের বিষয়ে বিভ্রান্তি ও কুফরীতে লিপ্তদের বিরুদ্ধে কঠোর হুমকি উচ্চারিত হয়েছে এবং কুফরীতে লিপ্ত ব্যক্তিরা আহলে কেতাব হলেও তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করা হয়েছে। পাশাপাশি মোমেনদের অবস্থাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন এবং আল্লাহর বিধানের প্রতি তাদের আনুগত্য কিরূপ। ঈমানের কিছু আলামত রয়েছে, যা হামেশাই অভ্রান্ত থাকে। অনুরূপভাবে কুফরীরও কিছু আলামত রয়েছে, যা সন্দেহ সংশয়ের উর্ধে, এ সব আলামত এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের আয়াতগুলো দেখুন,

'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। ইতিপূর্বে মানব জাতির পথপ্রদর্শনের নিমিত্ত নাযিল করা তাওরাত, ইনজীল এবং অন্য সকল গ্রন্থের সমর্থক হিসেবে তোমার ওপর নির্ভুলভাবে তিনি কেতাব নাযিল করেছেন। তিনি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী কেতাব নাযিল করেছেন। যারা আল্লাহর আয়াতগুলোর প্রতি কুফরী করবে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।'

'তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি তোমার ওপর কেতাব নাযিল করেছেন। যার ভেতরে কিছু আয়াত রয়েছে দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট। যা কেতাবের প্রধান ও মৌলিক অংশ, আর অন্য কতক আয়াত রয়েছে দ্ব্যর্থবোধক, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলোর অনুসরণ করে থাকে ...।'

'আল্লাহর ফেরেশতারা এবং জ্ঞানবান লোকেরা ন্যায়নিষ্ঠভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। .... আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান। কেতাবধারীরা নিজেদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের কাছে সত্য জ্ঞান আসার পরেই মতভেদে লিপ্ত

---

(১) অধ্যাপক মোহাম্মদ ইযযত যরুফ স্বীয় পুস্তক 'সীরাতুর রসূল'-এ লিখেছেন যে, 'বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই প্রতিনিধি দলটি হিজরতের এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যেই মদীনায় এসেছিল। অর্থাৎ প্রথম আড়াই বছরের মধ্যে, তবে তার এই সময় নির্ধারণের ঐতিহাসিক ভিত্তি কী, তা আমার জানা নেই। আমি যত বর্ণনাই পড়েছি, তাতে মনে হয় ৯ম হিজরী, না হয় অন্যান্য প্রতিনিধি দলের সাথে নাযরানী প্রতিনিধি দলের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। (প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বছর যে ৯ম হিজরী, তা সর্বজনবিদিত)

অবশ্য ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, যে, নাযরানী প্রতিনিধি দল সম্ভববত হোদায়বিয়ার আগে এসেছিলো। কিন্তু এই ধারণার ভিত্তি কী তা তিনি ব্যক্ত করেননি এবং এর সপক্ষে কোনো বর্ণনাও তিনি তুলে ধরেননি। যাই হোক, এ আয়াতগুলো নাযরানীদের আগমন উপলক্ষে নাযিল হওয়ার সম্ভাব্যতা তাদের হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে আগমনের সম্ভাব্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট। একটি সত্য হলে অপরটিও সত্য। পক্ষান্তরে তাদের ৯ম হিজরীতে আগমন সংক্রান্ত বর্ণনা সত্য মেনে নিলে আয়াতগুলোকে ও এর নাযিল হওয়ার বর্ণিত উপলক্ষকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মেনে নিতে বাধ্য হতে হয়।

হয়েছে। আল্লাহর আয়াতগুলোকে যারা অস্বীকার করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হিসাব দ্রুত নিষ্পন্ন করবেন।'

সূরার এ অংশটিতে অনেকটা প্রকাশ্যভাবেই ইহুদীদের প্রতি হুমকি রয়েছে। যেমন,

'যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করে এবং ন্যায়বিচার ও সদাচারের আদেশ দানকারীদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।'

এখানে ইহুদীদের নামোল্লেখ না করা হলেও নবী হত্যার উল্লেখ করা হয়েছে, যা সরাসরি ইহুদীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত আয়াতের নিষেধাজ্ঞাও লক্ষণীয়,

'মোমেনদেরকে বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু বানানো মোমেনদের পক্ষে সমীচীন নয়।'

এ দ্বারাও প্রধানত ইহুদীদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যদিও মোশরেকদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া যায়। সূরা আলে ইমরান নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্তও কিছু সংখ্যক মুসলমান তাদের মোশরেক আত্মীয়দের সাথে এবং ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতো। তাদের সর্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এই আত্মীয় বা বন্ধুরা মোশরেক বা ইহুদী হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা তাদের সকলকেই 'কাফের' আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রসংগে আরো দুটি আয়াত লক্ষ্য করুন,

'যারা কুফরী করেছে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা অচিরেই পরাভূত হবে এবং দোযখে সমবেত হবে। দোযখ হচ্ছে নিকৃষ্টতম বাসস্থান। পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলো এমন দুটি দলের মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষা বিষয় রয়েছে। একটি দল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর অপরটি হচ্ছে কাফের, চর্মচক্ষু দিয়ে তারা তাদেরকে নিজেদের দ্বিগুণ দেখতে পায়। ....'

স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এ আয়াত দুটিতে বদর যুদ্ধের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। আর এখানে 'তোমরা পরাভূত হবে' এ সম্বোধনটি ইহুদীদের উদ্দেশে করা হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল (স.) বদর যুদ্ধে কোরায়শদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে ইহুদীদের ডেকে বললেন, তোমরা কোরায়শদের পরিণতি বরণ করার আগে ইসলাম গ্রহণ করো। ইহুদীরা জবাবে বললো, 'হে মোহাম্মদ! যুদ্ধবিদ্যায় অদক্ষ কোরায়শ দলকে পরাজিত করে তুমি গর্বিত হয়ো না। তুমি আমাদের সাথে যুদ্ধ করলেই বুঝতে যে, আমরা কেমন যোদ্ধা! আমাদের মতো যোদ্ধার সাথে তোমার মোকাবেলা হয়নি।' এরপরই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত দুটি নাযিল করেন। (আবু দাউদ)

অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতে রসূল (স.)-কে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তা লক্ষণীয়,

'তারা যদি তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তুমি বলো যে, আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আর কেতাবপ্রাপ্তদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, তোমরা কি আত্মসমর্পণ করেছো? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে তাঁরা সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার কাজ দাওয়াত পৌছানো ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন।'

এ উপদেশ যদিও একটি চলতি আলোচনা সম্পর্কেই এসেছিলো, তথাপি এটি একটি সাধারণ ও সর্বাত্মক উপদেশ। রসূল (স.) যাতে সকল ইসলাম বিরোধী ব্যক্তির মোকাবেলায় একে কাজে লাগাতে পারেন, সে জন্যে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে।

আয়াতটির শেষাংশ, 'তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার কাজ দাওয়াত পৌছানো ছাড়া আর কিছু নয়.....' দ্বারা বুঝা যায় যে, রসূল (স.) তখনো পর্যন্ত আহলে কেতাবের সাথে লড়াই করার আদেশ দেয়া হয়নি, এমনকি 'জিযিয়া' আদায়েরও নির্দেশ পাননি। এ থেকেও

আমাদের এই মতটির পক্ষে অধিক সমর্থন পাওয়া যায় যে, এই আয়াতগুলো ৯ম হিজরীর নাজরানীদের উপলক্ষে নয় বরং আরো আগে নাযিল হয়েছিলো।

এভাবে আমরা দেখতে পাই, কোরআন ও সুন্নাহর উক্তিসমূহের প্রকৃতিই এই যে, তা সকল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোনো বিশেষ উপলক্ষের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। এখানেও তাই এ আয়াতগুলো নাজরানী প্রতিনিধি দলের জন্যেই নির্দিষ্ট নয়। আরব উপদ্বীপে ইসলামের শত্রু বিশেষত ইহুদীদের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘাতের ক্ষেত্রে যেমন কোরআনের এই সকল আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ, তেমনি নাযরানী প্রতিনিধি দলও একটি উপলক্ষ হয়ে থাকতে পারে।

সূরার এই প্রথম অংশটিতে আকীদাগতভাবে ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিমূল সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালো বিশ্লেষণ রয়েছে। অনুরূপভাবে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত দাবী এবং বাস্তব জীবনে তার কার্যকর প্রভাব সম্পর্কেও রয়েছে তেজোদীপ্ত বক্তব্য। এসব কার্যকর প্রভাব ঈমানের অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য দাবী। আল্লাহর একত্ববাদ যেহেতু ইসলামের মূল আকীদা তাই ইসলামকে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবেও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং তাও করা হয়েছে তাওহীদ ভিত্তিক এই আকীদার দাবী হিসাবেই। ইসলাম ছাড়া আর কোনো মতবাদ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও তাঁর রসূলের সুন্নাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের আদেশ মানে না এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে না, সে মুসলমান নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ছাড়া অর্থাৎ তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছু পছন্দও গ্রহণ করেন না। এ কারণেই তিনি আহলে কেতাবের এই আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, তারা আল্লাহর কেতাব অনুসারে নিজেদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের দাওয়াত পেয়েও তা প্রত্যাখ্যান করে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর কেতাবকে যাবতীয় বিবাদ বিসম্বাদ ও সমস্যার সমাধানের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হিসাবে গ্রহণ না করাকে কুফরীর আলামতরূপে বিবেচনা করেছেন। এ আচরণ আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

সূরার প্রথমাংশের শেষ ভাগ পুরোপুরিভাবেই আল্লাহর দ্বীনের বাস্তব আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয়েই কেন্দ্রীভূত। এক্ষণে আমি সূরার এই প্রথমাংশের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবো।

'আলিফ লাম মীম।' এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর আলোচনায় আমি ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারার শুরুতে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তাই একমাত্র ব্যাখ্যা নয়, তাকে আমি অগ্রগণ্য ব্যাখ্যা মনে করেছি মাত্র। এ অক্ষরগুলো দ্বারা এই মর্মে আভাস দেয়া হয়েছে যে, এই মহাগ্রন্থ মূলত এই সব বর্ণমালা দিয়ে রচিত এবং এই বর্ণমালা আরবদের আয়ত্তাধীন হওয়া সত্তেও তারা এই বর্ণমালা দিয়ে এই অলৌকিক গ্রন্থের সমমানের কোনো গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম নয়।

বহু সংখ্যক সূরার প্রারম্ভে বিদ্যমান এ জাতীয় বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার অগ্রাধিকার ভিত্তিক ব্যাখ্যা হিসাবে আমার উপরোক্ত বক্তব্য বেশ কতকগুলো সূরার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ ব্যাখ্যা একাধিক সূরার অনুরূপ বর্ণমালায় নিহিত নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করাকে আমাদের জন্যে সহজ করে দেয়। সূরা আল-বাকারায় উক্ত বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা দিয়ে শুরু হওয়ার পর সামান্য কিছু দূর গিয়েই এই বলে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, 'আমার বান্দার ওপর আমি যে ওহী নাযিল করেছি, তা নিয়ে তোমরা যদি সন্দেহে লিপ্ত হও, তাহলে অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া তোমাদের যে সব সহযোগী রয়েছে তাদেরকেও ডেকে নিয়ে এসো– যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।' বস্তুত এ চ্যালেঞ্জ সূরার প্রারম্ভের সে বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাতেই প্রচ্ছন্ন ছিলো।

কিন্তু এখানে সূরা আলে ইমরানের এই বর্ণমালার সংকেতের অন্যরকম অর্থ প্রতিভাত হচ্ছে। সেটি এই যে, এই কেতাব এক অদ্বিতীয় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এই কেতাব আহলে কেতাব গোষ্ঠীর সমর্থিত অন্যান্য আসমানী কেতাব থেকে ভিন্ন ও অভিনব কোনো কেতাব নয়, সেগুলোর মতো এ কেতাবও কতিপয় অক্ষর ও শব্দের সমষ্টি। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রসূলের ওপর এ কেতাব নাযিল করার মধ্যে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব কিছু নেই।

পৌত্তলিকতা, খৃষ্টবাদ বনাম তাওহীদ

মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতকে অস্বীকারকারী আহলে কেতাবদের লক্ষ্য করে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। নবুওত, রেসালাত, আসমানী কেতাব ও ওহী সম্পর্কে তারা ছিলো পুরোপুরি অভিজ্ঞ। যুক্তি প্রমাণাদির ভিত্তিতে যদি তারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতো, তাহলে তাদেরই এ দাওয়াতের সর্বপ্রথম গ্রহণকারী তথা সর্বাগ্রে মুসলমান হওয়ার কথা ছিলো।

এই অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দ্বারা সূরা আরম্ভ করা হয়েছে। তাদের হৃদয়ে যে মারাত্মক সন্দেহ সংশয় বিরাজ করতো কিংবা যে সন্দেহ সংশয়কে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের মনে ঢুকানোর চেষ্টা করতো এখানে তা নিরসন করা হয়েছে। হৃদয়ের অভ্যন্তরে এই সন্দেহ-সংশয়ের প্রবেশ রোধ করা হয়েছে। আর আল্লাহর আয়াতগুলোর ব্যাপারে প্রকৃত মোমেনদের ভূমিকা কী এবং বিকারগ্রস্ত ও বিপথগামীদের ভূমিকাই বা কী, তাও চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই সাথে আল্লাহর সাথে মোমেনদের সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি তাদের একনিষ্ঠতা, ভক্তি ও বিনয় কিরূপ হওয়া উচিত, সর্বোপরি আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে তাদের কিরূপ জ্ঞান থাকা উচিত, তা এই আয়াতগুলোতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

'চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'

এই নির্ভেজাল, অকাট্য, দ্ব্যর্থহীন তাওহীদই ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সাথে জাহেলী আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। এখান থেকেই এই দুই ধরনের আকীদা বিশ্বাসের পথ আলাদা হয়ে যায়।' জাহেলী আকীদা বিশ্বাস বলতে নাস্তিক, পৌত্তলিক, অংশীবাদী, ইহুদী ও খৃষ্টান সকলের আকীদা বিশ্বাসকেই বুঝায়, চাই তাদের মধ্যে যতো দল উপদল থাকুক না কেন। এই আকীদা বিশ্বাস মুসলিম এবং সকল অমুসলিমদের জীবনের মধ্যে একটা ভেদরেখা টেনে দেয়। কেননা, আকীদা বিশ্বাসই মানুষের বাস্তব জীবনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই' কথাটার অর্থ হলো, এবাদাত, আনুগত্য ও দাসত্ব পাওয়া এবং আদেশ দান ও আইন জারী করার একমাত্র আল্লাহর অধিকার। এ অধিকারে আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই। 'আল-হাই' অর্থ চিরঞ্জীব ও স্বয়ম্ভু। তিনি সত্য, অনাদি ও অনন্ত, সীমাহীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কাজেই তাঁর গুণাবলীতে তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউ নেই। 'আল কাইয়ুম' অর্থ যাঁর সক্রিয় সাহায্যে সকল জীবের জীবন এবং সকল বস্তুর অস্তিত্ব আবির্ভূত হয় ও টিকে থাকে, সর্বোপরি সকল জীবের ও সকল বস্তুর উর্ধে যার সত্ত্বা বিরাজ করে। সুতরাং এই বিশ্বপ্রকৃতিতে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো জীব বা বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

এই আকীদাই হচ্ছে বিশ্বাস ও চিন্তার সংযোগস্থল এবং আদর্শ ও জীবনাচারের মোহনা। আল্লাহ তায়ালাই যে একমাত্র মাবুদ এই সত্যটির মাঝে এবং জহেলী চিন্তাধারার মাঝে এটি আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের সংযোগস্থল। উল্লেখ্য যে, তৎকালীন আরবের মোশরেক, ইহুদী ও খৃষ্টান, বিশেষত খৃষ্টানদের চিন্তাধারা সবই ছিলো জাহেলী চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত।

পবিত্র কোরআন ইহুদীদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছে যে, ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র (নাউযু বিল্লাহ!) এমনকি বর্তমান ইহুদী সমাজের মনগড়া 'পবিত্র গ্রন্থ'টিতেও এ ধরনের একটি বক্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৃষ্টি পুস্তকের ৬ষ্ঠ সংশোধনীতে এই বক্তব্য দ্রষ্টব্য।(২)

খৃষ্টানদের চিন্তা ও বিশ্বাসে বহু বিকৃতি এসেছে এবং তা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। যেমন তারা বলতো যে, 'আল্লাহ তায়ালা তিনজন মাবুদের মধ্যে তৃতীয় মাবুদ'। তারা আরো বলতো যে, মাসীহ ইবনে মারিয়ামই আল্লাহ তায়ালা। তারা হযরত ঈসা ও তাঁর মাতাকে আল্লাহর অতিরিক্ত মাবুদ হিসাবে মানতো। তাছাড়া তারা তাদের মধ্যকার দরবেশ ও আলেমদেরকে (আইনদাতা হিসেবে) অতিরিক্ত রব বা প্রতিপালক বলে গ্রহণ করতো।

আর্নোল্ড লিখিত পুস্তক 'আল্লাহর দিকে আহ্বান'-এ এসব বিকৃত চিন্তাধারার কিছু কিছু তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে উক্ত পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি,

'ইসলামের বিজয়ের একশ' বছর আগে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান রোম সাম্রাজ্যকে কিছুটা ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। কিন্তু তার মৃত্যুর পরই সে ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফলে একটা অভিন্ন জাতীয়তার চেতনা সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর বন্ধন দৃঢ় করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তবে হিরাক্লিয়াস সিরিয়াকে কেন্দ্রের অধীনে ফিরিয়ে আনতে পুরোপুরি সফল হননি। সমন্বয় সৃষ্টির জন্যে যে সাধারণ ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেন, দুর্ভাগ্যবশত তা বিভক্তি ও বিশৃংখলা দূর করার পরিবর্তে তা আরো বাড়িয়ে তোলে। সেখানে ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ছাড়া জাতীয়তাবাদী চেতনার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমন অন্য কিছুই ছিলো না। তাই তিনি ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসের এমনভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, যা দ্বারা পরস্পরের প্রতি বৈরী সম্প্রদায়গুলোর উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারেন এবং ধর্মত্যাগী ও গোঁড়া ধর্মানুরাগীদের মধ্যে এবং উভয় গোষ্ঠীর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ে তুলতে পারেন। ওদিকে ৪৫১ খৃষ্টাব্দে খালকীদোনিয়া একাডেমী ঘোষণা করে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে একই সাথে দুইটি সত্ত্বার অধিকারী বলে মেনে নেয়া উচিত। এই দুটি সত্ত্বার ভেতরে কোনো মেলামেশাও হয় না, পরিবর্তনও ঘটে না, একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্নও হয় না। আর এ দুই এর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে উভয়ের বিপরীত কোনো কিছু সংঘটিত হতে পারবে না-তাও নয়। প্রকৃতপক্ষে এই উভয় সত্ত্বাকে নিজ নিজ গুণ বৈশিষ্ট্য সহকারে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং উভয়টির একই দেহে ও একই ঐশ্বরিক সত্ত্বায় সম্মিলিত হতে হবে। দুইটি ঐশ্বরিক সত্ত্বায় বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হলে যেমন হতো, তা হবে না। একই ঐশ্বরিক সত্ত্বায় সম্মিলিত হওয়া বলতে আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহর পুত্র ও আল্লাহর বাণীর একীভূত ও একাকার সত্ত্বা বুঝানো হয়েছে। ইয়াকিবা গোষ্ঠী এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে একই সত্ত্বার অধিকারী বলে স্বীকার করতো। তারা বলতো, হযরত ঈসা (আ.) হচ্ছেন বহু সত্ত্বার সমন্বিত রূপ এবং সমুদয় ঐশ্বরিক ও মানবীয় গুণাবলীর সমাহার। কিন্তু যে বস্তু এই সকল গুণাবলী ধারণ করে, তাকে দ্বৈত সত্ত্বা বিবেচনা করা হয়নি বরং তা একক ও বহু সত্ত্বার সম্মিলিত সত্ত্বায় পরিণত হয়েছে। এই বিতর্ক প্রায় দুই

(২) বক্তব্যটি হচ্ছে এই, 'এরূপ সংঘটিত হলো যে, যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো এবং তাদের অনেক মেয়ে জন্ম নিলো, তখন আল্লাহর পুত্ররা দেখলো যে, মানুষের মেয়েরা খুবই সুন্দরী। তাই তারা তাদের পছন্দ মতো নারীদেরকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলো। তখন প্রভু বললেন, আমার আত্মা মানুষের ভেতর চিরকাল অধীন হয়ে থাকবে না। বিপথগামী হওয়ার কারণে সে মানুষের রূপ ধারণ করেছে এবং তার আয়ুষ্কাল হবে ১২০ বছর। পৃথিবীতে তখন বড় বড় স্বৈরাচারী ছিলো। তারপরও আল্লাহর পুত্ররা মানুষের মেয়ের সাথে মিলিত হতো এবং মেয়েরা তাদের জন্য সন্তান প্রসব করতো। এরাই হচ্ছে সেইসব স্বৈরাচারী শাসক, যাদের নাম চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছে।'

শতাব্দীব্যাপী অর্থোডক্স সম্প্রদায় ও ইয়াকিবা সম্প্রদায়ের মধ্যে অব্যাহত থাকে। ইয়াকিবা সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে মিসর, সিরিয়া ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমা বহির্ভূত দেশগুলোতে বিস্তার লাভ করে। লক্ষণীয় যে, হযরত ঈসা (আ.) একটি মাত্র ইচ্ছা শক্তির অধিকারী– এই মতবাদ প্রচারের মাধ্যমে সম্রাট হিরাক্লিয়াস খৃষ্টবাদের সংস্কারের যে চেষ্টা চালান, তাও ছিলো এই সময়কারই ঘটনা। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, এই ধর্ম একই সময়ে দুটি স্বতন্ত্র সত্ত্বার প্রবক্তা। আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর মানবীয় সত্ত্বায় একক ঐশ্বরিক সত্ত্বার সম্মেলনেরও পক্ষপাতী। কেননা, একই ঐশ্বরিক সত্ত্বার দুই ধরনের জীবনের অবস্থান সে অস্বীকার করে। এই ধর্মের বক্তব্য হলো, হযরত ঈসা (আ.) যিনি একক ব্যক্তিসত্ত্বার মালিক এবং আল্লাহর পুত্র একক মানবীয় ও ঐশ্বরিক শক্তির বলে মানবীয় ও ঐশ্বরিক উভয় বৈশিষ্ট্যকে বাস্তবায়িত করেন। অন্য কথায় বলা যায়, দেহাকৃতিপ্রাপ্ত এই ঐশ্বরিক বাণীতে একটি মাত্র ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হতে পারে– একাধিক ইচ্ছা নয়। কিন্তু হিরাক্লিয়াস তার এই সংস্কার প্রচেষ্টার করুন পরিণতি ভোগ করেন। শান্তির ভিত্তি স্থাপন করার আশা পোষণকারীরা চিরকাল তার মতোই ভাগ্য বরণ করেছে। তার এই প্রচেষ্টার ফল দাঁড়ায় এই যে, এই বিতর্ক মারাত্মক ও সহিংস রূপ ধারণ করে। এমনকি স্বয়ং হিরাক্লিয়াস নাস্তিক রূপে চিহ্নিত হন এবং উভয় সম্প্রদায়ের কোপানলের শিকার হন।' (হাসান ইবরাহীম ও তার সহকর্মীর অনুবাদ, পৃঃ ৫২-৬৮)

অপর একজন খৃষ্টীয় গবেষক 'ক্যান টেইলর' হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবকালীন প্রাচ্যের খৃষ্টানদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, 'খৃষ্টান জনগণ কার্যত পৌত্তলিকে পরিণত হয়েছিলো। তারা ধর্মযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনকারী একদল মানুষের, একদল সাধু সন্ন্যাসীর ও একদল ফেরেশতাদের পূজা করতো।' (একই গ্রন্থ পৃঃ ৬৮)

এরপর আসে মোশরেক তথা পৌত্তলিকদের আকীদাগত বিকৃতি ও বিভ্রান্তির প্রসংগ। এ ব্যাপারে কোরআন বহু তথ্য দিয়েছে। যেমন, তারা জ্বিন, ফেরেশতা, চন্দ্র, সূর্য ও মূর্তির পূজা করতো। এদের মধ্যে যারা বলতো যে, আমরা এই সকল দেব দেবীর পূজা করি শুধু এ জন্যে যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে, আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃতি তাদের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত কম ছিলো। বস্তুত নিতান্ত আনুষংগিকভাবে ওপরে যে বিকৃত ও বিভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদের বিবরণ দেয়া হলো, সে সব মতবাদ সমাজে চালু থাকা অবস্থায় ইসলাম এই সূরায় তার আকীদা বিশ্বাসকে নির্ভেজাল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্ত করে।

'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।'

এ ঘোষণাটি উল্লেখিত বাতিল মতাদর্শগুলোর মধ্য থেকে ইসলামের আকীদা বিশ্বাসকে পৃথক করে তুলে ধরে। অনুরূপভাবে মানুষের জীবন ও কর্মের মাঝেও একটা পার্থক্য চিহ্নিত করে। যে ব্যক্তির সমগ্র চেতনা জুড়ে আল্লাহর অস্তিত্বের এই বিশ্বাস বিরাজ করে যে, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি ছাড়া আর কোনো চিরঞ্জীব সত্ত্বা নেই, তাঁর ওপরই সকল সৃষ্টির স্থীতি নির্ভরশীল এবং তিনিই সকল প্রাণী ও পদার্থের প্রতিপালক– সেই ব্যক্তির জীবন যাপনের নীতি ও পদ্ধতি হবে উল্লেখিত বাতিল মতাদর্শের ধারক ব্যক্তির চাইতে একবোরেই ভিন্ন। যে ব্যক্তি সে সব বাতিল মতাদর্শে বিশ্বাস করে, সে তার বিবেকের ওপর এমন কোনো সত্ত্বার প্রভাব ও কর্তৃত্ব অনুভব করতে পারে না, যিনি প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষণ তার ওপর কর্তৃত্বশীল।

বস্তুত সুস্পষ্ট ও নির্ভেজাল তাওহীদ যেখানে উপস্থিত, সেখানে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো দাসত্ব চলতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যেতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো আইন, বিধান, উপদেশ, পথনির্দেশ, জীবনের কোনো দিক ও বিভাগে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সাহিত্যে, নৈতিকতায়, সামাজিকতায় বা অর্থনৈতিক

লেনদেনে– কোথাও নয়। ইহকালীন অথবা পরকালীন জীবন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো দিকে মনোনিবেশ করারও অবকাশ থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে উল্লেখিত বাতিল মতাদর্শগুলোতে যারা বিশ্বাসী, তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গন্তব্য থাকে না। হালাল হারামের কোনো বাছবিচার থাকে না। ভালো-মন্দের কোনো ভেদাভেদ থাকে না– তা সে আইন কানুন, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, লেনদেন বা যে ব্যাপারেই হোক। কেননা, এসব জিনিস যে উৎস থেকে আসে, সেই উৎস যদি নির্দিষ্ট থাকে, সেই উৎসের প্রতি যদি অবিচল আনুগত্য থাকে, তবেই তা সুনির্দিষ্ট রূপ নেবে।

এ জন্যে জীবন যাপনের বাতিল ও সত্য পথের মোহনার মুখোমুখি এরূপ অকাট্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।'

এ কারণে জীবনযাপনের পদ্ধতি ও পথ এরূপ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হওয়া একমাত্র ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মতবাদের নয়। বস্তুত ইসলাম তার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ আকীদা হিসাবে অন্তরে ততোক্ষণ বদ্ধমূল হয় না, যতক্ষণ তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত না হয়। অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকেই বাস্তবায়িত করা চাই এবং জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট থাকা চাই।

সকল রেসালাতের আদি উৎস এক ও অভিন্ন

জীবন পথের মোহনায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে এই অকাট্য তাওহীদের ঘোষণা দেয়ার পর পরবর্তী রেসালাত, কেতাব ও দ্বীনের উৎস– যা সর্বকালে ও সকল নবীর বেলায় ছিলো এক ও অভিন্ন– সে সম্পর্কে ঘোষণা আসছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমার ওপর সত্যসহকারে কেতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্ববর্তী ওহীর সমর্থক, আর ইতিপূর্বে তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল, মানবজাতির পথনির্দেশক হিসাবে। আর নাযিল করেছেন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'

এই আয়াতের প্রথমাংশে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসের সকল মৌলিক বিষয় এবং আহলে কেতাব ও অন্যান্য যারা মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতকে ও তাঁর আনীত আল্লাহর বিধানের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যে দাঁতভাংগা জবাব রয়েছে।

এ আয়াতে সকল রসূলদের কাছে যে একই উৎস থেকে কেতাব নাযিল হয়, সে কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বস্তুত সে উৎস হচ্ছেন চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ তায়ালা, যার কোনো শরীক নেই। তিনিই তোমার কাছে কোরআন নাযিল করেছেন, যেমন ইতিপূর্বে মূসা (আ.)-এর ওপর তাওরাত এবং ঈসা (আ.)-এর ওপর ইনজীল নাযিল করেছেন। সুতরাং একই সত্ত্বার মধ্যে দাসত্ব ও প্রভুত্বের মিশ্রন ঘটতে পারে না। প্রভু, মনিব বা মাবুদ একজনই এবং তিনিই তাঁর মনোনীত বান্দাদের কাছে কেতাব নাযিল করেন। আর আল্লাহর বান্দারা বিধান গ্রহণ এবং পালন করে। তারা বান্দাই, যদিও তারা মর্যাদায় নবী ও রসূল।

আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কেতাবসমূহ যে ধর্ম এবং যে মহাসত্য নিয়ে এসেছে, এ আয়াতে তাকেও এক ও অভিন্ন ধর্ম বলা হয়েছে। এই যে কেতাব তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে, তা 'সত্য সহকারে' নাযিল হয়েছে। আগে নাযিল হওয়া তাওরাত ও ইনজীলের সমর্থক হিসাবে নাযিল হয়েছে এবং এই সকল কেতাবের একই উদ্দেশ্য মানব জাতিকে নির্ভুল ও সঠিক পথ প্রদর্শন। এই নয়া গ্রন্থ কোরআন আল্লাহর কেতাবসমূহে বিধৃত সত্য এবং মানুষের মনগড়া প্রচলিত রাজনৈতিক ও চিন্তাগত ধ্যান-ধারণা থেকে উদ্ভূত অসত্যকে ছাঁটাই-বাছাই করে অসত্যকে

প্রত্যাখ্যান ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। (বিশিষ্ট খৃষ্টান লেখক আর্নল্ডের রচিত 'ইসলামের আহ্বান' নামক গ্রন্থ থেকে ইতিপূর্বে আমরা এতদসংক্রান্ত কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছি।)

এ আয়াতটিতে আনুষংগিকভাবে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আহলে কেতাব সম্প্রদায়ের নয়া রেসালাতকে অস্বীকার করার পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। কেননা, এই নয়া রেসালাত পূর্ববর্তী রেসালাতসমূহের ধারাবাহিকতা নিয়েই নাযিল হয়েছে। নয়া কেতাবও আগেকার কেতাবসমূহের মতো সত্য সহকারে নাযিল হয়েছে। আগেকার কেতাবগুলো যেমন মানুষরূপী রসূলদের ওপর নাযিল হয়েছিলো এ কেতাবও একজন মানুষরূপী রসূলের ওপরই নাযিল হয়েছে। এ কেতাব তার পূর্ববর্তী কেতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণকারী। যে সত্যকে আগেকার কেতাবগুলো সংরক্ষণ করতো এ কেতাবও সেই সত্যকে সংরক্ষণ করে। এ কেতাবকে তিনিই নাযিল করেছেন যিনি সকল কেতাব নাযিল করার ক্ষমতার অধিকারী। সেই মহান সত্ত্বাই এ কেতাবের রচয়িতা, যিনি মানবজাতির জন্যে জীবনবিধান রচনার একমাত্র অধিকারী। আপন রসূলের কাছে নাযিল করা কেতাবের মাধ্যমে মানবজাতির আকীদা বিশ্বাস, স্বভাবচরিত্র, আইন বিধান ও আচরণ পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতার একমাত্র মালিক।

এরপর আয়াতটির দ্বিতীয়াংশে রয়েছে আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকারকারীদের প্রতি কঠোর হুমকি এবং আল্লাহর কঠিন আযাব সম্পর্কে হুশিয়ারী। কেননা, যারা আল্লাহর কিছু আয়াতকে অস্বীকার করে, তারা প্রকৃতপক্ষে গোটা ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করে। আহলে কেতাব তথা ইহুদী ও খৃষ্টানরা তো তাদের কাছে ইতিপূর্বে নাযিল করা কেতাবকে বিকৃত করেছে। ফলে সেই বিকৃতি তাদেরকে কোরআন অস্বীকার করার প্ররোচনা দিয়েছে। অথচ এই নতুন গ্রন্থ হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার প্রভেদকারী স্পষ্ট ও অকাট্য গ্রন্থ। এ আয়াতে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করার যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে, তা দ্বারা প্রাথমিকভাবে আহলে কেতাবের প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে। বস্তুত অন্য সকলের আগে আল্লাহর কঠিন শাস্তির হুমকি তাদের উদ্দেশেই উচ্চারিত হয়েছে।

আর এই সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী জ্ঞান যার আওতা থেকে আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো কিছুই গোপন থাকে না তার আওতায় একটি অতি গভীর ও অতি সূক্ষ্ম ঘটনা মানুষের স্নায়ুমন্ডলীকে স্পর্শ করে। এই ঘটনাটি মানুষের জন্মলাভের ঘটনা যা মানুষের অজানা ও অদৃশ্য অর্থাৎ জরায়ুর জগতে সংঘটিত হয়ে থাকে। সেই জগত মানুষের জ্ঞান, উপলব্ধি ও ক্ষমতার আওতা বহির্ভূত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ৫ম আয়াতটিতে বলেন,

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি জরায়ুসমূহে যেমন চান তোমাদের প্রতিকৃতি তৈরি করেন। সেই মহাপরাক্রমশালী মহাকুশলী আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।'

আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, তিনি এভাবে তোমাদের চেহারা ও আকৃতি তৈরী করেন, যে আকৃতি দিতে তাই চান দেন, আর এই আকৃতিকে যে ধরনের প্রকৃতি ও গুণাবলী দিয়ে মন্ডিত করতে চান করেন। একমাত্র তিনিই এই প্রতিকৃতি তৈরীর পরিকল্পনা করতে সক্ষম। কেননা, তিনিই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত, সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম ইচ্ছার মালিক। 'যেমন ইচ্ছা করেন', তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই', 'মহাপরাক্রমশালী' এই কথাগুলোতে তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটেছে। 'আল আযীয' অর্থ হচ্ছে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, পরিকল্পনা ও নির্মাণ উভয় কাজেই সার্বভৌম ইচ্ছার মালিক। 'আল হাকীম' অর্থ হচ্ছে নিজের দক্ষতা, নৈপুণ্য, কুশলতা, বিচক্ষণতা ও বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতা দ্বারা আপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। কোনো পদক্ষেপ নেন এবং কোনো সাহায্যকারী ছাড়াই এককভাবে তাকে সৃষ্টি করেন।

এই সূক্ষ্ম বক্তব্যে হযরত ঈসা (আ.), তাঁর জন্ম ও আবির্ভাব সম্পর্কে খৃষ্টানদের সন্দেহের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে হযরত ঈসা

(আ.)-কে সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং ঈসা (আ.) আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্র বা আল্লাহর ইহলৌকিক রূপ হতে পারেন না। আর তাওহীদবাদের বিপরীতে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর, অস্পষ্ট, পক্ষপাতদুষ্ট যতো রকম চিন্তাধারা থাকতে পারে– তার সবই এখানে বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে।

দ্ব্যর্থবোধক আয়াত নিয়ে মাথা ঘামানো মুর্খতা ছাড়া কিছু নয়

এরপর যাদের হৃদয়ে বিকৃতি ও বক্রতা রয়েছে তাদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের স্বভাব এই যে, তারা কোরআনের 'মোহকাম' অর্থাৎ অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলোর সুস্পষ্ট বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং 'মোতাশাবেহাত' একাধিক অর্থবোধক আয়াতগুলোর অনুসরণ করে। যাতে সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা যায়। এই সাথে প্রকৃত মোমেনদের লক্ষণসমূহ যথা তাদের খালেস ঈমান এবং আল্লাহর কাছ থেকে আগত প্রতিটি নির্দেশকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়া ইত্যাদির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম আয়াতের বক্তব্য এটাই।

'তিনিই সেই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তোমার ওপর কেতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে অধিকাংশ আয়াত দ্ব্যর্থহীন এবং অন্যগুলো রূপক। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা ভংগ করেন না।'

বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খৃষ্টানরা রসূল (আ.)-কে বলেছিলো, 'আপনি কি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ কথা বলেন না যে, তিনি আল্লাহর বাণী ও তাঁর রুহ?' এ প্রশ্ন দ্বারা তারা চাচ্ছিলো যে, রসূল (স.) যেন হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের পক্ষে সমর্থন দেন এবং মেনে নেন যে, হযরত ঈসা (আ.) মানুষ ছিলেন না বরং 'রূহুল্লাহ' (আল্লাহর রুহ) ছিলেন। যে সব আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বাণী ও আল্লাহর রূহ আখ্যা দেয়া হয়েছে, সেগুলো আসলে 'মোতাশাবেহাত' তথা রূপক আয়াত। এসব আয়াতকে তারা এ জন্যেই মানতো, যাতে এর মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকমের সন্দেহ সৃষ্টি করা যায়। অথচ তারা সেই সব সুস্পষ্ট আয়াতগুলোকে মানতো না, যাতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাঁর শরীক ও সন্তানাদি থাকার কথা সর্বতোভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের এই আচরণ সম্পর্কেই এ আয়াত কয়টি নাযিল হয়েছে। এতে রূপক অর্থবোধক আয়াতগুলোকে মতলব সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা ও দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহকে পরিত্যাগ করার যে প্রবণতা খৃষ্টানরা দেখিয়ে যাচ্ছিলো, তা তুলে ধরা হয়েছে।

তবে এই আয়াতের মূল বক্তব্য শুধু উল্লেখিত ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার চেয়েও ব্যাপক। এই কেতাব সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের, দেশের ও প্রজন্মের মানুষের নীতি ও আচরণ কী হওয়া উচিত, সে কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে। কোরআনে ঈমান ও আকীদা, ইসলামী জীবন যাপন পদ্ধতি এবং অদৃশ্য বিষয় সংক্রান্ত এমন অনেক তথ্যাদি রয়েছে যে ব্যাপারে কোরআনের দেয়া তথ্য ছাড়া শুধু মানুষের বুদ্ধি বিবেক ও নিজস্ব উপায় উপকরণ দ্বারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও আইন-বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আর এগুলোই কোরআনের মূল অংশ। অদৃশ্যের যেসব বিষয় শুধুমাত্র রসূল (স.)-এর কাছ থেকে শুনেই বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে, ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব ও জন্ম তারই আওতাভুক্ত। এগুলোকে যতোটুকু বুঝা যায় ততোটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং শর্তহীনভাবে সেভাবেই মেনে নিতে হবে। কেননা, এগুলো 'নির্ভুল ও সত্য' উৎস থেকেই আগত। তবে অনুধাবন করা আসলেই কঠিন। কেননা, তা স্বাভাবিকভাবেই সীমাবদ্ধ মানবীয় বোধশক্তির নাগালের বাইরে।

স্বভাব ও বিবেকবুদ্ধির সরলতা ও বক্রতাভেদে মানুষ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কোরআনের উল্লেখিত দু'রকমের আয়াতকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে থাকে। যাদের

মনে বক্রতা, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি রয়েছে, স্বভাবজাত সারল্য ও সুস্থতা থেকে যারা বঞ্চিত, তারা সেই সব স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন নীতিমালাকে বর্জন করে, যার ভিত্তিতে আকীদা বিশ্বাস, শরীয়ত ও আইন বিধান প্রণীত হয়। তারা কোরআনের অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য উক্তিসমূহের পেছনে ছোটে। এসব অস্পষ্ট উক্তি, যাকে 'মোতাশাবেহ' বলা হয়, এগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এর উৎসকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে। এই উৎস আল্লাহ তায়ালা। তিনি প্রকৃত সত্যকে পুরোপুরি জানেন বলে এগুলোর অর্থ না বুঝেও এগুলোকে মেনে নিতে হবে। কারণ মানুষের বোধশক্তি সীমিত ও আপেক্ষিক। কিন্তু এসব 'মোতাশাবেহ' আয়াতকে না বুঝেও তার ওপর ঈমান আনা মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও জন্মগত বিবেকবুদ্ধি সুস্থ থাকলেই সম্ভব। সুস্থ বিবেক থাকলে মানুষ প্রত্যক্ষ প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝতে পারে যে, সমগ্র কোরআনই অকাট্য সত্য এবং তার সামনে বা পেছনে কোথাও মিথ্যার অনুপ্রবেশের পথ নেই। কিন্তু বিবেকবুদ্ধি যাদের অসুস্থ ও বিকৃত, তাদের এ সব 'মোতাশাবেহ' তথা অস্পষ্ট আয়াতের পেছনে ছোটার উদ্দেশ্য হলো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এসব দুর্বোধ্য 'মোতাশাবেহ' আয়াতে তারা আকীদা বিশ্বাসকে টলিয়ে দেয়ার মতো অপব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ পেয়ে থাকে। যদিও এসব আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে আদৌ কোনো চিন্তা ভাবনার অবকাশ রাখা হয়নি, তবু তারা জোরপূর্বক এ নিয়ে মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে। ফলে চিন্তার নৈরাজ্য দেখা দেয় এবং এ থেকে জন্ম নেয় নানা বিকৃত মতভেদ। অথচ এসব আদৌ জন্ম নিতো না যদি তারা অনুমানের ভিত্তিতে এমন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা না করতো, যার ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেই না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ 'মোতাশাবেহ' আয়াতের ব্যাখ্যা জানে না।'

সত্যিকার জ্ঞানীদের চিন্তাধারা

পক্ষান্তরে যারা সঠিক অর্থেই বিচক্ষণ জ্ঞানী, তারা মানবীয় বোধশক্তির পরিধি কতোদূর তা জানে এবং মানুষের আয়ত্তাধীন উপায় উপকরণের সাহায্যে কাজ করার সাধ্য কতোদূর তাও জানে। তারা পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা সহকারে বলে, 'আমরা এসব আয়াতে বিশ্বাস করি, সব আয়াতই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে এসেছে।'

বস্তুত কোরআন এবং তার প্রতিটি আয়াত ও প্রতিটি উক্তি আল্লাহর কাছ থেকে আগত, কেবল এ কারণেই তারা 'মোতাশাবেহ' আয়াতের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল ও বিশ্বাসী। কেননা, আল্লাহ তায়ালা যখন ধ্রুব সত্য, তখন তাঁর কাছ থেকে আগত বাণীও অকাট্য মহা সত্য। আর আল্লাহ তায়ালা যা কিছু স্থির করেন, তাও স্বতসিদ্ধভাবে নির্ভুল ও অকাট্য। তার কারণ অনুসন্ধান করা মানুষের দায়িত্বও নয়, তার পক্ষে সেটা সম্ভবও নয়। অনুরূপভাবে এর পেছনে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিহিত রয়েছে, তা উপলব্ধি করাও তার সামর্থের বাইরে।

বিচক্ষণ ও সূক্ষ্ম জ্ঞানী ব্যক্তিরা প্রথমত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত প্রত্যেক বাণীর সত্যতায় স্বতস্ফূর্তভাবে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে। কেননা, তারা নিজেরাও সত্যনিষ্ঠ স্বভাবের অধিকারী। এরূপ বিশ্বাস স্থাপনের পর মনের ভেতর তারা আর কোনো সন্দেহ সংশয় অনুভব করে না। কেননা তারা জানে যে, যে বিষয় মানবীয় জ্ঞানের আওতাধীন নয়, তা জানতে কৌতুহলী হওয়া ও চেষ্টা করা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। অনুরূপভাবে মানবীয় উপায় উপকরণ যে জিনিসের জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে না, তা নিয়ে মাথা ঘামানো মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

বস্তুত সূক্ষ্ম ও বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের একেবারে নির্ভুল চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ আয়াতে। অজানা কোনো জিনিসকে অস্বীকার করা কোনো বিচক্ষণ জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। যারা নিতান্তই ভাসা ভাসা জ্ঞানের অধিকারী, এটা শুধু তাদেরই কাজ। খোলসের সন্ধান পেয়েই তারা ভাবে যে, তারা সবকিছুই পেয়ে গেছে। অথবা তারা কোরআনের বর্ণিত অদৃশ্য তথ্যাবলীতে

নিজেদের অনুমান প্রয়োগ করে। ফলে তারা মনে করে যে, ওসব জিনিসের অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে, তবে সে সব জিনিসের আকৃতি প্রকৃতি তাদের আন্দাজ-অনুমান মোতাবেকই হতে হবে। এ কারণে আল্লাহর কথায় যে জিনিস শর্তহীন ও উন্মুক্ত রয়েছে, তাতে তারা নানা রকমের শর্ত আরোপ করেছে এবং নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এবং তাদের সীমাবদ্ধ বিবেকের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে নানা রকমের বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে। অথচ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা অধিকতর বিনয়ী হয় এবং তারা মানবীয় বিবেকবুদ্ধির আয়ত্তের বাইরের অনেক তথ্যকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হৃদয়বান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ স্মরণ করে না।'

কথাটার মর্ম এই যে, হৃদয়বান ব্যক্তিদের সত্যকে উপলব্ধি করার পথে একটি মাত্র জিনিসই অন্তরায়, আর তা হচ্ছে স্মরণ করা। কেননা, তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে ও জন্মগত বিবেকবুদ্ধির অভ্যন্তরে সত্য সর্বদা সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। কেবল তার কথা স্মরণ করলেই তা সক্রিয় হয়, স্পন্দিত হয়, আত্মপ্রকাশ করে এবং হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

আর স্মরণ করার পরই মিনতিসহকারে এই মর্মে প্রার্থনা করেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। হেদায়াত পাওয়ার পর কোনো অবস্থায়ই যেন তাদেরকে গোমরাহ করে না দেন, তাঁর রহমত যেন তাদের বঞ্চিত না করেন।

'হে আমাদের মালিক আমাদেরকে একবার যখন সত্যের পথে চালিত করেছো, তখন পুনরায় আর আমাদের মনকে বক্র ও পথভ্রষ্ট করে দিও না। আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত প্রদান করো। নিশ্চয়ই তুমি পরম দাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এক সন্দেহাতীত দিনে সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না।'

এটা হচ্ছে বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবস্থা। এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্কের প্রকৃত রূপ। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের সাথে সংগতিশীল আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস, তাঁর রহমত সম্পর্কে সম্যক অবগতি। এসব কিছু সত্ত্বেও তাঁর চূড়ান্ত ফয়সালা সম্পর্কে ভীতি ও উৎকণ্ঠা এবং আল্লাহভীতি, সদা সচেতনতা ও জাগতিক এই সকল গুণাবলীসজ্জিত মোমেনের সাথে যথাযথ মানানসই অবস্থা এটাই। কাজেই কারো একটি মুহূর্তের জন্যেও উদাসীন ও গর্বিত হওয়া উচিত নয় এবং কখনো এ কথা ভুলে যাওয়াও উচিত নয়।

বস্তুত গোমরাহীর পর হেদায়াত, অন্ধত্বের পর দৃষ্টিশক্তি, পথহারা হবার পর সঠিক পথ ফিরে পাওয়া, চিন্তার নৈরাজ্যের পর সত্যের নিশ্চিত সন্ধান লাভ, সৃষ্টির গোলামী থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর গোলামীতে আবদ্ধ হওয়া এবং তুচ্ছ পার্থিব মোহ থেকে মুক্ত হয়ে বৃহত্তর পরকালীন স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হওয়ার গুরুত্ব যে কতো বেশী, সেটা একমাত্র মোমেনের হৃদয়ই যথাযর্থভাবে উপলব্ধি করে থাকে। সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা কেবল ঈমানের প্রতিদানেই এতোসব অমূল্য সম্পদ তাকে দান করেছেন। আর এ জন্যেই সে পুনরায় গোমরাহীতে ফিরে যেতে এতো ভয় পায়। আলোকোজ্জ্বল, রাজপথের যাত্রী যেমন অন্ধকার গিরিবর্তে ফিরে যেতে ভয় পায়, ছায়ার পেলব পরশ উপভোগকারী যেমন রৌদ্রতপ্ত মরুপ্রান্তরে ফিরে যেতে ভয় পায়, এটা ঠিক তেমনি। আল্লাহদ্রোহীতা ও নাস্তিকতার অসার, শুষ্ক, তিক্ত ও দুর্ভাগ্যময় পরিণতি যে ইতিপূর্বে ভোগ করেছে, সে ছাড়া কেউ ঈমানের প্রফুল্লতার স্বাদ অনুভব করতে পারে না। গোমরাহী ও উদভ্রান্ততার কষ্ট যে ভোগ করেছে, একমাত্র সেই উপলব্ধি করতে পারে ঈমানের শান্তি ও পরিতৃপ্তির স্বাদ। এ কারণেই মোমেনরা তাদের প্রভুর কাছে এই দোয়ার মাধ্যমে মিনতি জানায়, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে হেদায়াত করার পর আর আমাদের অন্তরকে বাকা করে দিও না।'

তারা এখানেই ক্ষান্ত থাকে না, বরং আল্লাহর সেই অনুগ্রহও কামনা করে, যা গোমরাহীর অবসান ও হেদায়াত লাভের মাধ্যমে ইতিপূর্বে তারা অর্জন করেছে এবং ঈমানের ন্যায় অতুলনীয় দানের আকারে তারা তাকে পেয়েছে। তারা বলে,

'আর আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করো। নিশ্চয়ই তুমি পরম দাতা।'

বস্তুত তাদের ঈমানই তাদেরকে এই জ্ঞান দান করে যে, আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ ছাড়া কোনো কিছুই অর্জন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং তাদের অন্তর তাদের হাতে নয় বরং আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ। তাই সর্বান্তকরণে তারা কেবল তাঁরই সাহায্য ও মুক্তি কামনা করে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূল (স.) প্রায়ই এরূপ দোয়া করতেন, 'হে হৃদয়সমূহকে পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের ওপর স্থিতিশীল রাখো।' আয়েশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই দোয়াটা এতো ঘনঘন করেন কেন?' তিনি বললেন, 'প্রত্যেকটি অন্তর আল্লাহর দুই আংগুলের মাঝখানে থাকে। তিনি ওটাকে স্থির রাখতে চাইলে স্থির রাখেন। আর বক্র বা অস্থির করে দিতে চাইলে বক্র বা অস্থির করে দেন।'

ঈমানের বলে বলীয়ান অন্তর যখন বুঝতে পারে যে, আল্লাহর ইচ্ছা রোধ করার কোনো উপায় নেই, তখন পরম ঐকান্তিকতা ও উদগ্রীবতার সাথে সে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করে ও তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, যাতে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ও নেয়ামত অক্ষুণ্ন থাকে।

মোমেনদের প্রতি আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য

এরপর দ্বিতীয় রুকুতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের পাপাচারের কিরূপ শাস্তি দিয়ে থাকেন তা বলেন। সেই সাথে আহলে কেতাবদের সেই সব লোককেও কঠোর হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করেন, যারা মোহাম্মদ (স.)-এর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে কুফরীর পথ অবলম্বন করে এবং দাওয়াতের পথে বাধার সৃষ্টি করে। এখানে আল্লাহ তায়ালা রসূল (স.)-কেও শিখিয়ে দিচ্ছেন যেন তিনি তাদের হুঁশিয়ার করে স্মরণ করিয়ে দেন বদর যুদ্ধে তাদের চোখের সামনে মুষ্টিমেয় মোমেন দলকে কিভাবে আল্লাহ তায়ালা বৃহত্তর কাফের দলের ওপর জয়যুক্ত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ কথাই এখানে বলেছেন ১০ থেকে ১৩ আয়াতসমূহে।

এ আয়াতগুলো বনী ইসরাঈল তথা আহলে কেতাব গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। এতে শুধু যে তাদেরকে তাদের পূর্বের ও পরের কাফেরদের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তাই নয়, বরং খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফেরাউন ও তার দলবলের পরিণতিও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে তার দলবল ও সৈন্য সামন্তসহ ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে এটা তাদের এমন কোনো অবশ্যপ্রাপ্য রক্ষাকবচ নয় যে, তারা কুফরীতে লিপ্ত হলেও সেটা তাদের জন্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তারা বিপথগামী হলে তাদেরকে অবশ্যই অন্যান্য কাফেরদের মতো পরিণতি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বদরযুদ্ধে কোরায়শদের কি শোচনীয় পরিণতি হয়েছিলো তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর শাশ্বত নীতির কোনো পরিবর্তন নেই। কোরায়শদের যে পরিণতি হয়েছে, সেই পরিণতি থেকে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর পরিত্রাণ নেই। মূল কারণটি হলো আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করা। এই কারণটি থেকে মুক্ত থেকে বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারী হওয়া ছাড়া আর কোনোভাবেই আল্লাহর আযাব থেকে দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় নেই। ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না, তারা হবে দোযখের জ্বালানি।'

ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে বলে মনে করা হয়, কিন্তু এগুলো কেয়ামতের সেই বিপদসংকুল দিনে কোনোই কাজে আসবে না। কেননা, নিজেদের পাপাচারের কারণে কাফেররা সেদিন হবে দোযখের জ্বালানি। এভাবে তাদের মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ অস্বীকার করে তাদেরকে নিছক জ্বালানি কাঠ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শুধু ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততিই নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত যে কোনো কাজে আসে না– শুধু আখেরাতে নয়, দুনিয়াতেও– সে কথা ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে,

‘ফেরাউনের গোষ্ঠীর অনুসৃত রীতির মতো, তারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছিলো। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের পাপের জন্যে পাকড়াও করেছিলেন।’

এটা ইতিহাসে বহুবার সংঘটিত বাস্তব উদাহরণ। এ উদাহরণের বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তায়ালা এই কোরআনে দিয়েছেন। আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীরা যে সময়ের ও যে দেশেরই হোক না কেন, তাদের সকলের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রযোজ্য নীতি এতে প্রতিফলিত হয়েছে। কাজেই আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারীর কোনো উপায় নেই।

সুতরাং যারা মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি নাযিল করা কেতাবের বিধানসমূহকে অগ্রাহ্য করেছে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্যে এই পরিণতি নির্ধারিত। এ জন্যে রসূল (স.)-কে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তিনি যেন অস্বীকারকারীরকে অবশ্যম্ভাবী এই পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেন এবং কিছুদিন আগে সংঘটিত বদরযুদ্ধের ঘটনাও স্মরণ করিয়ে দেন। তারা হয়তো ফেরাউন ও তার পূর্ববর্তীদের কুফরী ও শোচনীয় পরিণতির কথা ভুলে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

‘যারা কুফরী করেছে তাদেরকে বলে দাও, তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে এবং .... আর অপরটি কাফের এবং (এই কাফেররা) অপর (মুসলিম) বাহিনীকে চাক্ষুষ দর্শনে দ্বিগুণ দেখে। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। এতে চক্ষুষ্মানদের জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে।’

আয়াতের এ অংশটি লক্ষণীয়, ‘তারা অপর বাহিনীকে চাক্ষুষ দর্শনে দ্বিগুণ দেখে।’

এর দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথমত, কাফের বাহিনী সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম বাহিনীকে দ্বিগুণ দেখে। আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাক্রমেই এরূপ হয়ে থাকবে। ফলে তাদের কাছে মনে হয়েছিলো যে, তারাই সংখ্যালঘু এবং মুসলমানরাই সংখ্যায় অধিক। ফলে তাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তারা পরাজিত হয়। দ্বিতীয়ত, এর বিপরীত অর্থও হতে পারে। সেটি এই যে, কাফেররা তো মোমেনদের প্রায় তিনগুণ ছিলো। কিন্তু মোমেনদের কাছে তাদেরকে মনে হচ্ছিলো মাত্র দ্বিগুণ। এ সত্তেও তারা দৃঢ় মনোবল নিয়ে লড়েছে ও বিজয়ী হয়েছে।

এখানে আসল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো আল্লাহর সাহায্য ও ব্যবস্থাপনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন কাফেরদের প্রতি কটাক্ষ ও হুমকি প্রদর্শন করা হয়েছে, অপরদিকে তেমনি মোমেনদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে তাদের শত্রুদেরকে হীনতর করে দেখানো হয়েছে। সূরার ভূমিকাতেই বলেছি যে, কোরআন এই উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ মোমেনদের মনোবল বৃদ্ধি ও কাফেরদের মনে ভীতি সৃষ্টি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

কোরআন এই বৃহত্তম সত্য সম্পর্কে ক্রমাগত সোচ্চার যে, আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যানকারী অমান্যকারীদেরকে তিনি পরাজিত করবেন এবং মোমেনদের দল যতো ক্ষুদ্রই হোক তাদেরকে তিনি বিজয়ী করবেন। আল্লাহর এ ওয়াদা চির অম্লান। আর আল্লাহর যখন ইচ্ছা, কারো ওপর থেকে নিজের সাহায্য ও সমর্থন প্রত্যাহারও করে নিতে পারেন। এটিও তাঁর চিরস্থায়ী নীতি।

মোমেনদের একমাত্র কর্তব্য হলো, উক্ত সত্যকে মনে প্রাণে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা এবং আল্লাহর উক্ত ওয়াদার ওপর আস্থাশীল থাকা। সাধ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করা, অতপর আল্লাহর সাহায্য যতো বিলম্বেই আসুক ধৈর্যধারণ করা এবং হতাশ না হওয়া। কেননা, সাহায্যের

উপযুক্ত সময় কখন, তা আল্লাহ তায়ালাই জানেন, তিনিই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বড় কুশলী ও প্রজ্ঞাময়। নিজের সেই সূক্ষ্মদর্শিতা অনুসারেই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সময় ঠিক করেন।

'নিশ্চয়ই এতে চক্ষুষ্মানদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।' বস্তুত শিক্ষা গ্রহণের জন্যে উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। নচেত দিনে রাতে প্রতি মুহূর্তেই তো শিক্ষা মানুষের সামনে আসছে এবং পুনরায় তা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

মানবীয় দুর্বলতা ও তার নিয়ন্ত্রণ

অতপর মুসলিম জাতির চরিত্র গঠনের প্রয়োজনে তাদেরকে সেই সব গোপন সহজাত দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করা হচ্ছে, যা যাবতীয় চারিত্রিক পদস্খলনের উৎস। সার্বক্ষণিক সচেতনতা দ্বারা যদি এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা না হয়, মানুষের মন মগযে যদি, উচ্চতর ও মহত্তর অভিলাষ না থাকে এবং আল্লাহর কাছে যে সর্বোত্তম ও পবিত্রতম সামগ্রী রয়েছে, তার প্রতি যদি মানুষ অধিকতর উদগ্রীব না হয়, তাহলে এই সব দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

পার্থিব কামনা বাসনা এবং রিপুসমূহের চাহিদা পূরণে আত্মনিয়োগ করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যে, এটি মানুষের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও উপলব্ধি এবং শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এ রোগ মানুষকে ভোগের সামগ্রীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে এবং তাকে উচ্চতর ও মহত্তর বিষয়াবলীর দিকে মনোনিবেশে বাধা দেয়। এ রোগ তার ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে এতো তীব্র করে তোলে যে, তার বাইরে অন্য কিছুর অনুসন্ধানের ক্ষমতা তার মধ্যে আর অবশিষ্ট রাখে না। এই পৃথিবীতে মানবরূপী মহত্তর সৃষ্টি এবং আল্লাহর প্রতিনিধির উপযুক্ত ভূমিকা পালনে যেরূপ মহৎ দৃষ্টিভংগির প্রয়োজন তা থেকে তাকে বঞ্চিত করে।

কিন্তু যেহেতু এই সব কামনা বাসনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকেই এগুলোর ওপর মানুষের জীবনরক্ষা ও সম্প্রসারণের একটা মৌলিক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সেহেতু ইসলাম এই সব রিপু ও প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে খতম করার উপদেশ দেয়নি। কেবলমাত্র এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা ও সুশৃংখল করার নির্দেশ দিয়েছে। মানুষ যাতে এগুলোর তীব্রতা হ্রাস করে এবং এগুলোর চাপ কমিয়ে আনে, সে জন্যে কিছু পরামর্শ দিয়েছে। সে যাতে এগুলোর গোলাম না হয়ে বরং এর নিয়ন্তা হয় এবং এর ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে নিজেকে উচ্চতর জগতে আরোহণ করাতে পারে সে জন্যে উপদেশ দিয়েছে।

এ কারণেই পবিত্র কোরআন মানুষের চরিত্রগঠনের এই দায়িত্ব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই এই সকল কামনা বাসনা ও রিপুসমূহের উল্লেখ করেছে। আর এর পাশাপাশি পরবর্তী জগতের নানাবিধ সুস্বাদু সামগ্রীর কথাও তুলে ধরেছে, যা কেবল এই পৃথিবীতে প্রকৃতির সম্ভোগের ইচ্ছা দমনকারী ও উচ্চতর মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণকারীদেরই প্রাপ্য।

কোরআন এখানে একটি মাত্র আয়াতেই মানুষের কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ও আকর্ষণীয় কামনা-বাসনাগুলোর নামোল্লেখ করেছে। এগুলো হচ্ছে নারীর ভালোবাসা, সন্তান সন্ততির ভালোবাসা, সহায় সম্পদ, ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও উর্বর ভূমির ভালোবাসা। পার্থিব আকর্ষণ ও ভালোবাসার যাবতীয় সামগ্রীর মধ্যে এগুলো হচ্ছে সর্বপ্রধান। এর মধ্যে কতক সামগ্রী তো রয়েছে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য ও তৃপ্তিদায়ক। আবার কতক সামগ্রী এগুলোর মালিককে পরোক্ষভাবে তৃপ্তি ও স্বাদ ভোগ করতে সাহায্য করে। আর পরবর্তী আয়াতে রয়েছে আখেরাতের উপভোগ্য সামগ্রীর বর্ণনা, যথা প্রবহমান ঝর্ণাসমূহ, পবিত্র স্ত্রী এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তোষ। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে এমন দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্যেই পার্থিব এসব সামগ্রী সুরক্ষিত রয়েছে। পরবর্তী ৪টি আয়াতের বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

'মানব জাতির জন্যে মোহনীয় করে রাখা হয়েছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত সোনা রূপা, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছেই হলো .... যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই তুমি আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও, আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। তারা ধৈর্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ পালনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।' (আয়াত ১৩ - ১৬)

এখানে 'মানব জাতির জন্যে মোহনীয় করে রাখা হয়েছে' এই উক্তিটিতে স্পষ্টতই ইংগিত রয়েছে যে, উল্লেখিত পার্থিব জিনিসমূহের প্রতি মানুষের আকর্ষণ একান্তই সহজাত। এ সব জিনিসকে আকর্ষণীয় ও প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। এটা মানুষের প্রকৃতির দুইটি দিকের একটির বাস্তব চিত্র। এ সব আকর্ষণীয় জিনিসের প্রতি মানুষের জন্মগত একটা টান রয়েছে। এটা তার মৌল গঠনপ্রণালীর অন্তর্ভূক্ত। এসব জিনিসকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করারও কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলো মানবজীবনের জন্যে অপরিহার্য। এগুলো তার স্থীতি, উন্নতি ও স্থায়িত্বের জন্যে অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু বাস্তবতার সাক্ষ্য এই যে, মানবপ্রকৃতির আরো একটি দিক রয়েছে, যা এই আকর্ষণে ভারসাম্য আনয়ন করে এবং ওই একটি দিকে একেবারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে তার উচ্চতর জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলা থেকে রক্ষা করে। এই দ্বিতীয় দিকটি হচ্ছে তার উচ্চতর মর্যাদায় বিচরণ ও বিকাশ লাভের যোগ্যতা। এটি হচ্ছে তার সকল আকর্ষণীয় জিনিস উপভোগ করতে গিয়ে প্রবৃত্তিকে নিরাপদ সীমারেখায় থামিয়ে রাখার যোগ্যতা। অর্থাৎ প্রবৃত্তিকে জীবনের গঠনমূলক সীমারেখায় সংযত রাখার যোগ্যতা। অবশ্য জীবনকে উচ্চতর স্তরে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রেখেই প্রবৃত্তি সংযতকরণের এই প্রক্রিয়া চালু রাখতে হবে। চালু রাখতে হবে মানবীয় অন্তকরণকে উচ্চতর জগত, পরকাল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি কেন্দ্রীভূত রাখার কার্যধারা। এই দ্বিতীয় যোগ্যতাটা প্রথমোক্ত যোগ্যতাকে পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্ন করে। ফলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও উচ্চতর মর্যাদায় উন্নত হওয়া থেকে এসব পার্থিব ভোগ্যসামগ্রী তার আত্মাকে বাধা দেবে না।

'মানুষের জন্যে মোহনীয় করে রাখা হয়েছে ভোগের উপকরণসমূহের ভালোবাসা।'

বস্তুত এসব উপকরণে মানুষের ভোগস্পৃহা এবং মোহ রয়েছে। কিন্তু এগুলোর অস্তিত্বই খারাপ নয় এবং আয়াতে এগুলোকে ঘৃণা করতেও বলা হয়নি। আয়াতে শুধু আহ্বান জানানো হয়েছে যেন আমরা এগুলোর প্রকৃতি উপলব্ধি করি, এগুলোকে যেন স্ব স্ব সীমায় সীমিত রাখি এবং জীবনের বৃহত্তর ও উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে এগুলোকে অন্তরায় হতে না দেই। কোরআন আমাদেরকে শুধু এই সব ভোগোপকরণের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ ভোগ করার পর সেখানেই নিমজ্জিত ও নিবৃত্ত না থেকে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে বলে।

এখানে ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে, সে মানুষের স্বভাব প্রকৃতির বাস্তবতাকে মেনে নেয় এবং তাকে উন্নত ও পরিশীলিত করে। ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতিকে অবদমিত করে না বরং সংযত ও নিয়ন্ত্রণ করে। যে সকল দার্শনিক আজকাল স্বভাবকে অবদমিতকরণ ও তার ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে আলোচনা করেন এবং অবদমনজনিত 'মানসিক বিকৃতি' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, তাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা নয় বরং অবদমিত ও করাই 'মানসিক বিকৃতির মূল কারণ।' আর অবদমিত ও নিষ্পেষিত করা বলতে বুঝায় মানুষের স্বভাবগত কামনা বাসনাকে ঘৃণ্য ও নোংরা মনে করে তাকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করা। এরূপ করার কারণে ব্যক্তি মানুষটি দু'টি পরস্পর বিরোধী চাপের মধ্যে পতিত হয়। একটি হলো ধর্মীয় কিংবা সামাজিক কারণে এই মনোভাব পোষণ করা যে, প্রবৃত্তির সকল চাহিদা নোংরা এবং মূলতই

অবৈধ। এই মনোভাবের ফলে সে মনে করতে থাকে যে, প্রবৃত্তির প্রত্যেক দাবী, চাহিদা ও ভোগস্পৃহাই হচ্ছে পাপ। একদিকে এই মনোভাবের চাপ, অপরদিকে এসব চাহিদা কখনো পরাজিত হয় না। কারণ মানবপ্রকৃতিতে এগুলোর অস্তিত্ব অত্যন্ত গভীর। তাছাড়া মানবজীবনে এগুলোর এমন মৌলিক ভূমিকা রয়েছে যা এর সাহায্য ছাড়া পালিত হয় না। আর আল্লাহ তায়ালা মানবপ্রকৃতিতে এগুলোকে বৃথা সৃষ্টি করেননি। এই দ্বিবিধ চাপের প্রভাবেই মানসিক বিকৃতির সৃষ্টি হয়। আমরা যদি তর্কের খাতিরে এই সব মনস্তাত্ত্বিক মতবাদের সত্যতা মেনে নেই, তবু দেখতে পাই যে, একমাত্র ইসলামই এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব থেকে মানবসত্ত্বার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাকে পূর্ণ ভারসাম্য সহকারে জীবনের স্বাভাবিক তৎপরতা অব্যাহত রাখার সুযোগ দিয়েছে।(১)

স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির প্রতি মানবসত্ত্বার আকর্ষণবোধ একটা প্রচন্ড ও দুরন্ত শক্তি। এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে স্তূপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের শক্তিকে। স্তূপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা মূলত অর্থলিপ্সাকে বুঝানো হয়েছে। তবে শুধু অর্থ লিপ্সাকে বুঝানো উদ্দেশ্য হলে শুধু 'সম্পদ' অথবা স্বর্ণ-রৌপ্য বলেই ক্ষান্ত করা হতো স্তূপীকৃত স্বর্ণ রৌপ্য বলা হতো না। আসলে এ দ্বারা সম্পদ সঞ্চয়ের ও স্তূপীকরণের দুর্নিবার মোহকেই বুঝানো হয়েছে। সঞ্চিত সম্পদ দ্বারা ধনিকরা প্রবৃত্তির অন্য যে সব আকাংখা চরিতার্থ করে থাকে, এখানে তা প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

এরপর স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্যের সাথে যুক্ত হয়েছে 'চিহ্নিত অশ্বরাজি'। অশ্ব আজকের এই যান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও একটি প্রিয় জিনিস। অশ্ব হচ্ছে যৌবন, সৌন্দর্য ও বীরত্বের প্রতীক। অশ্ব তীব্র মেধা, আনুগত্য ও প্রীতির প্রতীক। এমনকি যারা অশ্বের পিঠে আরোহণ করে না, তারাও কিন্তু তা দেখতে ভালোবাসে। কোনো জাতির মধ্যে বীরত্ব ও সাহসিকতা যতোক্ষণ থাকবে, ততোক্ষণ তাদের এই অশ্বপ্রীতি নিস্তেজ হতে পারে না।

এ সবের সাথে গবাদিপশু ও ক্ষেতের সংযোজন বিশেষ তাৎপর্যবহ। গবাদিপশু ও ফসলের ক্ষেত সাধারণত কল্পনায় ও বাস্তবে একত্রে বিরাজ করে। গবাদিপশু ও উর্বর শস্যক্ষেত অত্যন্ত আকর্ষণীয় বস্তু। কেননা এই দুটোতেই রয়েছে উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির দৃশ্য। জীবনের ক্রমবৃদ্ধি মূলতই একটি প্রিয় দৃশ্য। তদুপরি তার মালিকানা লাভের বিষয়টি যদি এর সাথে যুক্ত হয়, তাহলে ক্ষেত্র ও গবাদিপশু যথার্থই আকর্ষণীয়। এখানে যে লোভনীয় পার্থিব উপকরণসমূহের উল্লেখ করা হলো, এগুলো মানবমনের পরম ঈপ্সিত পার্থিব উপকরণাদির কয়েকটি নমুনা মাত্র। এগুলো প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সম্পদ। এগুলো কোরআনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত।

বস্তুবাদী জীবনের আরো একটা আকর্ষণীয় বস্তু, যা সর্বকালের সকল মানুষকে সমভাবে আকৃষ্ট করে থাকে তা হচ্ছে স্বয়ং এই পার্থিব জীবনটা। কোরআন এ জিনিসটিকে প্রথমে তুলে ধরে, অতপর তার প্রকৃত মূল্যমান নির্ণয় করে, যাতে মানুষ তাকে তার নিজ স্থানে সীমিত রাখে এবং অন্যান্য জিনিসের ওপর তাকে প্রাধান্য বিস্তার করতে না দেয়। তাই কোরআন বলছে,

'এ হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী।'

অর্থাৎ ওপরে যেসব জিনিসের উল্লেখ করা হলো, তার সবই হচ্ছে দুনিয়াবী জীবনের ভোগ্য সামগ্রী। দুনিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে 'নিকটতম।' অর্থাৎ কোনো চিরস্থায়ী জীবনের সামগ্রী নয় বরং ইহকালের জীবনের সামগ্রী। এখন যদি কেউ এর চেয়ে এমন মূল্যবান সামগ্রী কামনা করে, যা মানুষকে কেবল জৈবিক চাহীদার মধ্যে নিমজ্জিত করে দেয় না এবং উচ্চতর জীবনের অভিলাষ থেকে বঞ্চিত করে না, তাহলে সে ধরনের সামগ্রী শুধু আল্লাহর কাছেই রয়েছে। শুধু তাই নয়, সেখানে এই সকল সামগ্রীর উত্তম বিকল্পও রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

(১) মোহাম্মদ কুতুব প্রণীত 'বস্তুতান্ত্রিকতা ও ইসলামের সংঘাতের মুখে আদম সন্তান' দেখুন।

'আল্লাহর কাছেই রয়েছে মহৎ আশ্রয়। তুমি বলো, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে ভালো জিনিসের সন্ধান দেবো? পরহেযগারদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণা প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর পবিত্র সংগিনীরা এবং সর্বোপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তোষ। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।'

মোমেনের গুণাবলী ও তার চাওয়া পাওয়া

এখানে আয়াতে যে পরকালীন সামগ্রীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং পরহেযগারদের যার সুসংবাদ দিতে রসূল (স.)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আওতাধীন জিনিস। তবে পার্থিব সামগ্রী এবং এই সব সামগ্রীর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এই যে, এই সমস্ত সামগ্রী একমাত্র পরহেযগার লোকেরাই পেয়ে থাকে। যাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ আল্লাহভীতি বিরাজমান, কেবলমাত্র তাদের ভাগ্যেই এগুলো জোটে। আল্লাহভীতি মানুষের আত্মা ও ঐন্দ্রিক সত্ত্বা উভয়কে পরিশীলিত করে এবং মানুষকে পার্থিব ভোগের সামগ্রীতে পশুর মতো ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে, তারা যখন তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া এই সব ইন্দ্রিয়ানুভূত সামগ্রীর সন্ধানে নিয়োজিত হয়, তখন তাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে স্থূলতা ও পাশবিক ইন্দ্রিয়লিপ্সা থাকে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায়ই তারা তার সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। আর এই পবিত্র পরিচ্ছন্ন নিষ্পাপ সামগ্রীতে দুনিয়াবী সামগ্রীর পূর্ণাংগ বিকল্প রয়েছে। বরং তাতে কিছু বাড়তি জিনিসও রয়েছে। পার্থিব জীবনে যেখানে তাদের জন্যে রয়েছে উর্বর ও শস্যশ্যামল ক্ষেত, সেখানে আখেরাতে রয়েছে জান্নাত, যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। উপরন্তু তা চিরস্থায়ী, দুনিয়ার শস্যক্ষেতের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়। ইহকালে যেখানে তাদের রয়েছে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি, সেখানে আখেরাতে রয়েছে পবিত্র সংগিনীরা। পার্থিব জীবনের ভোগ লালসার তুলনায় আখেরাতের এই পূত-পবিত্র সংগিনীদের মধ্যে অনেক উৎকৃষ্টতর ভাবমূর্তি বিরাজমান।

চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদিপশু ও রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্যের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। কেননা, পৃথিবীর জীবনে এগুলো ছিলো ভোগ্যসামগ্রী অর্জনের উপায়মাত্র। কিন্তু আখেরাতের জীবনে কোনো উপায় উপকরণের প্রয়োজন থাকবে না। আপনা থেকেই সেখানে লক্ষ্য অর্জিত হবে।

সর্বোপরি আখেরাতে এই সকল সম্পদ সামগ্রীর চেয়ে বড় একটা জিনিসও মোমেনদের প্রাপ্য রয়েছে। সেটি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটি এতো বড় সম্পদ যে, ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের যাবতীয় সুখশান্তির সমান বরং আরো অনেক বড়।

'বস্তুত আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।'

অর্থাৎ কী স্বভাবপ্রকৃতি ও আবেগ অনুভূতি দিয়ে তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেটা তিনি সম্যক অবগত। এই স্বভাবপ্রকৃতির জন্যে কোন ধরনের বিধি-বিধান মানানসই এবং তাকে কিভাবে পরিচালনা করা দরকার, সে ব্যাপারেও তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন।

এরপর তিনি এই বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করছেন, যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সর্বদা জীবন যাপনে সংযত বা পরহেযগার, যার কারণে তারা আপন প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছে। 'যারা বলে, হে আমাদের প্রভু, আমরা ঈমান এনেছি।' ....

তাদের এই দোয়ায় সত্যিকার আল্লাহভীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। এখানে ঈমানের সাহসী ঘোষণার সাথে ঈমানের কথা উল্লেখ করে ক্ষমা ও দোযখ থেকে মুক্তি প্রার্থনা করা হয়েছে।

মোমেন বান্দাদের যে গুণাবলী এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, এর প্রত্যেকটিতে মানবজীবনের ও মুসলিম সমাজজীবনের এক একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। মোমেনদেরকে ধৈর্যশীল বলা হয়েছে। ধৈর্য এমন একটি গুণ, যা মানুষকে যে কোনো ব্যথা বেদনা ও অভিযোগের উর্ধে

তুলে ধরে। আন্দোলনের পথে যতো ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়, তা স্বীকার করা ও দৃঢ় মনোবল বজায় রাখা এবং আল্লাহর সামনে, তাঁর ইচ্ছার ও নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণকে প্রতিভাত করে।

মোমেনদেরকে সত্যবাদী বলা হয়েছে। সত্যবাদিতা এমন একটি গুণ, যা দ্বারা সত্যকে ধারণ করে মর্যাদাশীল হওয়া বুঝায়। আর সত্য হচ্ছে বিশ্বজগতের অস্তিত্বের ভিত্তি। সত্যবাদিতা শক্তির প্রতীক। এটা মানুষকে সকল দুর্বলতার উর্ধে তুলে ধরে। মিথ্যাবাদিতা যেখানে সত্য কথা বলার ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন এবং এর মাধ্যমে কোনো ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া ও উপকার লাভের শামিল, সত্যবাদিতা সেখানে এই ভীরুতা ও স্বার্থপরতার উর্ধে ওঠার নামান্তর।

মোমেনদেরকে এ আয়াতে আনুগত্যশীল বলা হয়েছে। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমেই আল্লাহর প্রাপ্য দান ও বান্দার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। এর মাধ্যমেই মানুষ প্রমাণ করতে পারে যে, সে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো অনুগত নয়। এটিই মানবীয় সৌভ্রাতৃত্বকে অগ্রাধিকার দানের এবং পৃথিবীতে মানবীয় মর্যাদা ও সামাজিক নিরাপত্তার প্রতীক।

সবার শেষে এই বলে মোমেনদের প্রশংসা করা হয়েছে যে, তারা ভোর রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। ভোর রাত এমন একটি মুহূর্ত, যখন গোটা প্রাকৃতিক পরিবেশে বিরাজ করে সুগভীর নিস্তব্ধতা। এ সময়ে মনের সকল দ্বন্দ্ব স্তিমিত থাকে। এই সময় যখন মানুষ ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তখন মনে হয় যেন মানুষ ও প্রকৃতি একই সাথে ক্ষমাপ্রার্থনায় লিপ্ত। বিশ্বের স্রষ্টার সামনে যেন মানবাত্মা ও বিশ্বআত্মা একাকার হয়ে মিনতি জানাচ্ছে।

এই সব ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, সৎপথে ব্যয়কারী ও ভোর রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী বান্দাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রকৃত অধিকারী। আর এই সন্তুষ্টি যে কোনো ভোগলিপ্সা ও বস্তুবাদী ভোগ্যসামগ্রীর চেয়ে উত্তম।

এভাবেই কোরআন মানুষকে বস্তুবাদীজগতের উর্ধ্বে উঠিয়ে মহাসত্যের জগতে বিচরণ করায়। ক্রমে সে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত করে। এক্ষেত্রে সে তার দুর্বলতা ও অক্ষমতার যেমন হিসাব করে, তেমনি তার শক্তি ও আবেগকেও যথাযথভাবে বিচেনায় আনে। তার ওপর কোনরূপ বল প্রয়োগ করে না বা দমননীতি চালায় না। স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে কখনো ব্যাহত করে না। কেননা, এই স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রকৃতির বিধান।

ইসলাম সম্পর্কে কিছু সামগ্রীক আলোচনা

এ পর্যন্ত সূরার আয়াতসমূহ তাওহীদ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজেই নিয়োজিত ছিলো। অর্থাৎ মানব জাতির আল্লাহ এক, কেতাব এক এবং রসূল এক। এ ব্যাপারে প্রকৃত মোমেনদের অবস্থান কী এবং আল্লাহর কেতাব ও তার আয়াতসমূহ নিয়ে যারা বক্রতা ও গোমরাহীতে লিপ্ত, তাদেরই বা পরিণাম কী তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। তারপর যে সকল জিনিস জন্মগতভাবেই মানুষকে তার আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়, তার বর্ণনা দিয়েছে এবং মোত্তাকী ও পরহেযগার বান্দাদরে পরিচয় তুলে ধরেছে।

এক্ষণে এই আলোচনার শেষে আমরা অপর একটি সত্যের সম্মুখীন হই। সে সত্যটি প্রথমোক্ত সত্যেরই ফলশ্রুতি। যে তাওহীদের কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, মানবজাতির জীবনে তার একটা বাস্তবরূপ লাভ করা আবশ্যক। আলোচনার যে দ্বিতীয় পর্ব এখন শুরু হচ্ছে, তাতে এই বিষয়টিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বিষয়টি আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রথমোক্ত সত্যটি অর্থাৎ তাওহীদের তত্ত্বটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাতে তার অনিবার্য দাবীগুলোও তুলে ধরা যায়। এখানেই তাই 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই' এই মর্মে স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্য, ফেরেশতাদের সাক্ষ্য এবং জ্ঞানীজনদের

সাক্ষ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে আলোচনার এই নয়া পর্বটির সূচনা করা হয়েছে। সেই সাথে মানব ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি আল্লাহর নিখুঁত ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগতের একক ও সর্বময় প্রতিপালক, তাই এই সত্যটি স্বীকার করার সাথে সাথে মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো নিজেকে একমাত্র আল্লাহর গোলাম বলে স্বীকার করা, আল্লাহর আইনকে জীবনের সকল ব্যাপারে সর্বোচ্চ আইনরূপে মেনে নেয়া, সেই সর্বময় প্রতিপালকের আনুগত্য করা, তাঁর কাছে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা। আর এই সত্যটিই প্রতিফলিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতের এই উক্তিটিতে

'নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা।'

অর্থাৎ তিনি এ ছাড়া আর কোনো দ্বীনকেই জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করেন না। ইসলাম অর্থই হলো আত্মসমর্পণ। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মানুষের কাছ থেকে যে দ্বীন গ্রহণ করেন, তা শুধু মস্তিষ্ক দ্বারা কোনো কিছু চিন্তা করা নয় এবং মন দ্বারা কোনো কিছুকে সত্য বলে মানাও নয়। বরঞ্চ তা হচ্ছে মস্তিষ্কের উক্ত চিন্তা এবং মনের উক্ত স্বীকৃতিকে বাস্তবে রূপদান। বান্দাদের সকল বিষয়ে আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করা, বান্দা কর্তৃক তাঁর হুকুম বা আইনকে নির্বিবাদে মানা এবং তাঁর বিধান সম্পর্কে রসূল (স.) যা নির্দেশ দেন তা অনুসরণ করাটাই ইসলাম।

এভাবে আলোচনার এক পর্যায়ে কোরআন আহলে কেতাবদের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করে ও তাদের আচরণকে জনসমক্ষে তুলে ধরে। আহলে কেতাবরা নিজেদেরকে আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী বলে দাবী করে থাকে। অথচ যখনই তাদেরকে আল্লাহর কেতাব অনুসারে বিচার ফয়সালা করতে আহ্বান জানানো হয়, তখনই তাদের একদল তা প্রত্যাখ্যান করে। এটা তাদের দাবীর একেবারেই পরিপন্থী ব্যাপার। কেননা ইসলাম ছাড়া আর কোনো দ্বীন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ, আল্লাহর রসূলের আনুগত্য এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের অনুসরণ ছাড়া ইসলামের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না।

এরপর কোরআন এই অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানের কারণ ব্যাখ্যা করে। তাদের এই অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান যে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঈমান না আনারই পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের ব্যাখ্যা অনুসারে তাদের এই প্রত্যাখ্যানের কারণ হলো কেয়ামতের দিন আল্লাহ যে ইনসাফের ভিত্তিতে কর্মফল দেবেন, সে ব্যাপারে তাদের অবিশ্বাস। (আয়াত ২৪)

'এর কারণ এই যে, তারা বলে বেড়াতো, হাতে গনা কয়েক দিন ছাড়া আমাদেরকে আগুনে স্পর্শ করবে না। তাদের মিথ্যা ও উদ্ভট অপপ্রচার ধর্ম সম্পর্কে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে রাখতো।'

বস্তুত এটা তাদের প্রতারণামূলক আত্মভিমান। আসলে তারা আদৌ আহলে কেতাব নয়। কোনো কেতাবই তারা মানে না এবং তারা মোমেন নয়। আল্লাহ তায়ালার কেতাব মেনে চলার দাওয়াত দিলে যারা তা প্রত্যাখ্যান করে তারা মোটেই আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হতে পারে না।

তাই এখানে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার হওয়ার মর্ম বিশ্লেষণ করছেন। বান্দার কাছ থেকে আল্লাহ তায়ালা শুধু চান আল্লাহর দ্বীনের বা আইনের আনুগত্য ও তাতে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ তাঁর কেতাব কোরআনের বিধান অনুসারে বিচার ফয়সালা করা ও তার অনুসরণ করা। এটা যে করবে না তার কোনো ধর্ম নেই, সে মুসলমান নয়, মুখে সে যতোই নিজেকে মুসলমান দাবী করুক! আল্লাহর দ্বীন কী জিনিস, সেটা ব্যাখ্যা করা ও সংজ্ঞা দেয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর এই সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন না। তিনি শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছা অনুসারেই ব্যাখ্যা করেন।

যারা কাফেরদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, 'আল্লাহ তায়ালা তাদের কেউ নয়'। কেননা কোরআনে বলা হয়েছে যে, কাফেররা আল্লাহর কেতাব অনুসারে বিচার-ফয়সালা করে না, সুতরাং তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণকারীর সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই। যারা আল্লাহর কেতাবকে অস্বীকারকারীদের সাথে মৈত্রী ও বন্ধুত্ব পাতায়, তারা যতোই আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী হবার দাবী করুক, আসলে তারা আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী নয়।

অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে উচ্চারিত এই সতর্কবাণীকে পরবর্তীতে আরো জোরদার করা হয়েছে এই বলে যে, এ বন্ধুত্ব গোটা দ্বীনকে ধ্বংস করে ছাড়বে। আর সেই সাথে মুসলমানদেরকে সৃষ্টি জগতের সকল তৎপরতার মূলে সক্রিয়, আসল শক্তি কি তা বুঝানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালাই সর্বময় ক্ষমতার সার্বভৌম মালিক। তিনি বিশ্বজগতের মহাপ্রতাপশালী রাজাধিরাজ। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার রাজত্ব কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত ও যাকে ইচ্ছা অপদস্থ করেন। মানবজাতির মধ্যে এতো সব পরিবর্তন সাধন গোটা বিশ্ব পরিচালনারই অংশ বিশেষ। তিনি যেমন মানুষের মর্যাদার পরিবর্তন ঘটান, তেমনি রাতকে দিন ও দিনকে রাত বানান এবং মৃতকে জীবিত ও জীবিতকে মৃত করেন। এভাবেই তিনি মানবজাতির এবং বিশ্বজগতের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং আল্লাহর আইন অমান্যকারী কাউকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই, সে যতো বেশী ধনবল, জনবল বা বাহুবলের অধিকারীই হোক না কেন।

এই পুন পুন সতর্কবাণী দ্বারা তৎকালীন মুসলিম সমাজের কিছু কিছু বাস্তব দুর্বলতার দিকে ইংগিত করা হচ্ছে। মুসলমানদের কাছে এ বিষয়টা পুরোপুরিভাবে স্পষ্ট ছিলো না। তাই কেউ কেউ মক্কায় মোশরেকদের সাথে ও মদীনায় ইহুদীদের সাথে পারিবারিক, গোত্রীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা করতেন। এ জন্যেই এই সতর্কবাণীর প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ছাড়া এ বিষয়েও ইংগিত দেয়া হচ্ছে যে, দৃশ্যমান বিভিন্ন প্রতি মানবমনের আকর্ষণ নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত শক্তি কোথায় নিহিত সে বিষয়টি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়া যেমন দরকার, তেমনি আকীদা বিশ্বাসের বাস্তব দাবী কী তাও মনে করিয়ে দেয়া জরুরী।

অবশেষে আলোচনার উপসংহার টানা হয়েছে এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য দ্বারা যে ইসলাম শুধু অন্তরে বিশ্বাস পোষণ এবং মুখ দিয়ে সাক্ষ্য দেয়া বা ঘোষণা দেয়ার নাম নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্যের নাম। বলা হয়েছে,

'তুমি বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুকরণ ও অনুসরণ করো, তা হলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং বলো, আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করো। তা করতে তারা যদি অস্বীকার করে, তাহলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না।'

হয় অনুসরণ করতে হবে যা আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন, নচেত কুফরীর পথ অবলম্বন করতে হবে যা আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। এ হচ্ছে দুটো সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র পথ।

তাওহীদের সুবিশাল পরিধি

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এবার আমরা এ অধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাবো।

'আল্লাহ ইনসাফের সাথে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ফেরেশতা ও জ্ঞানী জনেরাও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মহা প্রতাপশালী মাহজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই'

ইসলামের আকীদা বিশ্বাসের এটাই প্রথম তত্ত্ব। এটি হচ্ছে তাওহীদ তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মূলকথা এই যে, এবাদাত ও আনুগত্য লাভের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তিনিই একমাত্র ইনসাফ

প্রতিষ্ঠাকারী। এই মূলতত্ত্বের আলোচনার মধ্য দিয়েই সূরার সূচনা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'আলিফ, লাম, মীম', আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনিই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। এ দ্বারা একদিকে ইসলামী আকীদাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যাতে সাধারণ আহলে কেতাব ও মুসলমানদের তাওহীদী আকীদা উক্ত সন্দেহ দ্বারা প্রভাবিত না হতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে আল্লাহর একত্বের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এখানে প্রশ্ন তোলা হতে পারে যে, আল্লাহর সাক্ষ্য তো কেবল আল্লাহকে যে বিশ্বাস করে তার জন্যে যথেষ্ট। এমনকি তার এই সাক্ষ্যের প্রয়োজনই হয় না। এমতাবস্থায় আল্লাহর সাক্ষ্যদানের সার্থকতা কোথায়? এর জবাব এই যে, প্রকৃত ব্যাপার এটা নয় যে, আল্লাহকে বিশ্বাস করলে এই সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। কেননা, আহলে কেতাবরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, আবার তাঁর একজন পুত্রও তাঁর সাথে শরীক আছে এটা বিশ্বাস করতো। এমনকি স্বয়ং মোশরেকরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো। তাদের বিভ্রান্তি ছিলো শুধু এই যে, তারা আল্লাহর শরীক, সমকক্ষ, ছেলে ও মেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করতো। কাজেই এদের উভয়ের বিশ্বাসকে নির্ভুল করার জন্যে এটি একটি শক্তিশালী ও কার্যকর উক্তি হলো যে, তোমরা যে আল্লাহকে নিজেদের স্রষ্টা ও মাবুদ বলে মানো, তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি শুধু স্রষ্টা ও মাবুদ নন, বরং একমাত্র স্রষ্টা এবং একমাত্র মাবুদ।

এই বক্তব্য থেকে আরো একটা নিগূঢ় সত্য বেরিয়ে আসে। তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই, এই মর্মে স্বয়ং আল্লাহর সাক্ষ্যদান থেকে অনিবার্যভাবে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তারই জন্যে নিবেদিত নির্ভেজাল, একাগ্র ও একনিষ্ঠ এবাদাত ছাড়া অন্য কোনো রকম এবাদাত গ্রহণ করেন না। এই কথাটিই ইসলাম শব্দের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত। কেননা, ইসলাম অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণ শুধু আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রেই নয়, বরং কর্মজীবনেও হওয়া চাই। আল্লাহর কেতাবের নির্দেশাবলীর মধ্য দিয়ে যে বাস্তব কার্যোপযোগী জীবনব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় তার শর্তহীন আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ সম্পন্ন হতে পারে না। অথচ প্রত্যেক যুগেই এরূপ কিছু লোক পাওয়া যায় যারা দাবী করে যে, তারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে, কিন্তু একই সময়ে তারা কোনো না কোনো মানবরচিত বিধানের আলোকে নিজেদের বিবাদ নিষ্পত্তি করে। যারা আল্লাহর আইনের আনুগত্য করে না, তারা তাদের আনুগত্য করে এবং মানবরচিত মতবাদ, চিন্তাধারা, মূল্যবোধ ও আচরণ পদ্ধতি অবলম্বন করে। এ ধরনের আচরণ প্রকৃতপক্ষে তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। তারা 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী' এ দাবীর সাথে তাদের এ কাজ সংগতিপূর্ণ নয় এবং আল্লাহর এই সাক্ষ্যের সাথেও তা সংগতিপূর্ণ নয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। কেননা, প্রকারান্তরে তারা সেই সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই আল্লাহর পাশে ইলাহ হিসাবে মেনে নিয়েছে, যাদের রচিত মতবাদ ও আইন বিধান তারা নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে চলেছে।

এ পর্যায়ে ফেরেশতা ও বিজ্ঞজনদের সাক্ষ্যও আল্লাহর সাক্ষ্যের মতো। তারাও একমাত্র আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং নিসংকোচে ও নির্বিবাদে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নির্দেশের কাছে নিজেদেরকে সঁপে দেয়, যখন তা অকাট্যভাবে আল্লাহর নির্দেশ বলে প্রমাণিত হয়। সূরার শুরুতে বিজ্ঞজনদের সাক্ষ্য বলতে আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, তাঁর আদেশের আনুগত্য ও অনুসরণ এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণই বুঝানো হয়েছে।

আর আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতা ও বিজ্ঞজনদের সাক্ষ্য শুধু আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে নয় বরং ন্যায় বিচার যে তার ইলাহ হওয়ার অবিচ্ছেদ্য উপাদান, সে সম্পর্কেও বটে।

'আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতারা ও বিজ্ঞজনেরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং তিনি ন্যায়বিচারকও' এই উক্তি থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, এটি আল্লাহ তায়ালার ইলাহ হওয়ার অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়। আর এ উক্তির মধ্য দিয়ে সূরার শুরুতে যে বলা হয়েছে 'চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই', তারও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ন্যায়বিচারক হিসাবেই চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা অনন্তকাল ধরে এই সৃষ্টিজগতকে এবং মানবজীবনকে ন্যায়বিচার ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতেই পরিচালনা করে চলেছেন। মানবজাতি ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টির জীবনে তিনি এই ন্যায়নীতি প্রত্যক্ষভাবেই বাস্তবায়িত করেন। কিন্তু মানবজীবনে এই নীতি বাস্তবায়নের ভার তিনি স্বয়ং মানবজাতির হাতেই ন্যস্ত করেছেন। এর মাধ্যমে মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসাবে সম্মানিত করেছেন। এই বিধান মানবজাতির জন্যে স্বয়ং আল্লাহই রচনা করেছেন এবং তাঁর কেতাবে এটি গ্রন্থনা করেছেন। এই বিধান বাস্তবায়িত না করলে মানবজীবনে ন্যায়বিচারও প্রতিষ্ঠিত হবে না, আর তার সাথে বাদবাকী সৃষ্টিজগতের কোনো সমন্বয়ও গঠিত হবে না। ফলে সেটা হবে এক মহা অবিচার, সংঘাত, বিশৃংখলা এবং ধ্বংসের নামান্তর।

আমরা সমগ্র বিশ্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, মানবজাতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারের স্বাদ পেয়েছে কেবল তখনই, যখন তারা আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসিত হয়েছে। আর যখনই অন্য কোনো মানবরচিত বিধান দ্বারা শাসিত হয়েছে, তখন অনিবার্যভাবেই কোনো না কোনো প্রকারের যুলুম ও স্ববিরোধিতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। হয় কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গোষ্ঠী নির্যাতিত হয়েছে, নচেত কোনো গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যক্তি হয়েছে নিষ্পেষিত, নতুবা এক গোষ্ঠীর হাতে অত্যাচারিত হয়েছে আর এক গোষ্ঠী অথবা এক জাতির হাতে আর এক জাতি কিংবা এক প্রজন্মের হাতে আর এক প্রজন্ম। কেননা মানুষ স্বভাবগতভাবেই ভুলের উর্ধ্বে যেমন নয়, তেমনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মনের অধিকারীও নয়। কারো না কারো দিকে ঝুঁকে পড়া তার মজ্জাগত স্বভাব। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই ক্রটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁর ন্যায়বিচার সকল ঝোঁকপ্রবণতা থেকে মুক্ত। তিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা ও ইলাহ। আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো কিছুই তার অজ্ঞাত নয়। পুনরায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

'মহা পরাক্রমশালী মহা বিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।'

এখানে একই আয়াতে এই সত্যের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, ইলাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং পরাক্রম ও বিজ্ঞতা তাঁর অন্যতম গুণ। আর পরাক্রম ও বিজ্ঞতা ন্যায়বিচারক হওয়ার জন্যে অপরিহার্য শর্ত। কেননা ন্যায়বিচারের মূলকথা হচ্ছে যে জিনিস যে স্থানে থাকার যোগ্য তাকে সেই স্থানে রাখা। এ কাজটি বাস্তবায়নে ক্ষমতা ও পরাক্রম অত্যাবশ্যক। আল্লাহর যাবতীয় গুণবাচক নাম ইতিবাচক ও সক্রিয়তার দিকনির্দেশক। সুতরাং ইসলামী চিন্তাধারায় কোনো নেতিবাচক ধারণার স্থান নেই। কেননা এটা স্বয়ং আল্লাহরই গুণ। আর এই ইতিবাচক ও সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মানুষের মনকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে যুক্ত করে। ফলে তার আকীদা-বিশ্বাস অত্যন্ত সজীব ও সক্রিয় হয়ে থাকে, নিষ্ক্রিয় কল্পনার রূপ ধারণ করে না।

একই আয়াতে দু'বার করে যে বিষয়টির উল্লেখ করা হলো, তার স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত ফল এটাই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো ইলাহ যখন নেই, তখন তাঁকে ছাড়া আর কারো এবাদাত, আনুগত্য করারও অবকাশ নেই। এ কথাই পরিবর্তী দুটি আয়াতে বলা হয়েছে,

'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম।'

অর্থাৎ ইলাহ যখন একজন, তখন আনুগত্যও সেই একজনেরই চলবে। আর এই একমাত্র ইলাহের কাছে আত্মসমর্পণই হলো ইসলাম। এই আত্মসমর্পণের পর বান্দাদের জীবনে আল্লাহর

আনুগত্যের বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। ইলাহ যখন একজন, তখন তাঁকেই একমাত্র আইনদাতা ও আদেশদাতা হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে, এটাই নির্ভেজাল তাওহীদ। আর যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তা এই তাওহীদেরই দাবী। এই তাওহীদেরই দাবী হলো, 'একমাত্র ইসলামই আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।'

ইসলাম শুধুমাত্র মুখ দিয়ে উচ্চারিত কোনো দাবীর নাম নয়, শুধু মাথার ওপর তুলে ধরা পতাকার নাম নয়, শুধু মনে মনে বিশ্বাস করারও নাম নয়। শুধু নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত প্রভৃতি ব্যক্তিগত এবাদাতেরও নাম নয়। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম বলতে শুধু এগুলোকেই বুঝায় না। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ ও সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ বান্দাদের সকল বিষয়ে আল্লাহর কেতাব থেকে ফয়সালা গ্রহণ। কোরআনের নিজের ভাষাতেই কিছু পরে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

দ্বীন নিয়ে মতবিরোধ

আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও একমাত্র চিরঞ্জীব সত্ত্বা মেনে নেয়ার নাম হচ্ছে ইসলাম। অথচ আহলে কেতাবের লোকেরা আল্লাহ তায়ালা ও হযরত ঈসা উভয়ের সত্ত্বাকে ইলাহ ও চিরঞ্জীব বলে মানে। উভয়ের ইচ্ছাকেও তারা যৌথ ইচ্ছা বলে মনে করে। আর এই সব ধ্যান ধারণা নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে এমন তীব্র মতবিরোধ বিরাজমান যে, তা কখনো কখনো যুদ্ধের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এই মতবিরোধের কারণ এখানে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করছেন,

'কেতাবধারীরা তাদের কাছে জ্ঞান এসে যাওয়ার পরই মতভেদে লিপ্ত হয়েছে এবং লিপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র বিদ্রোহের মনোভাব নিয়েই।'

অর্থাৎ এই মতভেদ অজ্ঞতাবশত দেখা দেয়নি। কেননা, আল্লাহর একত্ব, একমাত্র তাঁরই ইলাহ হওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা, মানুষের প্রকৃতি এবং এবাদাতের তাৎপর্য, এ সব কিছু সম্পর্কে তাদের কাছে নির্ভুল জ্ঞান এসে গিয়েছিলো। তথাপি সীমালংঘন করার মনোভাব নিয়েই তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিলো। আল্লাহর কেতাবে যে ন্যায়বিচারের বিধান রয়েছে, তাকে উপেক্ষা করার কারণেই তারা কোন্দল ও বিভেদের শিকার হয়েছে। জনৈক আধুনিক খৃষ্টান লেখকের বই থেকে ইতিপূর্বে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাতে দেখেছি যে, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে কিভাবে ধর্মীয় বিভেদ জন্ম নেয়। আর এ বিভেদ শুধু যে ইহুদী ও খৃষ্টানদের জীবনেই ঘটে তা নয়। আমরা এও দেখেছি যে, মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য সন্নিহিত দেশ কর্তৃক রোমক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করাটা কিভাবে তাদের রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম বর্জনের কারণ হয়েছিলো এবং অন্য ধর্ম গ্রহণে তাদেরকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। অনুরূপভাবে, কোনো কোনো রোম সম্রাট তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার মানসে নতুন মধ্যবর্তী ধর্ম উদ্ভাবন করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে, নতুন উদ্ভাবিত ধর্ম তার উদ্দেশ্য সফল করবে। ভাবখানা এই যে, আকীদা বিশ্বাস যেন রাজনৈতিক দাবাখেলার গুটি এবং এটা এই হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ারই যোগ্য। বস্তুত এভাবেই সম্পূর্ণ সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এই ধর্মদ্রোহিতার আশ্রয় নেয়া হতো। এ জন্যে যথাযর্থভাবেই হুমকি দেয়া হয়েছে যে,

'যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতগুলোর সাথে কুফরী করবে, সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দ্রুত হিসাব নিতে সক্ষম।'

এখানে আল্লাহর একত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাসের ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হওয়াকে কুফরী বলা হয়েছে। এই কুফরীতে লিপ্তদেরকে ত্বরিত হিসাব নেয়া তথা শাস্তি দেয়ার হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে, যাতে দীর্ঘ সময় দান করলে তাদের কুফরী ও কলহ বিবাদ আরো বদ্ধমূল না হয়।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে আহলে কেতাব ও মোশরেকদের বেলায় অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের বিবাদের মীমাংসা করে তাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করার ও নিজের নীতিতে আপোষহীন থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

'এরপরও তারা যদি তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে বলো, আমি ও যারা আমার অনুসরণ করে আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছি। আর আহলে কেতাব ও নিরক্ষরদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছো? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে তোমার দায়িত্ব দ্বীনের প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

বস্তুত এর চেয়ে বেশী স্পষ্ট করে আর কিছু বলার থাকে না। হয় আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করে তাঁর কাছে সর্বাত্মকভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। নচেত আনুগত্য ও অনুকরণকে বিভক্ত করতে হবে। আর শেষোক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করলে তাওহীদও হবে না, ইসলামও হবে না।

এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে যে কথা বলতে শিক্ষা দিয়েছেন, তা তার আকীদা বিশ্বাসকেও যেমন স্পষ্ট করে দিয়েছে, তার বাস্তব জীবন প্রণালীকেও পরিষ্কার করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়' অর্থাৎ তাওহীদ ও দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে তর্ক করে। তাহলে বলো, আমি ও যারা আমার অনুসরণ করে আল্লাহর কাছে মুখমন্ডল সমর্পণ করেছি।' এখানে 'অনুসরণ' শব্দটা তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে বুঝা গেলো, শুধুমাত্র রসূলকে রসূল বলে স্বীকার করা যথেষ্ট নয়, বরং তার যথাযথ বাস্তব অনুসরণ ও অনুকরণও অপরিহার্য। অনুরূপভাবে 'মুখমন্ডল সমর্পণ' কথাটাও গভীর তাৎপর্যবহ। এ থেকে বুঝা গেলো, শুধু মুখ দিয়ে ইসলামের স্বীকৃতি অথবা শুধু অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করার নাম ইসলাম নয়। বরঞ্চ তা আনুগত্য ও অনুসরণসহ পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণও বটে। মুখমন্ডল সমর্পণ রূপক অর্থে আত্মসমর্পণকেই বুঝায়। যেহেতু মুখমন্ডল মানবদেহের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম অংগ, তাই মুখমন্ডল সমর্পণ দ্বারা গোটা সত্তাকেই সমর্পণ করা বুঝায়। স্বেচ্ছায় ও সানন্দে পরিপূর্ণ রূপে অনুগত হওয়া ও সর্বান্তকরণে যাবতীয় আদেশ নিষেধ মেনে নেয়াই হলো মুখমন্ডল সমর্পণ করা।

এটাই হলো মোহাম্মদ (স.)-এর আকীদা-বিশ্বাস ও তাঁর আনীত জীবন-পদ্ধতি। মুসলমানরা তাঁর আকীদা ও জীবন পদ্ধতি উভয়েরই অনুগত ও অনুসারী। আহলে কেতাব ও অন্যান্য সাধারণ নিরক্ষর আরব জনগণ এই আকীদা ও জীবন-পদ্ধতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কিনা, তা জিজ্ঞাসা করতে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে এই দুটি শিবিরের পরিচিতির মাঝে কোনো প্রকারের অস্পষ্টতা না থাকে। এ জন্যেই বলা হয়েছে, 'আহলে কেতাব নিরক্ষর মোশরেকরা এ ব্যাপারে সমান। আল্লাহর একাত্মবাদ, তাঁর একক ও চিরঞ্জীব ইলাহ হওয়াকে মেনে নেয়ার জন্যে তাদের সকলকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এটাই ইসলামের দাওয়াত। অতপর এ কথা মেনে নিলে যে কাজটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় তাও করার আহবান জানানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর বিধানকে জীবনের একমাত্র আদর্শরূপে মেনে নিতে বলা হয়েছে।

'তারা যদি আত্মসমর্পণ করে তবে তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে।'

বস্তুত হেদায়াত লাভ তথা সুপথপ্রাপ্তির রূপ বা আকৃতি একটাই। সেটা হচ্ছে ইসলাম। এটাই তার বাস্তব ও স্বাভাবিক আকৃতি। এ ছাড়া আর যা কিছু আছে তা গোমরাহী ও জাহেলিয়াত।

'যদি তারা অস্বীকার করে তাহলে জেনে রেখো, তোমার কাজ শুধু প্রচার করা।'

বস্তুত প্রচারকার্য সম্পন্ন করলেই রসূলের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অবশ্য এটা যুদ্ধের আদেশ আসার আগেকার ব্যাপার। যখন যুদ্ধের আদেশ এসে যায়, তখন যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের জন্যে দুটো পথ খোলা ছিলো। হয় ইসলাম গ্রহণ করবে এবং তার সমগ্র আইন-কানুন ও

বিধান মেনে নেবে। নচেত 'জিযিয়া' দেয়ার অংগীকার করে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নেবে। কেননা, বিশ্বাসের ওপর জোরজবরদস্তি করার বিধান ইসলামে নেই।

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক।'

অর্থাৎ তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান অনুসারেই তিনি তাদের সাথে আচরণ করে থাকেন এবং সর্বাবস্থায় তাদের ভাগ্য আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ। তবে তিনি তাদেরকে তাদের পরিণাম সম্পর্কে অন্ধকারে রাখেন না । তিনি তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাদেরকে আগেই জানিয়ে দেন। আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যানকারীদের ব্যাপারে এটা তাঁর শাশ্বত রীতি।

যে কারণে সকল আমল ধ্বংস হয়ে যায়

২১ ও২২ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি...... তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।'

এটাই হলো তাদের অনিবার্য পরিণাম এই শাস্তি দুনিয়ায় না আখেরাতে, তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এতে বুঝা যায়, শাস্তি তাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় হওয়া সম্ভব।

'তাদের যাবতীয় সৎকাজ দুনিয়া ও আখিরাতে বাতিল হয়ে যাবে।' এ আয়াতে ব্যবহৃত মূল শব্দটি হচ্ছে 'হাবেতাত'। এটি এসেছে 'হুবুত' থেকে। এর আভিধানিক অর্থ হলো, বিষাক্ত ঘাস খেয়ে পশুর পেট ফুলে যাওয়া। যে পশুর পেট ফুলে যায় তার মৃত্যু যেমন অবধারিত তেমনি এই সব অবিশ্বাসী কাফেরদের সৎকর্ম দৃশ্যত অনেক হলেও অনিবার্যভাবে ধ্বংসশীল ও বাতিল। কেননা, আখেরাতে তাদেরকে কেউ তাদের আযাব থেকে উদ্ধার করবে না।

এখানে আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করার পাশাপাশি নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করা কখনো যে ন্যায়সংগত ভাবেও হতে পারে এ কথা অকল্পনীয়। এখানে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দানকারীদেরকে হত্যা করার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। এ কয়টি অপকর্মের উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে ইহুদীদের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। কেননা, এগুলো ইহুদীদেরই ঐতিহাসিক চরিত্র। এগুলোর উল্লেখ করলে তাদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তবে একই সাথে এ দ্বারা খৃষ্টানদেরকেও বুঝানো অসম্ভব নয়। কেননা কোরআন নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত তাদের ইতিহাসও ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীদের হত্যার ঘটনায় কলংকিত ছিলো। খৃষ্টীয় রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মের বিরোধী হাজার হাজার মানুষকে তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। যারা এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতো ও হযরত ঈসা (আ.)-কে মানুষ মনে করতো, তাদেরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছিলো। আয়াতে এই সকল লোককেও ন্যায়বিচারের উপদেশ দানাকারীদের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ ধরনের অপকর্মে লিপ্ত সর্বকালের সকল মানুষের জন্যেই কোআনের এই হুশিয়ারী অনন্তকাল ধরে উচ্চকিত থাকবে।

'যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে' এই কথাটা দ্বারা কোরআন কী বুঝায় তা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। এ দ্বারা শুধু আল্লাহর অস্তিত্বকে খোলাখুলি অস্বীকারকারীদেরই শুধু বুঝানো হয়নি, বরং আল্লাহকে যারা একমাত্র ইলাহ মানে না এবং এবাদাত ও আনুগত্যকে শুধু আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, তাদেরকেও বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর যে বান্দাদের জীবনে শুধু আল্লাহর বিধান, আল্লাহর আইন এবং আল্লাহর পছন্দনীয় মূল্যবোধ চালু থাকবে সেই বান্দারাই মোমেন। আর যাদের জীবনে এর কোনো একটিও আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো মরযি অনুসারে চলবে, সে ব্যক্তি হয় আল্লাহর সাথে অন্যকেও ইলাহ মেনে নিয়ে মোশরেক হয়ে গেছে, নচেত সে আল্লাহকে আদৌ ইলাহ বলেই মানেনি– চাই সে মুখ দিয়ে তাঁকে হাজার বার ইলাহ বলুক। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এ বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

২৩,২৪ ও ২৫নং আয়াত লক্ষ্য করুন, 'তুমি কি দেখোনি যে, যাদেরকে কেতাবের একাংশ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর কেতাবের দিকে আহবান জানানো হয়েছে, যাতে কেতাব তাদের বিবাদের মীমাংসা করে দেয়। অতপর তাদের একদল অবজ্ঞার সাথে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। ...... তাদের ওপর যুলুম করা হবে না।'

এখানে তুমি কি দেখোনি বলে যে প্রশ্ন করা হয়েছে, তা আহলে কেতাবের অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ ও তাদের মুখোশ খুলে দেয়ার জন্যে করা হয়েছে। 'কেতাবের একাংশ' দ্বারা ইহুদীদের তাওরাত ও খৃষ্টানদের ইনজীলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা সকল রসূলের ওপর যে সব কেতাব নাযিল হয়েছে সেগুলোর সমষ্টি হলো আল্লাহর কেতাব। সেই হিসেবে তাওরাত ও ইনজীল 'আল্লাহর কেতাবের একাংশ'। সামগ্রিকভাবে সবগুলো কেতাবে আল্লাহর একত্ব ও তার চিরঞ্জীব হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। তাই প্রকৃতপক্ষে এই সবগুলো সামগ্রিকভাবে একই কেতাব। যার একাংশ পেয়েছে ইহুদীরা এবং একাংশ পেয়েছে খৃষ্টানরা। আর মুসলমানরা পেয়েছে সমগ্র কেতাব। কেননা এতে ইসলামের সকল নীতিমালা একত্রিত করা হয়েছে এবং তা সকল কেতাবের সমর্থক। বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এজন্যে যে আল্লাহর কেতাবের একাংশ প্রাপ্ত এই সব ইহুদী ও খৃষ্টানকে যখন তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কেতাব কোরআন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে, তখন তারা সকলে এই আহবানকে গ্রহণ করে না। তাদের একটি দল আল্লাহর কেতাবকে জীবনের সকল বিষয়ের নিয়ন্তা বানাতে চায় না। অথচ এটা আল্লাহর কেতাবের কোনো একটি অংশের প্রতিও বিশ্বাসী হওয়ার পরিপন্থী। নিজেদেরকে আহলে কেতাব দাবী করার পর এরূপ আচরণ করা তাদের পক্ষে একেবারেই বেমানান।

আহলে কেতাবদের সবাই নয় বরং একটি গোষ্ঠী যখন আল্লাহর কেতাবকে জীবনের সকল অংশ মেনে নেয়ার আহবান অগ্রাহ্য করে, তখন আল্লাহ তায়ালা এভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেন। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, যারা গোটা জীবন থেকে আল্লাহর বিধানকে নির্বাসিত ও নিজেরদেরকে মুসলমান মনে করে ও দাবী করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কিরূপ বিস্ময়, ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করতে পারেন! বস্তুত ২৩নং আয়াতটির মধ্য দিয়ে আসলে মুসলমানদের জন্যেও একটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, যাতে তারা ইসলামের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের মতো তারাও আল্লাহর অভিশাপের পাত্র না হয়। আহলে কেতাবরা, যারা নিজেরদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে না, তারা আল্লাহর কেতাব অনুসারে সকল বিবাদ ও সমস্যার সমাধানের আহ্বানকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের প্রতি এরূপ ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেন, তখন এ অস্বীকৃতি ও অবজ্ঞার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর কিরূপ ক্রোধ সৃষ্টি হতে পারে, তা সহজেই বুঝা যায়। বস্তুত এটি আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণ হতে বাধ্য। এ বরবাদী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

অতপর ২৪নং আয়াতে আহলে কেতাবদের এই অবস্থা ও অস্বীকৃতির কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এর কারণ এই যে, তারা বলে, নির্দিষ্ট কতকগুলো দিনের জন্যে ছাড়া আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তাদের দ্বীন সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ও উদ্ভট কথাবার্তা তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে।'

বস্তুত আল্লাহর কেতাব অনুসারে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করার আহবান অগ্রাহ্য করার আসল কারণ এই যে, তারা কেয়ামতের দিনের হিসাব নিকাশে যথাযথভাবে বিশ্বাস রাখতো না, আল্লাহর ন্যায় বিচার যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তা তারা মানতো না। এর প্রমাণ তাদের এই বক্তব্য যে, 'নির্দিষ্ট কতকগুলো দিনের জন্যে ছাড়া আগুন আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।'

নির্দিষ্ট কতক দিনের জন্যে ছাড়া তাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না কেন? অথচ আল্লাহর দ্বীনের মূল প্রাণসত্তা থেকে তারা বিচ্যুত হয়ে আছে। জীবনের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহর কেতাব অনুযায়ী কাজ করা হলো ইসলামের মূল প্রাণসত্ত্বা। সেটা তারা করবে না। তাহলে কোন কারণে আগুন তাদেরকে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে স্পর্শ করবে? আল্লাহ তায়ালা যে ন্যায়বিচারক ও নিরপেক্ষ বিচারক, সেটা যদি তার বিশ্বাস করে, তাহলে এ কথা তারা কিভাবে বলতে পারে? আসলে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা ও উদ্ভট অপবাদ চাপাতে চায় বলেই এ ধরনের উক্তি করে থাকে। আর তারপর এই উক্তি তাদেরকে মিথ্যামিথ্যি আশ্বস্ত করে রাখে ও বিপথগামী করে। একথাই আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলেছেন 'তাদের দ্বীন সম্পর্কে তাদের মিথ্যা এ উদ্ভট কথাবার্তা তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে।'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে এবং তাঁর বিচারে কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে এই বিশ্বাস কোনো মোমেনের মনে একই সময় একত্রিত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কারো মনে আখেরাতের ভয় বিদ্যমান থাকবে আবার সে জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর কেতাব অনুসারে ফয়সালা করা থেকে থাকবে– এটা সম্ভব নয়।

আজকের যুগে মুসলমান দাবীদারদের অনেকেই সেকালের আহলে কেতাবের মত চরিত্রের অধিকারী হয়ে গেছে। কেননা এই সকল মুসলমানদের জীবনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর কেতাব অনুসারে ফয়সালা করতে আহ্বান জানানো হলে তারা তা প্রত্যাখ্যান তো করেই উপরন্তু কেউ কেউ বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজন নেই বলেও ধৃষ্টতা দেখায়। এরপরও তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে। অতপর এই সব মুসলমানের মধ্য থেকে কেউ কেউ এমন আহমকের স্বর্গেও বাস করে যে, গুনাহ থেকে পবিত্র করার জন্যে অল্প কিছু দিন শাস্তি দেয়া ছাড়া আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কোনো দীর্ঘস্থায়ী আযাব দেবেন না বলে মনে করে। তারা কি মুসলমান নয়? হাঁ, তারা আহলে কেতাবদের মতোই মুসলামন। তাদেরই মতো অলীক বিশ্বাসে আক্রান্ত মুসলমান। অথচ ইসলামে এ ধরনের ধারণা বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। আল্লাহর প্রকৃত দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারে এই সব মুসলমান আর আহলে কেতাবদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়েই সমান। ইসলাম অর্থই হচ্ছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর দ্বীন ও বিধানের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছ থেকে নির্দেশগ্রহণ। ২৫নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তখন কেমন হবে, যখন আমি এক সন্দেহাতীত দিনের জন্যে তাদেরকে সমবেত করবো, যখন প্রতিটি আত্মাকে তার কৃতকর্মের পরিপূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের ওপর কোনোই অবিচার করা হবে না?'

'কেমন হবে?' এ উক্তিটি আসলে এক ভয়াবহ হুমকি। মোমেনের হৃদয় এর সম্মুখীন হতে আতংকবোধ করে। কেননা সে তো এই দিনে আল্লাহর মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। সে জানে, আল্লাহ তায়ালা একবারেই পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচারক। সে আহলে কেতাবদের ন্যায় মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও ভিত্তিহীন ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে না। এ হুমকি সকল মোশরেক, নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী আহলে কেতাব ও ইসলামের ভন্ড দাবীদারদের জন্যে সমভাবে উচ্চারিত। কেননা, জীবনের যাবতীয় বিষয়ে ইসলামকে বাস্তবায়িত না করার ব্যাপারে তারা সবাই সমান।

সুতরাং 'তখন কেমন হবে যখন আমি তাদেরকে এক সন্দেহাতীত দিনের জন্যে সমবেত করবো?' যখন আল্লাহর বিচার কার্যকর হবে? যখন প্রতিটি আত্মাকে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে? কোনোই অবিচার করা হবে না? অর্থাৎ কোনো পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি বা বৈষম্য

সেখানে থাকবে না। এখানে প্রশ্নটি বিনা জবাবেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে বিনা জবাবে ছেড়ে দেয়াতে প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে গিয়ে মানুষের মন আতংক ও ভয়ে প্রকম্পিত হয়।

আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিফলন

এরপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূল (স.)-কে এবং প্রত্যেক মোমেনকে বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও মানবজীবনে আল্লাহর একক ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের কথা স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। কেননা আল্লাহর একত্ব ও একাধিকপতিত্ব, এই দুটো জিনিসই আল্লাহর অংশীদারবিহীন ইলাহ হওয়া ও সার্বভৌমত্বের মূলকথা।

২৬ ও ২৭ নং আয়াতে কিভাবে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে লক্ষ্য করুন 'বলো হে আল্লাহ তায়ালা, হে বিশ্ব সম্রাজ্যের সার্বভৌম অধিপতি, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করে থাকো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। যাবতীয় মংগল ও কল্যাণ কেবল তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তুমি রাতকে দিনের এবং দিনকে রাতের অভ্যন্তরে ঢুকাও, আর জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করে আনো। আর তুমি যাকে চাও বিনা হিসাবে জীবিকা দাও।'

কি করুণ মিনতি! আয়াত দু'টির শাব্দিক বিন্যাসে রয়েছে প্রার্থনার ভাবধারা আর মর্মার্থে রয়েছে আত্মনিবেদনের মনোভাব। আর এতে এই উন্মুক্ত প্রকৃতির প্রতি যে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে তাতে রয়েছে আকর্ষণীয়ভাবে চেতনাকে জাগ্রত করার উদ্যোগ। এতে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার যে বিবরণ রয়েছে তাতে একটি মহাসত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। সেই মহাসত্যটি হলো, মানুষ ও প্রকৃতির স্রষ্টা ও শাসনকর্তা একই সত্ত্বা, মানুষ আল্লাহর পরিচালিত এই মহাবিশ্বের একটি অংশ বিশেষ। আল্লাহর আনুগত্য শুধু মানুষ করে না বরং গোটা বিশ্বপ্রকৃতিই আল্লাহর অনুগত। আর সর্বব্যাপী আনুগত্য থেকে কারো বিচ্যুত হওয়া বোকামি ও নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

'তুমি বলো, হে আল্লাহ তায়ালা, হে বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধিপতি! তুমি যাকে চাও রাজত্ব দাও' ..... ২৬নং আয়াতের এই বক্তব্যে আসলে আল্লাহর একক উলুহিয়াত ও সার্বভৌমত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি একমাত্র ইলাহ বিধায় একমাত্র অধিপতিও। তিনি এককভাবে বিশ্ব সাম্রাজ্যের মালিক ও অধিপতি। এতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। উপরন্তু তিনি নিজ কর্তৃত্বাধীন রাজ্য থেকে যেটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা দান করেন। অতপর যখন যার কাছ থেকে চান তা ফেরতও নেন। অর্থাৎ সম্পদে কারো মালিকানা মৌলিক নয় যে, সে নিজের খেয়ালখুশী মতো তা ব্যবহার করবে। আসল মালিক তাকে এ সম্পদ কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দান করেন। ক্ষণস্থায়ী মালিক যখন এ সম্পদে আসল মালিকের শর্তের পরিপন্থী আচরণ করে, তখন সেই আচরণ বাতিল ও অবৈধ হয়ে থাকে। পার্থিব জীবনে মোমেনদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এ ধরনের সম্পদ আসল মালিককে ফেরত দেয়া। আর আখেরাতে কিন্তু তাকে অবৈধ আচরণের জন্যে এবং আসল মালিকের শর্তের বিরুদ্ধাচরণের জন্যে জবাবদিহী করতে হবে।

অনুরূপভাবে তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, অথচ তাঁর সে ফয়সালায় কেউ বাধা দিতে পারে না। কেননা, কেউ তাঁর বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে পারে না এবং কেউ তা রদও করতে পারে না। কেননা, তিনিই সর্বেসর্বা, তিনিই নিরংকুশ একচ্ছত্র কর্তৃত্বের মালিক। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এই সর্বাত্মক ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী আর কেউ নেই।

আল্লাহর এই একচ্ছত্র ও নিরংকুশ কর্তৃত্বেই সার্বিক কল্যাণ ও মংগল নিহিত। তিনি যাকে চান রাজত্ব দেন, আর তিনি যার কাছ থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন, যাকে চান সম্মানিত করেন এবং যাকে চান অসম্মানিত করেন। এ সব তিনি ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথেই করেন। তিনি

যাই করেন, সর্ববস্থায়ই হয় তা সত্যিকার অর্থে কল্যাণজনক। 'তোমার হাতেই যাবতীয় মংগল, তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান' এই উক্তির মর্মার্থ এটাই।

মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর এই সার্বিক কর্তৃত্ব এবং মানুষের কল্যাণ বাস্তবায়নে তাঁর এই সর্বময় ক্ষমতা জীবন ও জগতের উপর আল্লাহর সার্বিক কর্তৃত্বেরই একটি দিক মাত্র।

২৭নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তুমি রাতকে দিনের এবং দিনকে রাতের ভেতরে ঢুকাও ....'

প্রকৃতির যে বিরাট সত্যটি এখানে চিত্রায়িত করা হয়েছে তা মানুষ মাত্রেরই হৃদয়, চেতনা, দৃষ্টি ও অনুভূতিকে আকৃষ্ট করে। প্রকৃতির শক্তিসমূহের একটির অপরটির ভেতরে গোপনে ও সন্তর্পণে ঢুকে পড়ার যে দৃশ্যটি রাত ও দিনের পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ এবং জীবিত ও মৃতের পরস্পর থেকে বের করে আনার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়, তা আসলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, প্রকৃতির শক্তি ও বস্তুসমূহের এই গতিশলিতায় আল্লাহর হাত রয়েছে। মানুষ একটু লক্ষ্য করলেই এই হাতের সক্রিয়তা অনুভব করতে পারে।

রাতের অভ্যন্তরে দিনকে এবং দিনের অভ্যন্তরে রাতকে ঢুকানোর অর্থ দু'রকমের হতে পরে। ঋতু পরিবর্তনের সময় দিনের আকার কমে রাতের আকার বৃদ্ধি পাওয়া অথবা রাতের আকার কমে গিয়ে দিনের আকার বৃদ্ধি পাওয়া অথবা সকালে ও বিকালে ধীরে ধীরে আলো ও অন্ধকারের একটির অপসৃত হওয়া এবং অপরটির আগমন। উভয় অর্থের বেলায়ই সুস্থ মন ও বিবেকের অধিকারী যে কোনো মানুষ আপন অন্তরদৃষ্টিতে দেখতে পায় আল্লাহ তায়ালা সৌরজগতকে স্বহস্তে ঘুরান ও চালান। এই অন্ধকারময় ভূপৃষ্ঠকে আলোকময় সৌরজগতের সামনে এমনভাবে পালাক্রমে সংকুচিত ও করেন যে, রাতের অন্ধকার চুপিসারে দিনের আলোর দিকে চলে আসে, আবার একটু একটু করে আধারের মধ্য থেকে ভোরের আলো বেরিয়ে আসে। আবার শীতের শুরুতে একটু একটু করে রাত দীর্ঘ হতে থাকে এবং তা দিনের অংশ বিশেষ গ্রাস করতে থাকে। অনুরূপভাবে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে একটু একটু করে দিন বাড়তে থাকে এবং তা রাতের অংশ বিশেষ গ্রাস করতে থাকে। সৌরমন্ডলের এই দু'টো গতির (আহ্নিকগতি ও বার্ষিকগতি) কোনোটি সম্পর্কেই মানুষ দাবী করতে পারবে না যে, এর গোপন রশি তার হাতে রয়েছে এবং সে-ই তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর কোনো বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে এরূপ দাবী করাও সম্ভব নয় যে, এই গতি কারো পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আপন থেকেই সংঘটিত হয়।

জীবন মৃত্যুর ব্যাপারটিও তেমনি। ধীরে ধীরে একটির মধ্যে আর একটির অনুপ্রবেশ ঘটে। প্রাণীর জীবনের যে মুহুর্তটিই অতিবাহিত হয় সে মুহূর্তটিতে মৃত্যু তার জীবনের দিকে এগিয়ে যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আয়ুষ্কালের যে অংশটুকুকে মৃত্যু গ্রাস করে নিচ্ছে, সেই অংশটুকুতেই জীবন গড়ে উঠছে, প্রাণীর কতকগুলো জীব কোষ আবার মরে যাচ্ছে ও বিদায় নিচ্ছে। আর তরতাজা কতকগুলো নতুন কোষ জন্ম নিচ্ছে ও কাজ শুরু করছে। যে কোষ মৃত হয়ে বিদায় নিচ্ছে, পরবর্তী আবর্তনে তা সজীব হয়ে ফিরে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে যে কোষ সজীব হচ্ছে, তা পরবর্তী আবর্তনে মৃত হয়ে চলে যাচ্ছে। একই প্রাণীর দেহে এভাবে নিরন্তর ঘটে চলেছে। এরপর আবর্তন সম্প্রসারিত হয়। ফলে গোটা প্রাণীই একসময় মারা যায়। কিন্তু তার কোষগুলো অণু পরমাণুতে পরিণত হয়ে নতুন প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। অতপর তা অন্য কোনো প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। ফলে সেখানে ক্রমান্বয়ে জীবনের আগমন ঘটে। এভাবে দিন-রাতের প্রতিটি মুহূর্তে চলতে থাকে চক্রাকার আবর্তন ও বিবর্তনের ধারা। কোনো মানুষ দাবী করতে পারে না যে, এ সব আবর্তন-বিবর্তনের কোনো একটি অংশেও তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা আছে।

গোটা বিশ্বজগত জুড়ে যেমন চলছে আবর্তন ও বিবর্তনের শাশ্বত গতিধারা, তেমনি একই রকমের ধারা চলছে প্রতিটি প্রাণীর জীবনেও। এই গতিধারা এবং এই আবর্তন ও বিবর্তন চলে

অত্যন্ত গোপনে, অত্যন্ত ধীরে ও শান্তভাবে। আলোচ্য আয়াতটাতে যে ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত আভাস দেয়া হয়েছে, তাতে মানুষের মন ও বিবেকের কাছে এই বিবর্তনকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই গোটা বিবর্তন প্রক্রিয়া চলে মহা শক্তিধর, মহা উদ্ভাবক, অতীব সূক্ষ্মদর্শী সত্ত্বার প্রত্যক্ষ পরিচালনায়। এই সুক্ষ্মদর্শী মহা পরিচালকের বিধানের বাইরে গিয়ে মানুষ কিভাবে নিজেদের জীবনকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে পারে? সেই মহাবিজ্ঞানী বিশ্ব প্রভুর পরিচালনাধীন এই প্রকৃতিরই একটি অংশ হয়ে কিভাবে মানুষ নিজের জন্যে নিজের মনগড়া জীবনবিধান রচনা করতে পারে? কিভাবেই বা মানুষ একে অপরকে গোলাম অথবা প্রভু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে? অথচ সকল মানুষেরই জীবিকা আল্লাহর হাতে এবং সকলেই আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল।

'তুমি যাকে চাও বিনা হিসেবে জীবিকা দাও।'

এভাবে এ দু'টি আয়াতে মানুষকে সেই মহাসত্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়েছে, যাতে বিধৃত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র ইলাহ, তিনিই সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র ও চিরঞ্জীব শাসক ও পরিচালক, তিনিই নিরংকুশ ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তিনিই একক শাসক, একক মালিক ও একমাত্র দাতা, তিনি ছাড়া আর কারো আনুগত্য অচল ও অবৈধ। তিনিই বিশ্ব সম্রাজ্যের অধিপতি, সম্মানদানকারী ও অবমাননাকারী, জীবন ও মৃত্যুদাতা, জীবিকাদাতা ও বঞ্চনাকারী এবং সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার ও কল্যাণ সহকারে মানুষ ও প্রকৃতির নিয়ন্তা ও বিধাতা।

বিধর্মীদের সাথে মিত্রতার বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশ

একটু আগেই আহলে কেতাবের যে সমালোচনা করা হয়েছে, এখানে ভিন্নতর আংগিকে তাকে প্রত্যয়ন করা হয়েছে। আহলে কেতাব আল্লাহর কেতাবের নির্দেশমালা অনুসারে জীবন যাপনের আহবান প্রত্যাখ্যান করেছিলো। অথচ সেই কেতাবে রয়েছে মানবজাতির জন্যে রচিত আল্লাহর বিধান, আর আল্লাহর বিধান অনুসারেই মানবজাতির জীবন এবং গোটা বিশ্বজগত পরিচালিত হয়। আহলে কেতাবদের এই আচরণের সমালোচনার পাশাপাশি পরবর্তী আয়াতের বক্তব্যের ভূমিকাও রয়েছে এ দুই আয়তে। পরবর্তী আয়াতে মোমেনদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যেন মোমেনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ না করে। কেননা, তাদের হাতে কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা রয়েছে অন্যের হাতে। মোমেনদের একমাত্র অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাংখী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়।

২৮, ২৯, ও ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মোমেনরা যেন মোমেনদের স্থলে কাফেরদেরকে বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ না করে। .... আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি অনুকম্পাশীল।'

পূর্ববর্তী ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে এই চেতনা জাগ্রত করা হয়েছে যে, সকল ক্ষমতা ও সকল জীবিকা এবং সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ কেবল আল্লাহরই হাতে রয়েছে। তাহলে আল্লাহর দুশমনদের সাথে মোমেনদের প্রীতি ও বন্ধুত্ব কিভাবে হতে পারে? একই হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ঈমানও থাকবে, আবার আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বও থাকবে সেটা সম্ভব নয়। এ কারণেই এই কঠোর সতর্কবাণী এসেছে এবং জীবনে আল্লাহর কেতাবের নির্দেশাবলী প্রয়োগে অসম্মত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীকে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়েছে। চাই এই বন্ধুত্ব স্থাপন আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতেই হোক অথবা তাকে সাহায্য করার মাধ্যমে অথবা তার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে হোক।

২৮ নং আয়াতের বক্তব্যটি লক্ষ্য করুন,

'মোমেনদের উচিত নয় মোমেনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা। যে ব্যক্তি তা করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই থাকবে না।'

অর্থাৎ আল্লাহর সাথে তার কোনো যোগসূত্র ও অভিভাবকত্ব থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা থেকে সে বহু দুরে চলে যাবে এবং তার সাথে তার সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে।

অমুসলিমদের বন্ধুত্বের কথা প্রকাশ্য ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করলে যদি স্থান ও কালভেদে বিপদের আশংকা থাকে, হাঁ শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে মুখে মুখে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় বন্ধুত্বের কথা বলার অনুমতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'তবে যদি কাফেরদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য বিপদাশংকা এড়িয়ে যেতে চাও তবে সে কথা আলাদা।'

তবে মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র মুখে মুখেই দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা যাবে, আন্তরিকভাবে বন্ধুত্ব ও প্রীতির মনোভাব পোষণ করা যাবে না এবং কোনো কর্মকান্ডের মাধ্যমেও বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়া যাবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, বাস্তব কর্মকান্ডের মাধ্যমে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করা যাবে না বরং শুধুমাত্র মৌখিকভাবে দ্ব্যর্থবোধক ভংগির মাধ্যমে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করা যাবে। সুতরাং কোনো মোমেন ও কাফেরদের মধ্যে আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক থাকতে পারবে না এবং বাস্তব কর্মকান্ডের মাধ্যমে মোমেন কর্তৃক কাফেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা যাবে না। আত্মরক্ষার এই পন্থা ইসলাম অনুমোদন করেনি। এটা হবে আল্লাহকে ধোকা দেয়ার শামিল। আর কাফেরের সংজ্ঞা এখানে পরোক্ষভাবে এবং সূরার অন্য একটি স্থানে প্রত্যক্ষভাবে এইরূপ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জীবনের সকল ক্ষেত্রকে শর্তহীনভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করবে না, সেই কাফের।

আর যেহেতু বিষয়টি এখানে মানুষের মনের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং সমগ্র ব্যাপারটা যেহেতু অদৃশ্যযামী ও অন্তর্যামী আল্লাহর প্রতি সত্যিকার আন্তরিক ভয় পোষণের ওপর নির্ভরশীল তাই এক বিস্ময়কর ভংগিতে আল্লাহর গযব ও প্রতিশোধ থেকে মোমেনদের সাবধান করা হয়েছে,

'আল্লাহ তায়ালা নিজের থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করছেন, আর আল্লাহর কাছেই তো তোমাদের ফিরে যেতে হবে'।

অতপর একই ধরনের সতর্কবাণী অব্যাহত রয়েছে। মোমেনকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহর চক্ষু তার ওপর নিবদ্ধ রয়েছে এবং আল্লাহর জ্ঞান তাকে ঘিরে রেখেছে।

'বলো, তোমরা যদি তোমাদের মনের কথা লুকাও কিংবা প্রকাশ করো (তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ তোমাদের মনের কথা) আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন এবং আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় তথ্যই তিনি জানেন। বস্তুত তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।'

উপরোক্ত আয়াতে যে হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে এ আয়াতে তা আরো জোরদার ও শানিত করা হয়েছে। আল্লাহর ভয় আরো বেশি করে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। আর আপন সীমাহীন জ্ঞান ও শক্তির বলে তিনি যে কঠোর প্রতিশোধ নিতে সক্ষম, যা থেকে বাঁচার ও পালানোর কোনো উপায় নেই, সেই প্রতিশোধ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ দেয়া হয়েছে এ আয়াতে। পরবর্তী ৩০ নং আয়াতে সতর্কীকরণ এবং হৃদয়ে পরশ বুলিয়ে দেয়ার হুশিয়ার করণের এই প্রক্রিয়া কেয়ামতের ভয়াবহ দিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে অব্যহত রাখা হয়েছে। সেই দিনের ভয়াবহতাকে তাৎক্ষণিক কোনো সৎকাজ বা সদিচ্ছা দ্বারা কিছুমাত্র ম্লান করা যাবে না। সেদিন প্রত্যেক আত্মা শুধুমাত্র তার অতীত জীবনের সঞ্চিত কাজের সাক্ষাত পাবে। বলা হয়েছে,

'যেদিন প্রত্যেক আত্মা তার ইতিপূর্বে করা সৎ কর্মকে যথাযথভাবে পেয়ে যাবে। আর তার করা অসৎ কর্ম সম্পর্কে তার মনোভাব হবে এই যে, ওসব অসৎ কর্মের মাঝে ও তার মাঝে যদি অনেক দূরত্ব বিরাজ করতো, তা হলে খুবই ভালো হতো।'

নিজের ভালো ও মন্দ কাজ দ্বারা মানুষ সেদিন কি নিদারুণভাবে ঘেরাও হবে, কিভাবে তার সামনে তার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে, কি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সে পতিত হবে, সেই দৃশ্যকে মানুষের মানসপটে উন্মুক্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। এই দুঃসহ অবস্থায় পতিত হয়ে মানবাত্মা শুধু আফসোস করবে যে, আহা, আজ তার করা অপকর্ম এতো কাছে না এসে যদি অনেক দূরে থাকতো অথবা এই দিনটা তার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকতো, তবে কতোই না ভালো হতো! কিন্তু এ আফসোসে সেদিন কোনো লাভ হবে না। সেদিন পালানোর বা অব্যাহতি লাভের কোনো উপায় থাকবে না। আয়াতের শেষাংশে আবারো আল্লাহ তায়ালা নিজের সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলছেন,

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন।'

আর সর্বশেষে নিজের দয়া ও করুণার সুযোগ গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন এই বলে যে,

'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুকম্পাশীল।'

এভাবে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে তাকে শেষবারের মতো সুযোগ দেয়া হয়েছে।

বস্তুত তিনি যে এভাবে বান্দাকে হুশিয়ার ও স্মরণ করিয়ে দিয়ে আত্মশুদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছেন, এটাও তাঁর দয়া ও অনুকম্পা এবং তিনি যে বান্দার কল্যাণ চান এটা তারই প্রমাণ।

বাণিজ্যিক প্রয়োজনে অথবা আত্মীয়তার দাবীতে মক্কায় মোশরেকদের সাথে এবং মদীনায় ইহুদীদের সাথে নমনীয় সম্পর্ক রক্ষা করে চলার যে বিপজ্জনক প্রবণতা মুসলমানদের মধ্যে বিরাজ করতো, আলোচ্য কয়েকটি আয়াতে নানাভংগিতে সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি জোরদার প্রচারাভিযান চালানো হয়েছে। কেননা ইসলাম চায়, নতুন প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজ শুধুমাত্র ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠুক এবং এই আদর্শের বিরোধীদের সাথে তাদের কোনো প্রকার নমনীয় ও আপোষমূলক সম্পর্ক না থাকুক। অনুরূপভাবে ইসলাম চায় মুসলমানদের মন যেন ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহের আরোপিত বাধাবিপত্তি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধানের কাছে একনিষ্ঠভাবে আত্মসমর্পিত থাকে।

তাই বলে ইসলাম এতো অনুদার নয় যে, অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না। অমুসলিমদের মধ্যে যারা নিরীহ, শান্তিপ্রিয় এবং ধর্মের পার্থক্যের কারণে মুসলমানদের প্রতি বৈরী নয়, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে ইসলাম বাধা দেয় না। কিন্তু আলোচ্য আয়াতগুলোতে যে সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা হচ্ছে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আর বন্ধুত্ব হচ্ছে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা, পরস্পরকে সাহায্য করার মনোভাব এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধন। কোনো খাঁটি মোমেনের মধ্যে এ ধরনের মনোভাব যদি বিরাজ করে, তবে তা শুধু অপর মোমেনের জন্যেই বিরাজ করতে পারে কোনো কাফেরের জন্যে নয়। শুধুমাত্র মোমেনরাই আল্লাহর কেতাবের অনুগত ও অনুসারী হিসাবে পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠ নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে।

সবার শেষে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বিষয়টির উপসংহার টানা হয়েছে। এটি বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে যেমন চূড়ান্ত উপসংহার, তেমনি এই সূরারও সবচেয়ে ব্যাপক গুরুত্ববহ মৌলিক বক্তব্য। এতে অত্যন্ত অল্প কথায় এবং স্পষ্টভাষায় ঈমান ও ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য এবং ঈমান ও কুফুরের পার্থক্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিন্দুমাত্রও কোনো সন্দেহ থাকতে দেয়া হয়নি।

৩১ ও ৩২ নং আয়াত দুটি লক্ষ্য করুন,

'বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। এতে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা

ক্ষমাশীল ও দয়াশীল। বলো, তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্য করো। তারা এ আহবান অগ্রাহ্য করলে জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের ভালোবাসেন না।'

বস্তুত আল্লাহর ভালোবাসা নিছক মৌখিক দাবী করার বিষয় নয়। কিংবা নিছক আবেগে ভেসে যাওয়ারও বিষয় নয়, যদি না তার সাথে আল্লাহর রসূলের অনুকরণ ও অনুসরণ এবং তাঁর আনীত বিধানের বাস্তবায়ন না থাকে। ঈমান শুধু কিছু আবেগের স্ফুরণ, কিছু শ্লোগান ও বুলি আওড়ানোর নাম নয়। ঈমান হলো আল্লাহর গোলামী ও তাঁর রসূলের আনীত বিধান অনুসরণের নাম।

প্রথম আয়াতটির তাফসীর প্রসংগে ইমাম ইবনে কাসীর বলেন, 'আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করে, অথচ মোহাম্মদ (স.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে না, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সে যতোক্ষণ তার সমস্ত কাজে ও কথায় রসূল (স.)-এর শরীয়াতের অনুসারী না হবে, ততক্ষণ সে তার সে দাবীতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবে। কেননা, রসূল (স.) বলেছেন, 'আমার অনুসৃত বিধানের সাথে সংগতিশীল নয় এমন কাজ যে করে, সে প্রত্যাখ্যাত।'

আর দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি বলেন 'এ আয়াত প্রমাণ করে যে, রসূলের তরীকা বা আদর্শের বিরোধিতা কুফরী। এই দোষে যে দোষী আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন না, চাই সে যতোই নিজেকে আল্লাহপ্রেমিক ভাবুক বা দাবী করুক।'

ইমাম ইবনে কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ 'যাদুল মায়াদে' বলেন,

'যে ব্যক্তি রসূল (স.)-এর জীবনী মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, আহলে কেতাব ও মোশরেকরা বিভিন্ন সময়ে রসূল (স.)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তাকে সত্যবাদী বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু এই সাক্ষ্যদান তাদেরকে মুসলমান বানাতে পারেনি। এ থেকে জানা গেলো, ইসলাম এই সাক্ষ্যদানের অতিরিক্ত কিছু, ইসলাম নিছক ইসলামের পরিচয় জানা ও তার প্রতি স্বীকৃতি ঘোষণারও নাম নয়; বরং ইসলাম হচ্ছে জানা, স্বীকৃতি দেয়া এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী রীতিনীতি ও বিধানকে অনুসরণ করার নাম।'

ইসলামের এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা না থাকলে ইসলাম থাকে না। যেমন, আল্লাহর আইন তথা শরীয়তের আনুগত্য, আল্লাহর রসূলের অনুকরণ ও অনুসরণ এবং আল্লাহর কেতাবের আলোকে সকল বিরোধের মীমাংসা করা। এ বৈশিষ্ট্য ইসলামের আনীত তাওহীদ বিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি। এই তাওহীদ বিশ্বাসের মূলকথা হলো, আল্লাহ তায়ালা মানুষের একমাত্র ইলাহ বা মাবুদ, মানুষ একমাত্র তাঁরই শরীয়ত নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে বাধ্য এবং একমাত্র তাঁরই নির্ধারিত মূল্যবোধ ও নিয়ম অনুসারে নিজেদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে বাধ্য। এ কারণেই ইসলামে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সার্বভৌমত্ব যেমন মানবজীবনের নিয়ন্ত্রণে কার্যকর, তেমনি তা সমভাবে কার্যকর প্রাকৃতিক জগতের পরিচালনায়ও। আর মানুষ তো এই প্রাকৃতিক জগতেরই একটি অংশ বিশেষ।

সূরার এই প্রথম অধ্যায়টিতে আল্লাহর একাত্ববাদকে এতো পূর্ণাংগভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কারো পক্ষে তা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান । আর ইসলাম আল্লাহ তায়ালা যেমন নাযিল করেছেন, তেমনই আছে। অসত্য ধ্যান-ধারণা ও অপপ্রচার দ্বারা একে বিকৃত করার সাধ্য কারো নেই।

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا
فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۗ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي
سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا
وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ

৩৩. অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আদম, নূহ এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদের সৃষ্টিকুলের ওপর (নেতৃত্ব করার জন্যে) বাছাই করে নিয়েছেন। ৩৪. (নেতৃত্বে সমাসীন) এদের সন্তানরা বংশানুক্রমে পরস্পর পরস্পরের বংশধর। আল্লাহ তায়ালা (সবার কথাবার্তা) শুনতে পান এবং (সব কথা তিনি) জানেন। ৩৫. (স্মরণ করো,) যখন ইমরানের স্ত্রী বললো, হে আমার মালিক, আমার গর্ভে যা আছে তাকে আমি স্বাধীনভাবে তোমার (দ্বীনের কাজ করার) জন্যে উৎসর্গ করলাম, তুমি আমার পক্ষ থেকে এ সন্তানটিকে কবুল করে নাও, অবশ্যই তুমি (সব কথা) শোনো এবং (সব বিষয়) জানো। ৩৬. অতপর (এক সময়) যখন ইমরানের স্ত্রী তাকে জন্ম দিলো, (তখন) সে বললো, হে আমার মালিক, (একি!) আমি তো (দেখছি) একটি মেয়ে সন্তান জন্ম দিয়েছি (একটা মেয়েকে কিভাবে আমি তোমার পথে উৎসর্গ করবো); আল্লাহ তায়ালা তো ভালোভাবেই জানতেন, ইমরানের স্ত্রী কি জন্ম দিয়েছে, (আসলে) ছেলে কখনো মেয়ের মতো (সব কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম) হয়না, (ইমরানের স্ত্রী বললো), আমি এ শিশুর নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি এ শিশু ও তার (অনাগত) সন্তানকে অভিশপ্ত শয়তানের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষার জন্যে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। ৩৭. আল্লাহ তায়ালা (ইমরানের স্ত্রীর দোয়া কবুল করলেন এবং) তাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবেই গ্রহণ করে নিলেন এবং (ধীরে ধীরে) তাকে তিনি ভালোভাবেই গড়ে তুললেন, (আর সে জন্যেই) আল্লাহ তায়ালা তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রাখলেন, (বড়ো হবার পর) যখনি যাকারিয়া তার কাছে (তার নিজস্ব)

عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ

عِنْدِ اللّٰهِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ

دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ

اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي

الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًاۢ بِكَلِمَةٍ مِّنَ

اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ

اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۖ

قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ

اٰيَةً ۖ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۖ

এবাদাতের কক্ষে যেতো, (তখনি সে দেখতে) পেতো সেখানে কিছু খাবার (মজুদ রয়েছে, খাবার দেখে) যাকারিয়া জিজ্ঞেস করতো, হে মারইয়াম, এসব (খাবার) তোমার কাছে কোত্থেকে আসে? মারইয়াম জবাব দিতো, এ সব (আসে আমার মালিক) আল্লাহর কাছ থেকে; (আর) অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে বিনা হিসেবে রেযেক দান করেন। ৩৮. সেখানে (দাঁড়িয়েই) যাকারিয়া তার মালিকের কাছে দোয়া করলো, হে আমার মালিক, তুমি তোমার কাছ থেকে আমাকে (তোমার অনুগ্রহের প্রতীক হিসেবে) একটি নেক সন্তান দান করো, নিশ্চয়ই তুমি (মানুষের) ডাক শোনো। ৩৯. অতপর ফেরেশতারা তাকে ডাক দিলো এমন এক সময়ে– যখন সে এবাদাতের কক্ষে নামায আদায় করছিলো (ফেরেশতারা বললো, হে যাকারিয়া, আল্লাহ তায়ালা তোমার ডাক শুনেছেন), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ইয়াহইয়ার (জন্ম সম্পর্কে) সুসংবাদ দিচ্ছেন, (তোমার সে সন্তান) আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাণীর সত্যায়ন করবে, সে হবে (সমাজের) নেতা, (সে হবে) সচ্চরিত্রবান, (সে হবে) নবী, (সর্বোপরি সে হবে) সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের একজন। ৪০. (এ কথা শুনে) যাকারিয়া বললো, হে আমার মালিক, আমার (ঘরে) ছেলে হবে কিভাবে, (একে তো) আমি নিজে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে গেছি, (তদুপরি) আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (সন্তান ধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম); আল্লাহ তায়ালা বললেন, হাঁ এভাবেই আল্লাহ তায়ালা যা চান তা তিনি করেন। ৪১. যাকারিয়া নিবেদন করলো, হে মালিক, তুমি আমার জন্যে (এর) কিছু (পূর্ব) লক্ষণ ঠিক করে দাও; আল্লাহ তায়ালা বললেন (হাঁ), তোমার (সে)

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ
الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ
عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي
وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ
يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾

লক্ষণ হবে এই যে, তুমি তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ইংগিত ছাড়া কথাবার্তা বলবে না; (এ অবস্থায়) তুমি তোমার মালিককে বেশী বেশী স্মরণ করবে এবং সকাল সন্ধ্যায় (তাঁর পবিত্র নামসমূহের) তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।

রুকু ৫

৪২. (অতপর মারইয়াম বয়োপ্রাপ্ত হলে) আল্লাহর ফেরেশতারা যখন বললো, হে মারইয়াম, আল্লাহ তায়ালা নিসন্দেহে তোমাকে (একটি বিশেষ কাজের জন্যে) বাছাই করেছেন এবং (সে জন্যে) তোমাকে তিনি পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীকুলের ওপর তিনি তোমাকে বাছাই করেছেন। ৪৩. হে মারইয়াম, (এর যোগ্য হওয়ার জন্যে) তুমি সর্বদা তোমার মালিকের অনুগত হও, তাঁর কাছে (আনুগত্যের) মাথা নত করো এবং এবাদাতকারীদের সাথে তুমিও (তার) এবাদাত করো। ৪৪. (হে নবী,) এ সবই তো (ছিলো তোমার জন্যে) অদৃশ্যলোকের সংবাদ, আমিই এগুলো তোমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছি; (নতুবা) তুমি তো সেখানে তাদের পাশে হাযির ছিলে না– (বিশেষ করে) যখন (এবাদাতখানার পুরোহিতরা) মারইয়ামের পৃষ্ঠপোষক কে হবে এটা নির্বাচনের জন্যে কলম নিক্ষেপ (করে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা) করছিলো, আর তুমি তাদের ওখানেও উপস্থিত ছিলে না যখন তারা (এ নিয়ে) বিতর্ক করছিলো! ৪৫. অতপর ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে (একটি পুত্র সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত) নিজস্ব এক বাণীর দ্বারা সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম মাসীহ– (সে পরিচিত হবে) মারইয়ামের পুত্র ঈসা, দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই সে সম্মানিত হবে, সে হবে (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম।

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالَتْ
رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ
اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ إِذَا قَضٰٓى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ
فَيَكُوْنُ ﴿٤٧﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْإِنْجِيْلَ ﴿٤٨﴾
وَرَسُوْلًا إِلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ ۙ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكُمْ ۙ أَنِّيْٓ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ
فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا ۢ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ
وَأُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا
تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ۖ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

৪৬. সে দোলনায় থাকা অবস্থায় (যেমন) মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে, পরিণত বয়সেও (তেমনিভাবে তাদের সাথে) কথা বলবে, (বস্তুত) সে হবে নেককার মানুষদের একজন। ৪৭. মারইয়াম বললো, হে আমার মালিক, আমার (গর্ভে) সন্তান আসবে কোত্থেকে? আমাকে তো কখনো কোনো মানব সন্তান স্পর্শ পর্যন্ত করেনি; আল্লাহ তায়ালা বললেন, এভাবেই– আল্লাহ তায়ালা যাকে চান (চিরাচরিত নিয়ম ছাড়াই) তাকে পয়দা করেন; তিনি যখন কোনো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তখন শুধু তাকে বলেন, 'হও', অতপর (সাথে সাথে) তা (সংঘটিত) হয়ে যায়। ৪৮. (ফেরেশতারা মারইয়ামকে বললো,) তোমার সন্তানকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব ও প্রজ্ঞার বিষয়গুলো শেখাবেন, (সাথে সাথে তিনি তাকে) তাওরাত এবং ইনজীলও শিক্ষা দেবেন। ৪৯. (আল্লাহ তায়ালা তাকে) বনী ইসরাঈলদের কাছে রসূল করে পাঠালেন (অতপর সে আল্লাহর রসূল হয়ে তাদের কাছে এসে বললো), আমি নিসন্দেহে তোমাদের মালিকের কাছ থেকে (নবুওতের কিছু) নিদর্শন নিয়ে এসেছি (এবং সে নিদর্শনগুলো হচ্ছে), আমি তোমাদের জন্যে মাটি দ্বারা পাখীর মতো করে একটি আকৃতি বানাবো এবং পরে তাতে ফুঁ দেবো, অতপর (তোমরা দেখবে এই) আকৃতিটি আল্লাহর ইচ্ছায় (জীবন্ত) পাখী হয়ে যাবে, আর জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকেও সুস্থ করে দেবো, (আল্লাহর ইচ্ছায় এভাবে) আমি মৃতকেও জীবিত করে দেবো, আমি তোমাদের আরো বলে দেবো, তোমরা তোমাদের ঘরে কি কি জিনিস খাও, আবার কি জিনিস (না খেয়ে) জমা করে রাখো; (মূলত) তোমরা যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো তাহলে (নিসন্দেহে) এতে

مُؤْمِنِينَ ﴿٤٩﴾ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ
لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٥٠﴾ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ
هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ
مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ
اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا
أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُوا
وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। ৫০. (মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম আরও বলবে,) তাওরাতের যে বাণী আমার কাছে রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী, (তা ছাড়া) তোমাদের ওপর হারাম করে রাখা হয়েছে এমন কতিপয় জিনিসও আমি তোমাদের জন্যে হালাল করে দেবো এবং আমি তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে (এই) নিদর্শন নিয়েই এসেছি, অতএব তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা আমার মালিক, তোমাদেরও মালিক, অতএব তোমরা তাঁরই এবাদাত করো; (আর) এটাই হচ্ছে একমাত্র সঠিক ও সোজা পথ। ৫২. অতপর ঈসা যখন তাদের থেকে কুফরী আঁচ করতে পারলো, তখন সে (সাথীদের ডেকে) বললো, কে (আছো তোমরা) আল্লাহ তায়ালার (পথের) দিকে (চলার সময়) আমার সাহায্যকারী হবে! হাওয়ারীরা বললো, (হ্যাঁ) আমরাই (হবো) আল্লাহর সাহায্যকারী; আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি (হে ঈসা), তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা সবাই আল্লাহর এক একজন অনুগত বান্দা। ৫৩. (হাওয়ারীরা বললো,) হে আল্লাহ, তুমি যা কিছু নাযিল করেছো আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের কথাও মেনে নিয়েছি, সুতরাং তুমি (সত্যের পক্ষে) সাক্ষ্যদাতাদের সাথে আমাদের (নাম) লিখে দাও। ৫৪. বনী ইসরাঈলের লোকেরা (আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে দারুণ) শঠতা করলো, তাই আল্লাহও কৌশলের পন্থা গ্রহণ করলেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম কৌশলী!

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ
وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ
خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ

রুকু ৬

৫৫. যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ঈসা, আমি তোমার এ দুনিয়ার (জীবন কাটানোর) কাল শেষ করতে যাচ্ছি এবং (অচিরেই) আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনবো, যারা (তোমাকে মেনে নিতে) অস্বীকার করছে তাদের (যাবতীয় পাপ) থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেবো, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করছে তাদের আমি কেয়ামত পর্যন্ত এই অস্বীকারকারীদের ওপর (বিজয়ী করে) রাখবো, অতপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে, সেদিন (ঈসা সম্পর্কিত) যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিলে তার সব কয়টি বিষয়ই আমি তোমাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবো। ৫৬. যারা (আমার বিধান) অস্বীকার করেছে আমি তাদের এ দুনিয়ায় (অপমান) ও আখেরাতে (আগুনে দগ্ধ হওয়ার) কঠোরতর শাস্তি দেবো, (এ থেকে বাঁচানোর মতো সেদিন) তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। ৫৭. অপরদিকে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অতপর আল্লাহ তাদের (সবাই)-কে তাদের পাওনা পুরোপুরিই আদায় করে দেবেন; আল্লাহ তায়ালা যালেমদের কখনো ভালোবাসেন না। ৫৮. এই (কিতাব) যা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি, তা হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ বিশেষ। ৫৯. আল্লাহ তায়ালার কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে (প্রথম মানুষ) আদমের মতো; তাকেও আল্লাহ তায়ালা (মাতা-পিতা ছাড়া সরাসরি) মাটি থেকে পয়দা করেছেন, তারপর তাকে বললেন, (এবার তুমি) হয়ে যাও, সাথে সাথে তা (মানুষে পরিণত) হয়ে গেলো। ৬০. (এ হচ্ছে) তোমার মালিক

فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا
جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَ
نِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ قف ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ج
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦٢﴾
فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ يٰاَهْلَ
الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ
اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

(আল্লাহ)-এর পক্ষ থেকে (আসা) সত্য (প্রতিবেদন), অতপর তোমরা কখনো সেসব দলে শামিল হয়ো না যারা (ঈসার ব্যাপারে নানারকম) সন্দেহ পোষণ করে। ৬১. এ বিষয়ে আল্লাহর কাছ থেকে (সঠিক) জ্ঞান আসার পরও যদি কেউ তোমার সাথে (খামাখা) ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক করতে চায় তাহলে তুমি তাদের বলে দাও, এসো (আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত হই), আমরা আমাদের ছেলেদের ডাকবো এবং তোমাদের ছেলেদেরও ডাকবো, (একইভাবে আমরা ডাকবো) আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদেরও, (সাথে সাথে) আমরা আমাদের নিজেদের এবং তোমাদেরও (এক সাথে জড়ো হওয়ার জন্যে) ডাক দেবো, অতপর (সবাই এক জায়গায় জড়ো হলে) আমরা বিনীতভাবে দোয়া করবো, (আমাদের মধ্যে) যে মিথ্যাবাদী তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। ৬২. এ হচ্ছে সঠিক (ও নির্ভুল) ঘটনা। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মা'বুদ নেই; নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা পরম শক্তিশালী ও প্রজ্ঞাময়। ৬৩. অতপর তারা যদি (এ চ্যালে থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (তারা যেন জেনে রাখে,) আল্লাহ তায়ালা কলহ সৃষ্টিকারীদের (ভালো করেই) জানেন।

রুকু ৭

৬৪. (হে নবী,) তুমি বলো, হে কিতাবধারীরা, এসো আমরা এমন এক কথায় (উভয়ে একমত হই) যা আমাদের কাছে এক (ও অভিন্ন এবং সে কথাটি হচ্ছে), আমরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে অংশীদার বানাবো না, (সর্বোপরি) এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমরা আমাদের মাঝেও

أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿٦٤﴾

একে অপরকে প্রভু বলে মেনে নেবো না; অতপর তারা যদি (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদের তুমি বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।

তাফসীর

আয়াত ৩৩-৬৪

যে সমস্ত রেওয়ায়াতে রসূল (স.) ও নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের মধ্যকার বিতর্কের বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, এই সূরায় হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মারইয়াম ও হযরত ইয়াহইয়ার জন্মবৃত্তান্তের সাথে অন্য যে কয়টি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার সবই উক্ত প্রতিনিধি দল কর্তৃক ব্যক্ত করা সন্দেহ সংশয়ের জবাব। পবিত্র কোরআনে যে হযরত ঈসা (আ.)-কে মারইয়ামের কাছে পাঠানো আল্লাহর বাণী ও আত্মা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তার বরাত দিয়েই নাযরানী প্রতিনিধি দল তাদের সন্দেহ ব্যক্ত করে। তা ছাড়া ইতিপূর্বে সূরা মারইয়ামে যে সব বিষয় বর্ণিত হয়নি, সে সম্পর্কেও তারা তথ্য জানতে চেয়েছিলো। এই রেওয়ায়াতগুলোর বিবরণ সঠিকও হতে পারে। তবে আলোচ্য সূরায় এই ঘটনাগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা কোরআনের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই হয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্যে সাধারণত কেসসা কাহিনীর অবতারণা করা হয়ে থাকে। যে সূরায় এই কেসসা কাহিনী বর্ণিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব উক্ত সূরার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই এই কেসসা কাহিনী যে পরিমানে ও যে ভংগীতে বর্ণনা করলে তত্ত্বগুলো মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হবে, সেই পাঠ্যমানে ও সেই ভংগীতেই বর্ণনা করা হয়। তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনে ও তাকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করার ক্ষেত্রে কেসসা-কাহিনীর একটা স্বতন্ত্র রীতি রয়েছে। এই রীতির বৈশিষ্ট্য এই যে, তা উক্ত তত্ত্ব ও তথ্যকে অত্যন্ত জীবন্তভাবে এবং মানবজীবনে নিত্য চলমান বাস্তব ঘটনার আকারে পেশ করা হয়। তত্ত্ব ও তথ্যকে উদাহরণ ও ঘটনাবলী ছাড়া পেশ করলে হৃদয়ে যতোটা বদ্ধমূল হতো, এভাবে তা তার চেয়ে বেশী বদ্ধমূল হয়।

এখানে আমরা যে কেসসা কাহিনীর বিবরণ পাই, তা সূরার মূল আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এর বিষয়বস্তু সূরার আলোচ্য বিষয়ের মতোই ব্যাপক। তাই এ কেসসা কাহিনীগুলো ঘটনার প্রেক্ষাপটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং এটি সূরার একটি স্বতন্ত্র মৌলিক উপাদান হিসাবে বহাল রয়েছে এবং ইসলামী আদর্শের মৌল তত্ত্বসমূহও এর আওতাভুক্ত হয়েছে।

আগেই বলেছি যে, সূরার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে তাওহীদ। আর তাওহীদ বলতে বুঝায় মাবুদ, ইলাহ, শাসক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবেও আল্লাহর একত্ব ও একচ্ছত্র আধিপত্য। হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা এবং অন্যান্য আনুষংগিক ও পরিপূরক ঘটনা এই তাওহীদ তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করে, পক্ষান্তরে পুত্র ও অংশীদার হওয়ার ধারণাকে শুধু খন্ডনই করে না, বরং সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, অবাস্তব ও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত বলে আখ্যায়িত করে। এ জন্যে হযরত মারিয়ামের জন্মবৃত্তান্ত এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও নবুওত লাভের ঘটনা এমন বিশদভাবে বর্ণনা করে যে, তার মানুষ হওয়া সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তিনি যে একজন পূর্ণাংগ মানুষ,

তিনি যে নবীদেরই একজন, তার প্রকৃতি ও স্বভাব যে তাদেরই মতো, তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। এ বর্ণনা থেকে তার জন্মের ঘটনায় যে অলৌকিক বিষয়গুলো যুক্ত রয়েছে তারও এমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে, তাতে আর কোনো জটিলতা থাকে না এবং বিষয়টি যে একেবারেই স্বাভাবিক ও গতানুগতিক তা স্পষ্ট হয়ে যায়। অবশেষে উপসংহারে যখন মন্তব্য করা হয় যে, ঈসা (আ.)-এর উদাহরণ আল্লাহর কাছে আদমের মতোই। তাকে তিনি মাটি দিয়ে সৃষ্টি করে তার মধ্যে রূহ ফুকে দিয়েছিলেন, তখন হৃদয় ও মন পরিপূর্ণ প্রশান্তি লাভ করে এবং অবাক হয়ে ভাবতে থাকে যে, এমন সরল ও স্বাভাবিক জিনিস নিয়ে আবার কিভাবে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিলো?

সূরার দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রথম বিষয় থেকেই উদ্ভূত। এটি হলো ইসলামের অর্থ ও তাৎপর্য। ইসলামের অর্থ হলো, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। সমগ্র কেসসা জুড়ে এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর এই উক্তির মধ্য দিয়ে এটি প্রতিফলিত হয়েছে। 'আমি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সমর্থক হয়েও এসেছি এবং তোমাদের ওপর হারাম ঘোষিত কিছু জিনিসকে আবার হালাল করতেও এসেছি'– এ বক্তব্যে রেসালাতের প্রকৃতি কী, তা তুলে ধরা হয়েছে। রেসালাতের উদ্দেশ্য যে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং হালাল ও হারাম কী তা বর্ণনা করা, তা এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রেসালাতে যারা বিশ্বাসী, তারা হালাল ও হারামের এই বিধান মেনে চলবে। এরপর হাওয়ারীদের [ঈসা (আ.)-এর সাহাবীরা] ভাষায় আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে,

'অতপর যখন ঈসা তার জাতির পক্ষ থেকে কুফরীর মনোভাব টের পেলো, তখন বললো, আমাকে আল্লাহর কাজে সাহায্য করবে এমন কে আছে? তখন হাওয়ারীরা বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, ...।' আয়াত ৫২-৫৩)

এ সূরার আর একটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হলো, আল্লাহর সাথে মোমেনদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার চিত্র তুলে ধরা। আলোচ্য কাহিনীতে আল্লাহর এই প্রিয় বান্দাদের জীবনীর কতিপয় পূন্যময় অংশের এ খন্ড চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ইমরানের স্ত্রী কর্তৃক আপন শিশুকন্যা সম্পর্কে আল্লাহর সাথে একান্ত আলাপ, হযরত যাকারিয়ার সাথে মারিয়ামের তথোপকথন, আল্লাহর সাথে হযরত যাকারিয়ার একান্ত আলাপ, হযরত ঈসা (আ.)-এর আহ্বানে হাওয়ারীদের সাড়াদান এবং আল্লাহর কাছে হাওয়ারীদের বক্তব্য পেশ ইত্যাদি।

অতপর ঘটনাবলীর বর্ণনা শেষে এই কয়টি তথ্যের সারনির্যাস সহকারে উপসংহার টানা হয়েছে। ঘটনাবলীতে যে তত্ত্ব কয়টি বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রকৃতি বর্ণনা। আল্লাহর সৃষ্টি ও ইচ্ছার ধরন বিশ্লেষণ, তার নিরেট ও নির্ভেজাল একত্ব বর্ণনা করা আহলে কেতাবদের এদিকে আহ্বান জানানো এবং তাদেরকে 'মোবাহালার' চ্যালেঞ্জ প্রদান। (মোবাহালার ব্যাখ্যা সামনে আসছে।)

অবশেষে সূরার এই অধ্যায়টির শেষে উক্ত তাওহীদ তত্ত্বের একটি পূর্ণাংগ বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাতে রসূল (স.) তা আহলে কেতাবদের সকলের সামনে পেশ করেন, যারা প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এসেছিলো। যারা আসেনি তাদের সামনেও। তার সমকালীন প্রজন্মের সামনে এবং তার পরবর্তীকালের কেয়ামত পর্যন্ত সকল অনাগত প্রজন্মের সামনেও। সে বর্ণনাটি এরূপ,

'বলো, হে আহলে কেতাবরা, এমন একটি বক্তব্যের দিকে এগিয়ে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। সেটি এই যে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবো না। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবো না। তারা যদি এ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে তা হলে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান।'

এই চূড়ান্ত বক্তব্য দ্বারা সকল বিতর্কের অবসান ঘটে। ইসলাম মানুষের কাছ থেকে কী চায় এবং তাদের জীবনের জন্যে কী ভিত্তি রচনা করে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এই বক্তব্য দ্বীন ও ইসলাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য কী, তাও ব্যাখ্যা করে, আর এটি সকল কৃত্রিম বিধি-বিধানকে বাতিল করে দেয়। এটি প্রকৃতপক্ষে গোটা সূরার চূড়ান্ত লক্ষ্য। সকল কেসসা-কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর এটা শুধু এই সূরার নয়– সমগ্র কোরআনে যতো কেসসা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলোরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হযরত ঈসা (আ.)-এর কাহিনী সূরা মারিয়ামেও বর্ণিত হয়েছে, এখানেও বর্ণিত হয়েছে। তবে ঘটনার কোনো অংশ এখানে সংক্ষিপ্ত ও সূরা মারিয়ামে বিস্তৃত। সূরা মারিয়ামে ঈসা (আ.)-এর জন্মবৃত্তান্ত বিশদভাবে এসেছে, কিন্তু হযরত মারিয়ামের জন্মবৃত্তান্তের কোনো বর্ণনাই নেই। আর এখানে ঈসা (আ.)-এর রেসালাত ও হাওয়ারীদের বর্ণনা বিস্তারিত, কিন্তু তার জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত হলেও উপসংহার এখানে বেশ দীর্ঘ। কেননা এটি একটি ব্যাপক বিষয়ে বিতর্কের প্রসংগে এসেছে। সেই ব্যাপক বিষয় হচ্ছে তাওহীদ, রেসালাত, দ্বীন ও ওহী। সূরা মারিয়ামে এ সব বিবরণ নেই। এ থেকে বুঝা যায়, কেসসা-কাহিনী বর্ণনায় কোরআনের অনুসৃত রীতি হলো, যে প্রেক্ষাপটে কেসসা বর্ণিত হয়েছে, সেই প্রেক্ষাপট অনুপাতে কেসসাকে লম্বা বা দীর্ঘ করা। এবার আয়াতগুলোর বিস্তারিত তাফসীরে মনোনিবেশ করছি।

শুরুতেই বর্ণনা করা হয়েছে আল্লাহর সেই সব প্রিয় বান্দাদের কথা, যাদেরকে তিনি সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই একই দ্বীন সহকারে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে তারা ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রজন্মের ঈমানী কাফেলার অগ্রনায়ক হন। এখানে তাদের সকলকে পরস্পরের বংশধর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ প্রজাতিগত বংশধরই হতে হবে, তা নয়। যদিও আদম ও নূহ প্রজাতিগতভাবেও সকল প্রজন্মের অভিন্ন পূর্বপুরুষ। তবু এ দ্বারা প্রধানত আল্লাহর মনোনয়ন এবং আদর্শগত বংশধরকেই প্রকৃত বংশধর বলে ধরা হয়েছে। (আয়াত ৩৩ ও ৩৪)

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, তারা পরস্পরের বংশধর।'

এখানে আদম ও নূহকে দুই ব্যক্তি হিসাবে এবং ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরকে দু'টো পরিবার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবরাহীম ও ইমরান উভয়কে একই নীতির ভিত্তিতে মনোনীত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীমের বংশধর থেকে মনোনয়ন লাভের ব্যাপারে এই নীতি সূরা 'বাকারায়' বর্ণনা করা হয়েছে। সে নীতিটি এই, নবুওতের উত্তরাধিকার রক্ত সম্পর্কীয় উত্তরাধিকার নয়, বরং তা হচ্ছে আদর্শিক উত্তরাধিকার,

'ইবরাহীমকে যখন তার প্রতিপালক বিভিন্ন বাণী দ্বারা পরীক্ষা করলেন, তখন সে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো। তখন আল্লাহ তাকে বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা বানাবো। ইবরাহীম বললো, আমার বংশধর থেকেও কি? (এভাবে নেতা বানাবে?) তিনি বললেন, (না,) অসৎ কর্মশীলরা আমার দায়িত্ব লাভ করবে না।'

কোনো কোনো রেওয়ায়াতে ইমরানকে হযরত ইবরাহীমের বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সত্য হলে ইমরানের বংশধরের উল্লেখ দ্বারা এই শাখাটিকে একটি বিশেষ উপলক্ষে অর্থাৎ হযরত ঈসা ও মারিয়ামের ঘটনা বর্ণনা উপলক্ষে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

মারইয়ামের জন্ম বৃত্তান্ত

আমরা দেখতে পাই যে, ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরের মধ্যে ইমরানের শাখাটির উল্লেখ করা হলেও মূসা ও ইয়াকুবের শাখা দু'টির উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণ এই যে, এখানে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম ও হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে বিতর্কের দ্বারা অব্যাহত রয়েছে। পরবর্তী

অধ্যায়ে এ বিতর্কটি দেখা যাবে। সুতরাং এখানে হযরত মূসা বা হযরত ইয়াকুবের উল্লেখ প্রাসংগিক হতো না। ভূমিকা স্বরূপ এই ঘোষণার অব্যাবহিত পরই সরাসরি ইমরানের পরিবার ও মারইয়ামের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা শুরু হয়েছে।

৩৫, ৩৬, ও ৩৭ নং আয়াত কয়টি লক্ষ্য করুন,

স্মরণ করো, যখন ইমরানের স্ত্রী বললো যে, হে আমার প্রভু! আমার পেটে যে সন্তান রয়েছে ..... আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা বিনা হিসাবে জীবিকা দান করেন।'

এখানে 'মান্নতের' যে ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা আমরা ইমরানের স্ত্রী তথা মারিয়ামের মাতার মন, তার ঈমানদারী ও এবং তার প্রিয়তম সম্পদকে স্বাধীন অবস্থায় ও একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশে উৎসর্গ করার অংগীকার সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। তার প্রিয়তম সম্পদ ছিলো তার পেটের সন্তান। আর এখানে বাধা বন্ধন, শেরেক ও আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো বন্ধনে আবদ্ধ না থাকাকে স্বাধীনতা বলে আখ্যায়িত করা তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুর বন্ধন, আনুগত্য ও গোলামী থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত থাকাই হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো জিনিসের, শক্তির বা ব্যক্তির বিন্দুমাত্রও অধীন হওয়া হলো গোলামী ও পরাধীনতা।

এ জন্যে তাওহীদই হচ্ছে স্বাধীনতার সবচেয়ে নিখুত দৃষ্টান্ত। মানুষ নিজের ব্যক্তিসত্ত্বায়, জীবন যাপন পদ্ধতিতে, আইন কানুন, রীতিনীতি অথবা মূল্যবোধে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো প্রতি আনুগত্য পোষণ করলে কিংবা তার মনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো অধীনতা চেপে থাকলে অথবা তার জীবনে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো আইন বিধান, মূল্যবোধ বা মানদন্ডের আধিপত্য থাকলে সে স্বাধীন হতে পারে না। ইসলাম যখন এসেছে, তখন সে মানবজগতে স্বাধীনতার একটামাত্র রূপই নিয়ে এসেছে, সে রূপটি হচ্ছে তাওহীদ তথা এক আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সকলের গোলামীর জিঞ্জীর ছিন্ন করা।

ইমরানের স্ত্রী এই মিনতিপূর্ণ দোয়া করেন যে, তার প্রভু যেন তার কলিজার টুকরোকে তার উদ্দেশে উৎসর্গ করার এই মান্নত কবুল করেন। তার এই দোয়া থেকে প্রকৃত ইসলামের ভাবমূর্তি ফুটে ওঠে, সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া সব কিছু থেকে বেপরোয়া হওয়া কাকে বলে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি দোয়া করেন,

'হে আমার প্রভু, আমার পেটে যে সন্তান রয়েছে, তাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত অবস্থায় তোমার নামে উৎসর্গ করলাম। তুমি আমার পক্ষ থেকে কবুল করো। তুমি তো সব কিছু শোনো ও জানো। কিন্তু তিনি যখন সন্তান প্রসব করলেন, তখন কন্যা সন্তান দেখে তিনি বললেন, আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। অথচ সে কী প্রসব করেছে তা আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে ভালো জানেন। সে আরো বললো, পুরুষ সন্তান তো কন্যা সন্তানের মতো নয়। আমি তাকে মারইয়াম নামকরণ করেছি। আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে ন্যস্ত করলাম।'

ইমরানের স্ত্রী পুত্র সন্তান কামনা করেছিলেন। কেননা, উপাসনালয়ের সেবার জন্যে পুরুষ সন্তানদেরকেই উৎসর্গ করার নিয়ম প্রচলিত ছিলো। তারা লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একাগ্রচিত্তে উপাসনা করতো ও উপাসনালয়ের সেবা করতো। এখন কন্যা সন্তান হওয়ায় তিনি আক্ষেপের সুরে বললেন, 'হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি!'

সে যাই হোক, তিনি যে সন্তান লাভ করলেন, তা নিয়েই স্বীয় প্রভুর দরবারে চলে গেলেন। কেবল এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, পুরুষ সন্তান যদি হতো, তবে সে দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করতে পারতো। 'পুরুষ মহিলার মতো নয়'। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে পুরুষ যেমন ভালোভাবে

সেবা করতে পারে, মেয়েরা তেমন পারে না। 'আর আমি তার নামকরণ করেছি মারইয়ম।' এই সমস্ত কথাবার্তা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিবেশে বলা হয়েছে এবং এমন ব্যক্তি বলছে, যে মনে করছে যে সে সম্পূর্ণ একাকী আল্লাহর সাথে কথা বলছে। তাই যা মনে আসছে তাই সে অকপটে খুলে বলছে এবং অত্যন্ত বিনম্রভাবে নিজের যা আছে তাই তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছে। আল্লাহর এই সমস্ত মনোনীত বান্দারা আল্লাহর সাথে এ রকম একান্ত ও প্রীতিপূর্ণ সান্নিধ্যেই অবস্থান করে থাকে, এ রকম সহজ সরল ভাষাতেই কথা বলে থাকে এবং আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন, সাড়া দেন এমন একজন অতি ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের সাথে কথা বলছে মনে করেই বলে থাকে।

'আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে তোমার আশ্রয়ে ন্যস্ত করলাম।'

মাতা তার প্রিয়তমা কন্যাকে আপন প্রভুর হাতে, তাঁর তত্ত্বাবধানে ও তার তদারকীতে সোপর্দ করে বিদায় হবার মুহূর্তে এ কথা বলছে। এ কথার মধ্য দিয়ে সত্যনিষ্ঠ হৃদয়ে উদ্ভূত বাসনারই স্ফুরণ ঘটেছে। কেননা নিজের কন্যাকে অভিশপ্ত শয়তানের স্পর্শ থেকে নিরাপদে রাখার আল্লাহর আশ্রয়ে দেয়ার চেয়ে ভালো কোনো উপায় তার জানা ছিলো না।

'অতপর তার প্রভু তাকে উত্তমভাবে গ্রহণ করলেন এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন।' মায়ের হৃদয় নিংড়ানো আন্তরিকতা এবং মান্নতের ব্যাপারে তার এই দৃঢ়তার ফল হিসাবে তাকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করলেন, আর নযীরবিহীনভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় সন্তান ধারণের প্রস্তুতি হিসাবে তাকে যথোপযুক্ত দৈহিক ও মানসিক পুষ্টি, প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ দান করলেন।

'আর তাকে যাকারিয়ার অভিভাবকত্বে দিলেন।'

অর্থাৎ তৎকালীন ইহুদী এবাদাতখানার মোতাওয়াল্লী এবং হযরত হারুন (আ.)-এর বংশোদ্ভূত হযরত যাকারিয়া মারিয়ামের রক্ষক ও অভিভাবক হলেন। এভাবে মারিয়াম পরম বরকতময় পরিবেশে বড়ো হতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জীবিকা সরবরাহ করতে লাগলেন,

'যখনই যাকারিয়া মেহরাবে তার কাছে যেতো, দেখতো তার কাছে কোনো না কোনো খাবার রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করতো, হে মারিয়াম, এ সব তোমার কাছে কোথা থেকে এলো? মারিয়াম বললো, এসব আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।'

এই জীবিকা বা খাদ্য কী ধরনের ছিলো, তার বিবরণ বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন রকম দেয়া হয়েছে। আমি এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমাদের শুধু এতোটুকু জানাই যথেষ্ট যে, মারিয়াম বড়ই কল্যাণময়ী ও ভাগ্যবতী মহিলা ছিলেন, চার দিক থেকে তার কাছে এতো প্রচুর খাদ্য আসতো যে, তা দেখে তার অভিভাবক একজন নবী হওয়া সত্ত্বেও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, এতো খাদ্য তোমার কাছে কোথা থেকে আসে। আর মারিয়াম একজন সত্যিকার মোমেন নারীর মতো সব কিছুকে আল্লাহর অনুগ্রহ বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে, 'সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি যাকে চান বিনা হিসাবে জীবিকা দেন।'

এ উক্তি যথার্থভাবে আল্লাহর সাথে একজন মোমেনের সম্পর্ক কেমন থাকে, তার চিত্র তুলে ধরে। আল্লাহর সাথে তার যে গোপন সম্পর্ক থাকে, তাকে সে এভাবে বিনীত ভাষার মাধ্যমে সংরক্ষণ করে, কোনো রকম গর্ব ও অহংকার প্রকাশ করে না। অপর দিকে এই অস্বাভাবিক ও অসাধারণ ঘটনা আল্লাহর নবী যাকারিয়াকে হতবাক করে দিলেও তা আসলে পরবর্তী বিস্ময়কর ঘটনা হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পটভূমিই তৈরী করে মাত্র।

এই সময়ে হযরত যাকারিয়ার মন আন্দোলিত হয়। এই সন্তানহীন বৃদ্ধের মনে সন্তানলাভের স্বাভাবিক আকাংখা জেগে ওঠে। মানবসভ্যতার বিকাশের লক্ষ্যে আল্লাহর সৃজিত প্রাকৃতিক নিয়মে

বংশধর লাভের এ দুর্বার আকাংখা সকল মানুষেরই মজ্জাগত। এমনকি যারা উপাসনালয়ে জীবনোৎসর্গ করে তারাও এ আকাংখা থেকে মুক্ত থাকে না।

৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১ নং আয়াতে যাকারিয়ার এই সন্তান প্রার্থনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের ইয়াহইয়া নামক সন্তান লাভের সুসংবাদ দানের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে আমরা আরো একটি অস্বাভাবিক ঘটনারই সম্মুখীন হই। আল্লাহর ইচ্ছার অতি দ্রুত এবং প্রচলিত রীতি প্রথার বন্ধনমুক্ত বাস্তবায়ন আমরা দেখতে পাই। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ একে অসম্ভব মনে করে। আর যখন তাকে অস্বীকার করতে পারে না বাস্তব ঘটনা আকারে তা সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে কেন্দ্র করে নানা রকমের অলীক কাহিনী আবিষ্কার করে।

হযরত যাকারিয়া ছিলেন অনেক বয়স্ক তদুপরি তার স্ত্রী নিসন্তান হওয়া সত্ত্বেও পুণ্যময় মারইয়ামকে জীবিকা লাভ করতে দেখে উৎসাহিত হয়ে সন্তান লাভের অভিলাষে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। তাই তিনি আল্লাহর কাছে সকরুণভাবে প্রার্থনা করেন। ৩৬ নং আয়াতে দেখুন,

'তখনই যাকারিয়া স্বীয় প্রভুকে ডাকলো। সে বললো, হে আমার রব, আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটি সৎ সন্তান দাও। তুমি তো (বান্দার) প্রার্থনা শুনো।'

এই ঐকান্তিক ও আন্তরিক দোয়ার ফল কী ফললো? দোয়া কবুল হয়ে গেলো। কেননা আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হওয়া কোনো প্রচলিত প্রথার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা নির্ভর করে একান্তভাবে আল্লাহর অবাধ ইচ্ছার ওপর। তিনি যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন। (আয়াত ৩৯)

'যাকারিয়া যখন মেহরাবে নামায পড়ছে, ঠিক তখনই তাকে ফেরেশতারা ডেকে বললো যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ইয়াহিয়া নামক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণ করবে, সে নেতা হবে, নারী স্পর্শমুক্ত হবে এবং সে অত্যন্ত পুণ্যবান নবী হবে।'

পবিত্র মন থেকে নির্গত এই দোয়াও কবুল হয়ে গেলো। কেননা, সে এমন সত্ত্বার কাছে দোয়া করেছিলো যিনি যখন খুশী তা কবুল করার নিরংকুশ ক্ষমতা রাখেন। ফেরেশতারা এমন একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো, যার নাম জন্মের আগেই প্রচারিত হয়। তার নাম ছিলো ইয়াহইয়া। তার গুণ বৈশিষ্ট্য ও সুপরিচিত। তিনি একজন মহান নেতা, পাপ ও লালসামুক্ত মানুষ, মোমেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বাণীর সত্যতা প্রতিপন্নকারী এবং একজন সৎকর্মশীল নবী।

মানুষ অসম্ভব মনে করলেও এই বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়ার সন্তান হয়েছিলো। মানুষ যে জিনিসকে প্রকৃতির অলংঘনীয় বিধি বলে মনে করে, তা কোনো চূড়ান্ত ও শেষ কথা নয়। এটা শুধু একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। মানুষের বয়স ও জ্ঞান দু'টোই সীমাবদ্ধ। আর এই সীমাবদ্ধতা দ্বারাই তার বিবেকবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। এই ছক বাধা শক্তি সামর্থ নিয়ে সে প্রকৃতির কোনো চূড়ান্ত বিধি জানতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর সামনে তার সংযত থাকা উচিত এবং নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। বিনা যুক্তিতে তার হাওয়ায় গদা ঘোরানো এবং 'এটা অসম্ভব ওটা সম্ভব' বলার ধৃষ্টতা দেখানো উচিত নয়। সামান্য জ্ঞান ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আল্লাহর অসীম ইচ্ছা ও ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করতে যাওয়া তার উচিত নয়।

এই দোয়া কবুল হয়ে যাওয়া হযরত যাকারিয়ার জন্যেও অপ্রত্যাশিত ছিলো। কেনই বা হবে না? তিনি আর যাই হোন, মানুষ তো! তাই আল্লাহর কাছে কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলেন যে, মানুষের পরিচিত নিয়ম-নীতির ছকের বাইরে এই বিস্ময়কর ঘটনাটা কিভাবে ঘটবে?

৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছো, যাকারিয়া বললো, 'হে আমার প্রভু! কিভাবে আমার সন্তান হবে? আমি তো বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা!' জবাব পেলেন সহজ ও সাবলীল ভংগীতে,

'আল্লাহ তায়ালা বললেন, এভাবেই, আল্লাহ তায়ালা যা চান তা করেন।'

'এভাবেই!' অর্থাৎ কিনা এটাই প্রথাসিদ্ধ, বারংবার সংঘটিত ও সুপরিচিত ব্যাপার যে, আল্লাহ তায়ালা যা চান চিরকাল তাই হয় এবং হয়ে আসছে। কিন্তু মানুষ এভাবে চিন্তা করে না। তারা আল্লাহর সক্রিয়তা সম্পর্কে সচেতন নয় এবং বাস্তবতা মনে রাখে না। এভাবেই অর্থাৎ এরূপ সহজেই তিনি যা চান তাই করেন। যাকারিয়া বৃদ্ধ এবং তার স্ত্রী বন্ধ্যা, তাতে কী হয়েছে যে, তিনি তাকে সন্তান দিতে পারবেন না! এসব তো মানুষের নিজেদের বানানো সীমা ও ছক। এর ভিত্তিতে তারা প্রকৃতির এক একটা নিয়ম বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় এবং কোনো কিছুই প্রচলিত রীতিনীতির ছকে আবদ্ধ নেই। সব কিছুই তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আর তাঁর ইচ্ছা অসীম ও অবাধ কিন্তু যাকারিয়া এই সুসংবাদের বাস্তব রূপ লাভে আগ্রহের আতিশয্যে এবং দোয়া কবুলের আকস্মিকতায় বিহ্বল হয়ে আল্লাহর কাছে একটি আলামত চাইলেন, যার ওপর নির্ভর করে তিনি নিশ্চিত থাকতে পারবেন। তাই বললেন,

'হে আমার প্রভু, আমার জন্যে তুমি একটি আলামত বা লক্ষণ নির্ধারণ করে দাও।'

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রকৃত নিশ্চিন্ততা অর্জনের পথের সন্ধান দিলেন। তাকে তার পরিচিত ছক বাঁধা বৃত্তের বাইরে বের করে আনলেন। বললেন, তার আলামত হলো, যখন তার মন মানুষের প্রতি নিবিষ্ট থাকবে, তখন সে নীরবতা অবলম্বন করবে, আর যখন আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করবে, তখন শুধু তাঁর তাসবীহ ও গুণগানে সরব ও সোচ্চার হবে,

'তোমার আলামত এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ছাড়া কথা বলতে পারবে না এবং সকাল বিকাল তাসবীহ পাঠ করবে।'

ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও তার প্রেক্ষাপট

এখানে এসে কোরআন পরবর্তী ঘটনা স্মরণে নীরব হয়ে যায়। আমরা জানি যে, এটা বাস্তবিকপক্ষে কার্যকর হয়েছিলো। হযরত যাকারিয়া এক অপরিচিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তার একই জিহ্বা মানুষের সাথে কথা বলতে গেলে আড়ষ্ট হয়ে যায় এবং আল্লাহর তাসবীহ পাঠ ও তার কাছে মোনাজাত করতে গেলে সরব হয়ে যায়। কোন প্রাকৃতিক আইনে এটা সংঘটিত হলো। সে আইনটি হলো এই যে, আল্লাহর ইচ্ছাই সর্বোচ্চ, চূড়ান্ত ও বাধাবন্ধনহীন। এই আইন ছাড়া এই অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আর বৃদ্ধ বয়সে বন্ধ্যা স্ত্রীর পেট থেকে সন্তান ইয়াহইয়াকে লাভ করার ঘটনাও তদ্রূপ।

হয়তো এই অলৌকিক ঘটনাই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের পটভূমি তৈরী করেছিলো। সেই ঘটনাও ছিলো আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতা ও বাধাবন্ধনহীন ইচ্ছার নিদর্শন। এখান থেকে শুরু হচ্ছে হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনার ও মারিয়ামের পবিত্রতা, প্রার্থনা ও এবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর অসীম কুদরতের দান গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করার বিবরণ। (আয়াত ৪২-৪৩)

'যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারিয়াম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং সারা দুনিয়ার নারীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। হে মারিয়াম! তুমি স্বীয় প্রভুর কাছে সেজদা ও প্রার্থনা করতে থাকো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করতে থাকো।'

কি ধরনের মনোনয়ন ছিলো এটি? আল্লাহর প্রত্যক্ষ কুদরতী ফুঁক গ্রহণ করে সন্তান ধারণের জন্যে তাকে মনোনীত করা হয়েছিলো। সৃষ্টির প্রথম মানব আদমও এই ধরনের ফুঁক গ্রহণ করেছিলেন। মানবজাতিকে তারই ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে এই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করা হয়েছিলো। মানবেতিহাসের এক নযীরবিহীন ঘটনার জন্যে এভাবে মনোনীত হওয়া নিসন্দেহে এক যুগান্তকারী ব্যাপার, অথচ তখনও পর্যন্ত মানবজাতির কাছে এই অসাধারণ বিষয়টি জানা ছিলো না।

পবিত্রতার উল্লেখ এখানে তাৎপর্যবহ। কেননা, ইহুদীরা সতী সাধ্বী পবিত্র নারী মারিয়ামের প্রতি ঈসা (আ.)-এর জন্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে নানা রকমের সন্দেহ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। যেহেতু এটা অস্বাভাবিক জন্মের ঘটনা, তাই তারা এরা পেছনে অবমাননাকর রহস্য আছে বলে মনে করে। আল্লাহ্ তায়ালা ওদেরকে কুৎসিত করে দিলেন।

এখান থেকে প্রকাশ পায় আল্লাহর দ্বীন কতো মহৎ., কতো উদার এবং এর উৎস কতো সন্দেহাতীত। মোহাম্মদ (স.) খৃষ্টানসহ সকল আহলে কেতাবদের পক্ষ থেকে এহেন অপবাদ, অপপ্রচার কুৎসা নেই, যা সহ্য করেননি। অথচ তিনিই আল্লাহর পক্ষ থেকে মারিয়ামকে সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রমণী বলে উল্লেখ করেন। আর তা তিনি এটা বুঝতে পেরেই করেছেন যে, তিনি এমন এক জাতির সাথে বিতর্কে লিপ্ত, যে জাতি মারইয়ামের পবিত্রতা নিয়ে গর্বিত এবং তার পবিত্রতা থেকেই ইসলাম গ্রহণ না করার পক্ষে তারা যুক্তি দেখায়।

এই উদারতার তুলনা কোথায়? এই দ্বীনের সত্যতা এবং রসূলের (স.) সত্যবাদিতায় এর চেয়ে মহৎ দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে, তিনি স্বীয় রবের পক্ষ থেকে মারিয়াম ও ঈসা (আ.) সম্পর্কে যে নির্ভুল তথ্য লাভ করেন, এমন প্রতিকুল পরিবেশেও তিনি তা তুলে ধরেন। রসূল না হলে এ সত্যটি এমন প্রতিকুল পরিবেশে কখনো তিনি ফাঁস করতেন না।

'হে মারইয়াম! স্বীয় প্রভুর কাছে তুমি প্রার্থনা করো......।'

এই এবাদাত, এই রুকু, সেজদা এবং আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের এই তাগিদের উদ্দেশ্য গুরুতর ও মহৎ কাজের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ। কাহিনীর এই পর্যায়ে এসে এবং বৃহত্তর ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে আয়াতে এই কাহিনী বলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যটি হচ্ছে ওহীর সত্যতা প্রমাণ করা। কেননা এসব ঘটনা রসূল (স.)-এর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলো। একমাত্র ওহীর বদৌলতেই তিনি জানতে পেরেছেন।

'এটা অদৃশ্যের খবরের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো তোমার কাছে আমি ওহীযোগে পাঠিয়েছি। মারিয়ামের অভিভাবক কে হবে, তা নিয়ে যখন তারা (লটারীর) তীর নিক্ষেপ করছিলো তখন তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না। তারা যখন ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো, তখনও তুমি সেখানে ছিলে না।'

'হায়কেলে সোলায়মানী'র (ইহুদীদের এবাদাতখানা বা মসজিদ) মোতাওয়াল্লীদের পক্ষ থেকে নারীদের অভিভাবকত্ব লাভের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, মারইয়ামের মা যখন শিশু মারইয়ামকে নিয়ে 'হায়কেলে' এলেন এবং স্বীয় মান্নত পূরণ করতে চাইলেন। তখন এই ঘটনা ঘটে। এখানে যে ঘটনার আভাস দেয়া হয়েছে, বাইবেলের 'ওল্ড টেষ্টামেন্ট' ও 'নিউ টেষ্টামেন্টে' এর উল্লেখ নেই। অথচ এ ঘটনা ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মযাজকদের অজানা থাকার কথা নয়। ঘটনাটা হলো হায়কেলে মোতাওয়াল্লীদের তীর নিক্ষেপের ঘটনা। এর উদ্দেশ্য ছিলো মারইয়ামের অভিভাবক কে হবে, সে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা, কোরআন এর বিশদ বিবরণ দেয়নি। সম্ভবত কোরআন তার এই স্থায়ী নীতির কারণে দেয়নি যে, সে পরবর্তী বংশধরকে যে তথ্য যতোটুকু জানাতে চায়, তার চেয়ে বেশী সে কখনো বলে না। আমরা এতটুকু বুঝতে পারি যে, এ যুগের লটারীর ন্যায় তীর নিক্ষেপের একটা বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করার ব্যাপারে তারা একমত হয়েছিলো মারইয়ামের অভিভাবকত্ব নির্ণয়ের জন্যে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, তীরগুলোকে পরে জর্ডান নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। অতপর শুধু হযরত যাকারিয়ার তীরই ভেসে উঠেছিলো। এটা তাদের মধ্যে নির্ধারিত আলামত হিসেবে সিদ্ধান্ত ছিলো। এভাবে যাকারিয়ার অভিভাবক হওয়া নিশ্চিত হয়। তাই মারিয়াম তার অভিবাবকত্বে ন্যস্ত হয়।

এটা ছিলো রসূল (স.)-এর অজানা তথ্য। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আর এটা হয়তো 'হায়কেলে'র গোপন রহস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, যা প্রকাশ করার অনুমতি ছিলো না। তাই

তৎকালীন আহলে কেতাবের বড় বড় নেতাদের মোকাবেলার জন্যে কোরআন এই অজানা তথ্য ফাঁস করে। যাতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন অকাট্য ও নির্ভুল ওহী এবং রসূলও সত্যবাদী রসূল। এই যুক্তিকে তারা খন্ডাতে পেরেছে বলে কোথাও বর্ণিত হয়নি। তারা তো তর্ক করতেই এসেছিলো। খন্ডন করতে পারলে নিশ্চয়ই তারা করতো।

এবার আমরা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের ঘটনায় আসছি, যা মানুষের প্রচলিত রীতিপ্রথার দৃষ্টিতে সবচেয়ে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনা ছিলো। (আয়াত ৪৫-৫১)

পূর্ববর্তী আদেশ অনুসারে মরিয়ম পবিত্রতা অর্জন, দোয়া যেকের ও এবাদাত দ্বারা এই অনুগ্রহ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার জন্যে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার খবর তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমেই পেলেন।

'যখন ফেরেশতারা বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তার পক্ষ থেকে একটি বাণী সম্পর্কে, তার নাম 'মারইয়াম তনয় ঈসা', দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি সম্মানিত এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। আর তিনি মানুষের সাথে মায়ের কোলে থাকা অবস্থায়ও এবং পূর্ণবয়স্ক অবস্থায়ও কথা বলবেন।' (আয়াত ৪৫-৪৬)

এ আয়াত দু'টিতে পরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বাণী যার নাম 'ইবনে মারইয়াম' তার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে যে, হযরত ঈসাকে 'বাণী' বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য কী?

এ ধরনের বিভিন্ন অদৃশ্য বিষয় রয়েছে, যার সঠিক তাৎপর্য নির্ণয় করা আমাদের সাধ্যাতীত। সম্ভবত এটি সূরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'মোতাশাবেহাতের' অন্তর্ভুক্ত।

তবে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যায় যদি আমরা নিম্নের তথ্যটিকে এমনভাবে বুঝতে চেষ্টা করি, যাতে আল্লাহর সাথে হৃদয় সম্পৃক্ত হয় এবং তার বাধাবন্ধনহীন ইচ্ছা, সীমাহীন ক্ষমতা ও সৃজনীশক্তিকে আমরা উপলব্ধি করি।

আল্লাহ তায়ালা আদম (আ.)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করে মানবজীবনের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। এখন চাই তাকে সরাসরি মাটি থেকে সৃষ্টি করে থাকুক, অথবা তার পরবর্তী বংশধরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করে থাকুক। যে গুপ্ততথ্য আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না, তার প্রকৃতি অনুসারে এর কোনোটি আগের বা পেছনের নয়। যে জীবন প্রথম সৃষ্ট আদমের দেহে সঞ্চারিত হয় এবং আদম যদি প্রত্যক্ষভাবে প্রাণহীন মাটি থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে, উভয় অবস্থাতেই জীবন আল্লাহর সৃষ্টি। আর এ দু'টির কোনোটাই অপরটির আগে সৃষ্টি নয়।

এ জীবন কোত্থেকে এলো এবং কিভাবে এ জীবন নিসন্দেহে মাটি এবং অন্য সকল জড় পদার্থ থেকে ভিন্ন জিনিস। এটি একটি অতিরিক্ত ও ভিন্নধর্মী জিনিস। এ জিনিসের কোনো বৈশিষ্ট্য বা আলামত মাটি বা অন্য কোনো জড় পদার্থে কখনো পাওয়া যাবে না।

এ রহস্য কোথা থেকে এলো? একে অস্বীকার করা বা উপহাস করার জন্যে আমাদের অজ্ঞতা যথেষ্ট নয়, যেমন বস্তুবাদীরা কিছুটা হঠকারীতার সাথেই তা করে থাকে। সেই হঠকারীতাকে কোনো বৈজ্ঞানিক তো দূরের কথা, যার কিছুমাত্র বিবেকবুদ্ধি আছে সেও মেনে নিতে পারে না।

আমরা জানি না। অথচ আমরা মানুষেরা আমাদের বস্তুগত উপায়, উপকরণ দ্বারা এর উৎস জানার জন্যে বা একে স্বহস্তে সৃষ্টি করার জন্যে যতো চেষ্টা চালিয়েছি, তার সবই বৃথা গেছে।

আমরা জানি না; কিন্তু যে আল্লাহ তায়ালা জীবন দিয়েছেন তিনি জানেন। তিনি আমাদেরকে বলছেন যে, এটা তাঁর আত্মা থেকে একটা ফুঁক। আর তার একটিমাত্র কথা দ্বারা সব কিছু অস্তিত্বে আসে। সে কথাটা হলো 'হও'। এই ফুঁকটা কী জিনিস? মৃত বস্তুর মধ্যে কিভাবে ফুঁক দেয়া হয়? যার ফলে উক্ত মৃত বা জড় বস্তুর মধ্যে এই দুর্বোধ্য সূক্ষ্ম গুপ্ত রহস্য সঞ্চারিত হয়।

এটি কি জিনিস? কেমন জিনিস? মানুষের বিবেকবুদ্ধিকে এ জিনিস উপলব্ধি করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। কেননা, সে এর যোগ্যই নয়। মানুষকে খেলাফতের যে মৌলিক দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনে জীবন ও ফুঁকের রহস্য উপলব্ধি তার জন্যে মোটেই প্রয়োজন নেই। মানুষ কখনো কোনো নিষ্প্রাণ জিনিসে প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। সুতরাং জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য কী, আত্মা থেকে ফুঁক দেয়ার মর্ম কী, কিভাবে আদমের সত্তার সাথে তার সংযোগ ঘটেছে, অথবা প্রথম সৃষ্ট প্রাণী যে জীবন যাপন শুরু করেছে, সেই জীবনের প্রথম ধাপে তার আগমণ কিভাবে ঘটলো, তা জেনে মানুষের কোনো লাভ নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন যে, আদমের দেহে তিনি আপন আত্মা থেকে যে ফুঁক দিয়েছেন, সেটাই তাকে এতো মর্যাদা ও বিশিষ্টতা দান করেছে, এমনকি ফেরেশতার ওপরও তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। সুতরাং যে জীবন পোকা মাকড় ও অন্যান্য প্রাণীকে দেয়া হয়, আল্লাহর ফুঁক বলতে নিছক সেই ধরনের কোনো জীবনকেই বুঝায় না, বরং তা তার চেয়ে নিশ্চয়ই ভিন্নতর। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর আমরা মানুষকে এমন একটি সৃষ্টিরূপে নিবেচনা করতে বাধ্য হই, যার আবির্ভাব হয়েছিলো বিশ্ব প্রকৃতির অন্য সকল প্রাণী থেকে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়ে।

আসলে এটা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, এটা ছিলো নিছক একটি প্রাসংগিক ইংগীত, যা পাঠককে সম্ভাব্য একটি সংশয় থেকে রক্ষার জন্যে পেশ করা হলো। মানবসৃষ্টির ব্যাপারে যখন আমরা একটা বিতর্ক তুলে ধরেছি, তখন এই সংশয়টা জন্ম নেয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিলো।

আসল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এখানে এই যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সামনে জীবনের উদ্ভব সংক্রান্ত গোপন রহস্য উদঘাটন করেছেন, যদিও এই রহস্যের স্বরূপ এবং নির্জীব দেহে সেই জীবন কিভাবে ফুঁকে দেয়া হয়, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না।

হযরত আদমকে আল্লাহ তায়ালা এককভাবে সৃষ্টির পর পরবর্তী মানবসৃষ্টিকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করে দেন। সে নিয়মটি হলো একজন নারী ও একজন পুরুষের মিলনের মাধ্যমে ডিম্বাণু ও শুক্রকীটের সংযুক্তি সাধন, অতপর এই সংযুক্তির ফলে গর্ভধারণ ও প্রজনন সম্পন্ন করা। ডিম্বাণু একটি জীবন্ত জিনিস। অনুরূপ শুক্রকীটও জীবন্ত ও একটি সক্রিয় বস্তু।

এ নিয়মে মানব বংশধরের ক্রমবিকাশ অব্যাহত রইলো। এক পর্যায়ে এসে আল্লাহ তায়ালা আবার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মানবজাতির কোনো বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই প্রচলিত প্রজনন নীতির ব্যতিক্রম ঘটাবেন। যদিও তা পুরোপুরি প্রথমটার মতো হবে না। এখানে শুধু একজন স্ত্রীলোক থাকবে এবং প্রথমবারে যে ঐশী ফুঁক দ্বারা জীবনের উন্মেষ ঘটেছিলো, এই স্ত্রী লোকও অবিকল সেই ফুঁক লাভ করবে, আর তাতেই তার উদরে নতুন জীবনের আবির্ভাব ঘটবে।

এখন বিবেচ্য বিষয়, এই 'ফুকটিই' কি সেই বাণী? আর এই বাণী কি সৃষ্টিকর্তার সৃজনী ইচ্ছারই স্ফুরণ বুঝায়? এই বাণী কি আল্লাহর 'কুন' বা 'হও' সূচক আদেশ, না তার ইচ্ছার স্ফুরণকেই রূপক অর্থে বাণী বলা হয়েছে? আর এই বাণী কি স্বয়ং হযরত ঈসা, না যে উপাদান থেকে তিনি গঠিত সেই উপাদান?

এ সব প্রশ্নের কোনো কুল কিনারা নেই। এ সব প্রশ্নের শেষফল সন্দেহ-সংশয় ছাড়া আর কিছু নয়। সার কথা শুধু এই যে, আল্লাহ তায়ালা একটি নযীরবিহীন ও ব্যতিক্রমধর্মী জীবন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে তার যে স্বাধীন, সার্বভৌম ইচ্ছা আপন আত্মা থেকে একটি ফুঁক দিয়ে জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম, সেই ইচ্ছা অনুসারে ইপ্সিত জীবন সৃষ্টি করলেন। আমরা শুধু এই জীবনের লক্ষণ ও আলামতটুকুই বুঝতে পারি, কিন্তু তার স্বরূপ কি তা জানি না। সেটা না জানাই আমাদের উচিত। কেননা, পৃথিবীতে আমাদের খেলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যে এর কোনো

প্রয়োজন নেই। কারণ কাউকে জীবন দান করা আমাদের খেলাফতের দায়িত্বের আওতাভুক্ত নয়। এভাবে বিষয়টি সহজে হৃদয়ংগম করা যায় এবং এ থেকে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের উদ্রেক হয় না।

এভাবে ফেরেশতারা মারইয়ামকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে অচিরেই একটি বাণী আসবে, যার নাম মারইয়াম তনয় ঈসা। এ সুসংবাদ থেকে আগন্তুকের নাম ও বংশ পরিচয় জানা গেলো। এ বংশ পরিচয় থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত ঈসা তার মায়ের পরিচয়েই পরিচিত হবেন। এই সুসংবাদ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর গুণ ও মর্যাদা জানা গেছে, যেমন, তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে অত্যন্ত মর্যাদাশালী এবং তিনি আল্লাহর ঘনিষ্ঠজন। আরো জানা গেছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সাথে সাথেই একটি মোজেযা দেখা দেবে। তাহলো, 'তিনি মায়ের কোলে বসেই মানুষের সাথে কথা বলবেন।' 'আর তার ভবিষ্যত জীবনের একটি দৃশ্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, 'প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও' তিনি মানুষের সাথে কথা বলবেন। আর তিনি যে শ্রেণীর লোক হবেন তারও বর্ণনা এতে রয়েছে যে, 'সে হবে পুণ্যবানদের একজন।'

অপরদিকে সতী সাধ্বী, পবিত্র, কুমারী ও প্রচলিত সমাজরীতির মধ্যে আবদ্ধ যুবতী মারইয়াম এই সুসংবাদ শুনে স্বভাবতই হতবাক হয়ে গেলেন এবং এই দুর্বোধ্য রহস্য উদঘাটনের জন্যে আপন প্রভুর কাছে জানতে চান, 'হে আমার প্রভু, আমার সন্তান হবে কিভাবে, অথচ আমাকে তো কোনো পুরুষ স্পর্শই করেনি?'

এর জবাবে তাকে সেই সহজ সরল সত্য কথাটি জানানো হলো, যা সীমিত জ্ঞানের অধিকারী মানুষ দীর্ঘদিন আপাত দৃশ্যমান উপায় উপকরণের সাথে পরিচিত থাকার কারণে ভুলে থাকে

'আল্লাহ তায়ালা বললেন! আল্লাহ তায়ালা এভাবেই– যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন 'হও, আর অমনি তা হয়ে যায়।'

এই আদি ও আসল সত্যের দিকে যখন তার দৃষ্টি ফেরানো হয়, তখন বিস্ময় ও বিমূঢ়তার ভাব কেটে যায় এবং মন আশ্বস্ত হয়ে যায়। তখন সে বরং নিজের উপরই বিস্মিত হয়ে ভাবে যে, এমন সহজ স্বাভাবিক ও দেদীপ্যমান বিষয়টি নিয়ে আমি এমন অবাক হলাম কেমন করে?

এভাবেই কোরআন অত্যন্ত সহজ ও সরল ভংগীতে এমন বড় বড় তত্ত্ব সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাধারা গড়ে তোলে। জটিল দার্শনিক বিতর্কের দরুন যে সব সন্দেহ সংশয় জট পাকিয়ে ফেলে, তাকে কোরআন এভাবে তা খুলে দিয়ে সত্যকে মনমগজে স্থিরভাবে বদ্ধমূল করে দেয়।

ঈসা (আ.)-এর মোজেযা ও তার মিশন

এরপর ফেরেশতা মারইয়ামকে নযীরবিহীন প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী এই অসাধারণ সৃষ্টির ভবিষ্যত জীবনের আরো কিছু বিবরণ দেয় যে, কিভাবে তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্যে জীবন যাপন করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আর তিনি তাকে কেতাব, হেকমত (তত্ত্বজ্ঞান) এবং তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দেবেন।

'কেতাব' শব্দ দ্বারা কখনো কখনো লেখা বুঝান হয়ে থাকে। আবার কেতাব বলতে তাওরাত এবং ইনজীলকেও বুঝায়। আর হেকমত এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যা বিদ্যমান থাকলে প্রতিটি ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়– যা সত্য, ন্যায় ও নির্ভুল তা চেনা যায় এবং তার অনুসরণ করা যায়। হেকমত বিপুল কল্যাণের উৎস ও ভান্ডার। তাওরাত হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসৃত গ্রন্থ ছিলো ইনজীলের মতোই। হযরত ঈসা (আ.) ইসলামের যে সংস্করণটি নিয়ে এসেছিলেন, তাওরাত ছিলো তার ভিত্তি, আর ইনজীল ছিলো তাওরাতের মূল আদর্শ এবং বনী ইসরাঈলীদের স্মৃতিতে বিকৃত ও নির্জীব অবস্থায় বিদ্যমান ইসলামী জীবনাদর্শের কোনো গ্রহণযোগ্যতা এ দুটো গ্রন্থের কোনোটাই ছিলো না। তাওরাত হযরত ঈসা (আ.)-এর আনীত ধর্ম

ও জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি এবং তৎকালীন সমাজের অনুসৃত আইন বিধান সম্বলিত গ্রন্থ। ইনজীলে তাওরাত থেকে খুব সামান্যই পরিবর্তন বিদ্যমান। ইনজীল হচ্ছে ইসলামী আদর্শের সংস্কার ও নবায়ন এবং আল্লাহর সাথে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার মাধ্যমে তার বিবেকবুদ্ধিকে পুনর্গঠনের পথনির্দেশিকা। এই পথনির্দেশনা অনুসরণ করে সংস্কার ও সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে গিয়েই হযরত ঈসা ইহুদীদের চক্রান্তের শিকার হন। সে কাহিনী পরবর্তীতে আসছে।

'আর বনী ইসরাঈলীদের জন্যে রসূল হিসাবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বলবেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নির্দেশনসমূহ নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্যে মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতি বানিয়ে দেই। অতপর তাতে যখন ফুৎকার দেই, তখন তা আল্লাহর হুকুমে সত্যিকারের পাখীতে পরিণত হয়।'(আয়াত-৪৮-৪৯)

এই আয়াত দু'টি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) বনী ইসরাঈলেরও নবী ছিলেন। এ কারণেই মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হওয়া তাওরাত হযরত ঈসা (আ.)-এরও গ্রন্থ ছিলো, আর ইনজীল ছিলো প্রেরণার সৃষ্টিকারী একটি বাড়তি গ্রন্থ।

যে সব অলৌকিক জিনিস বা মোজেযা হযরত ঈসা (আ.)-এর সংগে থাকবে বলে আল্লাহ তায়ালা মারিয়ামকে জানিয়েছিলেন এবং যা কার্যত বনী ইসরাঈলের সামনেই প্রকাশ পেয়েছিলো, তা হলো মৃত ও নির্জীব বস্তুসমূহের মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহর হুকুমে তাকে সজীব করা, মৃত মানুষকে আল্লাহর হুকুমে পুনরুজ্জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়া, কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে বনী ইসরাঈলীরা নিজেদের ঘরে কি খায় এবং কি সঞ্চিত রাখে তা অদৃশ্যভাবেই বলতে পারা।

কোরআনে এই সবকটি মোজেযার উল্লেখের পর বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, এসবই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা ও আল্লাহর অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন করেন।

এই সমস্ত মোজেযা সাধারণভাবে নির্জীব পদার্থকে জীবনদান, মৃতের পুনরুজ্জীবন, সুস্থতা পুনর্বহাল করা এবং দূর থেকে অদৃশ্য জিনিসকে দেখার সাথে সম্পৃক্ত। আর হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের সাথে এগুলোর কি চমৎকার মিল। তার নিজের জন্মও হযরত আদম (আ.)-এর মতো এক জ্বলন্ত মোজেযা। এ থেকে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন তার এক সৃষ্টির হাত দিয়ে এতসব মোজেযা সংঘটিত করাতে পারেন, তখন সেই সৃষ্টিকেই তিনি এক নযীরবিহীন পন্থায় সৃষ্টি করতেও সক্ষম। সুতরাং এই অস্বাভাবিক জন্মের ঘটনা নিয়ে আর সন্দেহ-সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ নেই। কেননা গতানুগতিক রীতি প্রথার মধ্যে মানুষ নিজে আবদ্ধ থাকলেও সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহকে মানুষ তার মধ্যে রাখতে পারে না।

'আর আমি তোমাদের সামনে বিদ্যমান তাওরাতকে সত্যায়িত করতে এসেছি, তোমাদের ওপর নিষিদ্ধ করা কতক জিনিসকে বৈধ করতে এসেছি এবং তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সঠিক পথ।' (আয়াত ৫০-৫১)

বনী ইসরাঈলের প্রতি ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতের এই উপসংহার আল্লাহ দ্বীনের প্রকৃতি সংক্রান্ত কয়েকটি মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান দেয় এবং সকল নবীর দাওয়াতের আলোকে এই দ্বীনের তাৎপর্য কী, সে সম্পর্কে কতিপয় মূল্যবান সত্য উদঘাটন করে। বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখ দিয়ে যখন এগুলো উচ্চারিত হয়, তখন এই তত্ত্বগুলোকে অধিকতর মূল্যবান বলে মনে হয়। কেননা হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম ও তার পরিচয় নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। অথচ কেবল আল্লাহর দ্বীনের মৌল আদর্শ থেকে বিচ্যুতির কারণেই এ বিভ্রান্তি ছড়ানো সম্ভব হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের এই প্রকৃতি কোনো রসূলের আমলেই পরিবর্তিত হয় না।

'আমি তোমাদের সামনে বিদ্যমান তাওরাতকে সত্যায়িত করতে এবং তোমাদের ওপর নিষিদ্ধ করা কিছু জিনিসকে বৈধ করতে এসেছি।'

এ উক্তি থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর শরীয়তের প্রকৃত রূপটি উদঘাটিত হয়। যে তাওরাত গ্রন্থ হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছে, যা সেই সময়কার প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজ জীবনকে সংঘটিত করার জন্যে আইন দিয়েছিলো এবং যাতে বনী ইসরাঈলের জীবনের সমস্যা ও ঘটনাবলী আলোচিত হয়েছে, (যেহেতু একটি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর জন্যে এতে একটি বিশেষ ধর্মীয় বিধান দেয়া হয়েছিলো)। সেই তাওরাত হযরত ঈসা (আ.)-এর রেসালাতের জন্যেও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। তার রেসালাত এই তাওরাতকে সত্যায়িত করতে এসেছিলো। তবে কিছু কিছু হারামকে হালাল করার সংশোধনীও এর অন্তর্ভুক্ত। এ সব জিনিস হারাম ঘোষিত হয়েছিলো তাদের কিছু কিছু গুনাহের শাস্তিদানের জন্যে। পরে আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে নিজ দয়ায় তাঁর কিছু কিছু জিনিসকে পুনরায় হালাল করে দেন।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর দ্বীন চাই তা কোনো নবীর আমলের দ্বীন হোক না কেন তার প্রকৃতি এই যে, তাতে মানুষের সামষ্টিক জীবনকে সুষ্ঠভাবে সংঘবদ্ধ করার জন্যে আইনগত বিধান থাকবেই। তাতে শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক ভাবাবেগকে প্রশমিত করার উপকরণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানই থাকবে না। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান না থাকলে তা আল্লাহর দ্বীন হতে পারে না। আল্লাহর দ্বীন হলো মানুষের যে অংশ রয়েছে, তা আনুষ্ঠানিক এবাদাত নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনের অন্যান্য অংশ ও বিভাগের বিধান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

কিন্তু খৃষ্টবাদে এই কান্ডটি ঘটেছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর আনীত দ্বীন প্রকৃতপক্ষে শেষ নবীর দ্বীন আসার আগ পর্যন্ত সময়ের জন্যে প্রবর্তিত হয়েছিলো বিধায় তার আইনগত বিধানের অংশটি তার নৈতিক আধ্যাত্মিক ও এবাদাত সম্বলিত অংশটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ইহুদীদের সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর, তার সহচরদের ও পরবর্তীকালে তার আনীত দ্বীনের অনুসারীদের মধ্যে স্থানীয় শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় আইন-কানুন সম্বলিত তাওরাত এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণাদায়ক উপদেশাবলী সম্বলিত ইনজীলের মাঝে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়ে গেছে। আর তাওরাতের সেই আইন কানুন এবং শরীয়ত একটি নির্দিষ্ট যুগের ও নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীর জন্যে নির্ধারিত ছিলো। পক্ষান্তরে সমগ্র মানবজাতির জন্যে চিরস্থায়ী শরীয়ত ও আইন-কানুন নির্ধারিত সময়ে নাযিল করা হবে বলে আল্লাহ তায়ালা স্থির করে রেখেছিলেন।

মোদ্দা কথা, এভাবে খৃষ্টবাদ আল্লাহর শরীয়ত ও আইনবিহীন একটি সমাজে পরিণত হয়। আর এই পর্যায়ে এসে তা তৎকালীন বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। কেননা মানবজাতির সামাজিক জীবনের নেতৃত্ব দিতে হলে একদিকে যেমন বিশ্বজগত ও মানবজীবনের অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যাসম্বলিত একটি আদর্শের প্রয়োজন, তেমনি আনুষ্ঠানিক এবাদাত ও নৈতিক মূল্যবোধসম্বলিত একটি বিধানেরও প্রয়োজন। আবার একইভাবে এমন একটি অপরিহার্য আইনগত বিধি ব্যবস্থারও প্রয়োজন, যা গোটা সমাজজীবনকে সুশৃংখল করে গড়ে তুলবে এবং যা উল্লেখিত আকীদা ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকেই উৎসারিত। এই সার্বিক বিধি-ব্যবস্থাসম্বলিত দ্বীনই একটা সুষ্ঠ সামাজিকব্যবস্থা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সভ্যতার অবকাঠামো গড়ে তোলার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম। খৃষ্টীয় ধর্মে যখন উক্ত বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়, তখন তা মানবজীবনের মূল্যবোধ ও বাস্তব কর্ম-প্রেরণা পরস্পর থেকে পৃথক হতে বাধ্য হয়। এই বিচ্ছেদটা সামাজিক জীবনসহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা দেয়। ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো তার স্বাভাবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কার্যত ভিত্তিহীন বা পংগু হয়ে পড়ে।

এ ঘটনাটা মানব ইতিহাসের কোনো নগণ্য ঘটনা ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিলো মানবজাতির জন্যে একটি ভয়াবহ বিপর্যয়। এ বিপর্যয়ের ফলেই আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতার ওপর রকমারী দুর্যোগ ও দুর্ভোগ নেমে আসে। এ অবস্থা এখনো খৃষ্টবাদকে আকড়ে ধরে থাকা দেশগুলোতে বিরাজমান, যদিও সেখানে খৃষ্টবাদ আইন-কানুন ও সামাজিক বিধানবিহীন নিরেট নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার সমর্থক তেমনি খৃষ্টবাদ থেকে বিচ্যুত অথচ খৃষ্টান নামধারী দেশগুলোতেও তা পুরোপুরি বিরাজমান। আসলে হযরত ইসা যে ঐশী বিধান নিয়ে আসেন, তা হচ্ছে গোটা মানবজীবনকে সংগঠিত করার এমন এক ব্যবস্থা, যা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসেরই ভিত্তিতে প্রাপ্ত নৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা গঠিত। বলা বাহুল্য, শুধু হযরত ঈসা (আ.)-এর আনীত দ্বীন নয়, আল্লাহর দ্বীন বলতে যা বুঝায় তা সর্বকালেই এ ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধান না হলে তাকে খৃষ্টবাদ বলেও অভিহিত করা চলে না। তাকে দ্বীন বা ধর্ম বলাও সংগত নয়। এরূপ সর্বাত্মক বিধি-ব্যবস্থা ছাড়া মানবজীবনের জন্যে এমন কোনো সামাজিক বিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিক জীবনের চাহিদা পূরণে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম। এ বিষয়টিই হযরত ঈসা (আ.)-এর নিম্নোক্ত উক্তির অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়,

'আর আমি আমার সামনে বিরাজমান তাওরাতের সত্যায়ন এবং তোমাদের ওপর নিষিদ্ধ কতিপয় জিনিসকে বৈধ করে দেয়ার জন্যে এসেছি।'

আর এ সত্য জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে তিনি আরো বৃহৎ ও অকাট্য সত্য তাওহীদের ওপর নির্ভর করছেন, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের একটি নিদর্শন নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও আমার প্রতিপালক। সুতরাং একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করো। এটাই সঠিক পথ।'

এখানে হযরত ঈসা সেই মহাসত্যের ঘোষণা দিচ্ছেন, যার ওপর আল্লাহর গোটা দ্বীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সেটি হচ্ছে এই যে, তিনি যে মোজেযা নিয়ে এসেছেন, তা তার নিজের কৃতিত্ব নয়। একজন মানুষ হিসাবে এ সব অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর কোনো ক্ষমতা তার নেই। এগুলো তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এনেছেন। তার মূল দাওয়াত হলো, আল্লাহকে ভয় করা ও তার রসূলের অনুসরণ করা। তারপর তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তারও প্রভু তার জাতিরও প্রভু। তিনি নিজে প্রভু নন তিনি বান্দা মাত্র। তাই তিনি তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদাতে মশগুল হতে বলেছেন। সবশেষে বলেছেন যে, আল্লাহর একত্ব, এককভাবে শুধু তাঁরই দাসত্ব এবং তার আনা জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করাই হলো সেরাতুল মোস্তাকীম বা সঠিক ও নির্ভুল পথ। এছাড়া আর সব পথই হচ্ছে বিপথগামিতা। ফেরেশতাদের মাধ্যমে মারইয়ামকে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদদান এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর রেসালাত, মোজেযা, ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পর সরাসরি হযরত ঈসা কর্তৃক বনী ইসরাঈলের কুফরীর আভাস পাওয়া ও আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারী আহ্বানের বিবরণ দেয়া শুরু হয়েছে।

'অতপর যখন ঈসা তাদের দিক থেকে কুফরীর আভাস পেল, তখন সে বললো, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে আছে! হাওয়ারীরা বললো, আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান। হে আমাদের মালিক, হে আমাদের প্রভু! তুমি যা নাযিল করেছো, তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং রসূলের অনুসারী হয়েছি। কাজেই তুমি আমাদেরকে সাক্ষী হিসাবে লিখে নাও।'

এখানে কোরআনের বিবরণে একটু বড় রকমের ফাঁক রয়েছে। ফেরেশতাদের সুসংবাদ অনুসারে হযরত ঈসা যে সত্য সত্যই জন্ম নিলেন; তাকে নিয়ে মারইয়াম আপন জ্ঞাতি ও গোষ্ঠীর

কাছে গেলে হযরত ঈসা যে মায়ের কোলে বসেই কথা বলে উঠলেন, প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তিনি যে স্বজাতিকে দাওয়াত দিলেন এবং ইতিপূর্বে তার যে সব মোজেযার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে তা যে তিনি সত্যই দেখালেন, তার বিবরণ এখানে দেয়া হয়নি। (অবশ্য সূরা মারইয়ামে তা দেয়া হয়েছে)। এ ধরনের ফাঁক কোরআনের কাহিনী বর্ণনায় মাঝে মাঝে দেখা যায়। পুনরাবৃত্তি এড়ানো এবং সূরার বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাহিনী সংক্ষেপ করাই এর উদ্দেশ্য।

যে সকল মোজেযা দেখানো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে তার পেছনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন এবং আল্লাহর শক্তির সাহায্যেই তিনি সেগুলো দেখাচ্ছেন। সেই সব মোজেযা দেখার পরও এবং হযরত ঈসা বনী ইসরাঈলের ওপর থেকে বিভিন্ন আইনগত হারামকে হালাল করা সত্ত্বেও বনী ইসরাঈল তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। এটা বুঝতে পেরেই ঈসা আহ্বান জানালেন যে, 'কে আছে আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী?'

অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত ও আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব পালনে আমাকে সহায়তাকারী কে আছে? এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রত্যেক আকীদা ও আদর্শের প্রচার প্রসারের কাজে দাওয়াত দাতার কিছু সাহায্যকারী থাকা প্রয়োজন, যারা তার সহযোগিতা করবে তাকে রক্ষা করবে প্রচার করবে এবং এর পরে তার ওপর বহাল থাকবে।

'হাওয়ারীরা বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী .... আমরা মুসলমান'।

এখানে তারা ইসলামকে তার আসল অর্থে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ আমরা আত্মসমর্পণকারী। আর তারা তাদের এই আত্মসমর্পণে এবং আল্লাহর সাহায্য করার কাজে অর্থাৎ আল্লাহর রসূলকে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সর্বাত্মক সাহায্য করার কাজে হযরত ঈসাকে সাক্ষী রেখেছে। এরপর তারা আল্লাহর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের মানসে আল্লাহর দিকে এই বলে মনোনিবেশ করেন যে, 'হে আমাদের প্রতিপালক..... কাজেই তুমি আমাদের সাক্ষী হিসাবে লিখে নাও।'

আল্লাহর সাথে সরাসরি বায়াত স্থাপনের এই উদ্যোগ খুবই তাৎপর্যবহ। আসলে মোমেনের অংগীকার প্রাথমিকভাবে আল্লাহর সাথেই হয়ে থাকে। রসূল যখন আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেন, তখন আকীদার দৃষ্টিকোণ থেকে রসূলের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। এরপর বায়াত সরাসরি আল্লাহর সাথেই সম্পাদিত হয়। রসূলের পর বায়াত মোমেনের ঘাড়ে এসে পড়ে। এ বায়াতে রসূলের আনুগত্যের অংগীকারও থাকে। কাজেই ব্যাপারটা শুধু মনে মনে আকীদা বা বিশ্বাস পোষণের মধ্যে সীমিত নয়, বরং আদর্শের অনুসরণ এবং রসূলের অনুকরণও এর অন্তর্ভুক্ত। এটিই এই সূরার মূল বক্তব্য যার নানাভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। হাওয়ারীদের এ কথাটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 'আমদেরকে সাক্ষী হিসাবে লিখে নাও'। কিসের সাক্ষী ও কি ধরনের সাক্ষী?

আল্লাহর দ্বীনে বিশ্বাস স্থাপনকারীর ওপর এই দ্বীনের পক্ষে সাক্ষ্যদান করার দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। এই দ্বীনের চিরস্থায়ী ও বিজয়ী আদর্শ হিসাবে টিকে থাকার যে ন্যায্য অধিকার আছে এবং তা যে মানবজাতির কল্যাণ নিশ্চিতকারী একমাত্র ব্যবস্থা এই মর্মে সাক্ষ্যদান করা তার দায়িত্ব। মোমেনের নিজের জীবনে, চরিত্রে ও আচরণে এই দ্বীনের জীবন্ত চিত্র ফুটে না ওঠা পর্যন্ত তার এই সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব পালিত হবে না। এই জীবন্ত চিত্র দেখে জনগণ তার ভেতরে ইসলামের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখতে পারবে, সেই দৃষ্টান্ত নিজেই সাক্ষ্য দেবে যে, অন্য সকল আদর্শের চেয়ে এ দ্বীনের আদর্শই অধিক কল্যাণ ও মঙ্গলের নিশ্চয়তা দানকারী।

অনুরূপভাবে সে যতোক্ষণ আল্লাহর দ্বীনকে তার জীবনের মূল ভিত্তি হিসাবে এবং তার সমাজের কার্যকর বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে, তার নিজের ও জাতির অনুসৃত আইন ও বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না করবে, ততক্ষণ সাক্ষ্যদানের এই দায়িত্ব তার পালন করা হবে না। তার চারপাশে বিরাজমান সমাজ ও সভ্যতা যখন আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে, এরূপ সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সে যখন সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত হবে (জেহাদ করবে)।

যে সমাজ, যে রাষ্ট্র মানব সমাজের ওপর আল্লাহর বিধান কার্যকর করে না, সেই সমাজের অধীন জীবন যাপনের চেয়ে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে মৃত্যুবরণকে যখন শ্রেয় জ্ঞান করবে, তখনই তার সাক্ষ্যদান সম্পূর্ণ হবে। এরূপ মৃত্যুর অর্থ হবে এই যে, এই দ্বীন যে তার জীবনের চেয়েও মূল্যবান এবং যে সব আশা-আকাংখার জন্যে মানুষ বেঁচে থাকে, তার চেয়েও মহান সেই মর্মে সে সাক্ষ্য দিলো। এ কারণেই এই পথে জীবনদানকারীকে 'শহীদ' অর্থাৎ সাক্ষী বলা হয়।

হাওয়ারীরা যে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের সাক্ষী হিসাবে লিখে নেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলো তার অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের জীবনকে ইসলামের জীবন্ত চিত্র রূপে গড়ে তোলার ক্ষমতা ও সামর্থ দেন, তাদের সমাজে এই দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্যে তাদের সব কিছু উৎসর্গ করে জেহাদ করার তাওফীক দেন এমনকি এর মূল্য যদি তাদেরকে আপন জীবন দিয়েও পরিশোধ করতে হয় তবে তাতেও যেন তারা পিছপা না হয়।

একজন মুসলমানের জন্যে এর চেয়ে মহৎ ও উত্তম দোয়া আর কিছুই হতে পারে না। নিজেকে মুসলমান বলে যিনিই পরিচয় দেন তার এই দোয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা করা উচিত। এটাই প্রকৃত ইসলাম। যে ব্যক্তি আপন দ্বীনের জন্যে এই সাক্ষ্য না দেয় এবং সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তরাত্মা পাপী। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে অথচ ইসলাম মোতাবেক কাজ কর্ম ও আচরণ করে না। অথবা নিজে তদনুযায়ী কাজ করলেও অন্যদেরকে সেদিক ডাকে না, সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহর বিধানকে চালু করার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রামে লিপ্ত হয় না, বরং সে এই কষ্টের চেয়ে ঘরে বসে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন যাপনকে অগ্রাধিকার দেয়, ইসলামের চেয়ে নিজের জীবনকে বেশী গুরুত্ব দেয়, সে ইসলামের পক্ষ্যে সাক্ষী দিতে কার্পণ্য করে, অথবা ইসলামের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে অন্যদেরও দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়। এভাবে যারা নিজেদের মোমেন পরিচয় দিয়ে প্রকৃত মোমেনসুলভ ভূমিকা পালন না করে মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়, তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ!

ঈসা (আ.)-কে হত্যা করার জন্যে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র

এরপর হযরত ঈসা ও বনী ইসরাঈলের মধ্যকার বাদবাকী ঘটনা পরবর্তী আয়াতগুলোতে বর্ণনা করা হয়। (আয়াত ৫৪-৫৭)

ইহুদীরা আপন নবীদের ওপর ঈমান আনার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি করে তা ছিলো খুবই ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। তারা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটায়। এমনকি ইউসুফ নাজ্জার নামক এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে তার মহীয়সী সতী সাধ্বী মাতার বিরুদ্ধেও তারা অপবাদ রটনা করে। অথচ ইনজীলের বর্ণনা অনুসারে এই ব্যক্তি মারইয়ামকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলো বটে, কিন্তু তার সাথে তার কোনো সাক্ষাতই হয়নি। হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা ও জালিয়াতির অভিযোগ আনে এবং রোমান শাসক 'বিলটিস'-এর কাছে তার বিরুদ্ধে এই মর্মে মামলা দায়ের করে যে, তিনি জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানি দেন এবং তিনি নানা রকমের জালিয়াতী ও ম্যাজিক দ্বারা মানুষের আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করার কাজে লিপ্ত। কিন্তু বিলটিস পৌত্তলিক হয়েও একজন নিষ্পাপ মানুষকে তাদের প্ররোচনা অনুসারে শাস্তি দিতে সাহস করলেন না। তিনি বরং তারা নিজেরা স্বহস্তে তাকে শাস্তি দিক এই বলে তাকে তাদের হাতে সমর্পণ করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা ষড়যন্ত্র করলো। আল্লাহ তায়ালাও ফন্দি আটলেন, আর আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠ কৌশল অবলম্বনকারী।' (আয়াত ৫৪)

মূল আরবী শব্দ 'মাকরুণ' অর্থ ফন্দি করা ষড়যন্ত্র করা বা কৌশল করা। একই শব্দ দ্বারা আল্লাহর কৌশল ও তাদের কৌশলের উল্লেখ মূলত তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতি বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, আল্লাহর কৌশল আর আল্লাহর দুশমনের ষড়যন্ত্র মুখোমুখী হলে কোনটি জয়যুক্ত হতে পারে।

তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর আল্লাহ তায়ালা সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে নিজের সান্নিধ্যে তুলে নেবেন। এভাবে তিনি কাফেরদের ঘৃণ্য স্পর্শ থেকে তাকে পবিত্র রাখতে চাইলেন এবং তার অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন। চূড়ান্তভাবে আল্লাহর সিদ্ধান্তই কার্যকরী হলো। আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করলেন এবং কাফেরদের ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে ঈসা, আমি তোমাকে আমার কাছে নিয়ে নেবো, তুলে নেবো, কাফেদের কবল থেকে মুক্ত করবো এবং তোমার অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদর ওপর স্থান দেবো।'

আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তাকে তুলে নিয়েছিলেন এবং কিভাবে নিজের কাছে নিয়ে নিয়েছিলেন, এ সব 'মোতাশাবেহাত' তথা মানবীয় বুদ্ধির বাইরের বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃত রূপ আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানে না। আর এ নিয়ে আলোচনা করার মাঝে কোনো ফায়দাও নেই। যারা এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়, তারা এর মাধ্যমে মনেও কোনো শান্তি পায় না, কোনো সত্যের সন্ধানও পায় না। বরঞ্চ এতে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে যায়।

তবে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত কাফেরদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের ব্যাপারটা মোটেই দুর্বোধ্য বা জটিল নয়। আল্লাহর প্রকৃত দ্বীন ইসলামের বিশ্বাসীরাই হযরত ঈসা (আ.)-এর যথার্থ অনুসারী। কেননা প্রত্যেক নবী ছিলেন ইসলামেরই বার্তাবাহক। যারা ইসলামের অনুসারী আল্লাহর দাড়িপাল্লায় তারা কাফেরদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর দ্বীন সব সময় এক। হযরত ঈসা এবং তার পূর্বের ও পরের প্রত্যেক নবী ও রসূল ইসলামেরই নবী ও রসূল। আর যারা মোহাম্মদ (স.)-এর অনুসারী, তারা একই সাথে আদম (আ.) থেকে এ পর্যন্ত আগত সকল নবী ও রসূলের অনুসারী।

এর বক্তব্য এই সূরার বিষয়বস্তুর সাথেও সামঞ্জশীল, দ্বীনের প্রকৃত তাৎপর্যের সাথেও এটা মানানসই। আর কাফের ও মোমেনের শেষ পরিণতি কী সে কথা আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতের শেষাংশে এবং পরবর্তী ৫৬ ও ৫৭ নং আয়াতে বলেছেন,

'অতপর তোমাদের সকলকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। কাফেরদেরকে আমি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় কঠোর শাস্তি দেবো। কেউ তাদের সাহায্য করতে আসবে না। আর যারা মোমেন ও সৎকর্মশীল, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাদের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে ভালোবাসেন না।'

এখানে কর্মফলের কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার করা হবে, যাতে চুল পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব হবে না, কোনো মিথ্যা রটনা ও উচ্চাভিলাষ দ্বারা এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে না। আল্লাহর কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহ তায়ালা সকল বিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবেনই। কাফেররা দুনিয়া ও আখেরাতে কঠিন আযাব ভোগ করবেই, কেউ তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে না এবং সৎকর্মশীল মোমেনদেরকে তিনি পূর্ণমাত্রায় প্রতিদান দেবেন। তিনি যালেমদেরকে ভালোবাসেন না। যালেমদেরকে যখন ভালোবাসেন না তখন কর্মফল প্রদানে তিনি নিজে যুলুম করবেন এর প্রশ্নই ওঠে না।

আর আহলে কেতাবের লোকেরা যে সব লম্বা লম্বা বুলি আওড়ায় যে তাদের কয়েকদিনের জন্যে ছাড়া দোযখে যেতে হবে না এবং এর ভিত্তিতে আল্লাহর ন্যায় বিচারের ধারণাকে বিকৃত করে তারা যে সব বড় বড় আশার জাল, বোনে, তার সবই মিথ্যা, বাতিল ও ভিত্তিহীন।

কোরআনের বর্ণনা এই পর্যায়ে পৌঁছার পর যখন হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনা নিয়ে বিতর্ক

তীব্র আকার ধারণ করে, তখন এই ঘটনা সম্পর্কে এমনভাবে উপসংহার টানা হয় যে, তাতে এই কাহিনীর মূল শিক্ষাগুলো তুলে ধরে রসূল (স.)-কে এই বিতর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দিয়ে নিজের দাওয়াতের কাজে অবিচলভাবে নিয়োজিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (আয়াত ৫৮-৬৪)

এই উপসংহারে রসূল (স.)-এর ওপর নাযিল করা ওহীর সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'এই সকল নিদর্শন এবং বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আমি তোমাকে আবৃত্তি করে শুনাচ্ছি।'

অর্থাৎ যে কাহিনী বর্ণনা করা হলো, তা সহ সমগ্র কোরআনই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা ওহী যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর কাছে পাঠিয়েছেন। আয়াতের বর্ণনাভংগীতে সম্মান, ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতির ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাঁর নবীর কাছে আয়াত পাঠ করে শোনান, এর চেয়ে সম্মান ও ভালোবাসার নিদর্শন আর কী হতে পারে! কোরআনকে 'বিজ্ঞানময় গ্রন্থ' বলা হয়েছে এ জন্যে যে, এতে যেরূপ সর্বোচ্চ মানের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, মনমগজকে আকৃষ্ট করা, দখল করা এবং ও হৃদয়ে বদ্ধমূল করার ব্যাপারে এর বাচনশৈলীর অকল্পনীয় কৃতিত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে তার কোনো তুলনা নেই। অতপর ঈসা (আ.)-এর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা প্রসংগে আল্লাহর সৃষ্টি ও তার ইচ্ছার প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহর এই সৃষ্টিশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি অন্য সকল জিনিসের ন্যায় হযরত ঈসাকেও সৃষ্টি করেছে। (আয়াত ৫৯)

'আল্লাহর কাছে ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মতোই। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, অতপর বললেন, 'হও', অমনি তা হয়ে গেলো।'

প্রচলিত যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া দেখতে মানুষ অভ্যস্ত, তার আলোকে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম বিস্ময়কর বটে। তবে মানবজাতির পিতা হযরত আদমের সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে এতে বিস্ময়ের কী আছে? আহলে কেতাব গোষ্ঠী যদিও হযরত ঈসা (আ.)-এর বিনা পিতায় জন্ম গ্রহণের কারণে তাকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয় নানা রকমের অলীক কাহিনী রটিয়ে বেড়ায়, কিন্তু তারা হযরত আদমের জন্ম মাটি থেকে হওয়ার কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে। আল্লাহর আত্মা থেকে একটি 'ফুঁ' দ্বারা এই প্রথম মানবকে সৃষ্টি করা হয়। সে কথাও তারা অম্লান বদনে স্বীকার করে। হযরত ঈসাকে নিয়ে তারা যে সব গুজব রটায়, হযরত আদমকে নিয়ে তা কিন্তু রটায় না। আদম (আ.) সম্পর্কে একথাও তারা বলে না যে, তিনি ঐশ্বরিক স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী। অথচ আদম ও ঈসা উভয়েই বিনা পিতায় জন্মেছেন এবং উভয়েরই সৃষ্টির মূলে একই উপাদান সক্রিয়। সে উপাদান হলো আল্লাহর একটি 'ফুঁ'। আর তা 'হও' শব্দ উচ্চারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তাকে 'হও' বলেন, অমনি তা হয়ে যায়।

এভাবে হযরত ঈসা ও আদমের এবং গোটা সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির সহজ ও সাদামাঠা রহস্য উন্মোচিত হয়ে যায় এবং অতি সহজে ও অতি স্পষ্টভাবে অন্তরে বদ্ধমূল হয়। ফলে মানুষ এক সময় অবাক হয়ে ভাবতে থাকে যে, এ বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হলো কি করে? এটা তো আবহমানকাল ধরে প্রচলিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়া। বিশ্বের শাশ্বত সৃজন প্রক্রিয়া।

বিতর্ককারীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

এ হচ্ছে 'বিজ্ঞানময় গ্রন্থের' বর্ণনাভংগী। এ গ্রন্থ স্বাভাবিক ও সুস্থ স্বভাবের মানুষকে সাবলীল সাধাসিধে যুক্তির মাধ্যমে কঠিন বিষয়কেও সহজ করে বুঝিয়ে দেয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর বিষয়টি নিয়ে এ পর্যন্ত আলোচনা করার পর পরবর্তী আয়াতে (৬০ নং আয়াত) রসূল (স.)-কে সম্বোধন করে তাকে সত্যের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এই সাথে রসূল (স.) ও তাঁর সহচরদের মনে যাতে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের কারণে এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি না হয়, সে জন্যে সতর্ক করা হয়েছে।

'তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে এ বর্ণনা অকাট্য সত্য। তুমি সন্দেহকারীদের দলভুক্ত হয়ো না।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহীর ব্যাপারে রসূল (স.) কখনো সন্দেহকারী ছিলেন না। তথাপি এ সতর্কবাণী তাকে সত্যের ওপর বহাল রাখার পদক্ষেপ মাত্র। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর শত্রুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি ভয়ংকর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। এও বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক যুগেই মুসলমানরা তাদের শত্রুদের পক্ষ থেকে অভিনব ধরনের ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে থাকে এবং ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারকদের মোকাবেলায় মুসলমানদেরকে সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল থাকতে উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক।

যেহেতু এই পর্যায়ে এসে বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই আল্লাহ তায়ালা তার রসূল (স.)-কে এই বিতর্কের অবসান ঘটানো ও বিরোধী আহলে কেতাবকে 'মোবাহালায়' অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। (আয়াত ৬১)

'তোমার কাছে নিশ্চিত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাকে বলো, এসো আমরা উভয়পক্ষ আমাদের ছেলেমেয়ে ও আপন জনদেরকে ডেকে সমবেত করি। অতপর এইভাবে 'মোবাহালা' করি যে, মিথ্যাবাদীদের ওপর অভিশাপ পাঠাই।'

আল্লাহর এই নির্দেশ মোতাবেক রসূল (স.) তার বিতর্কের প্রতিপক্ষকে এই মর্মে দোয়া করার জন্যে এক জায়গায় সমবেত হবার আহবান জানিয়েছিলেন যে, দুই পক্ষের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, তার ওপর আল্লাহ তায়ালা যেন অভিশাপ বর্ষণ করেন। কিন্তু তারা অভিশাপের ভয়ে এই মোবাহালায় হাযির হয়নি। এতে বোঝা যায় যে, আপন জনগণের কাছে নিজেদের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হবে, বিশেষত গীর্জার যাজকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও উপঢৌকনাদিতে ভাটা পড়বে এমন আশংকায় তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা কোনোভাবেই যুক্তির অভাবের কারণে এরূপ করেনি; বরং নিছক স্বার্থ, লোভ ও প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনাই মানুষকে অকাট্য সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

পরবর্তী আয়াতগুলো সম্ভবত আহলে কেতাবভুক্ত বিবাদীদের 'মোবাহালা' থেকে পিছটান দেয়া ও ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করার পর নাযিল হয়। এতে মোবাহালার চ্যালেঞ্জের পর ওহীর পরিচয়, ওহীতে কেসসা-কাহিনী বর্ণনা করার তাৎপর্য এবং তাওহীদের তাৎপর্য বিশ্লেষণসহ সার্বিক পর্যালোচনা করা হয়। সেই সাথে যারা এ সত্য গ্রহণে বিমুখ হয়ে গোটা পরিবেশে অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়, তাদেরকে হুমকি দেয়া হয়েছে। (আয়াত ৬২-৬৩)

এ কয়টি আয়াতে যে তত্ত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে তার উল্লেখ ইতিপূর্বেও করা হয়েছে। তবে মোবাহালা থেকে বিরোধীতের পিছটান দেয়ার পর সেই সত্যগুলোর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু একটা নূতন কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো সত্য অস্বীকারকারী লোকদেরকে নৈরাজ্যবাদী বলে আখ্যায়িত করা এবং নৈরাজ্যবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞাত আছেন বলে হুঁশিয়ারী জ্ঞাপন করা।

মানুষ যেভাবে মানুষের ইলাহ হতে চেষ্টা করে

তাওহীদ তত্ত্বকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকারকারী লোকেরা পৃথিবীতে যে নৈরাজ্য বিস্তার করে তা এক মহা নৈরাজ্য। প্রকৃতপক্ষে এই তাওহীদ তত্ত্বকে স্বীকৃতি না দেয়া ব্যতীত পৃথিবীতে নৈরাজ্য দেখা দেয়ার আর কোনো কারণ নেই। মৌখিক স্বীকৃতির কথা বলছি না, অন্তরের নেতিবাচক স্বীকৃতিরও তেমন গুরুত্ব নেই। দু'ধরনের স্বীকৃতি মানব জীবনে কোনো বাস্তব প্রভাব বিস্তার করে না। প্রকৃতপক্ষে তাওহীদ তত্ত্ব ও মানব জীবনে তার সকল অনিবার্য ফলাফলের প্রতি স্বীকৃতি না দেয়াই নৈরাজ্যের আসল কারণ। তাওহীদ-তত্ত্বের প্রথম অনিবার্য ফল হলো এতো মানুষের একাধিক প্রভু আর থাকে না। প্রভু ও মনিব হয়ে যায় একজন। তাই সে দাসও হয় একজনের। আল্লাহ তায়ালা

ছাড়া আর কারো দাসত্ব থাকে না, আনুগত্য থাকে না এবং বিধি-বিধান গ্রহণের আর কোনো উৎসও থাকে না। দাসত্ব হয় শুধু আল্লাহর, আনুগত্য হয় শুধু আল্লাহর, অনুকরণ অনুসরণও হয় শুধু আল্লাহর। আইন কানুন, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও শিষ্টাচার এবং মানবজীবনের যে কোনো ব্যাপারে বিধি বিধান গ্রহণের একমাত্র উৎস মানতে হবে আল্লাহকে। নচেত তা হবে শেরেক অথবা কুফর, চাই মুখে ও মনে যতোই স্বীকৃতি ঘোষণা করা হোক, বাস্তব অর্থে তা সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো কার্যকর প্রভাব বিস্তার করে না।

একজন মাত্র সার্বভৌম মাবুদ ও শাসক না থাকলে বিশ্ব জাহানের শৃংখলা বজায় থাকতে পারে না। এ কথাই কোরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোনো মাবুদ থাকলে আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতো।' মানুষের ভেতরে খোদাসুলভ আচরনের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যা দেখা দেয় তা হলো মানুষ কর্তৃক মানুষের জন্যে আইন প্রণয়ন এবং তাদের জন্যে ন্যায়-অন্যায় ও ভালো মন্দের মানদন্ড নির্ধারণ। যে ব্যক্তি এই কয়টি কাজের কোনো একটি করার অধিকার নিজের জন্যে দাবী করে, সে খোদাসুলভ বৈশিষ্টের দাবীদার এবং সে নিজেকে আল্লাহর বিকল্প ইলাহ্ বা খোদা ঘোষণাকারী।

এভাবে পৃথিবীতে যখন একাধিক ইলাহের কর্তৃত্ব চলে, যখন মানুষ মানুষকে পরস্পরের মনিব ও দাস বানায়, যখন একজন বান্দা দাবী করে যে, সে মানুষের আনুগত্য লাভের অধিকারী মানুষের জন্যে আইন প্রণয়নের অধিকারী এবং মানুষের জন্যে ন্যায়-অন্যায় ও ভালো মন্দের মাপকাঠি নির্ণয়ের অধিকারী, তখন সে প্রকারান্তরে নিজেকে খোদা বলেই দাবী করে, যদিও সে ফেরাউনের মতো ঘোষণা না দেয় যে, 'আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভু' তবু সে আল্লাহর বিকল্প প্রভু হয়ে বসেছে বলে বুঝে নিতে হবে। এ ধরনের মানুষের কর্তৃত্ব মানা আল্লাহকে অস্বীকার করার শামিল। আর এটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে কুৎসিত ধরনের শেরক এবং নৈরাজ্য ও বিপর্যয়।

এ কারণেই উপরোক্ত হুমকি ও হুঁশিয়ারী উচ্চারণের পর আহলে কেতাবদের একটি সর্বসম্মত বাণী অর্থাৎ তাওহীদের বাণী গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। (আয়াত ৬৩)

'বলো, হে আহলে কেতাবরা! তোমরা আমাদের সর্বসম্মত একটি বাণীর দিকে এসো। সেটি এই যে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো এবাদাত করবো না, তার সাথে আর কাউকে শরীক করবো না, আর আমরা পরস্পরকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু বানিয়ে নেবো না।'

নিসন্দেহে এটি একটি ন্যায় সংগত দাওয়াত, এ দাওয়াত দ্বারা রসূল (স.) নিজে তার সহকর্মীদের নিয়ে সমাজের প্রভু বা কর্তা হতে চাননি। এটা একটা অভিন্ন ও সর্বসম্মত আহ্বান, যার সামনে সবাই এক কাতারে শামিল। কেউ কারো উর্ধে নয় এবং কেউ কারো মনিব নয়। এ আহ্বান গ্রহণ করতে অস্বীকার করা শুধু নৈরাজ্যবাদী ও সত্যদ্রোহীর পক্ষেই সম্ভব।

এ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করার দাওয়াত। আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করা চলবে না-মানুষকেও নয়, পাথরকেও নয়। কাউকে প্রভু বা ইলাহ্ বানানো যাবে না– নবী রসূলকেও নয়। কেননা, নবীরা সবাই আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে শুধু তাঁর দ্বীন প্রচার কার জন্যে মনোনীত করেছেন, তার সহ-ইলাহ বা সহ-রব হবার জন্যে নয়।

'এটা যদি তারা না মানে, তাহলে বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম'।

অর্থাৎ তারা যদি একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করতে এবং তাকেই একমাত্র প্রভু ও মনিব বলে মানতে সম্মত না হয়, তাহলে বলো যে, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম।

মুসলমানদের মধ্যেও পরস্পরকে আল্লাহকে বিকল্প মনিব হিসাবে গ্রহণকারীদের মধ্যে এই তুলনা সুস্পষ্টভাবে ও দ্ব্যর্থহীনবাবে ব্যক্ত করে, কারা প্রকৃত মুসলমান।

যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করে এবং যারা মানুষকে খোদার আসনে বসায় না, তারাই মুসলমান। এই বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দুনিয়ার সকল জাতি ও গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে এবং দুনিয়ার সকল জাতির জীবন যাপন পদ্ধতির মধ্য থেকে তাদের জীবন পদ্ধতির বিশিষ্টতা দান করে। এ বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে থাকলে তারা মুসলমান, নচেত তারা অমুসলিম, চাই তারা যতোই নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করুক না কেন। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য সবকিছুর দাসত্ব থেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত হওয়ার নাম। ইসলামী জীবনব্যবস্থা ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা এই স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়।

মানবরচিত সকল জীবন ব্যবস্থায় মানুষ মানুষকে খোদার আসনে বসায়। কোনো দেশে সর্বোচ্চ মানের গণতন্ত্র থাকুক অথবা নিম্নমানের স্বৈরতন্ত্র থাকুক, সর্বত্র এই একই অবস্থা। প্রভুত্ব ও খোদায়ীর সর্ব প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো মানুষকে গোলাম বানানোর অধিকার এবং মানুষের জন্যে আইন-কানুন, মূল্যবোধ ও মানদন্ড রচনার অধিকার। মানবরচিত সকল ব্যবস্থায় একটি মানব গোষ্ঠী কোনো না কোনো আকারে এই অধিকারের দাবীদার। এতে করে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। এই নির্দিষ্ট যে গোষ্ঠীটি বাদবাকী দেশবাসীর দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে তাদের জন্যে আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হয় পার্থিব খোদা। এভাবেই মানুষ মানুষকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু ও ইলাহ হওয়ার অধিকার দান করে। এভাবে দেশবাসী তাদের দাসত্ব করে, যদিও তারা তাদের জন্যে রুকু সেজদা করে না। বস্তুত দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়।

একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাধীনেই মানুষ এই গোলামী থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন হয়। স্বাধীন এই অর্থে যে, সে আইন-কানুন, আদর্শ, মূল্যবোধ ও মানদন্ড একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো মানুষের মতো সমমর্যাদা ভোগ করে। সবাই এক কাতারে অবস্থান করে, একই প্রভুর আদেশ পালন করে এবং কেউ কাউকে মনিব বলে মানে না।

এই অর্থেই ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন। দুনিয়ার সকল নবী ও রসূল এই ইসলাম নিয়েই এসেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে নিজের দাসত্বের অধীন করার জন্যে এবং সকল যুলুম থেকে মুক্ত করে আল্লাহর ন্যায় বিচারের নীচে আশ্রয় দানের জন্যে নবীদেরকে ইসলামী বিধান সহকারে পাঠিয়েছেন। যারা তা অগ্রাহ্য করে, তারা মুসলমান নয়, তা যে যতোই সাফাই গেয়ে নিজেকে মুসলমান প্রমাণ করার চেষ্টা করুক না কেন। কেননা, আল্লাহর কাছে ইসলামই একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান।

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ
ٱلتَّوۡرَىٰةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴿٦٥﴾ هَٰٓأَنتُمۡ
هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجۡتُمۡ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا
لَيۡسَ لَكُم بِهِۦ عِلۡمٞۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا
كَانَ إِبۡرَٰهِيمُ يَهُودِيّٗا وَلَا نَصۡرَانِيّٗا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفٗا
مُّسۡلِمٗا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّ أَوۡلَى ٱلنَّاسِ
بِإِبۡرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۗ
وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٨﴾ وَدَّت طَّآئِفَةٞ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَوۡ
يُضِلُّونَكُمۡ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَٰٓأَهۡلَ

৬৫. (তুমি আরো বলো,) হে কিতাবধারীরা, তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে (আমাদের সাথে অযথা) কেন তর্ক করো, অথচ (তোমরা জানো) তাওরাত ও ইনজীল তার (অনেক) পরে নাযিল করা হয়েছে; তোমরা কি (এ কথা) বুঝতে পারছো না? ৬৬. হ্যাঁ, এর কয়েকটি বিষয়ে তোমাদের (হয়তো) কিছু কিছু জানাশোনা ছিলো এবং সে বিষয়ে তো তোমরা তর্ক বিতর্কও করলে, কিন্তু যেসব বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞানই নেই সেসব বিষয়ে তোমরা বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছো কেন? আল্লাহ তায়ালাই (সব কিছু) জানেন, তোমরা কিছুই জানো না, ৬৭. (সঠিক ঘটনা হচ্ছে,) ইবরাহীম না ছিলো ইহুদী–না ছিলো খৃস্টান; বরং সে ছিলো একজন একনিষ্ঠ মুসলিম; সে কখনো মোশরেকদের দলভুক্ত ছিলো না। ৬৮. মানুষদের ভেতর ইবরাহীমের সাথে (ঘনিষ্ঠতম) সম্পর্কের বেশী অধিকার তো আছে সেসব লোকের, যারা তার অনুসরণ করেছে, এ নবী ও (তার ওপর) ঈমান আনয়নকারীরাই (হচ্ছে) ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা একমাত্র তাদেরই সাহায্যকারী (পৃষ্ঠপোষক) যারা তাঁর ওপর ঈমান আনে। ৬৯. এ কিতাবধারীদের একটি দল (বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে) তোমাদের কোনো না কোনোভাবে পথভ্রষ্ট করে দিতে চায়; যদিও তাদের এ বোধটুকু নেই যে, (তাদের এসব কর্মপন্থা) তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। ৭০. হে কিতাবধারীরা, তোমরা (জেনে বুঝে) কেন

الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ۝٧٠ يٰاَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝٧١ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا
بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا
اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٧٢ وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ط
قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ لا اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ
اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ط قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اللّٰهِ ج يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝٧٣ يَّخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٧٤

আল্লাহর আয়াত (ও তাঁর বিধান) অস্বীকার করছো, অথচ (এই ঘটনাসমূহের সত্যতার) সাক্ষ্য তো তোমরা নিজেরাই বহন করছো। ৭১. হে কিতাবধারীরা, কেন তোমরা 'হক'-কে বাতিলের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছো, (এতে করে) তোমরা তো সত্যকেই গোপন করে দিচ্ছো, অথচ (এটা যে সত্যের একান্ত পরিপন্থী) তা তোমরা ভালো করেই জানো।

রুকু ৮

৭২. আহলে কিতাবদের (মধ্য থেকে) একদল (নির্বোধ) তাদের নিজেদের লোকদের বলে, মুসলমানদের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা সকাল বেলায় তার ওপর ঈমান আনো এবং বিকেল বেলায় (গিয়ে) তা অস্বীকার করো, (এর ফলে) তারা সম্ভবত (ঈমান থেকে) ফিরে আসবে। ৭৩. যারা তোমাদের জীবন বিধানের অনুসরণ করে, এমন সব লোকজন ছাড়া অন্য কারো কথাই তোমরা মেনে নিয়ো না; (হে নবী,) তুমি বলে দাও, একমাত্র হেদায়াত হচ্ছে আল্লাহর হেদায়াত (তোমরা একথা মনে করো না যে), তোমাদের যে ধরনের (ব্যবস্থা) দেয়া হয়েছে তেমন ধরনের কিছু অন্য কাউকেও দেয়া হবে এবং (সে সূত্র ধরে) অন্য লোকেরা তোমাদের মালিকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম যুক্তিতর্ক খাড়া করবে, (হে নবী); তুমি তাদের বলে দাও, (হেদায়াতের এ) অনুগ্রহ অবশ্যই আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা দান করেন; আল্লাহ তায়ালা বিশাল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন। ৭৪. নিজের দয়া দিয়ে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই (হেদায়াতের জন্যে) খাস করে নেন; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন অসীম দয়া ও অনুগ্রহের মালিক।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ ۚ

وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ

عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ

سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ بَلٰى

مَنْ أَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَإِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ

الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولٰٓئِكَ

لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ

إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ

مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ

৭৫. আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোকও আছে, তুমি যদি তার কাছে ধন সম্পদের এক স্তূপও আমানত রাখো, সে (চাওয়ামাত্রই) তা তোমাকে ফেরত দেবে, আবার এদের মধ্যে এমন কিছু (লোকও) আছে যার কাছে যদি একটি দীনারও তুমি রাখো, সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না, হ্যাঁ, যদি (এ জন্যে) তুমি তার ওপর চেপে বসতে পারো তাহলে (সেটা ভিন্ন), এটা এই কারণে যে, এরা বলে, এই (অ-ইহুদী) অশিক্ষিত লোকদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, (এভাবেই) এরা বুঝে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে। ৭৬. অবশ্য যে ব্যক্তি (আল্লাহর সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলে এবং (সে ব্যাপারে) সাবধানতা অবলম্বন করে, (তাদের জন্যে সুখবর হচ্ছে) আল্লাহ তায়ালা সাবধানী লোকদের খুব ভালোবাসেন। ৭৭. (যারা নিজেদের আল্লাহর সাথে সম্পাদিত) প্রতিশ্রুতি ও শপথসমূহ সামান্য (বৈষয়িক) মূল্যে বিক্রি করে দেয়, পরকালে তাদের জন্যে (আল্লাহর পুরস্কারের) কোনো অংশই থাকবে না, সেদিন এদের সাথে আল্লাহ তায়ালা কোনো কথাবার্তা বলবেন না, (এমনকি সেদিন) আল্লাহ তায়ালা তাদের দিকে তাকিয়েও দেখবেন না এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের পাক পবিত্রও করবেন না, (সত্যিই) এদের জন্যে রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আযাব। ৭৮. এদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে, যারা কিতাবের কোনো অংশ যখন পড়ে তখন নিজেদের

الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ

وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ

تَدْرُسُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ

اَرْبَابًا ۗ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَاِذْ اَخَذَ

اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ

جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۗ

জিহ্বাকে এমনভাবে এদিক-সেদিক করে নেয়, যাতে তোমরা মনে করতে পারো যে, সত্যি বুঝি তা কেতাবের কোনো অংশ, কিন্তু (আসলে) তা কেতাবের কোনো অংশই নয়, তারা আরো বলে, এটা আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে, কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে আসা কিছু নয়, এরা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা কথা বলে চলেছে। ৭৯. কোনো মানব সন্তানের পক্ষেই এটা (সম্ভব) নয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওত দান করবেন, অতপর সে লোকদের (ডেকে) বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে (এখন) সবাই আমার বান্দা হয়ে যাও, বরং সে (তো নবুওতপ্রাপ্তির পর এ কথাই) বলবে, তোমরা সবাই তোমাদের মালিকের বান্দা হয়ে যাও, এটা এই কারণে যে, তোমরাই মানুষদের (এই) কিতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও (তাই) অধ্যয়ন করছিলে। ৮০. আল্লাহর ফেরেশতা ও তাঁর নবীদের প্রতিপালকরূপে স্বীকার করে নিতে এ ব্যক্তি তোমাদের কখনো আদেশ দেবে না; একবার আল্লাহর অনুগত মুসলমান হবার পর সে কিভাবে তোমাদের পুনরায় কুফরীর আদেশ দিতে পারে?

রুকু ৯

৮১. আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁর নবীদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন (তখন তিনি বলেছিলেন, এ হচ্ছে) কিতাব ও (তার ব্যবহারিক) জ্ঞান কৌশল, যা আমি তোমাদের দান করলাম, অতপর তোমাদের কাছে যখন (আমার কোনো) রসূল আসবে, যে তোমাদের কাছে রক্ষিত (আগের) কিতাবের সত্যায়ন করবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার (আনীত

قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ

قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ

ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ

أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ

مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا

فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ

বিধানের) ওপর ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে; আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি এ (কথার) ওপর এ অংগীকার গ্রহণ করছো? তারা বললো, হ্যাঁ আমরা (মেনে চলার) অংগীকার করছি; আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থেকো এবং আমিও তোমাদের সাথে (এ অংগীকারে) সাক্ষী হয়ে রইলাম। ৮২. অতপর যারা তা ভংগ করে (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, তারা অবশ্যই বিদ্রোহী (বলে পরিগণিত) হবে। ৮৩. তারা কি আল্লাহর (দেয়া জীবন) ব্যবস্থার বদলে অন্য কোনো বিধানের সন্ধান করছে? অথচ আসমান যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, আল্লাহ তায়ালার (বিধানের) সামনে আত্মসমর্পণ করে আছে এবং প্রত্যেককে তো তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। ৮৪. (হে নবী,) তুমি বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, ঈমান এনেছি আমাদের ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তার ওপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের অন্যান্য বংশধরদের প্রতি যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার ওপরও (আমরা ঈমান এনেছি), আমরা আরো ঈমান এনেছি, মূসা, ঈসা এবং অন্য নবীদের তাদের মালিকের পক্ষ থেকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তার ওপরও, (আল্লাহর) এ নবীদের কারো মাঝেই আমরা কোনো ধরনের তারতম্য করি না, (মূলত) আমরা সবাই হচ্ছি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান)। ৮৫. যদি কেউ ইসলাম ছাড়া (নিজের জন্যে) অন্য কোনো জীবন বিধান অনুসন্ধান করে তবে তার কাছ থেকে সে (উদ্ভাবিত) ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না, পরকালে সে চরম ব্যর্থ হবে। ৮৬. (বলো,) যারা

يَهۡدِى اللّٰهُ قَوۡمًا كَفَرُوۡا بَعۡدَ اِيۡمَانِهِمۡ وَشَهِدُوۡۤا اَنَّ الرَّسُوۡلَ
حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الۡبَيِّنٰتُ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهۡدِى الۡقَوۡمَ الظّٰلِمِيۡنَ ﴿۸۶﴾
اُولٰٓـئِكَ جَزَآؤُهُمۡ اَنَّ عَلَيۡهِمۡ لَعۡنَةَ اللّٰهِ وَالۡمَلٰٓـئِكَةِ وَالنَّاسِ
اَجۡمَعِيۡنَۙ ﴿۸۷﴾ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنۡهُمُ الۡعَذَابُ وَلَا هُمۡ
يُنۡظَرُوۡنَۙ ﴿۸۸﴾ اِلَّا الَّذِيۡنَ تَابُوۡا مِنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِكَ وَاَصۡلَحُوۡا ۗ
فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ﴿۸۹﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بَعۡدَ اِيۡمَانِهِمۡ
ثُمَّ ازۡدَادُوۡا كُفۡرًا لَّنۡ تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ ۚ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ
الضَّآلُّوۡنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا وَمَاتُوۡا وَهُمۡ كُفَّارٌ فَلَنۡ يُّقۡبَلَ
مِنۡ اَحَدِهِمۡ مِّلۡءُ الۡاَرۡضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افۡتَدٰى بِهٖ ؕ اُولٰٓـئِكَ

ঈমানের (আলো পাওয়ার) পর কুফরী করেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কিভাবে (আবার আলোর) পথ প্রদর্শন করবেন, অথচ (এর আগে) এরাই সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল সত্য এবং (এ রসূলের মাধ্যমেই) এদের কাছে উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ এসেছিলো; (আসলে) আল্লাহ তায়ালা কখনো সীমালংঘনকারী ব্যক্তিদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না। ৮৭. এসব (সীমালংঘনজনিত) কার্যকলাপের একমাত্র প্রতিদান হিসেবে তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা, তাঁর ফেরেশতা ও অন্য সব মানুষের অভিশাপ (বর্ষিত হবে)। ৮৮. (সে অভিশপ্ত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম,) সেখানে তারা অনাদিকাল ধরে পড়ে থাকবে, (এক মুহূর্তের জন্যেও) তাদের ওপর শাস্তির মাত্রা কমানো হবে না, না আযাব থেকে তাদের (একটুখানি) বিরাম দেয়া হবে! ৮৯. (তবে) তাদের কথা আলাদা, যারা (এসব কিছুর পর) তাওবা করেছে এবং (তারপর) নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৯০. কিন্তু যারা একবার ঈমান আনার পর কুফরীর (পথ) অবলম্বন করেছে, অতপর তারা এই বেঈমানী (কার্যকলাপ) দিন দিন বাড়াতেই থেকেছে, (আল্লাহর দরবারে) তাদের তাওবা কখনো কবুল হবে না, কারণ এ ধরনের লোকেরাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট। ৯১. (এটা সুনিশ্চিত,) যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে এবং কুফরী অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়েছে, তারা যদি নিজেদের (আল্লাহর আযাব থেকে) বাঁচানোর জন্যে এক পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসেবে খরচ করে, তবু তাদের কারো কাছ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرِينَ ﴿٩١﴾ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

থেকে তা গ্রহণ করা হবে না; বস্তুত এরাই হচ্ছে সে সব (হতভাগ্য) ব্যক্তি যাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ আযাব, আর সেদিন তাদের কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।

রুকু ১০

৯২. তোমরা কখনো (যথার্থ) নেকী অর্জন করতে পারবে না, যতোক্ষণ না তোমরা তোমাদের ভালোবাসার জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করবে; (মূলত) তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো, আল্লাহ তায়ালা তা জানেন।

তাফসীর

আয়াত ৬৫-৯২

সূরার পূর্ববর্তী অংশ, যা ৩৩ থেকে ৬৪ নং আয়াত পর্যন্ত বিস্তৃত, তার বিষয়বস্তু এবং বর্তমান অংশটির বিষয়বস্তু অনেকাংশে এক রকম। যেমন, আহলে কেতাব ও মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত ও আদর্শিক লড়াই, ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র, ধোকাবাজী ও মিথ্যাচার। সত্য ও বাতিলের জোড়াতালি ও জগাখিচুরি করার ফন্দি, সন্দেহ-সংশয় বিস্তারের অপচেষ্টা এবং অব্যাহতভাবে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা। অতপর এসবের প্রতিরোধের নিমিত্ত কোরআনের কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন, মোমেনরা যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে সে সম্পর্কে তাদেরকে নিশ্চিত করা ও তাদের শত্রুরা যে বাতিলের ওপর আছে, সে সম্পর্কে তাদেরকে পুনরায় সতর্ক করা। তারা মোমেনদের বিরুদ্ধে যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা এবং সর্বশেষে মুসলমানদের কাছে তাদের শত্রুদের মুখোশ উন্মোচনের জন্যে তাদের স্বভাব, চরিত্র-কর্ম ও মানসিকতা ব্যাখ্যা করা। তারা যে সব জ্ঞান ও পান্ডিত্য জাহির করে তারও স্বরূপ উন্মোচন করার মাধ্যমে মুসলমানদের যারা তাদের ওপর আস্থা রাখতো তা নষ্ট করা, সর্বোপরি তাদের প্রতি একটা ঘৃণা সৃষ্টি করার সাথে সাথে তাদের দুরভিসন্ধিগুলো উন্মোচন করে দিয়ে তাদের ধোকা ও প্রতারণা থেকে মুসলমানদের নিরাপদ করা।

শুরুতেই ইহুদী ও খৃষ্টানদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা হযরত ইবরাহীমকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত ছিলো। ইহুদীরা বলতো, তিনি ইহুদী ছিলেন, খৃষ্টানরা বলতো, তিনি খৃষ্টান ছিলেন। তাদের এই দু'টো মতকেই অযৌক্তিক বলে খন্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের সাথে তার কিসের সম্পর্ক? তিনি তো ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের জন্মেরও আগে, এমনকি তাওরাত, ইনজীলেরও নাযিল হওয়ার আগে এসেছিলেন, তাকে নিয়ে এই বিতর্কের কোনো ভিত্তি ও যুক্তি নেই। ইবরাহীমের প্রকৃত আদর্শ কী ছিলো তা জানিয়ে বলা হয়েছে যে, তার আদর্শ ছিলো আল্লাহর শাশ্বত জীবনব্যবস্থা ইসলাম। হযরত ইবরাহীমের অনুসারীরাও ছিলো মুসলিম। সকল মোমেনের বন্ধু ও অভিভাবক আল্লাহ তায়ালা। কাজেই উভয় পক্ষের দাবী বাতিল হয়ে গেলো।

আর সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল নবী রসূল ও মোমেন মুসলমানের অভিন্ন বন্ধন হলো ইসলামের বন্ধন। এ কথাই বলা হয়েছে এই আয়াতে, 'ইবরাহীমের সবচেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে তার অনুসারীরা, এই নবী এবং তার প্রতি ঈমান আনয়নকারীরা।'

এরপর ইবরাহীম ও অন্যদেরকে নিয়ে আহলে কেতাবদের বিতর্কের আসল উদ্দেশ্য কী, তা উন্মোচন প্রসংগে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসে সংশয় সৃষ্টি করার দুরভিসন্ধি নিয়েই এই বিতর্ক করা হয়। এ জন্যে বিপথগামী করার চেষ্টায় নিয়োজিত এই গোষ্ঠীকে সরাসরি সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'হে আহলে কেতাব! কি কারণে তোমরা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করো? অথচ তোমরা সাক্ষী আছো, (যে, এগুলোই সত্য।) হে আহলে কেতাব! তোমরা কেন জেনেশুনে সত্যকে মিথ্যার পোশাক পরাও এবং সত্যকে গোপন করো?'

অতপর মোমেনদেরকে তাদের শত্রুদের একটি কুটিল দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো অত্যন্ত নোংরা ধোকাবাজীর মাধ্যমে তাদের দ্বীনের প্রতি আস্থা শিথিল করা। এই দুরভিসন্ধিটি ছিলো এই যে, দিনের প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়া হবে। অতপর একই দিনের শেষ ভাগে তা পরিত্যাগ করা হবে। এভাবে দুর্বল বিশ্বাসী মুসলমানদের মনে সংশয় সৃষ্টি করা যাবে যে, রসূলরাও আসমানী কেতাব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এই আহলে কেতাব যখন ইসলাম গ্রহণ করে আবার ত্যাগ করেছে তখন নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে। জানা কথা যে, এ ধরনের দুর্বল বিশ্বাসী সব সমাজেই থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আহলে কেতাবের একটি দল বললো যে, মোমেনদের ওপর অবতীর্ণ কেতাবের ওপর দিনের প্রথমভাগে ঈমান আনো ও শেষভাগে তা ত্যাগ করো, হয়তো এতে মোনেনরা তাদের বিশ্বাস থেকে ফিরে আসবে। বস্তুত এটি ছিলো একটি জঘন্য ও নোংরা ষড়যন্ত্র।

এরপর আহলে কেতাব গোষ্ঠীর স্বভাব ও চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়েছে এবং ওয়াদা পালনে ও আমানতদারীতে তারা কিরূপ তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে আমানতদারীতে পাকা, কিন্তু অধিকাংশই ওয়াদাপালন, আমানতদারী ও দায়িত্বশীলতার ধারই ধারে না। তারা তাদের দায়িত্বহীনতা, খেয়ানত ও ওয়াদাখেলাপীর পক্ষে বড় বড় বুলি আওড়ায় ও ধর্মীয় যুক্তি প্রদর্শন করে। অথচ তাদের ধর্মে এ ধরনের চরিত্রের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। বলা হয়েছে, আহলে কেতাবের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যে, তুমি যদি তার কাছে বিপুল সম্পদও গচ্ছিত রাখো, তবে সে তা ফেরত দেবে, আর কেউ কেউ এমনও আছে যে, তার কাছে এক দীনার গচ্ছিত রাখলেও তা সে ফেরত দেবে না।'...এ প্রসংগে পরবর্তী আয়াতে ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা হয়েছে, যার চালিকাশক্তি ও উৎস হচ্ছে আল্লাহর ভীতি, হাঁ, যে ব্যক্তি ওয়াদা পূরণ করে ও আল্লাহকে ভয় করে, সেই সব আল্লাহভীরুকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। ....

এরপর আহলে কেতাবের আরেকটি চারিত্রিক ভ্রষ্টতা ও ধর্মের ব্যাপারে তাদের সস্তা মিথ্যাচারের নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, যা তারা করে নিছক স্বার্থের মোহেই করে থাকে।

'আহলে কেতাবের মধ্যে একটি গোষ্ঠী এমনও আছে যারা মুখ বিকৃত করে কেতাব পড়ে, যাতে তোমরা মনে করো সে যা উচ্চারণ করেছে তা কেতাবের অন্তর্ভুক্ত অথচ তা কেতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।' তারা বলে, 'ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি। তারা জেনে শুনে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যাচার করে।'

তাদের মুখ বিকৃত করে আওড়ানো এ সব কথার মধ্যে হযরত ঈসার ইলাহ হওয়া সংক্রান্ত মিথ্যা প্রচারণাও থাকতো। অথচ আল্লাহ তায়ালা এমন কথা তাদের কেতাবে নাযিল করেননি বা এমন নির্দেশ দেননি বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন। 'কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কেতাব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও নবুওত দেবেন, আর সে পরক্ষণেই মানুষকে বলবে, তোমরা সবাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমার গোলাম হয়ে যাও।' নবী রসূলরা

একথাই বলেন যে, তোমরা আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে যাও। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা ও নবীদেরকে মাবুদ বানানোর জন্যে তোমাদেরকে আদেশ দেন না। তোমরা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কাফের হবার নির্দেশ দেবেন?'

এই প্রসংগে ধারাবাহিকভাবে আগত নবীদের মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্ক ও তাদের ঐক্যের বন্ধন বর্ণনা করে বলা হয়েছে প্রত্যেক নবী তার পরবর্তী নবীকে ও সাহায্য করবেন।

'স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তায়ালা নবীদের কাছ থেকে অংগীকার নিলেন যে, তোমাদের আমি যে কেতাব ও হেকমত দান করেছি, তারপর যদি কোনো রসূল তোমাদের আনীত বিধানের সমর্থক হয়ে আসে, তবে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবেই এবং তাকে সাহায্য করবেই। তিনি বললেন, তোমরা কি অংগীকার করলে এবং স্বীকার করলে? তারা বললো, হাঁ, আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমিও সাক্ষী থাকলাম।'

এ কারণেই আহলে কেতাবের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় শেষ নবীর ওপর ঈমান আনা ও তাকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করা। কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে করা এই অংগীকার রক্ষা করলো না।

এই অংগীকারের আলোকে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থার সন্ধান করে, সে আসলে গোটা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে।

'তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুর অন্বেষণ করে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহর কাছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।'

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে না সৃষ্টিজগতে তারা বিদ্রোহী ও সংখ্যালঘু রূপে চিহ্নিত হয়।

এই পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.) ও অন্যান্য মোমেনদেরকে আল্লাহর এই দ্বীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের তাগিদ দিয়েছেন, যা সকল নবীর দ্বীন ছিলো, আর এও বলে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের কাছ থেকে ইসলাম ছাড়া আর কোনো জীবনব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন না।

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থা অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না।'

যারা এই দ্বীনকে গ্রহণ করে না তাদের দুনিয়ায় সুপথপ্রাপ্তি কিংবা আখেরাতে মুক্তিলাভের কোনো উপায় নেই। আল্লাহর দ্বীনের অনুসারী না হয়ে যারা মারা যাবে, তারা যদি পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণও দেয় তবু তারা মুক্তি পাবে না। আর আল্লাহর পথে দান প্রসংগে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে নিজের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস দান করা মোমেনের কর্তব্য।

এভাবে সূরার আলোচ্য অংশটির সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা হলো। এর সারকথা হলো, ইসলামের শত্রুদের সাথে মুসলমানদের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও যুদ্ধ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত নির্দেশাবলী বর্ণনা করা। এবার আমরা এই অধ্যায়ের বিস্তারিত তাফসীর আলোচনা করবো।

মিল্লাতে ইবরাহীম ও মুসলিম ঐক্য

৬৫, ৬৬, ৬৭ ও ৬৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে আহলে কেতাব! কি কারণে তোমরা ইবরাহীমকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছ? অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বন্ধু।'....

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, নাজরানের খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্মযাজকরা রসূল (স.)-এর কাছে এসে এই বলে তর্ক জুড়ে দিলো যে, হযরত ইবরাহীম ইহুদী ছাড়া আর কিছু ছিলেন না, আর খৃষ্টানরা বললো, হযরত ইবরাহীম খৃষ্টান ছাড়া আর কিছু ছিলেন না। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন, 'হে আহলে কেতাব! কি কারণে তোমরা ইবরাহীমকে নিয়ে তর্কে লিপ্ত হচ্ছো?'

এ ঘটনা আয়াতটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষে হোক বা না হোক এর বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, এটি আহলে কেতাব গোষ্ঠীর অসত্য দাবিসমূহ এবং রসূল (স.)-এর সাথে তাদের বিতর্ক অথবা রসূল (স.)-এর উপস্থিতিতে তাদের পরস্পরের বিতর্ক খন্ডন করার জন্যে নাযিল হয়েছে। তাদের এই বিতর্কের উদ্দেশ্য ছিলো, আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরের মধ্যে নবুওত চালু রাখবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার আলোকে নিজেদেরকে নবুওতের উত্তরাধিকারী বলে প্রমাণিত করার চেষ্টা করা। শুধু তাই নয়, তারা এ দ্বারা মোহাম্মদ (স.)-এর এই দাবীও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলো যে, তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা ইবরাহীম (আ.)-এর আনীত দ্বীনের অনুসারী এবং উত্তরাধিকারী। তারা চেয়েছিলো মুসলমানদের সকলকে না হোক, অন্তত কতককে এ ব্যাপারে গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে দিতে।

এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এমন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন এবং তাদের যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন বিতর্কের অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন তাওরাত ও ইনজীল উভয় কেতাব নাযিল হওয়ার পূর্বেকার নবী, তখন তার ইহুদী বা খৃষ্টান হওয়া কিভাবে সম্ভব? এটা একেবারেই অযৌক্তিক দাবী। এর অযৌক্তিকতা কেবল ইতিহাসের পাতায় একবার নযর বুলালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই ৬৫ নং আয়াত আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হে আহলে কেতাব! কি কারণে তোমরা ইবরাহীম (আ.)-কে নিয়ে তর্কে লিপ্ত হচ্ছ?'

৬৬ নং আয়াতে তাদেরই সমালোচনা অব্যাহত রেখে বলা হয়েছে যে, তারা এমন গোঁয়ার যে, কোনো সুষ্ঠু যুক্তি ভিত্তিক বিতর্কের ওপর তাদের আস্থাও নেই। আয়াতটি লক্ষণীয়,

'তোমরা যা জানো তা নিয়ে– না হয় তর্ক করো। কিন্তু যা জানো না তা নিয়ে তর্ক করো কেন? আসলে আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু জানেন, তোমরা কিছুই জানো না।'

আহলে কেতাবরা ইতিপূর্বে হযরত ঈসা (আ.)-কে নিয়ে তর্ক করেছে। তাছাড়া তাদেরকে যখন আল্লাহর কেতাবের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, তখন তারা তা নিয়েও বিতর্কে লিপ্ত হয়ে সে আহ্বানও উপেক্ষা করেছে। এসব বিষয় তো তাদের মোটামুটি জানাশোনার আওতাভুক্ত ছিলো। কিন্তু যে জিনিস তাদের জন্মেরও আগের ব্যাপার এবং তাদের আসমানী কেতাব নাযিল হওয়ারও আগের ঘটনা, তা নিয়ে তারা যদি তর্ক করে, তবে তার পক্ষে কোনো যুক্তিপ্রমাণ থাকতে পারে না। এমনকি তার কোনো দৃশ্যমান প্রমাণও থাকার কথা নয়। কাজেই এটা কেবল তর্কের খাতিরেই তর্ক। এ তর্কের পেছনে কোনো নীতির বালাই নেই। এ ধরনের তর্কে যে ব্যক্তি লিপ্ত হয়, তার কথায় আদৌ কর্ণপাত করা চলে না।

এভাবে তাদের বক্তব্যকে মূল্যহীন আখ্যা দেয়ার পর ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নিজেই প্রকৃত সত্য তুলে ধরছেন। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কী ছিলেন এবং তার ধর্ম কেমন ছিলো, সে কথা আল্লাহ তায়ালাই নির্ভুলভাবে জানেন। সেই সুদূর অতীতের ইতিহাস তিনি ছাড়া আর কে জানবে? কাজেই এ ব্যাপারে তাঁর কথাই চূড়ান্ত সত্য। অবশ্য কেউবিনা যুক্তিতে তর্ক করতে চাইলে এই অকাট্য সত্য নিয়েও করতে পারে বই কি!

'ইবরাহীম ইহুদীও ছিলো না, খৃষ্টানও ছিলো না, সে ছিলো একনিষ্ঠ মুসলিম, সে মোশরেকও ছিলো না।'

ইতিপূর্বের আয়াতে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি ইহুদী ছিলেন না, খৃষ্টানও ছিলেন না। বরং তাওরাত ও ইনজীল তো তার পরেই নাযিল হয়েছে। এ আয়াতে সেই সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে। এখানে একথাও জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, ইবরাহীম ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম থেকে বিমুখ এবং একনিষ্ঠ মুসলমানই ছিলেন। ইসলামের যে ব্যাপক অর্থ ইতিপূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে, সেই অনুসারেই তিনি পরিপূর্ণ মুসলমান ছিলেন।

'আর সে মোশরেক ছিলো না।' এ কথাটাও ইতিপূর্বে 'একনিষ্ঠ মুসলমান' কথাটার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে এটি সুষ্ঠ করে বলার উদ্দেশ্য হলো কয়েটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে ইংগীত করা।

প্রথমত, ইহুদী ও খৃষ্টানরা বিকৃত আকীদা-বিশ্বাস পোষণের কারণে মোশরেকে পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই ইবরাহীম (আ.) ইহুদী বা খৃষ্টান নন, বরং তিনি ছিলেন একত্ববাদী মুসলিম।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম ও শেরেক সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস। এ দু'টো একত্রিত হতে পারে না। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ তাওহীদ এবং এই তাওহীদের সকল দাবী ও বৈশিষ্ট্য তার আওতাভুক্ত। তাই তা কোনো ধরনের শেরেকের সাথে জড়িত নয়।

তৃতীয়ত, মোশরেক কোরায়শ গোত্রও দাবী করতো যে, তারা হযরত ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী এবং তার গড়া কাবার মোতাওয়াল্লী। এই দাবী এখানে খন্ডন করা হচ্ছে, কেননা তিনি ছিলেন একত্ববাদী মুসলিম। আর ওরা হচ্ছে মোশরেক।

আর যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ.) একত্ববাদী মুসলমান ছিলেন, মোশরেক ছিলেন না, তাই ইহুদী-খৃষ্টান ও মোশরেকের তার উত্তরাধিকারী হওয়ার কোনো উপায় নেই। কেননা, তারা তার আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে অবস্থিত। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে মানুষের ঐক্য ও মিলনের প্রথম বন্ধন। কোনো বংশ-জাতি ও ভূখন্ড তার ঐক্যের বন্ধন হতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ তার আত্মার ভিত্তিতেই মানুষ। আল্লাহর যে ফুৎকার দ্বারা মানুষ তৈরী হয়েছে তারই ভিত্তিতে মানুষের আত্মা তৈরী হয়েছে। তাই এই আত্মার সর্ব প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, আকীদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সে ঐক্যবদ্ধ হয়। ভূমি, মাঠ, ঘাস, সীমা ইত্যাদি যার ওপর ভিত্তি করে পশু পাখি ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। মানুষ এ ধরনের জিনিসের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয় না। জাতি জাতিতে ও প্রজন্মে প্রজন্মে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে গেলেও আকীদা ও আদর্শ ছাড়া আর কোনো কিছুর ভিত্তিতে স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে না। আদর্শের বন্ধনেই মোমেনরা জাতিগত ও জন্মগতভাবে সময় ও কালের ব্যবধান পেরিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে। আদর্শের বন্ধনই তাদেরকে রক্ত, বর্ণ বংশ, সবকিছু অতিক্রম করে আপনজন হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালাই হন তাদের সকলের বন্ধু। আল্লাহর আনুগত্য তাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করে।

একথাই বলা হয়েছে ৬৮ নং আয়াতে। যথা, 'ইবরাহীমের বন্ধু হিসাবে তারাই সবচেয়ে উপযোগী যারা তার অনুসারী, এই নবী এবং যারা তার ওপর ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বন্ধু।'

বস্তুত যারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জীবদ্দশায় তার অনুসারী ছিলো এবং তার আনীত জীবনবিধান মেনে চলতো, তারাই তার বন্ধু ও আপন জন। তারপরই এই নবী মোহাম্মদ (স.)-এর স্থান, যিনি সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী সাক্ষী এবং আল্লাহর সাক্ষ্য অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসৃত আদর্শ ইসলামের অনুগামী, অতপর যারা এই নবীর ওপর ঈমান এনেছে। সুতরাং তারা সবাই আদর্শিক বন্ধনে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ।

'আর আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বন্ধু ও আপন জন।' অর্থাৎ মোমেনরা আল্লাহর দলের সদস্য, তাঁর পরিবারের সদস্য তার উম্মাতের সদস্য, তারই পতাকাতলে তারা দন্ডায়মান এবং তাঁরই বন্ধুত্বের বন্ধনে তারা আবদ্ধ। এই বন্ধন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দীর ওপারে, দেশ থেকে দেশান্তরে, বংশ থেকে বংশান্তরে এবং পরিবার থেকে পরিবারান্তরে বিস্তৃত।

মানবজাতির মিলন ও ঐক্যের জন্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত প্রগতিশীল ও সর্বোত্তম পন্থা। বিনা বাধায় মানুষের মিলনের এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। এখানে মিলনের পথে যে বাধা আছে তা মানুষের ইচ্ছাধীন। এই বাধাকে যে কেউ আপন ইচ্ছায় অতিক্রম করতে পারে। কেননা,

ইসলাম এমন একটি আকীদা ও আদর্শ যাকে মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে পারে এবং তাতেই তার ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অথচ ঐক্যের ভিত্তি যদি বংশ, গোত্র কিংবা জাতীয়তাবাদ হয়ে থাকে তাহলে মানুষ এর কোনোটাই পাল্টাতে পারে না। অনুরূপভাবে বর্ণ, ভাষা, শ্রেণী ইত্যাদি যদি ঐক্য ও মিলনের ভিত্তি হয়ে থাকে তাহলেও মানুষ এগুলোর বাধা কোনেদিনই অতিক্রম করতে পারবে না। এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে তা আদৌ অতিক্রম করতে পারে না যদি তা পুরুষানুক্রমিক বা বংশানুক্রমিক ব্যাপার হয়, যেমন হিন্দুদের শ্রেণীভেদ। এরূপ ক্ষেত্রে মানবীয় সম্মেলনের পথের এই বাধা চিরদিনের জন্যে বহাল থাকে। অপর দিকে আকীদাগত, আদর্শগত ও চিন্তাগত বন্ধন সবচেয়ে উন্নত ও কার্যকর। কেননা এ জিনিসটা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতার আওতাভুক্ত ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। নিজের বর্ণ, বংশ, ভাষা ও শ্রেণীগত বন্ধন ছিন্ন বা পরিবর্তন না করে মানুষ নিজের পছন্দসই আদর্শ গ্রহণ করে এর ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ হতে সক্ষম।

এদিক থেকেই মানুষকে সকল প্রাণীর চেয়ে মর্যাদাবান করা হয়েছে। কেননা তার ঐক্য ও মিলনের ভিত্তি হিসাবে যে জিনিসটাকে গ্রহণ করা হয়েছে, তা তার সবচেয়ে ভালো ও মহৎ উপাদান– এই উপাদানও তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে।

ইসলাম চায় মানবজাতি নিজের আত্মার সম্বল এবং হৃদয় ও বিবেকের সম্পদের ওপর নির্ভর করে সংঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠী হিসাবে বেঁচে থাকুক। ভৌগলিক সীমারেখা, অথবা বর্ণ ও বংশগত পরিচয়ের ভিত্তিতে ইতর প্রাণীর মতো বেঁচে থাকুক এটা ইসলাম চায় না। শেষোক্ত সীমারেখাগুলো চারণক্ষেত্রের সীমারেখার মতো, যা পশুদের জন্যে নির্ধারণ করা হয়। যাতে একজনের পশুর পাল অপরজনের পশুর পালের সাথে মিশে না যায়।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে এই সব তর্ক-বিবাদের আড়ালে আহলে কেতাবের গুপ্ত অভিপ্রায়ের বিষয়টি ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদের সামনে তাদের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধির কুৎসিত চেহারা উন্মোচন করে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দেয়া হয়েছে। ৬৯ থেকে ৭৪ নং আয়াত দেখুন।

মুসলমানদের যে জিনিসটি নিয়ে আহলে কেতাব সবচেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন তা হচ্ছে তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শ। মুসলিম উম্মাহ হেদায়াত লাভ করুক এবং তাদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল ফিরে পাক– এটা তাদের মোটেই মনোপূত নয়। এ জন্যে এখানে তাদেরকে তাদের এই জীবনবিধান থেকে বিপথগামী করার জন্যে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ৬৯ নং আয়াতের বক্তব্য এটাই।

'আহলে কেতাবের একটি গোষ্ঠীর দুরাশা এই যে, তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করবে ....' অর্থাৎ এটাই তাদের সকল চক্রান্তের মূলকথা ও মূল সাক্ষ্য।

প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তাদের এরূপ দুরাশা পোষণ যে তাদেরই একটা গোমরাহী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, এমন জঘন্য দুরাশা ও দুরভিসন্ধি কখনো সদিচ্ছা ও হেদায়াতের ফলশ্রুতি হতে পারে না। তারা যে মুহূর্তে হেদায়াতপ্রাপ্ত মোমেনদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চায়, সেই মুহূর্তে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করে থাকে। বস্তুত, নিজে পথভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া অন্যকে পথভ্রষ্ট করতে চাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যে আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

'আসলে তারা নিজেদেরকেই গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করে, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।'

মুসলমানরা যতোক্ষণ ইসলামের ওপর অবিচল থাকবে, ততক্ষণ তাদের শত্রুরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বরঞ্চ তাদের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি বুমেরাং হয়ে তাদেরই সর্বনাশ ঘটাবে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ পর্যায়ে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর অপরাধমূলক ভূমিকার মুখোশ উন্মোচন করা হয়। ৭০ ও ৭১ নং আয়াত দেখুন,

'হে আহলে কেতাব! তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে কেন অস্বীকার করো? অথচ তোমার (এর) চাক্ষুষ সাক্ষী, হে আহলে কেতাব! তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো কেন এবং সত্যকে গোপন করো কেন? অথচ তোমরা তো জানো।'

বস্তুত আহলে কেতাব গোষ্ঠী সেকালেও চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করতো এবং আজও প্রত্যক্ষ করে যে, ইসলামের মধ্যেই প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে। তাদের আসমানী কেতাবে হযরত মোহাম্মদ (স.) ও ইসলাম সম্পর্কে যে সব আভাস-ইংগীত ও সুসংবাদ রয়েছে তা যারা জানতো ও বুঝতো, তারাও এ সত্য প্রত্যক্ষ করতো, যারা জানতো না তারাও প্রত্যক্ষ করতো। যারা জানতো তাদের অনেকে তো তাদের উপলব্ধির কথা সরাসরি প্রকাশ করতো এবং কেউ কেউ এর ভিত্তিতে ইসলামও গ্রহণ করেছে। তবে ইসলামের মধ্যে যে তারা ঈমানের দিকে আহ্বানকারী উজ্জ্বলতর সত্যের সন্ধান পেতো, তারা তা অস্বীকার করতো। এর কারণ এটা নয় যে, ইসলামের যুক্তির কোনো ঘাটতি রয়েছে, এর আসল কারণ হলো স্বার্থপরতা ও মুসলমানদেরকে বিপথগামী করা। কোরআন তাদেরকে 'আহলে কেতাব' বলে সম্বোধন করে। কেননা, এটা তাদের এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা তাদেরকে আল্লাহর এই কেতাবের প্রতি ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করার কথা।

মুসলমান ছদ্মাবরণে ইহুদী খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র

পুনরায় তাদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপকর্ম তুলে ধরা হয়েছে। সত্যকে গোপন করা ও মিথ্যার স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানোর যে ইচ্ছাকৃত ঘৃণ্য অপকর্মে তারা লিপ্ত ছিলো, তার আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এখানে তৎকালীন আহলে কেতাবের এই জঘন্য অপকর্মটির কঠোর সমালোচনা করেছেন। এই অপকর্ম তারা আজও অব্যাহত রেখেছে। এটা তাদের চিরাচরিত রীতি। প্রথমে এটি শুরু করেছে ইহুদীরা। তারপর খৃষ্টানরাও তাতে যোগ দিয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা ইসলামের সাহিত্য ভান্ডারে এতো বেশী কারচুপি ও বিকৃতি ঘটিয়েছে যে, তার উদঘাটন করতে আরো শত শত বছর লেগে যাবে। এই সাহিত্য ভান্ডারে তারা অগণিত সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়েছে। কেবলমাত্র আল্লাহর এই সুরক্ষিত মহাগ্রন্থ কোরআন এর ব্যতিক্রম। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ইসলামের ইতিহাসে, তার ঘটনাবলীতে ও তার ব্যক্তিবর্গের পরিচিতিতে তারা বহু কারচুপি ও জালিয়াতি করেছে, সত্যকে লুকানো, বিকৃত করা ও সত্যের সাথে মিথ্যার ভেজাল মেশানোর যাবতীয় অপকর্ম তারা করেছে। রসূল (স.)-এর হাদীসেও তারা কারচুপি করেছে ও সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়েছে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা হাদীস শাস্ত্রকে তাদের কারচুপি ও বিকৃতি থেকে মুক্ত করার জন্যে এমন সব গবেষক আমাদের জুটিয়ে দিয়েছেন, যারা হাদীসকে তাদের জালিয়াতির কবল থেকে মুক্ত করেছেন। তবে সীমিত মানবীয় শক্তি-সামর্থের সীমাবদ্ধতা হেতু এখনো হয়তো কিছু কিছু জালিয়াতি ধরা পড়তে বাকী থাকতে পারে। তারা কোরআনের তাফসীরেও কারচুপি ও জালিয়াতি করেছে, এ কারণে এই শাস্ত্রটি এমন এক কুলকিনারাহীন তেপান্তরের মাঠে পরিণত হয়েছে যে, প্রত্যেক গবেষককে তাফসীর সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে দিকভ্রান্ত হবার উপক্রম হতে হয়। তারা মুসলিম মনীষী, পন্ডিত এবং বর্ণনাকারীর পরিচিতির মধ্যেও নানা রকমের জালিয়াতি করেছে। প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিজীবী ও তাদের শিষ্যদের বেশে হাজার হাজার তথাকথিত মনীষী মুসলিম সাহিত্য ভান্ডারে অতীতেও অনুপবেশ করেছে এবং এখনো করছে। এই সকল তথাকথিত মুসলিম চিন্তাবিদরা মুসলিম দেশগুলোতে চিন্তার নেতৃত্বে জেকে বসেছে। এভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে শত শত কৃত্রিম পন্ডিতকে মুসলিম বিশ্বে ইহুদী ও খৃষ্টানদের চর হিসাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে করে ইহুদী ও খৃষ্টানরা বাইরে বসে প্রকাশ্যভাবে যে কাজ করতে পারে না, এই সব ভাড়াটে পন্ডিতরা ইসলামের শত্রুদের জন্যে সেই কাজগুলো করতে পারে।

এই ষড়যন্ত্র আজও অব্যহত রয়েছে। শত শত বছর ধরে বাতিল শক্তির সাথে আমাদের এই যে সংঘাত বেঁধেছে, তাতে জয়লাভ করার জন্যে এই সুরক্ষিত মহাগ্রন্থ কোরআনের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া মুসলিম উম্মাহর আর কোনো উপায় নেই।

অনুরূপভাবে আহলে কেতাবের একটি মহল মুসলিম উম্মাহর মনে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে অস্থিরতা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে এবং তাদেরকে একই প্রতারণাপূর্ণ পন্থায় সত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার মানসে যে সব অপচেষ্টা চালাতো, তা তুলে ধরা হয়েছে ৭২ ও ৭৩ নং আয়াতে।

'আহলে কেতাবের একটি দল বলতো, মুসলমানদের ওপর যে ওহী নাযিল হয়, তার ওপর দিনের প্রথম ভাবে ঈমান আনো এবং দিনের শেষভাগে তা প্রত্যাখ্যান করো, হয়তো এতে মুসলমানরা ধর্ম থেকে ফিরে আসবে। ....'

এটাই হলো তাদের সেই নোংরা প্রতারণাপূর্ণ পন্থা, যার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। কেননা তাদের ইসলাম গ্রহণ এবং তার কিছু পরেই তা পরিত্যাগ করা দেখে দুর্বল ঈমান, স্বল্পবুদ্ধি ও নিরক্ষর আরব মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, তারা নিজেরা ইসলামকে গভীরভাবে জানার সুযোগ ও যোগ্যতা কোনোটাই তখন পর্যন্ত পায়নি। আর আহলে কেতাব সম্পর্কে তারা জানতো যে, তারা তাদের চেয়ে আসমানী কেতাব ও ধর্ম সম্বন্ধে বেশী জানে। তাই তাদেরকেক ঈমান আনতে ও মুরতাদ হতে দেখে ভাবতে পারে যে, তারা নিশ্চয়ই ইসলামের কোনো ত্রুটির কথা জানে বলেই এটা করেছে। সুতরাং ওপথে না যাওয়াই ভালো।

আজও এই ধোকাবাজী ও ছলচাতুরী অব্যাহত রয়েছে। যখন যেখানে যে উপায়ে সম্ভব এই ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। তবে মুসলমানদের শত্রুরা হুবহু এই প্রতারণাপূর্ণ পন্থাকে এখন আর কার্যোপযোগী বলে মনে করে না। তাই তারা নব নব পন্থার আশ্রয় নিচ্ছে।

ইসলামের দুশমনরা মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে শিক্ষক, দার্শনিক, লেখক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের বেশে মুসলিম নামধারী ভাড়াটে বুদ্ধিজীবিদের এক বিরাট বাহিনী নিয়োগ করে রেখেছে। মুসলিম বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে তারা মুসলিম নাম ধারণ করতে পেরেছে। কেউ কেউ তো মুসলিম 'আলেম' খেতাবও পেয়েছে।

এই ভাড়াটে বুদ্ধিজীবি বাহিনীর ওপর স্থায়ী নির্দেশ রয়েছে, তারা যেন সাহিত্য শিল্প, সাংবাদিকতা, জ্ঞান, গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন পন্থায় মুসলমানদের মনে তাদের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসকে শিথিল ও নড়বড়ে করে দেয় এবং শরীয়তের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট করে দেয়। এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হলো ইসলামী আদর্শের অপব্যাখ্যা, ক্রমাগত তাকে 'রক্ষণশীল' বলে চিত্রিত করতে থাকা, এ আদর্শের চর্চা হ্রাস করা, জীবনের বাস্তব অংগন থেকে তাকে দূরে রাখা। ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী বিভিন্ন মতবাদ, মতাদর্শ, আইন, বিধি ও আচরণ রীতি প্রণয়ন, আর সে সকল নতুন উদ্ভাবিত মতবাদ ও মতাদর্শকে এমনভাবে সজ্জিত করা যাতে ইসলামী আদর্শের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। অশ্লীলতা ও যৌন বেলেল্লাপনার প্রচলন, নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করা এবং ইসলামের গোটা ইতিহাসকে বিকৃত করা– যেমন করে আহলে কেতাব গোষ্ঠী ধর্মগ্রন্থের উক্তি বিকৃত করে ইতিপূর্বেই তাদের হাত পাকিয়েছে।

ইসলামের এই শত্রুতা করার পরও তারা মুসলিম নামে অভিহিত। তারা মুসলিম নামধারী। ইসলামী নাম দ্বারা তারা দিনের প্রথম ভাগে নিজেদের ইসলামী পরিচয় প্রকাশ করে, আর এই সব অপরাধমূলক তৎপরতা দ্বারা শেষভাগে তারা কুফরী প্রকাশ করে। উভয় আচরণ দ্বারা তারা কোরআনে বর্ণিত প্রাচীন আহলে কেতাবের ভূমিকাই পালন করে যাচ্ছে।

আহলে কেতাব পরস্পরকে বলতো, দিনের প্রথম ভাগে নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে জাহির কর এবং শেষ ভাগে তা অস্বীকার করে দাও। হয়তো এতে মুসলমানরা তাদের ধর্ম থেকে

ফিরে আসবে। আর এ বিষয়টা স্বধর্মের অনুসারীদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে এ গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত করে না। ৭৩ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছে, তোমাদের ধর্মের অনুসারী ছাড়া আর কারো ওপর আস্থা রেখো না। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে এ রহস্য জানতে দিও না।

আজকের যুগের ইহুদী ও খৃষ্টানদের দালালরাও অনুরূপ। একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমঝোতা রয়েছে। সেটি হচ্ছে, সুযোগমতো ইসলামকে ধ্বংস করা। এই সমঝোতা কোনো চুক্তি বা ষড়যন্ত্রের আকারে নাও হতে পারে। তবে তা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে এক দালালের সাথে আর এক দালালের সমঝোতা হতে পারে, এই ব্যাপারে উভয়ে উভয়ের কাছে বিশ্বস্ত ও নিরাপদ। পরিবেশও তাদের অনুকুল। প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও প্রস্তুত আছে। পক্ষান্তরে যারা ইসলামের মর্ম বোঝে, তারা আজ হয় রণাংগন থেকে পলাতক, নচেত তারা শতধা বিচ্ছিন্ন।

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন ঘোষণা করেন যে, আল্লাহর হেদায়াতই আসল হেদায়াত। যে ব্যক্তি আল্লাহ হেদায়াতের আশ্রয় নেয় না, সে আর কখনো আর কোনো ব্যবস্থায় হেদায়াত পাবে না। 'বলো, আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র হেদায়াত।'

এ উক্তিটি আহলে কেতাব কর্তৃক দিনের প্রথম ভাগে ইসলামকে মেনে নেয়া ও শেষ ভাগে অস্বীকার করার নির্দেশ প্রতিরোধের জন্যে নাযিল হয়েছে। এতে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে তারা যেন এই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকে। কেননা, এটা আল্লাহর হেদায়াত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যাওয়ার শামিল। আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া আর কোনো হেদায়াত নেই। এই ধোকাবাজরা যা চাইবে তা গোমরাহী ও কুফরী ছাড়া আর কিছু নয়। আহলে কেতাবের উক্তি শেষ হওয়ার আগেই আল্লাহর উপরোক্ত মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহর হেদায়াতই একমাত্র হেদায়াত' এরপর তাদের অবশিষ্ট ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে,

'এ কথা বিশ্বাস করো না যে, তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, অনুরূপ জিনিস আর কাউকে দেয়া হবে অথবা তারা তোমাদের প্রভুর নিকট গিয়ে তোমাদের সাথে তর্ক করবে।'

এই উক্তি দ্বারা মূলত তাদের 'স্বধর্মানুসারী ছাড়া আর কাউকে তোমরা বিশ্বাস করো না,' এই উক্তির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুত এটা নিতান্তই প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু নয় যে, আল্লাহ তায়ালা আহলে কেতাবকে যে কেতাব ও নবুওত দিয়েছেন তা আর কাউকে দেবেন না। এতে তাদের এই ভীতিও প্রকাশ পেয়েছে যে, মুসলমানরা যদি শান্ত ও নিশ্চিত হয়ে যায় এবং আহলে কেতাবরা ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জানার পরও তা অস্বীকার করে তাহলে মুসলমানরা আল্লাহর কাছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ পেয়ে যাবে। ভাবখানা এই যে, মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পাকড়াও করবেন না। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর গুণাবলীর প্রতি ঈমান ও সঠিক ধারণা থাকলে এবং রেসালাত ও নবুওত কি জিনিস তা অবহিত থাকলে কেউ এ ধরনের মনোভাব করতে পারে না।

এরপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূল (স.)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আহলে কেতাব ও মুসলমানদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তায়ালা কোনো উম্মতের কাছে তাঁর রসূল আপন অনুগ্রহ বলেই পাঠান। ৭৩ নং আয়াতের শেষাংশে ও ৭৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে, যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহ তায়ালা উদার মহাজ্ঞানী। নিজ দয়ার জন্যে তিনি যাকে ইচ্ছা নির্দিষ্ট করেন। আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল।'

আর আহলে কেতাব যেহেতু আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ভংগ করেছে, তাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেনি, জেনে শুনে সত্যকে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করেছে, আল্লাহর অর্পিত আমানতকে সংরক্ষণ করেনি, তাদের কেতাবের বিধান ও তাদের

শরীয়তকে পরিত্যাগ করেছে। এবং নিজেদের বিরোধ মীমাংসায় আল্লাহর কেতাবকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারীরূপে মানেনি, তাই আল্লাহ তায়ালা শেষ রেসালাত ও শেষ কেতাবকে আহলে কেতাব গোষ্ঠীর বাইরের একজনকে দিতে মনস্থ করলেন। আহলে কেতাবের এই আচরণের কারণে যখন মানবজাতির নেতৃত্ব তাদের হাতে রইলো না, তখন তিনি মুসলিম উম্মার নিকট এই নেতৃত্ব ও এই আমানত আপন অনুগ্রহ বলে সমর্পণ করলেন। আল্লাহ তায়ালা উদার ও মহাজ্ঞানী। তিনি নিজের দয়ার সাথে তাকে চান নির্দিষ্ট করেন। কেননা, তার অনুগ্রহ অনেক উদার ও ব্যাপক এবং কোথায় কোথায় দয়া বিতরণ করা প্রয়োজন তা তিনি জানেন।

'আল্লাহ তায়ালা বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী'। বস্তুত আল্লাহর কেতাব ও আল্লাহর রসূলের চেয়ে বড় দয়া ও অনুগ্রহ কোনো জাতির জন্যে আর কিছু থাকতে পারে না।

মুসলমানরা যখন এ আয়াত শুনেছে, তখন বুঝতে পেরেছে আল্লাহ তায়ালা রেসালাতের উপহারকে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে তাদের ওপর কতো কৃপা করেছেন। এজন্যে তারা এ আমানতকে অর্থাৎ নবুওত ও কেতাবকে পরম মর্যাদা সহকারে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করেছে। গভীর আত্মপ্রত্যয় সহকারে তারা তাকে রক্ষা করেছে এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থেকেছে। বিজ্ঞানময় গ্রন্থ কোরআন তাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সর্বকালের মুসলমানদেরকে সে এই প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছে এবং দিয়ে যাবে।

নৈতিকতার মানদণ্ডে ইহুদী খৃষ্টানদের অবস্থান

এরপর ৭৫, ৭৬ ও ৭৭ নং আয়াতে লক্ষ্য করুন কতো নিখুঁতভাবে আহলে কেতাবের অবস্থা ও তাদের দোষত্রুটি এই আয়াত কয়টি তুলে ধরেছে এবং মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম কতো সুষ্ঠ ও সুন্দর মূল্যবোধ বহন করে তা বর্ণনা করেছে। প্রথমে লেনদেনের ক্ষেত্রে আহলে কেতাবের দুই শ্রেণীর লোকেরা নমুনা বর্ণনা করেছে,

'আহলে কেতাবের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছে, যার কাছে তুমি বিপুল পরিমাণ সম্পদ গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফেরত দেবে। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যার কাছে তুমি এক দীনার গচ্ছিত রাখলেও তা ফেরত দেয় না। যতোক্ষণ না তুমি তাদের ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তাগাদা দিতে থাকো। .....'

তৎকালীন আহলে কেতাবের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন যে সত্যপ্রীতি, ইনসাফ ও ক্ষতি না করার রীতি অবলম্বন করেছে, তা কোরআনের চিরাচরিত নীতি। আহলে কেতাবের যে নৈতিক অবস্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে, সর্বযুগের আহলে কেতাবেরই অবস্থা এরূপ। কোরআনের বর্ণনাভংগীর লক্ষণীয় দিকটি এই যে, আহলে কেতাব ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যতো বৈরী আচরণই করুন না কেন, যতো ধোকা, প্রতারণা, শঠতা, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করুক না কেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের যতো অকল্যাণ কামনা করুন না কেন, তাদের মধ্যকার সদাচারী ও ন্যায়পরায়ণ গোষ্ঠীর অধিকার সে কখনো হরণ করে না এবং চরম উত্তেজনাকর বাকযুদ্ধের সময় সে এই গোষ্ঠীর সদগুণাবলীর বর্ণনায় কুণ্ঠিত হয় না এবং কার্পণ্য করে না। তাই সে বলছে যে, আহলে কেতাবের সবাই অসৎ নয় বরং তাদের মধ্যে এমন একদল সৎ লোকও আছে, যারা পরের সম্পদ যতোই বিপুল লোভনীয় হোক না কেন, আত্মসাৎ করে না। একথাই বলা হয়েছে ৭৫ নং আয়াতে,

'আহলে কেতাবের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে যাদের কাছে বিপুল সম্পদ গচ্ছিদ রাখলেও তা সে ফেরত দেয়।'

তবে তাদের ভেতরে খেয়ানতকারী, পরস্ব অপহরণকারী, লোভ এবং গড়িমসিকারীও আছে, যারা প্রাপ্য ও গচ্ছিত ক্ষুদ্র জিনিসও ক্রমাগত দাবী করা ছাড়া ফেরত দেয় না। এরপরও তারা

তাদের এই নিন্দনীয় স্বভাবের সাফাই গাইতে গিয়ে নানা রকম দার্শনিক যুক্তি দেয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ও জেনেশুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে।

'তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যার কাছে তুমি একটি মাত্র দীনার গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফেরত দেবে না। যদি তুমি ক্রমাগত তার পেছনে লেগে না থাকো। কারণ তারা বলে যে, নিরক্ষরদের ব্যাপারে আমাদের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'

এটা বিশেষভাবে ইহুদীদের স্বভাব। তারাই এ কথা বলে থাকে এবং নৈতিকতার জন্যে তাদের কাছে একাধিক মানদন্ড রয়েছে। আমানত যদি দু'জন ইহুদীর মধ্যকার ব্যাপার হয়, তাহলে তা রক্ষা করতে ও যথাযথভাবে ফিরিয়ে দিতে তারা নিজেদেরকে বাধ্য মনে করতো। কিন্তু অ-ইহুদী যাদেরকে তারা 'উম্মী' বা নিরক্ষর বলে আখ্যায়িত করতো এবং আরবদেরকেই তারা এই নামে অভিহিত করতো, (কিন্তু আসলে তারা ইহুদী ছাড়া সকলকেই নিরক্ষর মনে করতো) তাদের সম্পদ আত্মসাত করাকে ইহুদীরা বৈধ মনে করতো। তাদেরকে ধোকা দেয়া, প্রতারণা করা এবং যে কোনো নিকৃষ্টতম পন্থায় তাদেরকে শোষণ করা ইহুদীরা অবৈধ মনে করতো না।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তারা দাবী করতো, তাদের ধর্ম নাকি তাদেরকে এ কাজের আদেশ দেয়। অথচ তারা জানতো যে, এটা নির্জলা মিথ্যা। আল্লাহ তায়ালা কোনো অন্যায়ের আদেশ দেন না, কোনো মানবগোষ্ঠীকে তিনি এ অনুমতি দেননি যে, অপর কোনো গোষ্ঠীর অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাত করবে এবং তাদের সাথে ওয়াদা পালন করবে না, আমানত রক্ষা করবে না। কিন্তু তারা যে ইহুদী! মানবতার সাথে দুশমনী করা তাদের রীতি ও ধর্ম।

'তারা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে।'

অতপর আমরা দেখতে পাই, কোরআন একটি মাত্র সাধারণ নৈতিক ও চারিত্রিক বিধি ও মানদন্ড নির্ধারণ করছে এবং তার নৈতিক দৃষ্টিভংগীকে আল্লাহর সাথে ও তাকে ভয় করার সাথে সংযুক্ত করছে। ৭৬ ও ৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'হ্যাঁ, যারা ওয়াদা পূরণ করে ও অবলম্বন করে তাদের আল্লাহ ভালোবাসেন। যারা আল্লাহর অংগীকার ও শপথকে নগণ্য মূল্যে বিক্রী করে, আখেরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আল্লাহ তাদের সাথে কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পাপমুক্ত করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'

বস্তুত এ হচ্ছে একই বিধি ও নীতি। আল্লাহভীতির মনোভাব নিয়ে এ বিধি যে মেনে চলেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসেন ও সম্মানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থের খাতিরে আল্লাহর সাথে করা অংগীকার ও শপথ বিসর্জন দেবে, আখেরাতে সে কল্যাণের কোনো অংশ পাবে না, আল্লাহর কাছে সে কোনো সুবিধা ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না, তার পাপ থেকে সে পবিত্র ও মুক্ত হবে না, সে শুধু যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

এখানে আমরা লক্ষ্য করি যে, ওয়াদা পূরণ আল্লাহভীতির সাথে সম্পৃক্ত। তাই বন্ধু বা শত্রু কারো সাথেই তাদের হেরফের করার অবকাশ নেই। এটা স্বার্থের ব্যাপার নয়, এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত ব্যাপারর। প্রতিপক্ষ কে– শত্রু না মিত্র, সেটা কোনো বিষয় নয়।

এ হচ্ছে ইসলামের সার্বজনীন নৈতিক বিধান– চাই তা ওয়াদা পালনের সাথে জড়িত হোক কিংবা অন্য কিছুর সাথে। যে কোনো পারস্পরিক আচরণ বা লেনদেন প্রাথমিকভাবে আল্লাহর সাথে আচরণ ও লেনদেন বলে গণ্য হয়। এখানে আল্লাহর উপস্থিতি তথা আল্লাহকেই প্রধান পক্ষ বলে বিবেচনা করতে হবে, তাঁর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলতে হবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করতে হবে। এখানে নৈতিক উদ্দীপক কোনো স্বার্থ নয় সমাজ বা জাতির বঞ্চিত কোনো বিষয় নয়, কিংবা বিরাজমান পরিস্থিতির দাবীও নয়। কেননা, একটি সমাজ বা জাতি বিকৃতি বা বিভ্রান্তির শিকার

হতে পারে। তার মধ্যে অন্যায় ও অবৈধ মানদন্ড চালু হয়ে যেতে পারে। তাই একটি চিরন্তন ও শাশ্বত মানদন্ড থাকা চাই যার প্রতি ব্যক্তি ও সমষ্টি সমভাবে অনুগত থাকবে, আর এই মানদন্ড উচ্চতর কোনো শক্তির সাহায্যে টিকে থাকবে। সেই শক্তি থাকবে জাতি ও সমাজের পরিবর্তনশীল দাবী ও স্বার্থের উর্ধে। সমাজের সকল মানদন্ড ও মূল্যবোধ গৃহীত হওয়া চাই আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ ও আল্লাহভীতির মনোভাব এর মধ্যে বিদ্যমান থাকা চাই। এটিই মুসলিম সমাজের পারস্পরিক লেন দেন নীতি নৈতিকতা তথা মানবতার জন্যে রক্ষকবচ এভাবে ইসলাম মানব জাতির জন্যে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এবং আল্লাহর পছন্দনীয় মানদন্ড, মূল্যবোধ ও নীতিমালার আনুগত্য নিশ্চিত করে।

এজন্যে যারা মানুষের সাথে ওয়াদা খেলাফ ও আমানতের খেয়ানত করে– কোরআন তাদেরকে 'আল্লাহর সাথে করা ওয়াদা খেলাপকারী ও শপথ ভংগকারী' বলে আখ্যায়িত করে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তাদের মানুষদের সাথে সম্পর্ক হওয়ার আগে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই এই খেয়ানতকারীরা আল্লাহর কাছে আখেরাতে কোনো প্রতিদান পাবে না। এটা হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে মানুষের সাথে ওয়াদা ও আমানতের প্রতি অবহেলার শাস্তি।

এ পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, কোরআন এই সব আমানত বিনষ্টকারীদের প্রতি আল্লাহর অবহেলাকে একটি দৃশ্যের আকারে চিত্রায়িত করেছে। সে বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পাপমুক্ত করবে না। মানবসমাজে অবহেলার চিহ্ন হিসাবে এই আচরণগুলো সুপরিচিতি। তাই কোরআন এই অবস্থাকে একটি জীবন্ত দৃশ্যরূপে তুলে ধরার মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছে, যাতে করে তা মানুষের অনুভূতিতে কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে। এটাই কোরআনের আকর্ষণীয় ও প্রভাবশালী বাচনরীতি।

ধর্মীয় নেতাদের দুর্নীতি জাতির চরম ধ্বংস ডেকে আনে

এরপর আহলে কেতাবের আরো কিছু নমুনা পেশ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠী ছিলো যারা মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে তারা জিহ্বাকে ওলট-পালট করে আল্লাহর কেতাবের মতো এমন কিছু আবৃত্তি করতো, যাতে তা কেতাবের অংশ বলে মনে হতো, অথচ তা কেতাবের অংশ নয়। আবার কখনো কখনো কোনো আয়াতের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের মতলব হাসিল করতো। আর এসব কিছুই তারা করতো নগণ্য পার্থিব স্বার্থের খাতিরে। আবৃত্তি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃত এই বিষয়গুলোর মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) সংক্রান্ত তাদের উদ্ভাবিত ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন মতামতগুলোও থাকতো, যা তৎকালীন গীর্জা ও শাসকদের মনোপুত ছিলো। ৭৮, ৭৯, ৮০ নং আয়াতে এই শ্রেণীটির বিশদ বিবরণ লক্ষণীয়।

ধর্মীয় নেতারা যখন দুর্নীতিপরায়ণ ও বিপথগামী হয়ে যায়, তখন তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক উপসর্গ হয়ে দাঁড়ায় এই যে, ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা ধর্মকে বিকৃত করার অত্যন্ত সহজ হাতিয়ারে পরিণত হয়। আহলে কেতাবের এই বিশেষ গোষ্ঠীটির এই যে অবস্থা কোরআন বর্ণনা করেছে, এটি আমরা আমাদের যুগে খুব বেশী দেখতে পাই ও এদের আমরা চিনতেও পারি। তৎকালে তারা আল্লাহর কেতাবের আয়াতগুলোকে শব্দগতভাবে অথবা নির্দিষ্ট কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্যে মর্মগতভাবে (অপব্যাখ্যার মাধ্যমে) বিকৃত করতো এবং তাকে আল্লাহর কেতাবের বিধান বলে চালিয়ে দেবার জন্যেই তারা এমন করতো। যেহেতু সাধারণ শ্রোতারা আল্লাহর দ্বীনের মূলনীতি ও আল্লাহর কেতাবের বক্তব্যের ব্যবধান বুঝতে পারতো না এবং কেতাবের এই সব বিকৃত বক্তব্য দ্বারা যে সব কৃত্রিম সিদ্ধান্ত তৈরী করা হতো, তার যথার্থতা নির্ণয় করতে পারতো না, তাই এই সুযোগটাকে তারা কাজে লাগাতো।

আজকের মুসলিম বিশ্বে আমরা অন্যায়ভাবে ধর্মীয় নেতা বলে পরিচিত এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে হুবহু এই নমুনাটাই দেখতে পাই। ধর্মকে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির সকল আশা আকাংখা

চরিতার্থ করার হাতিয়ার হিসাবে পদানত ও ব্যবহার করে। যেখানেই স্বার্থ উদ্ধার করা যাবে বলে মনে করে, সেখানেই তারা কোরআনের আয়াত ও হাদীসকে বিকৃত করে প্রয়োগ করে। এই আপদ শুধু আহলে কেতাবের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই– এমন যে কোনো জাতির মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে নিজেদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করে। তাদের দায়িত্ব সচেতনতা এমনভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর বান্দাদের মন রক্ষার খাতিরে কোরআনের কথাগুলোকে বিকৃত করতে তাদের বিবেকে কিছুমাত্র বাধে না। এমন কি আল্লাহর দ্বীনের সুস্পষ্ট লঘংন করে নিজেদের ভ্রষ্ট প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করতে তারা কুণ্ঠিত হয় না। আহলে কেতাবের এই বিশেষ গোষ্ঠীটির উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে এই বিপজ্জনক দোষ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কেননা, এই দোষটিই বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে বিশ্ব নেতৃত্ব কেড়ে নেয়ার কারণ হয়েছিলো।

আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে যেমন মনে হয়, বনী ইসরাঈলের এই নির্দিষ্ট গোষ্ঠী আল্লাহর কেতাবে রূপক বর্ণনা সম্বলিত বাক্যসমূহ খুঁজে বের করতো এবং সেগুলোর বিকৃতি সাধন ও অপব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে তা থেকে নানা ধরনের উদ্ভট মতবাদ বের করতো। জনগণকে ধারণা দিতো যে, এ মতবাদগুলো আল্লাহর কেতাব থেকেই পাওয়া গেছে। তারা বলতো যে, এগুলোই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন অথচ আল্লাহ তায়ালা তা বলেননি। এসব দ্বারা তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে ইলাহ বা খোদা সাব্যস্ত করতে চাইতো এবং বলতো, তার সাথে 'পবিত্র আত্মা' রয়েছে। তাদের আবিষ্কৃত উদ্ভট মতবাদ ছিলো এই যে, পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই মিলেই একক সত্ত্বা আল্লাহ তায়ালা গঠিত। নাউযু বিল্লাহ! তারা হযরত ঈসার পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য উদ্ধৃত করতো, যা এই উদ্ভট দাবীর সমর্থক। আল্লাহ তায়ালা এই উদ্ভট দাবী খন্ডন করে বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যাকে নবী হিসাবে মনোনীত করেন। তার পক্ষে এটা অসম্ভব যে, সে মানুষকে আদেশ দেবে যে, আমাকে ইলাহ হিসাবে মেনে নাও। ৭৯ ও ৮০ নং আয়াতে একথাই বলা হয়েছে।

বস্তুত একজন নবী বিশ্বাস করেন যে, তিনি একজন বান্দা ও বানীবাহক এবং আল্লাহ তায়ালাই তার ও সকলের প্রভু ও প্রতিপালক। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি তাঁরই দাসত্ব ও এবাদাত করে থাকে। সুতরাং তিনি নিজের জন্যে খোদায়ীর পদ দাবী করে মানুষকে দাস হিসাবে নিজের পদানত করতে চাইবেন, তা অসম্ভব। সুতরাং কোনো নবী মানুষদেরকে একথা বলবেন না যে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার গোলাম হয়ে যাও। নবী রসূলরা শুধু তাদের কাছ থেকে আল্লাহর নাযিল করা বিধান গ্রহণ করতে বলেন।

আল্লাহর নবী মানুষকে গোমরাহ করার জন্যে নয়– হেদায়াত করার জন্যেই আসেন। কুফরীর দিকে নয় বরং ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শনের জন্যে আসেন। কাজেই তিনি কখনো ফেরেশতা ও নবীদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করার আদেশ দিতে পারেন না। যারা মুসলমান হয়ে গেছে এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করেছে, তাদেরকে তিনি কাফের হয়ে যেতে বলতে পারেন না।

সুতরাং তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে যে অপপ্রচার চালায় তা অসম্ভব। আর এ ধারণা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কেতাবে এসেছে, তাও মিথ্যা। এই দু'টো কথাই উপরোক্ত আয়াত দু'টি থেকে প্রমানিত হয়। একই সাথে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও বিশ্বাসে অস্থিরতা আনয়নের উদ্দেশ্যে তারা আর যা যা বলে, তা সবই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সামনেই তাদেরকে এভাবে নগ্ন করে দিয়েছেন।

আগেই বলেছি যে, আমাদের মুসলিম সমাজে আহলে কেতাবের এই দলটির মতো একটি দল আছে, যারা ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হবার দাবিদার। কোরআনের এই নির্দেশ তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, তারা বিভিন্ন মিথ্যা প্রভুদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং তাদের

মনগড়া বিভিন্ন বিকৃত মতবাদকে প্রমাণিত করার জন্যে কোরআনের বক্তব্যকে নানাভাবে বিকৃত করে থাকে। আর বলে থাকে যে, 'এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, অথচ তা আল্লাহর কাছ থেকে আসে না। তারা আল্লাহর ওপর জেনে শুনে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে।'

আল্লাহর সাথে নবীদের ওয়াদা

এরপর আল্লাহর সাথে নবীদের করা অংগীকারের ভিত্তিতে কি ধরনের সম্পর্ক বিরাজ করে, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, শেষ নবীকে যারা অমান্য করে, তারা আল্লাহর অবাধ্য এবং আল্লাহর সাথে কৃত অংগীকার ও ভংগ করার দায়ে দোষী। ৮১, ৮২ ও ৮৩ নং আয়তে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের অংগীকার দিলেন। ....'

বস্তুত আল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি নিজে এবং তাঁর নবীরাও সাক্ষী ছিলেন। সকল নবীর কাছ থেকেই অংগীকার নিয়েছিলেন যে, তিনি তাকে যে কেতাব, ও হেকমতই দান করেন না কেন, তার পরবর্তী রসূলকে তার স্বীকার করতে হবে, তাদের ওপর ঈমান আনতে হবে ও তাকে সাহায্য করতে হবে, তার আনীত দ্বীনকে অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর সাথে প্রত্যেক রসূলের এই অংগীকার সম্পাদিত হয়।

কোরআনের ভাষায় নবীদের মধ্যবর্তী সময়কালগুলোকে একীভূত করে সকল নবীকে একই স্থানে সমবেত করে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের সবাইকে এক সাথে সম্বোধন করেছেন যে, তারা এই অংগীকার গ্রহণ করলো কিনা।

'তিনি (আল্লাহ) বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং আমার অংগীকার গ্রহণ করলে?'

তারা সবাই জবাব দেন, 'হাঁ। আমরা স্বীকার করলাম।' তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো। আমিও তোমাদের সাক্ষী রইলাম।'

এই এক মহতী দৃশ্য, যা এই আয়াতে চিত্রিত হয়েছে, তা যেন মহান আল্লাহর সামনে সকল নবী ও রসূলের সম্মেলনের এক মহান দৃশ্য। এ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর নবীদের এই কাফেলা অবিচ্ছেদ্যভাবে একীভূত ও পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মনিবেদিত। তারা যেন সমগ্র মানবজাতির জন্যে একটি মাত্র আদর্শের অংগীকার গ্রহণ করেছেন, যা কখনো স্ববিরোধিতার শিকার হবে না। এ জন্যে আল্লাহর যে বান্দাই নবী মনোনীত হন। তিনি এই দায়িত্ব পালনার্থেই পরবর্তী নবীদের ওপর ঈমান আনেন। কেননা, কোনো নবীর এ দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গৌরব থাকে না। কেননা তিনি তো আল্লাহর একজন মনোনীত বান্দা ও প্রচারকমাত্র। আর এ কাজকে মানবজাতির এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে পৌছানোর দায়িত্ব আল্লাহর।

এই অংগীকার ও এই চিন্তাধারা সহকারে আল্লাহর দ্বীন সকল ব্যক্তিগত আভিজাত্য বোধ থেকে মুক্ত। রসূল নিজের ব্যক্তিসত্ত্বার, নিজ জাতির, নিজ অনুসারীদের অভিজাত্যবোধ থেকে মুক্ত। এই একমাত্র আদর্শের আওতায় সব কিছুই আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত। নবীরা সকলে একমাত্র এই দ্বীনের ও প্রচারক সবাই এই মহতী কাফেলার অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত সত্যের আলোকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আহলে কেতাবের মধ্যে যারা শেষ নবীর ওপর ঈমান আনা, তার সমর্থন ও সহযোগিতা করা থেকে শুধু এই জন্যে বিরত থাকে যে, তারা নিজেদের ধর্ম আকড়ে ধরে রাখতে চায়, তারা আসলে তাদের নিজেদের ধর্মের মূলতত্ত্বকে কোনো আমলই দেয় না। কেননা, সেই মূলতত্ত্ব তাদেরকে শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার ও তাকে সাহায্য করার আহ্বান জানায়। এভাবে তারা তাদের ধর্মের নামে নিজেদের আভিজাত্যই ফলাতে চেষ্টা করে। তাদের যে নবীরা এই ধর্ম তাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন, তারা আল্লাহর কাছে অংগীকার এসেছেন যে, পরবর্তী ও শেষ নবীকে তারা সমর্থন ও সহযোগিতা করবেন। এ থেকে বুঝা যায়, যারা তাদের নবীদের শিক্ষা অমান্য করে শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে, তারা

কাফের। তারা আল্লাহর অংগীকার লংঘনকারী। কেননা, প্রত্যেক জাতির নবীর অংগীকার উক্ত জাতির অংগীকারেরই শামিল। অনুরূপভাবে এই অংগীকার লংঘন প্রাকৃতিক নিয়মের স্পষ্ট লংঘনের শামিল। কেননা গোটা বিশ্ব-প্রকৃতি আল্লাহর বিধানের অনুগত।

'এরপর যারা এ অংগীকার থেকে পশ্চাদপদ হবে, তারা অবাধ্য। তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছু চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।'

অর্থাৎ শেষ নবীর অনুসরণ থেকে যে পিছপা হয়, সে কাফের ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহর দ্বীন থেকে যে মুখ ফিরায়, সে এই মহাবিশ্বে একেবারে একাকী, আল্লাহর বাধ্যগত বিশ্ব নিখিলে সেই একমাত্র আল্লাহর বিদ্রোহী। আল্লাহর দ্বীন সব সময় এক। সকল নবী ও রসূল এই দ্বীন সহকারেই এসেছেন। এই দ্বীনের ব্যাপারেই নবীরা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা সকল নবীর কাছ থেকে একই অংগীকার নিয়েছেন। শেষ নবীর আনীত দ্বীনে ঈমান আনা, তার অনুসরণ ও অনুকরণ এবং সকল মতাদর্শের ওপর ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা ও সংগ্রাম দ্বারাই এই অংগীকার পূরণ করা সম্ভব। যে ব্যক্তি ইসলাম থেকে মুখ ফিরায়, সে আল্লাহর গোটা দ্বীন থেকে মুখ ফিরায়। সে মূলত আল্লাহর যাবতীয় অংগীকারই ভংগ করে।

ইসলামকে মেনে নেয়া মানবজন্মের প্রথম ও শেষ দাবী

ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠা ও তাঁর আনুগত্য করার নাম। এটা শুধু মানুষের নয়, গোটা বিশ্ব প্রকৃতিরই ধর্ম। এটাই ইসলামের বিশালতর ও ব্যাপকতর রূপ। এটা তার বিশ্বজোড়া রূপ। এ রূপ গোটা মানবচেতনাকে আচ্ছন্ন করে। এটা গোটা বিশ্বকে পদানতকারী এ মহাশক্তিধর শাসকের বিধান ও আইন। তিনি সকল জিনিস ও সকল প্রাণীকে তার নিজের একমাত্র বিধান ও একই শেষ পরিণতির দিকে ফিরিয়ে নেন।

'তারই কাছে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।' অর্থাৎ সেই মহাশক্তিধর ও মহা পরাক্রমশালী মহান শাসক ও অধিপতির কাছে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই।

শুধু তাই নয়, মানুষ যদি পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি চায়, তবে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা ছাড়া উপায় নেই। এতে গোটা বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে তার সমন্বয় ঘটবে। এই বিশ্বজগতের পারিপার্শ্বিকতায় বাস না করে তার যখন উপায় নেই এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা ছাড়া তার যখন গত্যন্তর নেই, তখন তার একাকী এমন কোনো মনগড়া ও স্বেচ্ছাচারমূলক বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করা উচিত নয়, যা মহান স্রষ্টার তৈরী বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে মানানসই নয়। মানুষের চিন্তায় ও চেতনায়, তার নিজের বাস্তবতায় ও অন্যদের সাথে সংযোগ ও সম্পর্কে এবং তার কাজ কর্মে প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধানের সাথে সমন্বয় সাধনই তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে পারে এবং সংঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে। সে যদি প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাহলে সে ধ্বংস ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। অথবা পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা তাকে যে খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পালনে অসমর্থ হবে। আর যদি সে তার ও সকল প্রাণীর নিয়ন্ত্রণকারী প্রাকৃতিক নিয়মনীতির সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে চলে, তাহলে সে সেগুলোর গুপ্ত রহস্য জানতে পারবে, তাদেরকে বশীভূত করে সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারবে যাতে তার সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয় এং সে ভীতি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা থেকে রক্ষা পায়। প্রাকৃতিক এই আগুনের শক্তিগুলোকে ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে, সে আগুনে পুড়ে মরবে, বরং তা দিয়ে রান্না করে খাবে, আলো জ্বালাবে এবং উত্তাপ লাভ করবে।

মানুষের জন্মগত স্বভাব মূলত প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের সাথে সমন্বিত এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজমান সকল জিনিস ও সকল প্রাণীর ন্যায় তাও আল্লাহর অনুগত। যখন মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী হয়ে যায়, তখন শুধু প্রকৃতির সাথেই নয় বরং প্রথমে সে নিজের

ব্যক্তিসত্তার সাথেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এটা তার জন্যে চরম সর্বনাশ ডেকে আনে। এটা তার যুগের পথভ্রষ্ট মানবজাতিকে ভাগ্যবিড়ম্বিত ও দুর্ভোগকবলিত জীবন উপহার দেয়, যা যাবতীয় প্রযুক্তিগত সাফল্য এবং সকল বস্তুগত সুযোগ সুবিধাকে ম্লান করে দেয়।

আজকের মানবজাতি এক তিক্ত শূন্যতার মাঝে জীবনযাপন করেছে। এটা তার আত্মার শূন্যতা, যা তার স্বভাবপ্রকৃতির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। তার আত্মা ঈমানের তথা আদর্শের শূন্যতায় ভুগছে। আর তার জীবন জর্জরিত হয়ে উঠেছে ঐশী জীবন বিধানের বাস্তব প্রতিফলনের অভাবে। এই বিধান মানুষের এবং প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

তীব্র খরাতপ্ত দুপুরে শান্ত শীতল ছায়া থেকে অনেক দূরে অবস্থানরত মানবজাতির প্রাণ যেন আজ ওষ্ঠাগত। দূর্নীতি ও অরাজকতায় তার জীবন আজ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত এবং আবহমান কালের সোজা ও সরল পথ থেকে সে আজ বিচ্যুত।

এ কারণেই সে আজ শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের শিকার, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় জর্জরিত। বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই তার ভাগ্যে জোটে না। আর এই অসহনীয় বাস্তবতা থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্যে তারা আফিম, হিরোইন ও যাবতীয় নেশাকর ড্রাগে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। উন্মাদসুলভ দ্রুতগতি, নির্বোধসুলভ ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসাহসিক অভিযান, বিরল ধরনের চালচলন, উৎকট ফ্যাশনের পোশাক ইত্যাদি এই উদ্বেগের ফল হিসাবেই নানা জায়গায় আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুগত প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত উৎপাদন, উচ্ছল বিলাসী জীবন ও বিপুল অবসর সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতার প্রবক্তারা আজ এই শোচনীয় দুর্দশায় পতিত। শুধু কি তাই! বরঞ্চ বস্তুগত সুখ-সমৃদ্ধি, উপচেপড়া প্রাচুর্য এবং জীবনপোকরণ ও সুযোগ-সুবিধার ব্যাপকতা যতো বৃদ্ধি পাচ্ছে, শূন্যতা, উদ্বেগ ও উদভ্রান্তি ততোই প্রকটতর হচ্ছে।

এই তিক্ত শূন্যতা মানবতাকে এক ভয়ংকর দানবের মতো তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাড়া খেয়ে মানবতা তা থেকে পালাচ্ছে। কিন্তু আবার সেই শূন্যতায় গিয়ে সে পৌঁছাচ্ছে। আজকের প্রাচুর্যময় ও বিত্তশালী দেশগুলোতে সফর করলে প্রথমেই অনুভব করবেন যেন সে দেশের মানুষগুলো পালাচ্ছে। ভয়ংকর হিংস্র দানবের তাড়া খেয়ে যেন তারা সবাই পালাচ্ছে। এমনকি নিজের সত্ত্বা থেকেও যেন তারা পলায়নপর। বস্তুগত প্রাচুর্য এবং ভোগ বিলাস যেখানে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, সেখানে অনতিবিলম্বেই এখন ঘটেছে স্নায়বিক ব্যাধি, মানসিক রোগ, নিভৃত বাস, উদ্বেগ, অসুস্থতা, উন্মাদনাজনিত রোগ, মাদক সেবন, মদ্যপান, অপরাধপ্রবণতা ও জীবন থেকে যাবতীয় সৎ চিন্তার বিলুপ্তির।

উন্নত দেশের মানুষ এখন আপন অস্তিত্বকেই খুঁজে পাচ্ছে না। তারা নিজেদের অস্তিত্বের আসল উদ্দেশ্যের সন্ধান পাচ্ছে না। তারা প্রকৃত সুখের সন্ধান পাচ্ছে না। কেননা, আল্লাহর রচিত কল্যাণময় জীবনব্যবস্থা থেকে তারা আজ বঞ্চিত। তারা মনের শান্তি থেকেও বঞ্চিত। কেননা, যে আল্লাহর কাছে তাদের ফিরে যেতে হবে, তাকেই তারা চেনে না।

মুসলিম উম্মাহ যখন একমাত্র ইসলামী আদর্শভিত্তিক জাতি– ভৌগলিক বর্ণ গোত্র ভিত্তিকে কোনো জাতি নয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের মধ্যে সম্পাদিত অংগীকারের তাৎপর্য কি, তা যখন যথাযথভাবে সে উপলব্ধি করে, মানবজাতির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রচলিত আল্লাহর এই দ্বীনের মর্ম কী এবং এই দ্বীনের বার্তাবাহক নবীদের মর্যাদা কী, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে এই তাৎপর্য পুরোপুরি বিশ্লেষণ করার এবং সকল নবীর প্রতি তার উম্মতের ঈমান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছাড়া কোনো ঈমান বা আমল গ্রহণযোগ্য নয়, তা জানিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন,

'বলো, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, আর আমাদের ওপর, ইবরাহীমের ওপর, ইসমাঈলের ওপর, ইসহাকের ওপর, ইয়াকুবের ওপর এবং ইয়াকুবের পৌত্রদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার ওপরও ঈমান এনেছি।(১) (৮৪ ও ৮৫ নং আয়াত)

---

(১) ইয়াকুব (আ.)–এর পৌত্ররা হলো বনী ইসরাঈল জাতির ১২টি শাখার প্রথম পুরুষ কয়জন।

এই হলো ইসলাম। ইসলাম এতো ব্যাপক এতোই সর্বাত্মক যে, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসূলকে সে নিজের নবী ও রসূল বলে গণ্য করে, সকল নবীর প্রচারিত ধর্মকে সে ঐক্যবদ্ধ করে, সেই সব ঐশী শরীয়তের মূলকথা একই বলে ব্যক্ত করে এবং ইসলামের প্রতি ঈমান আনয়নকে সেই সমস্ত নবীর প্রচারিত ধর্মের ওপর সামষ্টিকভাবে ঈমান আনার শামিল বলে গণ্য করে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, প্রথম আয়াতটিতে (৮৪ নং) আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনের প্রতি এবং পূর্ববর্তী সকল নবীর ওপর নাযিল হওয়া কেতাবের প্রতি ঈমান আনার উল্লেখ একত্রে করা হয়েছে। তারপরই এ ঈমান সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে যে,

'আমরা তারই কাছে আত্মসমর্পণকারী অর্থাৎ মুসলিম'

এখানে ইসলামের ঘোষণা দান তাৎপর্যসহ। কেননা, ইতিপূর্বে ৮৩ নং আয়াতের 'তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য কিছু চায়? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে', এই উক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তার অনুগত হওয়া, বশীভূত হওয়া তার আদেশনিষেধ, বিধি-ব্যবস্থা ও শাসনের অনুসারী হওয়া। সুতরাং প্রাকৃতিক বিশ্বের ইসলাম যে নির্দেশ মান্য করা এবং বিধিব্যবস্থা ও শাসনের অনুগত হওয়া, তাতে আর কোনো অস্পষ্টতা নেই। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা প্রসংগে ইসলাম ও তার তাৎপর্য বর্ণনায় সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, যাতে কারো মনে এরূপ ধারণা স্থান না পায় যে, মুখে কালেমা উচ্চারণ বা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করাই মুসলিম হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এরপর এই কালেমা পাঠের বাস্তব ফলশ্রুতি হিসাবে বাস্তব জীবনে বিধানকে কার্যকরী করার বুঝি কোনো দরকার হবে না।

পরবর্তী আয়াতে (৮৫ নং) যে সূক্ষ্ম, সর্বাত্মক ও অনমনীয় ঘোষণা আসছে, তার আগের আয়াতে (৮৪ নং) যেভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তা খুবই মূল্যবান। বলা হয়েছে,

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের অন্বেষণ করে, তা তার কাছ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না, আর সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

পূর্বাপর আয়াতসমূহের সাথে এ আয়াত মিলিয়ে পড়লে ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অন্য কোনো রকমের ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ থাকে না। আর এই আয়াতগুলোকে কোনোভাবে বিকৃত করে ইসলামের আল্লাহপ্রদত্ত ব্যাখ্যাকে পাল্টানোরও কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং একথাই চূড়ান্তভাবে সঠিক যে, গোটা বিশ্বজগতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে আইন ও বিধান প্রণয়ন করেছেন এবং যে আইন ও বিধানকে গোটা বিশ্বজগত সর্বাত্মক আনুগত্য সহকারে মেনে চলেছে, সেই বিধানের সর্বাত্মক আনুগত্যের নামই হচ্ছে ইসলাম।

সুতরাং ইসলাম কখনো শুধু মুখে মুখে দু'টো সাক্ষ্য দানের নামই হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। একথা শুধু মুখেই বলা হবে, অথচ এর মূলতত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসরণ করা হবে না, তাকে ইসলাম বলা হবে না। এ কথার তাৎপর্য হলো, ইলাহ বা মাবুদ হিসাবে আল্লাহর একত্ব এবং বিশ্বের শাসক ও পরিচালক হিসাবেও আল্লাহর একত্ব, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব সর্বময় প্রভুত্ব মেনে নেয়া। অতপর বান্দার বন্দেগী এবং দাসত্বেরও একমুখিতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তার মনোযোগ ও মনোনিবেশেরও একত্ব ও একমুখিতা। অনুরূপভাবে মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রসূল একথারও মূলতত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসরণ না করে শুধু মুখে বললেই তাকে ইসলাম বলে গণ্য করা যাবে না। এ কথা তাৎপর্য ও মূলতত্ত্ব হলো, মোহাম্মদ (স.) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে মানুষের পার্থিব জীবনে বাস্তবায়নের জন্যে যে বিধিবিধান ও জীবনব্যবস্থা এনেছেন, তাকে সর্বতোভাবে মানা এবং তার অনুসরণ করা।

আল্লাহর একত্ব, অদৃশ্য বিষয়সমূহ, কেয়ামত ও রসূলদের প্রতি শুধু মনে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলেই তা ইসলাম বলে গণ্য হবে না, যতোক্ষণ তা কার্যে পরিণত ও বাস্তবায়িত না করা হবে।

অনুরূপভাবে, ইসলাম শুধু আনুষ্ঠানিক এবাদাত, তপ, জপ, নৈতিক পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক তপস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই সব কিছুর বাস্তব ও কার্যকর প্রভাব যতোক্ষণ তার কর্মজীবনে না পড়বে, যতোক্ষণ সেই আল্লাহর ভয়ে গোটা জীবনকে তাঁর বিধানের আলোকে পরিশুদ্ধ করা না হবে, ততক্ষণ তাকে ইসলাম বলা যাবে না। কেননা, বাস্তব জীবনে প্রভাব বিস্তার না করলে এই সব এবাদাত ও যেকের তাসবীহ নিষ্ফল হবে। একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মানুষ যখন ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন যাপন করতে থাকবে, তখনই তা থাকে ইসলামী জীবনে পরিণত হবে।

এই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ইসলাম। কিছু মানুষের প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী যাকে ইসলাম বলে অথবা ইসলামের শত্রু বা তাদের ক্রীড়নকরা যাকে ইসলাম বলে তা ইসলাম নয়।

আর আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন, সেভাবে ইসলামকে জানা ও বুঝার পরও যারা তাকে সেভাবে গ্রহণ করে না তারা আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কখনো সুপথ দেখাবেন না এবং আযাব থেকে অব্যাহতিও দেবেন না। পরবর্তী ৮৬, ৮৭, ৮৮ ও ৮৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'আল্লাহ সেই গোষ্ঠীকে কিভাবে হেদায়াত করবেন, যারা ঈমান আনার পর পুনরায় কাফের হয়ে গেছে ... তাদের আযাব কমানো হবে না এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।'

এটি একটি ভয়ংকার হুশিয়ারী। যার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও ঈমান আছে, সে এ হুশিয়ারী শুনে প্রকম্পিত না হয়ে পারে না। যাদের মুক্তি লাভের সুযোগ দেয়া হয়েছে, অথচ তা সত্ত্বেও এভাবে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে এবং মুক্তি লাভের চেষ্টা করেনি, তার জন্যে এ প্রতিফল ন্যায়সংগত।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলাম তাওবার দ্বার রুদ্ধ করেনি। যে গোমরাহ ব্যক্তি তাওবা করতে চায়, তার জন্যে তাওবার দরজা উন্মুক্ত। তাকে শুধু দরজার কড়া নাড়তে হবে। আল্লাহর নিরাপদ আশ্রয়ে আশ্রয় চাইতে হবে এবং সৎকাজ করতে হবে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, তার তাওবা আসলেই খাটি। ৯০ নং আয়াত দেখুন, 'তবে যারা তারপর তাওবা করেছে এবং নিজেকে শুদ্ধ করেছে, তার জন্যে আল্লাহ দয়ালু ও ক্ষমাশীল।'

কিন্তু যারা তাওবা করে না এবং ফিরে আসে না বরং কুফরীর ওপর অনড় থাকে এবং কুফরী আরো বৃদ্ধি করে, এভাবে এক সময়ে তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যায় এবং পরীক্ষায় সময় ফুরিয়ে কর্মফলের সময় ঘনিয়ে আসে, তাদের আর তাওবা ও মুক্তির সুযোগ থাকে না। তারা যদি গোটা পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণও মুক্তিপণ হিসাবে দেয়, তবু তাতে কোনো লাভ হবে না। এ অবস্থায় তাকে মুক্তি দেয়ার কেউ থাকবে না। ৯১ ও ৯২ নং আয়াতের বক্তব্য এটাই। যে দানে কোনো লাভ হবে না, তার বর্ণনা দেয়ার পর প্রসংগত যে দান লাভজনক ও আল্লাহর মানোপুত তার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। ৯৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা যতোক্ষণ তোমাদের প্রিয় জিনিস দান করবে না, ততোক্ষণ কল্যাণ পাবে না।' তৎকালীন মুসলমানরা আল্লাহর এই নির্দেশনার মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তারা নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ দান করতেন। উৎকৃষ্টতর পুরস্কার লাভের আশায় তারা এমনটি করতেন।

ইমাম আহমদ হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণনা করেন যে, মদীনায় আবু তালহা সবচয়ে সম্পদশালী আনসারী ছিলেন। বী'র হা নামক পুকুরটি তার সবচেয়ে প্রিয় সম্পত্তি ছিলো এবং তা ছিলো মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত। এই পুকুরের পানি খুব ভালো ছিলো এবং রসূল (স.) তা পান করতেন। যখন এই আয়াতটি নাযিল হলো, তখন আবু তালহা বললেন, হে

আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো বলেছেন প্রিয়তম সম্পদ দান না করলে কল্যাণ পাওয়া যাবে না। বী'র হা আমার প্রিয়তম সম্পত্তি, আমি এটি আল্লাহর পথে দান করে দিলাম এবং এর কল্যাণ ও পুরস্কার আমি আল্লাহর কাছে আশা করি। সুতরাং আপনি এটি যেভাবে খুশী ব্যবহার করুন। রসূল (স.) বললেন, ঠিক আছে। ওটা খুব মূল্যবান সম্পদ। আমি তোমার কথা শুনেছি। আমি এটাই ভালো মনে করি যে, তুমি এটা নিজের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তালহা বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! ঠিক আছে আমি তাই করবো। এরপর আবু তালহা সেটি নিকটাত্মীয়দ এবং তার চাচাতো ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। (বোখারী ও মুসলিম)

বোখারী ও মুসলিমে অপর একটি হাদীসে আছে, যে হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, খয়বারে আমার যে ভূখন্ডটি আছে, তার চেয়ে ভালো আর কোনো সম্পত্তি আমার নেই। এই যমীনের ব্যাপারে আপনি আমাকে কী আদেশ দেন? রসূল (স.) বললেন, মূল যমীনটা রেখে দাও এবং ওর ফসল দান করো।

এভাবে অনেকে আল্লাহর এই আদেশ পালন করতে এগিয়ে এসেছেন। সেদিন ইসলাম তাদেরকে সুপথ দেখিয়েছিলো, তাই তারা এভাবে সম্পদের গোলামী থেকে, মনের সংকীর্ণতা, কৃপণতা এবং স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্তি লাভ করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং দুনিয়ার সকল মোহ থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চতর মর্যাদার সোপানে আরোহণ করেছিলেন।

সূরার দ্বিতীয় অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

আলোচ্য অংশটি সূরা 'আলে ইমরান'-এর পূর্বের অংশ এবং সূরা ' নেসা'র প্রথম অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং 'অল্ মুহ্সানাতু মিনান্ নিসা' পর্যন্ত এর আলোচনা পরিব্যাপ্ত।

'আলে ইমরান'-এর এই অংশটির আলোচনা প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত যা সূরাটির মূল বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলেছে এবং সে বিষয়টি আমরা সূরার তৃতীয় অংশের শুরুতে আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে পরে তা উল্লেখ করা যাবে।

উল্লেখিত চারটি ভাগের প্রথম ভাগে মদীনার আহলে কেতাব ও মুসলমানদের মধ্যে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের একটি দিক বর্ণিত হয়েছে। সূরাটির এই অংশের মুসলমানদের দলীয় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা স্থান পেয়েছে, যা দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসে সংঘটিত বদরযুদ্ধের পর থেকে নিয়ে তৃতীয় বছর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত ওহুদযুদ্ধের পরবর্তীকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।

সমগ্র সূরাটির মধ্যেই দেখা যায় এই যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা। আর এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে ঈমানী চিন্তা-চেতনার রৌশনী পরিস্ফুট এবং দ্বীন ও ইসলামের মূল তাৎপর্য বিদ্যমান। এখানে সেই মহাসত্য ভাস্কর হয়ে উঠেছে যা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে এবং যা নিয়ে সকল নবী-রসূলের আগমন ঘটেছে । সাথে সাথে এখানে সেই আহলে কেতাবদের যাবতীয় কর্মকান্ডের মূল রহস্য উদঘাটিত হয়েছে, যারা নবী (স.) ও তাঁর সংগী-সাথীদের সাথে নানা প্রকার তর্ক বাহাস করে চলেছিলো এবং তাদের সেই হীন উদ্দেশ্য উন্মোচিত হয়েছে যার কারণে তাঁর দ্বীন ইসলাম থেকে তারা ফিরে গিয়েছিলো। মদীনার মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে পৃথক পৃথকভাবে যোগাযোগ করার আশংকা গোপন চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো– তার বিবরণও এখানে পাওয়া যায়। এখানে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করার কথা জানা যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে সত্যের প্রোজ্জ্বল বাতিকে উদ্দীপিত করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর গাফলতি এবং শত্রুদের কথা কান দেয়ার কারণে তাদের মহাবিপদের সম্মুখীন হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

ওপরের অধ্যায়ের মতো দ্বিতীয় অধ্যায়ও সূরাটির বিরাট একটা অংশ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। এ অধ্যায়ে যে সংগ্রামের বর্ণনা রয়েছে তা শুধুমাত্র ষড়যন্ত্র, যোগাযোগ, চেষ্টা-তদবীর এবং

বাকযুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং সে সংগ্রাম ছিলো রণ-হংকার, তরবারি-তীর-ধনুকের ঝনঝনানির সংগ্রাম। এরপর এসেছে ওহুদের মারাত্মক যুদ্ধের, বিভিন্ন দুর্ঘটনা ও তার করুণ পরিণতির। এ বিবরণ এমন হৃদয়গ্রাহী যে, একমাত্র কোরআনের পক্ষেই তা উপস্থাপন করা সম্ভব ছিলো। এ সম্পর্কিত আয়াতগুলো ওহুদযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। এ সকল বিবরণের মধ্যে মুসলমানদের ঈমানী চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ঘটেছে এবং বিবরণ এসেছে যুদ্ধের আলোকে মুসলমানদের বাস্তব প্রশিক্ষণের। যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের চিন্তার ভ্রান্তি ধরা পড়া, এর ফলে তাদের বিশৃংখল অবস্থায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া, মুসলিম দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা ও নেতৃত্বের আনুগত্যের প্রয়োজন সম্পর্কিত আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে যে বিরাট আমানত দান করেছেন, তা বহন করার জন্যে তাদেরকে যোগ্য করে তোলা এবং এ মহান দায়িত্ব দান করে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে সম্মানিত করেছেন তার শোকর গোযারি করা সম্পর্কে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত কথা এসেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা পুনরায় আহলে কেতাবের বিবরণে ফিরে আসছে। সেখানে বলা হয়েছে নবী (স.)-এর সাথে তাদের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার কথা। নবী (স.)-এর মদীনায় পদার্পণ করার সাথে সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং তাদের মতের পরিবর্তনের কারনে তাদেরকে বারবার সাবধান করা হয়, সতর্ক করা হয় যেন তারা অতীতে নবীদের সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। এরপর মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যেন তারা ওদের অনুসরণ না করে। মোমেনদের অন্তরকে দৃঢ়তা দান করা হয়েছে যেন সত্যের পথে টিকে থাকতে গিয়ে জানমালের ওপর আসা যে কোনো পরীক্ষায় তারা টিকে থাকতে পারে এবং আহলে কেতাব ও মোশরেকদের দেয়া সকল দুঃখ-কষ্ট তারা যেন অম্লান-বদনে সহ্য করতে পারে।

শেষ অধ্যায়টিতে মোমেনরা তাদের রব-এর সাথে যে সম্পর্কে আবদ্ধ তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তারা যখন সৃষ্টির বুকে আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করে, তখন তাদের অন্তরে যে ভাবের সৃষ্টি হয় এই অধ্যায়ের প্রতিটি ছত্রে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। দেখানো হয়েছে কিভাবে মোমেনরা প্রকম্পিত হৃদয়ে, ভক্তি গদগদ কণ্ঠে এবং কাতরস্বরে তাদের রব এবং সমগ্র সৃষ্টির মালিক আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে আকুল আকুতি জানায়, আর এর জবাবে তাদের পরওয়ারগেদার যেন তাঁর ক্ষমার অবারিত দ্বার খুলে দিচ্ছেন এবং তাদেরকে নেক প্রতিদান দ্বারা ধন্য করছেন। সাথে সাথে তারা যেন বাস্তব চোখে কাফেরদের এই হীন অবস্থা দেখতে পায় এবং পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তাদের একান্ত চাওয়া ও পাওয়ার তুচ্ছ বস্তু সামগ্রী প্রত্যক্ষ করতে পারে। তাদের শেষ আশ্রয়স্থল জাহান্নাম কতো নিকৃষ্ট বাসস্থান তাও যেন ভালো করে দেখে নিতে পারে।

মোমেনদের প্রতি আল্লাহর যে আহ্বান দ্বারা সূরাটির পরিসমাপ্তি হয়েছে তাহলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে তারা যেন অবিচল থাকতে পারে। একে অপরকে সবর করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে সর্বোপরি সফলতা লাভের কামনায় সর্বদা তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি জাগরূক রাখতে পারে।

এইভাবে দেখা যায়, চারটি বর্ণনাধারা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত হয়ে তৃতীয় পারায় বর্ণিত বিষয়টিকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে সেই বিষয়ের প্রধান প্রধান কথাগুলো আমরা বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছি। আর ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে আমরা সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

বর্তমান পারায় দ্বিতীয় অধ্যায়টি হচ্ছে সূরা 'নেসা'র প্রথম অংশ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিকভাবে আলোচনা করার তাওফীক দান করুন।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ
عَلَىٰ نَفْسِهِۦ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَىٰةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا۟
بِالتَّوْرَىٰةِ فَاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى
اللَّهِ الْكَذِبَ مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ﴿٩٤﴾ قُلْ
صَدَقَ اللَّهُ ۗ فَاتَّبِعُوا۟ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ
وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

৯৩. (আজ তোমাদের জন্যে যে) সব খাবার (হালাল করা হয়েছে তা এক সময়) বনী ইসরাঈলদের জন্যেও হালাল ছিলো, (অবশ্য) এমন (দু'একটা) জিনিস বাদে, যা তাওরাত নাযিল হওয়ার আগেই ইসরাঈল তার নিজের ওপর হারাম করে রেখেছিলো; তুমি বলো (সন্দেহ থাকলে যাও), তোমরা গিয়ে তাওরাত নিয়ে এসো এবং তা পড়ে শোনাও, যদি (তোমরা তোমাদের দাবীর ব্যাপারে) সত্যবাদী হও! ৯৪. যারা এরপরও আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে, নিসন্দেহে তারা (বড়ো) যালেম। ৯৫. তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালা সত্য কথা বলেছেন, অতএব তোমরা সবাই নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করো, আর ইবরাহীম কখনো (আল্লাহর সাথে) মোশরেকদের (দলে) শামিল ছিলো না। ৯৬. নিশ্চয়ই গোটা মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটি বানিয়ে রাখা হয়েছিলো তা ছিলো বাক্কায় (তথা মক্কা নগরীতে,) এ ঘরকে কল্যাণ মঙ্গলময় এবং (মানবকুলের) দিশারীটি বানানো হয়েছিলো। ৯৭. এখানে রয়েছে (আল্লাহ তায়ালার) সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, (আরো) রয়েছে (এবাদাতের জন্যে) ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান (এই ঘরের বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে), যে এখানে প্রবেশ করবে সে (দুনিয়া আখেরাত উভয় স্থানেই) নিরাপদ (হয়ে যাবে; দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে) মানব জাতির ওপর আল্লাহর জন্যে এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিরই এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ থাকবে, সে যেন এই ঘরের হজ্জ আদায় করে, আর যদি কেউ (এ বিধান) অস্বীকার করে (তার জেনে রাখা উচিত), আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকুলের মোটেই মুখাপেক্ষী নন।

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ

عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ

الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ

رَسُولُهُ ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

৯৮. (হে নবী!) তুমি বলো, হে আহলে কিতাবরা, তোমরা কেন (জেনে বুঝে) আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করো, অথচ তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তায়ালাই তার ওপর সাক্ষী। ৯৯. তুমি (আরো) বলো, হে আহলে কিতাবরা, যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেন তাদের আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করছো (এভাবেই) তোমরা (আল্লাহর) পথকে বাঁকা করতে চাও, অথচ (এই লোকদের সত্যপন্থী হবার ব্যাপারে) তোমরাই তো সাক্ষী; আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এই সব (বিদ্রোহমূলক) আচরণ সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নন। ১০০. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো– (আগে) যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তোমরা যদি তাদের কোনো একটি দলের কথা মেনে চলো, তাহলে (মনে রেখো), এরা ঈমান আনার পরও (ধীরে ধীরে) তোমাদের কাফের বানিয়ে দেবে। ১০১. আর তোমরা কিভাবে কুফরী করবে, যখন তোমাদের সামনে (বার বার) আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হচ্ছে, তাছাড়া (এ আয়াতের বাহক স্বয়ং) আল্লাহর রসূল যখন তোমাদের মাঝেই মজুদ রয়েছে, যে ব্যক্তিই আল্লাহ (ও তাঁর বিধান)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, সে অবশ্যই সোজা পথে পরিচালিত হবে।

রুকু ১১

১০২. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে ভয় করো, ঠিক যতোটুকু ভয় তাঁকে করা উচিত, (আল্লাহর কাছে সম্পূর্ণ) আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না। ১০৩. তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ

مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ

وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ

بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ يَّوْمَ

تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۚ

কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর (সেই) নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের দুশমন ছিলে, অতপর আল্লাহ তায়ালা (তাঁর দ্বীনের বন্ধন দিয়ে) তোমাদের একের জন্যে অপরের মনে ভালোবাসার সঞ্চার করে দিলেন, অতপর (যুগ যুগান্তরের শত্রুতা ভুলে) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে একে অপরের 'ভাই' হয়ে গেলে, অথচ তোমরা ছিলে (হানাহানির) অগ্নিকুন্ডের প্রান্তসীমায়, অতপর সেখান থেকে আল্লাহ তায়ালা (তাঁর রহমত দিয়ে) তোমাদের উদ্ধার করলেন; আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারো। ১০৪. তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষদের কল্যাণের দিকে ডাকবে, সত্য ও) ন্যায়ের আদেশ দেবে, আর (অসত্য ও) অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে; (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে সাফল্যমন্ডিত। ১০৫. তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে; এরাই হচ্ছে সে সব মানুষ যাদের জন্যে কঠোর শাস্তি রয়েছে। ১০৬. সে (কেয়ামতের) দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র সমুজ্জ্বল হয়ে যাবে, (আবার) কিছু সংখ্যক মানুষের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (ও বিশ্রী) হয়ে পড়বে, (হাঁ) যাদের মুখ (সেদিন) কালো হয়ে যাবে (জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের জিজ্ঞেস করবে), ঈমানের

أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا
اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ
وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١١١﴾ ضُرِبَتْ

(নেয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসেবে) এ আযাব উপভোগ করতে থাকো! ১০৭. আর যাদের চেহারা আলোকোজ্জ্বল হবে, তারা (সেদিন) আল্লাহ তায়ালার (অফুরন্ত) দয়ার আশ্রয়ে থাকবে, তারা সেখানে থাকবে চিরদিন। ১০৮. এর সব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন, যথাযথভাবে আমি সেগুলো তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি; কেননা আল্লাহ তায়ালা (তাঁর আয়াতসমূহ গোপন রেখে এবং পরে সে জন্যে শাস্তির বিধান করে) সৃষ্টিকুলের ওপর কোনো যুলুম করতে চান না। ১০৯. (মূলত) আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্যে; সব কিছুকে একদিন আল্লাহর দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।

রুকু ১২

১১০. তোমরাই (হচ্ছো দুনিয়ার) সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির (কল্যাণের) জন্যেই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর (পুরোপুরি) ঈমান আনবে, আহলে কিতাবরা যদি (সত্যি সত্যিই) ঈমান আনতো তাহলে এটা তাদের জন্যে কতোই না ভালো হতো; তাদের মধ্যে কিছু কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, তবে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে সত্যত্যাগী লোক। ১১১. সামান্য কিছু দুঃখ কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কখনো কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তারা যদি কোনো সময় তোমাদের সাথে সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়, তাহলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতপর তাদের কোনো রকম সাহায্য করা হবে না। ১১২. যেখানেই এদের পাওয়া যাবে

عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ
مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ
الْمَسْكَنَةُ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ
الْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾ لَيْسُوا
سَوَآءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُونَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ
الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي
الْخَيْرٰتِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١١٤﴾ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَنْ يُّكْفَرُوهُ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۚ

সেখানেই এদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে রাখা হবে, তবে আল্লাহ তায়ালার নিজের প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতি (-র মাধ্যমে কিছুটা নিরাপত্তা পাওয়া গেলে সেটা) ভিন্ন, এরা (আল্লাহর ক্রোধ ও) গযবের পাত্র হয়েছে, এদের ওপর দারিদ্র ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এর কারণ ছিলো, এরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধানকে অস্বীকার করেছে, (আল্লাহর) নবীদের এরা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে; (মূলত) এ হচ্ছে তাদের বিদ্রোহ ও সীমালংঘনের ফল। ১১৩. তারা (আহলে কিতাব) আবার সবাই এক রকম নয়, তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে; যারা (সত্য ও ন্যায়ের ওপর অবিচল হয়ে) দাঁড়িয়ে আছে, যারা সারা রাত আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নামায পড়ে। ১১৪. তারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান রাখে এবং (মানুষদের) তারা ন্যায় কাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সৎকাজে এরা প্রতিযোগিতা করে, এ (ধরনের) মানুষরাই হচ্ছে (মূলত) নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত। ১১৫. তারা যা কিছু ভালো কাজ করবে (প্রতিদান দেয়ার সময়) তা কখনো অস্বীকার করা হবে না; (কারণ) আল্লাহ তায়ালা পরহেযগার লোকদের ভালো করেই জানেন। ১১৬. (একথা) সুনিশ্চিত, যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করে, তাদের ধন সম্পদ, সন্তান সন্ততি আল্লাহ তায়ালার মোকাবেলায়

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا

তাদের কোনোই উপকারে আসবে না; বরং তারা হবে (নিশ্চিত) জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে অনন্তকাল তারা পড়ে থাকবে। ১১৭. এ (ধরনের) লোকেরা এ দুনিয়ার জীবনে যা খরচ করে, তার উদাহরণ হচ্ছে, যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছে সেই দলের শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে প্রবাহমান হীমশীতল (তীব্র) বাতাসের মতো, যা (তাদের শস্যক্ষেত) বরবাদ করে দিয়ে গেলো; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর কোনোই অবিচার করেননি; বরং (কুফরীর পন্থা অবলম্বন করে) এরা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে। ১১৮. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কখনো নিজেদের (দলভুক্ত) লোকজন ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের (অন্তরংগ) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, কেননা এরা তোমাদের অনিষ্ট সাধনের কোনো পথই অনুসরণ করতে দ্বিধা করবে না, তারা তো তোমাদের ক্ষতি (ও ধ্বংস)-ই কামনা করে, তাদের (জঘন্য) প্রতিহিংসা ও (বিদ্বেষ) তাদের মুখ থেকেই (এখন) প্রকাশ পেতে শুরু করেছে, অবশ্য তাদের অন্তরে লুকানো হিংসা (ও বিদ্বেষ) বাইরের অবস্থার চাইতেও মারাত্মক, আমি সব ধরনের নিদর্শনই তোমাদের সামনে খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, তোমাদের যদি সত্যিই জ্ঞানবুদ্ধি থাকে (তাহলে তোমরা এ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে)। ১১৯. এরা হচ্ছে সেসব মানুষ, যাদের তোমরা ভালোবাসো; কিন্তু তারা তোমাদের (মোটেই) ভালোবাসে না, তোমরা তো (তোমাদের আগে আমার নাযিল করা) সব কয়টি কিতাবের ওপরও ঈমান আনো (আর তারা তো তোমাদের কিতাবকে বিশ্বাসই করে না), এ (মোনাফেক) লোকগুলো যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, হ্যাঁ, আমরা (তোমাদের কিতাবকে) মানি, আবার যখন

اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ

مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾ اِنْ تَمْسَسْكُمْ

حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ؗ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا

وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾

এরা একান্তে (নিজেদের লোকদের কাছে) চলে যায়, তখন নিজেদের ক্রোধের বশবর্তী হয়ে এরা তোমাদের (সাফল্যের) ওপর (নিজেদের) আংগুল কামড়াতে শুরু করে; তুমি (তাদের) বলো, যাও, নিজেদের ক্রোধের (আগুনে) নিজেরাই (পুড়ে) মরো, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (এ মোনাফেকদের) মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা যাবতীয় (চক্রান্তমূলক) বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। ১২০. (তাদের অবস্থা হচ্ছে,) তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে (তার কারণে) তাদের খারাপ লাগে, আবার তোমাদের কোনো অকল্যাণ দেখলে তারা আনন্দে ফেটে পড়ে; (এ প্রতিকূল অবস্থায়) যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারো এবং নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তাদের চক্রান্ত (ও ষড়যন্ত্র) তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের যাবতীয় কর্মকান্ড পরিবেষ্টন করে আছেন।

তাফসীর
আয়াত ৯৩-১২০

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েমের বিরুদ্ধে দুশমনীর চরম অবস্থা দেখতে পাই, আহলে কেতাবের সাথে তর্ক বিতর্ক ও বাহাস-এর মাধ্যমে তখন এ দুশমনী চলছিলো। তবে নাজরান থেকে আগত প্রতিনিধিদের বাহাস এর আওতায় পড়ে না। এ বিষয়টি হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। এতোটুকু বলা যায় যে, আহলে কেতাবের উভয় সম্প্রদায়-ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাহাসের বিষয়বস্তু ও ধরন ছিলো প্রায় একই প্রকার বরং বলা যায় যেন একটা ছিলো আর একটার পরিপূরক। যদিও এ অংশটি ইহুদীদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। এদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র মদীনার মুসলিম জামায়াতকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো এবং ধ্বংসাত্মক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে তা গিয়ে সমাপ্ত হতো। এর দ্বারা চূড়ান্তভাবে একথাটা স্পষ্ট হয়ে যেতো যে, মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো প্রকার আপোষরফায় আসা সম্ভব নয়। এরপর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখা যায় মুসলিম জামায়াতকে সম্বোধন করে বক্তব্যের ধারা এগিয়ে গেছে। সত্য ও সঠিক পথে থাকতে গিয়ে যেসব কাজ তাদের করতে হবে তার বিবরণ দান করা হয়েছে। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে সূরা বাকারাতে যেভাবে কথা বলা হয়েছে আলোচ্য অংশে সেই ধারারই অনুসরণ করা হয়েছে। এ কারণে সূরা দু'টি সাদৃশ্যপূর্ণ।

আলোচ্য পাঠে বলা হয়েছে, সকল খাদ্য খাবারই বনী ইসরাঈলের জন্যে হালাল ছিলো। নিষিদ্ধ ছিলো একমাত্র সেইগুলো, যেগুলো তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল(১) নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিলেন। এই বিবরণীতে বনী ইসরাঈলদের এ অভিযোগের জবাবও এসে গেছে যে, ইহুদীদের জন্যে যে সব খাদ্য-খাবার নিষিদ্ধ তা কোরআন হালাল করে দিয়েছে। সাথে সাথে বিরোধিতার শাস্তি স্বরূপই যে এ সকল খাদ্য-খাবার নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো তাও বলে দেয়া হয়েছে।

তারপর একইভাবে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে সূরা 'বাকারা'র একটি বড় অংশ জুড়ে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং জানানো হয়েছে যে, 'কাবা' হচ্ছে ইবরাহীম (আ.)-এর (নির্মিত) ঘর এবং পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দাসত্বের আনুষ্ঠানিক এবাদাতের জন্যে এই ঘরটিই সর্বপ্রথম স্থাপন করা হয়। অতএব, যারা ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর হওয়ার দাবী করে, তাদের পক্ষে এ অভিযোগ তোলা অশোভনীয়।

এ আলোচনার পরই আসছে আহলে কেতাবদের সমালোচনা। কারণ তারা জেনে বুঝে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করছিলো এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দিচ্ছিলো। এমনকি খোদ বহু মুসলমানদেরও তারা সংশয়ের মাঝে ফেলেছিলো। তারা তাদের অনেকের মনকে বাঁকা পথের দিকে ঝুঁকিয়ে ফেলেছিলো এবং পার্থিব জীবনের লালসাকে তাদের সামনে বড় করে তুলেছিলো, অথচ এই আহলে কেতাবরা সত্যকে উপলব্ধি করতো। সুতরাং না জানার কারণে তারা এমন ব্যবহার করতো এটা মোটেই ঠিক নয়।

এই কারণেই সকল আহলে কেতাবকে ডেকে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং মুসলিম জামায়াতকেও হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, যেন তারা এ আহলে কেতাবদের অনুসরণ না করে। কেননা তাদের অনুসরণ করা হবে 'কুফরী'র শামিল। আর মুসলিম উম্মাহর জন্যে এ ধরনের কুফরীতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া কিছুতেই শোভা পায় না– যেহেতু নিরন্তর তাদেরকে আল্লাহর কেতাব পড়ে পড়ে শোনানো হচ্ছে। তাদের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর রসূল (স.)ও বর্তমান রয়েছেন এবং তিনিও তাদেরকে নিয়মিত শিক্ষা দান করে চলেছেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর ভয় অন্তরে রেখে জীবন যাপন করতে আহ্বান জানাচ্ছেন এবং মৃত্যুর পর আল্লাহর সাক্ষাত পর্যন্ত ইসলামের পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকতে উদ্বুদ্ধ করছেন। ইসলামের পতাকাতলে একতাবদ্ধভাবে সমবেত থাকার জন্যে তিনি বারবার তাদেরকে আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ করাচ্ছেন। তাদের মধ্যে যেহেতু ইতিমধ্যে কিছু মতান্তর দেখা দিয়েছিলো এবং তারা এর ফলে কিছু ঝগড়া-বিবাদেও লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে তাদের অবস্থা এতোটা নাযুক হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা যেন আগুনের এক অতলান্ত গহ্বরের একেবারে কিনারে পৌঁছে গিয়েছিলো। সেই কঠিন অবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা ইসলাম রূপী নেয়ামত দ্বারা তাদেরকে উদ্ধার করলেন এবং নির্দেশ দিলেন, যেন তারা এমন জাতি হিসাবে গড়ে ওঠে, যারা মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং যাবতীয় মন্দ ও অপ্রিয় কাজ থেকে তাদের বিরত রাখবে। তারা তাদের জীবনের কাজ, কথা ও ব্যবহার দ্বারা আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার বাস্তব প্রমাণ দেবে এবং এইভাবেই তারা হবে সত্য পথের সংরক্ষক। ষড়যন্ত্রকারী আহলে কেতাবদের কথায় কান না দেয়ার জন্যে তারাই হবে তাদের একে অপরের সতর্ককারী। এ দায়িত্ব পালন না করলে তারা (সে আহলে কেতাবদের মতোই)

---

(১) প্রকাশ থাকে যে, ইবরাহীম (আ.)–এর পৌত্র নবী ইয়াকুব (আ.)–এর আর এক নাম ছিল ইসরাঈল। বিশেষ কোন কারণে তিনি কখনো কোনো কোনো জিনিস খেতেন না। তাঁর বংশধররা তাঁর ব্যক্তিগত অপছন্দ বা অসুবিধার কারণকে গুরুত্ব না দিয়ে ঢালাওভাবে নিজেরা সেগুলোকে বর্জনীয় সাব্যস্ত করে এবং নাফরমানী করে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করে। ফলে তাদের জন্য পরবর্তীতে সেগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।–সম্পাদক।

নানা ফেরকাতে ভাগ হয়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। বিভিন্ন হাদীসে জানা যায় যে, ইহুদীদের পক্ষ থেকে 'আওস ও 'খাযরাজ' দু'টি গোত্রের নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করার পরিপ্রেক্ষিতে হুশিয়ারীবাণী হিসাবে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

এরপর আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মুসলমানদের পদমর্যাদা এবং তাদের ভূমিকা কী হওয়া দরকার তা জানাতে গিয়ে বলছেন–

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে (মানুষের জন্যে কল্যাণকর বলে স্বীকৃত) সকল ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ ঈমান রাখবে।'

একথাগুলো দ্বারা তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অবহিত করা হচ্ছে। তাদেরকে তাদের দুশমনদের শক্তিহীনতা ও তুচ্ছতা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে, যতোই তারা মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্ষতি করতে চায় তারা কিছুই করতে পারবে না। স্থায়ীভাবে তাদের ওপর আল্লাহর সে দুশমনরা কিছুতেই বিজয়ী হতে পারবে না। তাদের সকল প্রকার প্রচেষ্টা ও দৌড়াদৌড়িতে অবশ্য সাময়িকভাবে কিছু কষ্ট মুসলমানদের হবে। তারপর নিজেদের মত ও পথে দৃঢ় থাকার কারণে অবশ্যই তারা আল্লাহর সাহায্য পাবে। অপরদিকে, আল্লাহর সেসব দুশমনকে ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত অপমানকর যিন্দেগী দান করবেন, এইভাবে নানা নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া এবং বহু নবীকে হত্যা করার অপরাধে তারা আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হবে। এই সব আহলে কেতাবদের মধ্যে ব্যতিক্রম তারা, যারা সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, ঈমান এনেছে এবং মুসলমানদের জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার নীতি মেনে নিয়েছে এবং সকল প্রকার কল্যাণকর বিধি-বিধানকে চালু করার জন্যে চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর ভাষায়, 'ওরা হচ্ছে সৎ ও নেক লোকের অন্তর্গত।' এরপর আল্লাহ তায়ালা সে সকল কাফেরদের প্রত্যাবর্তনস্থল নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন, যারা মুসলিম হয়নি। তাদের অস্বীকৃতির দরুন তাদের পাকড়াও করা হবে। যেসব ধন-সম্পদ তারা আজকে ব্যয় করছে সেদিন তা তাদের কোনো কাজে আসবে না। তাদের সন্তানাদিও সেদিন তাদের কোনো উপকার করতে পারবে না– একমাত্র ধ্বংসই হবে তাদের পরিণতি।

এ পাঠের পরিসমাপ্তি ঘটেছে মোমেনদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণের সাথে যেন তাদের কোনো গোপন কথা কোনো আহলে কেতাবকে না জানানো হয়। কারণ তারা মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দেখা পছন্দ করে এবং তাদের মুখ থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ ঝরে পড়ে। আর তাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তা আরো মারাত্মক। মুসলমানদের অকল্যাণ করতে না পেরে রাগের বশে তারা তাদের আংগুলগুলো কামড়াতে থাকে। মুসলমানদের ওপর কোনো বিপদ হলে তারা খুশী হয় এবং মুসলমানরা কোনো কল্যাণ লাভ করলে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়। অপরদিকে মুসলমানরা আল্লাহভীতি এবং সত্যের পথে অবিচল থাকার পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দান করবেন, ওসব দুশমনের সকল অকল্যাণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। এরশাদ হচ্ছে,

'ওরা যা কিছু করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা, তার সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণকারী।'

এই দীর্ঘ ব্যাখ্যার মাধ্যমে তখনকার মুসলিম জনসমষ্টিকে আহলে কেতাবদের নানা প্রকার ষড়যন্ত্র ও মুসলমানদের মধ্যে নানা প্রকার বিভেদ সৃষ্টি করার হীন প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে। অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রশ্নে ইসলামের দুশমনরা কতো প্রকার কৌশল অবলম্বন করতে পারে তাদের জানানো হচ্ছে, যাতে করে শক্তিশালী দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের দলীয় সংহতিকে স্থিতিশীল করার সকল মূলমন্ত্র সম্পর্কে তারা সঠিকভাবে

ওয়াকেফহাল হয়ে যায় এবং বিরোধীদের সাথে তাদের পার্থক্যও চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা চান, সে সকল হটকারী আহলে কেতাবদের সাথে মুসলমানদের সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাক, যা তাদেরকে এতোদিন পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিলো।

তারপর এইভাবে মুসলমানদের পরিচালনার ধারা পরবর্তীকালের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে চালু থেকেছে। তারপর প্রত্যেক যুগেই আহলে কেতাবদের শত্রুতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুসলিম উম্মাহকে সতর্কীকরণের কাজও বিভিন্ন উপায়ে ও বিভিন্ন ধরনে চালু থেকেছে। হুশিয়ারীর এই বিষয়টি বরাবর একই থেকেছে।

হালাল হারামের ব্যাপারে তাওরাত ও কোরআনের নীতি

এরশাদ হচ্ছে,

'সকল খাদ্যই বনী ইসরাঈদের জন্যে হালাল ছিলো, শুধু সেইগুলো বাদে যেগুলো তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের ওপর নিজের হারাম কারে নিয়েছিলো। বল, তাওরাত এনে পড়ে শোনাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। এরপর জেনে রেখো, আল্লাহর ওপর যারা মিথ্যা আরোপ করে তারাই যালেম।'

ইহুদীরা মোহাম্মদ (স.)-এর রেসালাতের যথার্থতাকে কটাক্ষ ও অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার অজুহাত তালাশ করতো। তারা চাইতো যেন রেসালাত মেনে নেয়ার ব্যাপারে মানুষের মনে নানা প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব এসে যায় এবং তাঁকে মানার ব্যাপারে যেন তারা অস্বস্তি বোধ করে। তারপর যখন কোরআন ঘোষণা দিলো, 'এই কেতাব (কোরআন) তাওরাতের সত্যায়নকারী', তখন তারা বলে উঠলো, তাহলে কোরআন সেই বনী ইসরাঈলদের জন্যে কেন সব জিনিসকে হালাল করলো যা তাদের জন্যে আগে হারাম করা হয়েছিলো?

বিভিন্ন রেওয়ায়াতে জানা যায় যে, তারা উটের গোশত ও দুধ সম্পর্কে বলতো যে, এগুলো বনী ইসরাঈলদের জন্যে হারাম। এই রকম আরো কিছু নিষিদ্ধ জিনিস আছে যা মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা হালাল করেছেন।

এখানে তাদেরকে কোরআন এক ঐতিহাসিক সত্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যে কথাটি তারা কোরআনের বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই ভুলে যেতে চাচ্ছে। আর সে সত্যটি হচ্ছে কোরআন তাওরাতের সত্যায়নকারী। এতদসত্তেও কোরআন এমন কিছু জিনিস হালাল করেছে যা ইসরাঈলদের জন্যেও হালাল ছিলো। সত্য কথা হলো যে, বনী ইসরাঈলের জন্যে সকল খাবারই হালাল ছিলো, শুধু সেইগুলো ছাড়া যেগুলোকে তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে স্বয়ং ইসরাঈল নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছিলেন। ইসরাঈল হচ্ছেন স্বয়ং ইয়াকুব (আ.)।

বিভিন্ন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি একবার এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তখন তিনি মানত করেন যে, সুস্থ হলে তিনি তাঁর সব চাইতে প্রিয় খাবার উটের গোশত ও দুধ, আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে খাওয়া ত্যাগ করবেন। পরবর্তীকালে ইসরাঈলীদের মধ্যে তাদের পূর্ব পুরুষদের অনুসরণে সে খাদ্য বস্তুগুলোকে হারাম মনে করার প্রথা চালু হয়ে যায়। এটা অবশ্যই ছিলো এক সাংঘাতিক ব্যাপার। এক ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত কোনো কারণে কোনো জিনিস বর্জন করলে তার বংশের লোকেরা সে জিনিসটাকে নিজেদের ওপর একেবারে হারাম করে নেবে এবং এভাবে তারা নিজেদেরকে নিজেদের বিধানদাতা বানিয়ে নেবে এটা অবশ্যই ছিলো এক বড় অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে আরো কয়েকটি খাদ্য হারাম করে দিয়েছিলেন। সেসব হারাম ঘোষিত খাদ্য সম্পর্কে সূরা 'আনআম'-এর একটি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

'আর যারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিলো তাদের জন্যে আমি হারাম করে দিয়েছিলাম সর্বপ্রকার নখওয়ালা (পাখীর গোশত) এবং গরু ও ছাগলের (আলগা) চর্বি, তবে, পৃষ্ঠদেশে লেগে থাকা নাড়ি ভুড়ির সাথে জড়িয়ে থাকা অথবা হাড়ের সাথে মিশে থাকা চর্বিকে আমি হারাম করিনি। তাদের বিদ্রোহাত্মক কাজের দরুনই আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।'

এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার পূর্বে এসব জিনিস বনী ইসরাঈলদের জন্যে কিন্তু হালালই ছিলো। এ সত্যের দিকে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন যে, উল্লেখিত খাদ্য-খাবারের ব্যাপারে প্রকৃত সত্য হচ্ছে এগুলো সবই হালাল জিনিস। বিশেষ প্রেক্ষাপটেই এগুলোকে হারাম করা হয়েছিলো। অতএব, মুসলমানদের জন্যে এগুলোকে হালাল বলে ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষিতে কোনো অভিযোগ তুলে এই মহান কোরআনের মধ্যে সন্দেহ আরোপ করারও কোনো অবকাশ নেই এবং (কোরআনে বর্ণিত) এই বিধানই হচ্ছে সর্বশেষ বিধান।

এরপর জোরালো দাবীর সাথে তাদেরকে তাওরাতের দিকে ফিরে আসার জন্যে আহ্বান জানিয়ে বলা হচ্ছে তারা যেন গভীরভাবে তাওরাত অধ্যায়ন করে। তাহলে তারা শুধু তাদের জন্যে বিশেষভাবে এই নিষিদ্ধ হওয়ার কারণগুলো দেখতে পাবে।

সর্বপ্রথম কেবলা কাবার ইতিহাস মর্যাদা ও ইহুদীদের ভূমিকা

এরশাদ হচ্ছে, 'বলো (হে রসূল), নিয়ে এসো তাওরাত, এনে পড়ে শোনাও দেখি, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।'

তারপর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করছে অত্যন্ত কঠিনভাবে তাকে ধমক দিয়ে বলা হচ্ছে যে, সে অবশ্যই যালেম হিসাবে পরিগণিত হবে।' সে না প্রকৃত সত্যের প্রতি, না নিজের প্রতি, আর না জনগণের প্রতিও সে কোনো ইনসাফ করছে। তাদের জেনে রাখা দরকার যে, যালেমের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। সুতরাং সেসব যালেমদের জন্যে তিরস্কারের এই ভাষা প্রয়োগই তাদের করুণ পরিণতি জানানোর জন্যে যথেষ্ট। এতে করে বুঝা যায়, তাদের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণাদায়ক আযাব অপেক্ষা করছে।

এমনি করে ইহুদীরা কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারটিও তুলে ধরলো এবং বারবার সে কথার পুনরাবৃত্তি করলো। রসূল (স.) হিজরতের পরেও ষোল-সতের মাস ধরে বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন এবং এ বিষয়ে ইতিপূর্বে সূরা বাকারার বিস্তারিত আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মুসলমানদের জন্যে কাবা শরীফকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করাটাই সঠিক এবং এটাই প্রথম কেবলা। অপরদিকে বায়তুল মাকদেসকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করাটা ছিলো একটা সাময়িক ব্যাপার এবং বিশেষ এক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন ছিলো। এর উপযোগিতা সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও ইহুদীরা এ প্রসংগটার বারবার এর পুনরাবৃত্তিও করছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পষ্ট সত্যের ব্যাপারে নানা প্রকার সন্দেহ আরোপ করে সত্যকে জটিল করে তোলা। আজও দীন-ইসলামের ওসব দুশমনরা একইভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশ্ন তুলে দীন ইসলামকে সন্দেহজনক করে তোলার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এখানে আল্লাহ তায়ালা নতুন এক বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রকে তাদেরই মুখের ওপর ছুঁড়ে মারছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'বলে দাও (হে রসূল) আল্লাহ তায়ালা সত্য বলেছেন। অতএব, নিষ্ঠার সাথে ইবরাহীমের জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করো, আর (জেনে রেখো) সে কখনো মোশরেকদের অন্তর্গত ছিলো না। প্রথম যে ঘরটিকে স্থাপন করা হয় গোটা মানবজাতির জন্যে, তা হচ্ছে মক্কা নগরীতে স্থাপিত (এই কাবাঘর), এ ঘর বিশ্ব জগতের সবার জন্যেই হেদায়াতের কেন্দ্র। এই ঘরের মধ্যে রয়েছে

কিছু স্পষ্ট নিদর্শন। (যেমন) মাকামে ইবরাহীম, আর যে ব্যক্তি এই ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে। আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সেই সকল মানুষের ওপর এই ঘরের হজ্জ ফরয করা ...... কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন।'

সম্ভবত 'কুল সাদাক্বাল্লাহু'.......আয়াতের শেষ পর্যন্ত যে কথাগুলো বলা হয়েছে তার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে যা কিছু ইতিপূর্বে বলেছেন সেই দিকেই ইংগীত করেছেন। বলেছেন, মানুষের আশ্রয়স্থল ও নিরাপত্তা লাভের স্থান হিসাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এই ঘরটিই বানিয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন যেন এ ঘরটি হেদায়াত প্রদর্শনের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সার্বক্ষণিক এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর এই কারণেই ইবরাহীম (আ.)-এর শেরেকমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদবাদী জীবনাদর্শকে অনুসরণ করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এরশাদ হচ্ছে,

'ইবরাহীম (আ.)-এর জীবনাদর্শকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করো। আর সে কোনো মোশরেকদের অন্তর্গত ব্যক্তি ছিলো না।'

অপরদিকে ইহুদীরা মনে করতো তারাই ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধর এবং উত্তরাধিকারী। সুতরাং এই পর্যায়ে কোরআনে করীম তাদেরকে সঠিকভাবে ইবরাহীম (আ.)-এর আদর্শ সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছে। সে আদর্শ হচ্ছে সর্বপ্রকার শেরেক থেকে দূরে থাকা। এ সত্যটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দুইবার বর্ণনা করা হচ্ছে, প্রথম বারে বলা হচ্ছে, তিনি ছিলেন সত্যপথের নিষ্ঠাবান একজন পথিক এবং দ্বিতীয় বারে বলা হচ্ছে, মোশরেকদের দলে শামিল ছিলেন না।

এপর সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করে দেয়া হচ্ছে যে, কাবাকে কেবলা হিসাবে গ্রহণ করে সেই দিকে মুখ করে নামায পড়ো। কারণ এই ঘরটিকেই পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো, যাতে করে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রতিজ্ঞা এবং আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করার জন্যে এই ঘরকেই মানুষ কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। আর এই কারণেই এ ঘরের ভিত্তিগুলোকে সমুন্নত করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ দেন। তিনি তাকে আরো জানিয়ে দেন যে, এই ঘর তাদের জন্যে নির্দিষ্ট, যারা এই ঘরটির তাওয়াফ করবে, আল্লাহর স্মরণে ধ্যানমগ্ন হয়ে একনিষ্ঠভাবে এখানে পড়ে থাকবে এবং রুকু ও সেজদা দান করার মাধ্যমে তারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করতে থাকবে। তিনি এ ঘরকে বরকতময় বানিয়েছেন এবং বিশ্বমানবতার হেদায়াত লাভের উৎস স্থল করেছেন। এখানে তারা আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার সন্ধান পাবে, যা ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছিলো। যেখানে দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আ.) এ ঘরের নির্মাণ কাজ চালিয়েছিলেন সেই স্থানে তার পদচিহ্নের স্পষ্ট ছাপ এখনও বর্তমান (মাকামে ইবরাহীম বলতে বুঝায় সেই ছাপযুক্ত পাথরটি– যার ওপর দাঁড়িয়ে ইবরাহীম (আ.) এই পবিত্র ঘরটি নির্মাণ করেছিলেন)।

এ পাথরটি পবিত্র কাবা শরীফের একেবারে সংলগ্ন ছিলো, দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) এই পাথরটি একটু দূরে সরিয়ে নেন যাতে করে এই পাথর দেখার জন্যে আগত তাওয়াফকারীদের নামায আদায়ে কোনো কষ্ট না হয়। এই স্থানটিকে নামাযের স্থান করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে, 'আর মাকামে ইবরাহীম (আ.)-কে নামাযের জায়গা হিসাবে গ্রহণ করো।'

এই ঘরের মর্যাদা সম্পর্কে আরো বলা হয়, যে ব্যক্তি এ ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যাবে। এমন কি যে কোনো ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির জন্যেও এ ঘর নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এমন নিরাপদ স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.) এ ঘরটি তৈরী করার পর থেকে বরাবরই নিরাপদ থেকেছে। এমনকি সেই জাহেলী যুগেও– যখন আরবরা ইবরাহীম (আ.)-এর প্রদর্শিত জীবনপদ্ধতি থেকে যোজন যোজন দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলো।

এ বিষয়ে হাসান বস্‌রী ও আরো অনেকের কথা থেকে জানা যায় যে, অনেক সময় এমনও হয়েছে, কখনও কোনো ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার পর এই বায়তুল হারামে প্রবেশ করেছে, সেখানে নিহত ব্যক্তির পুত্রের সাথে তার সাক্ষাত হয়েছে কিন্তু ওখান থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত সে তাকে কিছুই বলেনি। এটাই ছিলো নিরাপদ করার তাৎপর্য। এমনকি আরব জাহেলিয়াতের যুগে আশপাশের এলাকার লোকেরাও এ ঘরকে সম্মান দিতো। আল্লাহ তায়ালা এ ঘরের মর্যাদাকে আরবের জন্যে এক বিশেষ 'এহসান' হিসাবে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

'ওরা কি একটু চিন্তা করে দেখে না যে, আমি তাদের জন্যে কেমন নিরাপদ 'হারাম শরীফ' বানিয়ে দিয়েছি। অথচ তার ত্রিসীমানার আশপাশ থেকেও লোকদের ছোঁ মেরে নিয়ে যাওয়া হয়?'

আরো আশ্চর্যের বিষয়, কাবা শরীফের এই সর্বব্যাপী মর্যাদার ব্যাপ্তি এতদূর পর্যন্ত প্রসারিত যে, সেখানে কোনো জীবজন্তু শিকার করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ, পাখীকূলকে তাদের বাসা থেকে তাড়ানো এখানে হারাম। এমনকি কোনো গাছপালাও সেখানে কাটা যায় না।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে এই মর্মে কতিপয় হাদীস এসেছে। মুসলিম শরীফে বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল্লাহ (স.) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, এই শহরকে আল্লাহ তায়ালা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সম্মানিত করেছেন। এ কারণে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহরই মর্জিতে এ ঘর মর্যাদাবান থাকবে। আমার পূর্বে কোনো আমলেই এখানে যুদ্ধবিগ্রহ বৈধ ছিলো না এবং একদিনের এক বিশেষ সময় ব্যতীত আমার জন্যেও কখনও এ ঘরের এলাকায় যুদ্ধ করা বৈধ করা হয়নি। সুতরাং আল্লাহর মর্যাদাদানের কারণেই এ ঘর কেয়ামত পর্যন্ত মর্যাদাবান থাকবে। এখানকার কোনো গাছের কাঁটা কর্তিত হবে না, কোনো শিকারের পশুপাখীকে এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না, কোনো পতিত জিনিস সেই ব্যক্তি ছাড়া কেউ তুলবে না, যে জানে যে জিনিসটি কার এবং নির্জনতা নষ্ট করা হবে না.... হাদীসটির শেষ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

অতএব, এই হচ্ছে সেই ঘর যাকে আল্লাহ তায়ালা মহান মর্যাদা দিয়ে মুসলমানদের কেবলা বানিয়েছেন। এটিই সেই ঘর, যা এবাদাতের জন্যে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ঘর মুসলমানদের পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর ঘর। এখানে নিদর্শন বা সাক্ষ্যদানকারী এমন জিনিস রয়েছে যা এ ঘরটি ইবরাহীম কর্তৃক নির্মিত এ কথার প্রমাণ দেয়। আর ইসলাম তো হচ্ছে ইবরাহীম (আ.) অনুসৃত জীবনবিধান সুতরাং তাঁর ঘরই সেই প্রথম ঘর, যার দিকে মুখ করে মুসলমানরা নামায পড়ে। এ ঘর পৃথিবীতে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এ ঘরেই রয়েছে সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্যে হেদায়াতের আলো। এ ঘরই হচ্ছে দ্বীন ইসলামের মিলনকেন্দ্র।

হজ্জ ফরয হওয়া প্রসংগ

তারপর যাদের এ ঘর পর্যন্ত আসার সম্বল আছে তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এ ঘরে এসে হজ্জ করা ফরয করে দিয়ে জানিয়ে দিলেন, তাওফীক থাকা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি হজ্জ না করলে তা হবে কুফরীর শামিল, এতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না। ক্ষতি হবে তার নিজের। এরশাদ হচ্ছে,

'যাদের সামর্থ আছে তাদের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এই ঘরে এসে হজ্জ করা ফরয। যারা এ কাজ করতে অস্বীকার করবে তাদের জানা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব জগতের সবার থেকে মুখাপেক্ষীহীন।'

ওপরের আয়াতের ব্যাখায় দেখা যায় 'আ'লান্নাস' বলে জানানো হয়েছে, সকল মানুষের ওপর হজ্জ ফরয। এ প্রসংগে বলা যায়, আয়াতের অর্থে প্রথমত মনে হয় সকল ইহুদীদের ওপর হজ্জ ফরয, যারা কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়াতে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলো।

একই সময় দেখা যায়, এ ঘরটি তাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ.)-এর ঘর বিধায় তাদের কাছে এই ঘরে এসে হজ্জ করার দাবী জানানো হচ্ছে। কারণ এ ঘর তাদের পিতা ইবরাহীম (আ.)-এরই ঘর। আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সকল মানুষের জন্যে এ ঘরটিই প্রথম নির্মিত হয়, কিন্তু একমাত্র ইহুদী জাতিই আল্লাহর কাছে আনুগত্য প্রকাশের প্রতীক হিসাবে এই ঘরের দিকে মুখ করে নামায পড়তে সর্বপ্রথম অস্বীকার করে, তারা ইচ্ছা করেই এই নাফরমানী করে এবং একমাত্র তাদের থেকেই প্রথম এই ত্রুটি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত, বলা হচ্ছে, এই হজ্জ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে এই যেন চেতনা জাগে যে দ্বীন ইসলামী জীবন ও সমাজব্যবস্থা সকল মানুষের কাম্য। সবারই প্রয়োজন এর নির্দেশনাবলী ও অনুষ্ঠানসমূহ পালন করা। আর মোমেনরা যেমন করে এই ঘরের দিকে মুখ করে এবাদত করে, তেমনি অন্যরাও যেন সেই দিকে মুখ করে এবাদাত করে এবং সেই ঘরের হজ্জের জন্যে আসে। এ না হলে কুফরীই করা হবে, তা সে যে কোনো ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন! আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সবার থেকে মুখাপেক্ষীহীন মহান ও পবিত্র। আল্লাহর এতে কিছু আসে যায় না– কেউ ঈমান আনুক আর না আনুক আর কেউ হজ্জ করুক আর না করুক। ঈমান ও এবাদাতের কারণে কল্যাণ আসবে তাদেরই আর সফলও হবে তারা নিজেরা।

হজ্জ তখনই ফরয হয়, যখন বায়তুল্লাহ শরীফে আসা যাওয়ার পথ খরচ কারো হাতে এসে যায় এবং সে সুস্থ থাকে ও আসা-যাওয়ার পথকে নিরাপদ মনে করে। ঠিক কোন্ সময় হজ্জ ফরয হওয়ার নির্দেশ এসেছিলো সে বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। তবে যারা বিশ্বাস করে যে, হজ্জ সম্পর্কিত আলোচ্য আয়াতটি নবম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধিবর্গ আগমনের বছরে নাযিল হয়েছে, তারা মনে করে হজ্জ এই বছরেই ফরয হয়। তারা তাদের পক্ষে দলীল হিসাবে রসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জকে গ্রহণ করেন, যা এই তারিখের পর সংঘটিত হয়েছিলো। কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে 'ফী যিলালিল কোরআন-'এর দ্বিতীয় খন্ডে আমরা এ বিষয়ের ওপর আলোচনা রেখেছি যে, রসূলুল্লাহ (স.)-এর হজ্জ করাটাই হজ্জ দেরীতে ফরয হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল নয়। বরং অনেকের মতে এর কারণ হচ্ছে, মোশরেকরা বায়তুল্লাহ শরীফে উলংগ হয়ে তাওয়াফ করত। মক্কা বিজয়ের পরও তারা এইভাবে তাওয়াফ করতে থাকায় রসূলুল্লাহ (স.) তা অপছন্দ করেন, শেষ পর্যন্ত নবম বছরে সূরা 'বারআত' নাযিল হওয়ার পর মোশরেকদের জন্যে বায়তুল্লাহর তওয়াফ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এর পরের বছরে রসূলুল্লাহ (স.) হজ্জ করেন। তারপর থেকে হজ্জ ফরয হয়ে যায়। অথচ জানা কথা, হিজরতের পরে এবং ওহুদ যুদ্ধের পরে অথবা এর কাছাকাছি সময়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এটা অবশ্যই স্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমেই হজ্জ ফরয করা। এতে বলা হয়েছে, সামর্থবান সকল মানুষের ওপর এই ঘরের হজ্জ ফরয।

মুসলমানদের জন্যে হজ্জ হচ্ছে বাৎসরিক মহাসম্মেলন। এই পবিত্র ঘরে তারা সমবেত হয়ে পরস্পরের সাক্ষাত লাভ করবে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমান জাতির পিতা ইবরাহীম (আ.)-এর হাতে যে মহাসম্মেলনের সূচনা হয় এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদাতের জন্যে আল্লাহ তায়ালা এই ঘরকেই সর্বপ্রথম মনোনীত করেন তা জানা যায়। হজ্জের এই হচ্ছে তাৎপর্য। এই পবিত্র ঘর সেই মহাস্মৃতিই বহন করে চলেছে, যার তওয়াফ দিবারাত্রি সর্বক্ষণ জারি রয়েছে যেখানে এসে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তার একান্ত সান্নিধ্যে পৌঁছে যায়। এ বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় এবং এর ফলে মানুষ সত্যিকার মানুষে পরিণত হয়। মানুষ এখানে একত্রিত হয়ে বিশ্বমানবতাবোধ ফিরে পায়। তাই সবাইকে এই মহা সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে।

এই বিবরণ পেশ করার পর রসূলুল্লাহ (স.)-কে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তিনি যেন আহলে কেতাবদেরকে সতর্ক করে দেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন না করার পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তারা নিজ দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে মানুষকে সত্যপথ গ্রহণ করা থেকে বাধা দিয়েছে এবং আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে চলেছে, অথচ সে আয়াতগুলো যে কতো সত্য, তা তারা নিজেরা জানে এবং এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাসও রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'বলো, (হে রসূল) হে আহলে কেতাবরা, কেন আল্লাহর আয়াতগুলোকে(১) অস্বীকার করছো। অথচ ...... তোমরা যা কিছু করছো ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মোটেই উদাসীন নন।'

এই সূরার মাধ্যমে যেভাবে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এইভাবে অন্যান্য সূরায় তাদের সমালোচনাও করা হয়েছে। সমালোচনার প্রথম যে ফল পাওয়া গিয়েছিলো তা হচ্ছে, আহলে কেতাবরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে নিজেদের অবস্থানের তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলো এবং নিজেদের সেই দোষগুলো সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল হয়ে গিয়েছিলো, যা তাদের ধর্ম ও ধার্মিকতার অবস্থাকে ঠিক ঠিক প্রকাশ করে দিচ্ছিলো, মূলত সকল বিবেচনায়ই তারা ছিলো কাফের। তারা কোরআনের বহু আয়াত অস্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি কোরআনের কোনো ক্ষুদ্র অংশকেও অস্বীকার করলো সে প্রকৃতপক্ষে গোটা কোরআনকেই অস্বীকার করলো। তাদের কাছে বর্তমান কেতাবে যে কথাগুলো আছে তাও যদি তারা বিশ্বাস করতো, তাহলে তাদের রসূলের পরে অন্য যেসব রসূল এসেছেন তাদের ওপর ঈমান আনতো, কারণ দ্বীন ইসলাম এর মূল সত্য তো একই। এ সত্য যে চিনতে পেরেছে, সে সকল নবী-রসূলের আনীত সত্যকেই চিনবে এবং সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করবে।

মুসলিম সমাজের আহলে কেতাবের ষড়যন্ত্র

তারপর মুসলমানদের মধ্যেও আহলে কেতাবদের প্রভাবের কারণে কিছুসংখ্যক প্রতারক গড়ে উঠেছিলো। সেই দিন তাদের এই প্রতারণা করার স্বভাব দূর হবে যেদিন তারা আল্লাহকে দেখবে, আর সেই দিনই আহলে কেতাবদের সঠিক অবস্থা প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাদেরকে সেদিন পুরোপুরিভাবে কাফের হিসাবে চিহ্নিত করে দেয়া হবে। অতএব, সেদিন তাদের কাফের হওয়া সম্পর্কে আর কারো মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না। আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এমনভাবে তাদেরকে সেদিন তিরস্কার করবেন যে, এর ফলে তাদের কলিজাগুলো বেরিয়ে আসতে চাইবে।

তোমরা যা করছো আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার সাক্ষী। আর তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মোটেই উদাসীন নন।'

মানুষ যখন অনুভব করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দেখছেন এবং তিনি তার কোনো কিছু থেকেই গাফেল নন, তখন সে সম্যকভাবে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। এমতাবস্থায় তার ভিন্ন আচরণ, আত্মপ্রবঞ্চনা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, স্পষ্ট ভ্রান্তি ও কুফরীর নামান্তর।

তারা যে জেনে বুঝে সত্যকে অস্বীকার করে চলেছে এবং মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখছে তাদের এ আচরণকে আল্লাহ তায়ালা লিখে রাখছেন, যা তাদের বিরুদ্ধে একদিন সাক্ষ্য দান করবে। এরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা নিজেরাই তোমাদের কর্মকান্ডের সাক্ষী হবে।'

এ কথা দ্বারা এই সত্যটিই সাব্যস্ত হয়ে যাচ্ছে যে, যেসব জিনিসকে তারা অস্বীকার করছিলো তা আসলে তারা নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করতো এবং যে সকল কাজ থেকে মানুষকে তারা ফিরিয়ে

(১) 'আয়াত' বলতে কোরআনের আয়াত যেমন বুঝায়, তেমনি তাঁর শক্তি-ক্ষমতার নিদর্শন, যা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে–সেগুলোকেও বুঝায়।

রাখার চেষ্টা করতো তার কল্যাণকারিতা সম্পর্কেও তারা নিসন্দেহ ছিলো। এইভাবে জেনে বুঝে সত্যের বিরোধিতা করা অবশ্যই এক জঘন্য কাজ। এরা কখনো কারো কাছে বিশ্বস্ত হতে পারে না এবং এদের এই সত্য বিরোধিতার কারণে কেউ এদের সাথে বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। এরা চিরদিন এবং সবার কাছেই ধিকৃত ও সর্বত্র লাঞ্ছিত হতে থাকে।

নেতার কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে চিন্তা করতে আহ্বান জানানো, সুতরাং সে ভ্রান্ত জাতিকে ডেকে চিন্তা করতে বলার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

'কেন তোমরা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরানোর চেষ্টা করছো, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে? তাদেরকে কি তোমরা বাঁকা পথে চালাতে চাও?'

একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ফিরানোর জন্যে এ সত্যিই এক আন্তরিক প্রচেষ্টা। তাই বলা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহর পথই হচ্ছে সোজা, সঠিক ও মযবুত পথ। বাকি সকল পথই বাঁকা। আর মানুষ যখন আল্লাহর পথে আসতে মানুষকে বাধা দেবে এবং মোমেনদেরকেও যখন আল্লাহর পথে থাকতে গিয়ে বাধাগ্রস্ত হতে হবে, তখন ন্যায়বিচারের সমস্ত মানদন্ডের নিরাপত্তাও খতম হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যাবে শুধু বাঁকা আর বাঁকা পথ, কোনোভাবে তা সোজা হতে চাইবে না।

পৃথিবীর সবখানে অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে, প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা থেকে ফিরে যাওয়ার কারণেই এই অশান্তি ও বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে। সত্য সরল ও সহজ পথ পরিত্যাগ করে বাঁকা পথ অবলম্বন করার কারণে জীবনের সর্ব পর্যায়ে অশান্তি ও বিশৃংখলা অনিবার্য হয়ে পড়বে। মানুষকে আল্লাহর দেয়া সত্য সরল পথ গ্রহণ করার পথে বাধা সৃষ্টি করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ এই বিশৃংখলা আসবে। অপরদিকে, আল্লাহর পথ থেকে মোমেনদের ফেরানোর চেষ্টা, অর্থাৎ মোমেনদের মননশীলতা ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করার কারণে বিশৃংখলা ও অশান্তি আসবে। তাদের চরিত্র ও ব্যবহারের মধ্যে, তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও লেনদেনের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা এবং মানুষে মানুষে আরো যে সকল বিষয়ে যোগাযোগ হয় তার সঠিক ব্যবহার থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে চরম অশান্তি সেখানে নেমে আসবে। যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তারা বাস করে তার বন্ধন শিথিল করে দেয়া হবে এবং এক ভীষণ বিপর্যয় নেমে আসবে। এমতাবস্থায়, আল্লাহর পথে মযবুত হয়ে যে সব মানুষ দাঁড়াবে তারাই শুধু কল্যাণের অধিকারী হবে। আর যারা এ পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করবে তাই হবে বাঁকা পথ, সেটাই হবে বিশৃংখল ও নিকৃষ্ট পথ। মানুষের জীবন এ দু'টি পথের যে কোনো একটিতে চলতে বাধ্য। যারা আল্লাহর পথকে মযবুতভাবে ধারণ করবে তারা হবে কল্যাণের অধিকারী। আর এ পথ বর্জন করা হলে তা হবে ধ্বংস ও বিশৃংখলার পথ।

নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের অনুসরণ

আলোচনার এ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর আহলে কেতাবদের সাথে মুসলমানদের বিবাদের প্রসংগ শেষ হচ্ছে এবং তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তাদের দুর্ব্যবহারের কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে সর্বতোভাবে তাদেরকে সাবধান করা হচ্ছে, যুক্তিপূর্ণ কথার মাধ্যমে তাদের বিতর্ক করতে বলা হচ্ছে। এ প্রসংগে তাদের সেই সকল বৈশিষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যা অন্য জাতি থেকে তাদেরকে পৃথক করে রেখেছে, তাদের জীবনপদ্ধতির মূলনীতিসমূহ বিধৃত হয়েছে তাদের ধ্যান-ধারণার লক্ষ্য জানানো হয়েছে, যাতে করে স্পষ্টভাবে তারা তাদের জীবনের সেই মূল্যবোধকে বুঝতে পারে যে উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি তোমরা আহলে কেতাবদের কোনো একটি উপদলের অনুসরণ করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান গ্রহণ করার পরও কাফের বানিয়ে ছাড়বে। ... যে আল্লাহকে মযবুত করে ধরবে তাকে অবশ্যই সরল সঠিক ও মযবুত পথে পরিচালনা করা হবে।'

উম্মতে মুসলিমার আগমন এই জন্যে ঘটেছে যেন তারা পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। সে জীবনব্যবস্থা হবে স্বতন্ত্র বিজয়ী এবং সর্ববিষয়ে মানবনির্মিত জীবনব্যবস্থা থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এই ব্যবস্থা পৃথিবীতে এসেছেই মানবজীবনের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে। আল্লাহর দেয়া এ ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে বাস্তব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলে কর্মজীবনে জীবন্ত রূপ লাভ করবে। মানুষের চেতনা ও চরিত্রকে প্রভাবিত করবে। কর্মজীবনের প্রতিটি বিভাগের ওপর এ ব্যবস্থা সর্বোচ্চমানের কল্যাণকর অবদান রেখেছে।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থা প্রেরিত না হলে এ ব্যবস্থা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়তে পারতো না এবং মানুষের জীবনকেও এভাবে প্রভাবিত করতে পারতো না। এ ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ না করা হলে কিছুতেই কোনো মানুষের পক্ষে এ ব্যবস্থাকে চালু করা সম্ভব হতো না। আল্লাহর দেয়া পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোভাবেই এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব নয়।

কোরআনে করীম বিভিন্ন প্রসংগে বারবার এ কথার উল্লেখ করেছে। কোনো সমাজের সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব লাভ আল্লাহর দেয়া এক মহান নেয়ামত, সময়-সুযোগ মতো মুসলিম জনতার মধ্যে এ উপলব্ধি, চিন্তা-চেতনা এবং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার কথা বিভিন্ন জায়গায় এসেছে ও আসবে। আলোচ্য প্রসংগ এ চিন্তা-চেতনা বিকাশেরই একটি সুযোগ। এ প্রসংগে দেখা যায়, আহলে কেতাবদের সাথে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা উত্থাপিত হয়েছে। এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং মুসলিম জনতার মধ্যে তারা যে বিশৃংখলা সৃষ্টির পরিকল্পনা এঁটেছিলো তা রোধ করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এ সংঘর্ষের দুয়ার যে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়, বরং উম্মাতে মোহাম্মদীর জন্যে এ ধারা সার্বজনীন ও চিরন্তনভাবে চলতে থাকবে। প্রতিযোগিতার এ ধারা প্রতিটি যামানায় ও প্রতিটি জনপদে অবিরাম চলতে থাকবে। কারণ, ইসলামের অস্তিত্বের এটা হচ্ছে এক স্পষ্ট প্রমাণ।

এটা কি সত্য নয় যে, আজকের এই মানবগোষ্ঠী তাদের পরিচালনার জন্যে সঠিক নেতৃত্ব পেয়ে গেছে? এই নেতৃত্ব যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে এই নেতৃত্বের পরিবর্তে জাহেলী নেতৃত্ব কেন তারা গ্রহণ করে চলেছে? তারা কি মনে করে যে, এ ভ্রান্ত হঠকারী নেতৃবৃন্দ তাদেরকে আল্লাহর পথে চালাবে? নেতৃত্বদানের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি এ ধরনের লোকের হাতে দেয়া হলে জনগণের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা পাবে? প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য কথা, অসৎ চরিত্রের লোকের হাতে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সোপর্দ করা হলে সাধারণ মানুষ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। তাহলে তারা কোন উদ্দেশ্যে সে দুর্বৃত্তদের হাতে তাদের নেতৃত্ব তুলে দেবে?

একমাত্র সঠিক নেতৃত্বের ছত্রছায়ায়ই মানুষের প্রকৃত বোধোদয় হওয়া সম্ভব। সে পরিবেশে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সুষ্ঠ বিকাশের মাধ্যমে হৃদয় দুয়ারের কপাট খুলে যায়, সৃষ্টির মৌলিক চাহিদাগুলো তারা বুঝতে পারে এবং সমাজের উন্নতির গোপন রহস্যও তদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর এইভাবে জনতার শক্তি, ক্ষমতা ও সম্পদ সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এটা সন্দেহাতিতভাবে সত্য, যে নেতৃত্বের অধীনে এ সকল গুণের বিকাশ ঘটে, মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হয়, তা কোনো অকল্যাণ ও ধ্বংসের আশংকায় নিমজ্জিত হয় না। সে নেতৃত্বকে অবশ্যই ঈমান দ্বারা পরিচালিত হতে হবে।

এই অধ্যায়ে মুসলিম উম্মাহকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে, যেন তারা নিজেদের ছাড়া কারও অনুসরণ না করে। এখানে তাদেরকে তাদের মর্যাদা এবং নিরাপত্তা রক্ষার উপায় জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। আর এ উদ্দেশ্যে প্রথমেই সতর্ক করা হয়েছে, যেন তারা আহলে কেতাবদের অনুসরণ না করে। কেননা আহলে কেতাবরা তাদেরকে কুফরীর দিকে নিয়ে যাবে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, তোমরা আহলে কেতাবদের কোনো একটি দলের অনুসরণ করলে তারা ইমান গ্রহণ করার পরেও তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে। ....।'

আহলে কেতাবদের অনুকরণ ও তাদের সাথে মেলামেশা এবং তাদের মত, পথ ও মূল্যবোধকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে আভ্যন্তরীণভাবে তাদের কাছে পরাজয় বরণ করার সূচনা করা এবং উম্মতে মুসলিমাকে নেতৃত্ব দান করার যে মহান উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা হয়েছিলো সে চিন্তাটুকু পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে রাজী হয়ে যাওয়া। তাছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী নেতৃত্বের অধীন যে জীবন-বিধান ও সংগঠন গড়ে উঠেছিলো তা উন্নতি ও প্রগতির পথে যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম নয়– এটা মেনে নেয়া। এই ভাবে অতি সংগোপনে মানুষের অজান্তে তাদের অন্তরের মধ্যে কুফরীর প্রতি এক ঝোঁক-প্রবণতা দানা বেঁধে উঠে। যদিও তাৎক্ষণিকভাবে এরা আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী বিপদ অনুভব করতে পারে না।

মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাস ধ্বংসে বিধর্মীদের ষড়যন্ত্র

এটা তো হচ্ছে মুসলমানদের অবস্থা, আর অন্যদিকে আহলে কেতাবদের অবস্থা হচ্ছে, মুসলিম মিল্লাতকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা থেকে বড় আকাংখার বস্তু তাদের কাছে আর কিছুই নেই। কেননা মুসলমানদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা এমন এক মযবুত শিলাখন্ড যা তাদেরকে বাতিলপন্থীদের যাবতীয় আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এই ঈমানী শক্তিই তাদের শক্তির মূল উৎস, এটিই তাদের সকল বাধার বিন্ধাচল অতিক্রম করায় এবং তাদেরকে বন্ধুর গিরিপথ পার হতে সাহায্য করে। আর এ কথা তাদের দুশমনরা ভালোভাবেই জানে। একথা অতীত ও বর্তমানের ইসলামবিরোধীরাও তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে। সুতরাং তাদের সেই আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্যে তারা আজ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলেছে। এ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে তারা সাধ্যমতো সকল প্রকার ষড়যন্ত্র, ধোকাবাজি, কূটনীতি, সামরিক সরঞ্জামাদীর প্রদর্শন, এমনকি অকারণ ও অযৌক্তিকভাবে সামরিক শক্তি ব্যবহার করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। যখন তারা প্রকাশ্যভাবে এই আকীদা-বিশ্বাসে আক্রমণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন তারা নানা প্রকার ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের ইমানী দৃঢ়তা ধ্বংস করার চেষ্টা করে। তারপরও তারা এককভাবে যখন এ কাজে বিফল হয়, তখন মুসলমানদের মধ্য এমন সব মোনাফেকদের বের করে কাজে লাগায়, যারা তাদের দোসর হিসাবে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে বদ্ধপরিকর হয়। এই সব মোনাফেক নানা প্রকার মিথ্যা কথা ছড়িয়ে এই আকীদা-বিশ্বাসের মূল ভিত্তিকেই ভেতরে ভেতরে খোকলা বানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এ কাজে তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেন মুসলমানরা সন্দেহের গোলক ধাঁধায় পড়ে অবশেষে এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে বসে। ইসলামী জীবন-পদ্ধতির তুলনায় অন্য সকল মত ও পথকে একসময় ভালো মনে করতে শুরু করে, ইসলামের মর্যাদা তুচ্ছ জ্ঞান কুফরী নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিতে শুরু করে।

এক সময় আহলে কেতাবরা মুসলমানদের মধ্য থেকে তাদের অনুগত কিছু লোক পেয়েও যায়, যারা তাদেরই কথা মতো কাজ করে। তাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে এইসব মোনাফেকরাই যে সর্বতোভাবে তাদের খেদমত করে যাচ্ছে এবং এই ভাবে তারা তাদের নিজেদেরকে ও গোটা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে কুফরী ও গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

এ কারণেই এখানে এবং অত্যন্ত কঠিন শব্দ সমষ্টি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলছেন, 'হে ঈমানদাররা' আহলে কেতাবদের যে কোনো একটি উপদলের অনুসরণ যদি তোমরা করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান লাভ করার পরও কাফের বানিয়ে ছাড়বে।'

এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্যে ভয়ের ব্যাপার হচ্ছে ঈমানরূপী মহা মূল্যবান রত্ন লাভ করার পরও দেখা যাবে একসময় তারা কুফরী জীবনব্যবস্থার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে, যার ফলে তারা জান্নাতের পথ ছেড়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এটাই হচ্ছে প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা। আর এর কারণে আলোচ্য আয়াতে চাবুক কশার মতো তীব্র বাক্যবাণ দ্বারা তাদের বিবেককে ঝাঁকিয়ে তোলা হচ্ছে। এভাবে আলোচ্য আয়াতের বর্ণনাধারার মধ্যে দেখা যায়, একই সাথে রয়েছে হুশিয়ারী উচ্চারণ ও উপদেশ দান। বলা হয়েছে, ঈমান আনার পর যারা কুফরী করে তাদের থেকে অপ্রিয় কাজ আর কার হতে পারে? তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনানো হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল এখনও বর্তমান। ঈমান আনার জন্যে আহ্বান করার সিলসিলাও চালু আছে এবং ঈমানের সেই শুভ্র সমুজ্জ্বল বাতি, যা কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করে- তা আজও পুরোপুরি সক্রিয় রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'আর কেমন করে তোমরা কুফরী করছো অথচ তোমাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনানো হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর রসূল বর্তমান রয়েছে?'

হ্যাঁ, কোনো মোমেন ব্যক্তির জন্যে কুফরী করা এক মারাত্মক অপরাধ। রসূল (স.) ইন্তেকাল করার পর যখন তিনি তাঁর মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন, তখন আল্লাহর যে পথ-নির্দেশ নিয়ে তিনি এসেছিলেন তাও অবিকল অবস্থায় বর্তমান থেকে গেলো। পূর্ববর্তীদেরকে যেভাবে কোরআনে করীম সম্বোধন করেছে আমাদেরকেও তো সেই মহান কালাম আজ একইভাবে সম্বোধন করছে, সকল অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার পথ, পদ্ধতি ও পরিশুদ্ধির পতাকা আজও একইভাবে সমুন্নত রয়েছে। সে অবস্থায় মোমেন ব্যক্তি কি করে কুফরীর পথ অবলম্বন করতে পারে! সুতরাং এ কাজ যে করবে সে অবশ্যই এমন মারাত্মক অপরাধ করবে যার কোনো ক্ষমা হতে পারে না। দেখুন আল্লাহ পাকের চিরন্তন ঘোষণা,

'আর যে আল্লাহকে মযবুত করে ধরবে, তাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করা হবে।'

অবশ্যই এটা সত্য কথা, আল্লাহকে যে মযবুত করে ধরবে নিশ্চিত তাকে জাহেলিয়াতের সকল কলুষ কালিমা থেকে মুক্ত রাখা হবে এবং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা চিরন্তন, চিরঞ্জীব এবং সদা-সর্বদা নিজ ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

মুসলিম জামায়াতের জন্যে কিছু জরুরী জ্ঞাতব্য

অবশ্যই রসূলুল্লাহ (স.) তাঁর সাহাবাদের সাথে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে এক সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি তাদেরকে মত প্রকাশের প্রচুর সুযোগ দিতেন এবং বাস্তব জীবনের কর্মক্ষেত্রে তিনি তাদের অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্য দিতেন। যেমন কৃষিজ্ঞান ও যুদ্ধবিদ্যার কলাকৌশলসহ এই ধরনের আরো এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার সাথে তাত্ত্বিক আকীদা বিশ্বাসের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে এসব বিষয়ের কিছু না কিছু জ্ঞান প্রকৃতিগতভাবে অল্প বিস্তর প্রত্যেক মানুষকেই দেয়া হয়েছে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মানুষের এসব বিষয়ের জ্ঞান পরিপক্ক হয়। এগুলো নিছক কোনো সাংগঠনিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না। তত্ত্ব ও বাস্তব জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এখানে সুস্পষ্ট। জীবন পরিচালনার পদ্ধতি এক জিনিস এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব জ্ঞান

সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। ইসলাম আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জীবন পদ্ধতি অনুসারে জীবনকে পরিচালনা করার জন্যে এসেছে। ইসলাম মানুষকে বস্তুর গুণাগুণ জানতে, বুঝতে ও সেগুলোর সঠিক প্রয়োগ করে তার থেকে ফায়দা হাসিল করতে শিখিয়েছে, যাতে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার করা যায়। এ কথাগুলোর সপক্ষে এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হচ্ছে।

১। ইমাম আহমদ পর্যায়ক্রমে আবদুর রাযযাক, সুফীয়ান, জাবের, শাবী ও আবদুল্লাহ বিন সাবেত-এর বরাত দিয়ে জানাচ্ছেন, একবার নবী (স.)-এর কাছে ওমর (রা.) এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি বনী কোরায়যার এক ইহুদী ভাইকে তাওরাতের কিছু অংশ লিখে দিতে বললাম, সে আমাকে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত তাওরাতের এক উল্লেখযোগ্য অংশ লিখে দিলো। আমার কাছে তা আছে, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনাকে দেখানোর জন্যে কি তা পেশ করবো? রেওয়ায়াতকারী বলেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং রেওয়ায়াতকারী আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত ওমর (রা.)-কে বললেন, 'রসূলুল্লাহ (স.)-এর চেহারায় কি পরিবর্তন এলো তা আপনি খেয়াল করেননি?' ওমর (রা.) বললেন, আমি তো আল্লাহকেই আমার একমাত্র প্রতিপালক বলে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছি। ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নিয়েছি এবং মোহাম্মদ (স.)-কে স্বেচ্ছায় রসূল মেনে নিয়েছি। অতপর তিনি বলেন, তারপর রসূল (স.)-এর চেহারা মোবারক থেকে ক্রোধের চিহ্ন দূর হয়ে গেলো এবং তিনি এরশাদ করলেন, কসম সেই মহান সত্ত্বার, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে। আজ যদি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং মূসাও আবির্ভূত হন, আর আমাকে ছেড়ে তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে শুরু করো, তাহলেও তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে। তোমরা সমগ্র মানবমন্ডলীর মধ্যে আমার ভাগ্যবান উম্মত এবং আমিও সকল নবীদের মধ্যে তোমাদের জন্যে ভাগ্যবান নবী, তোমরা আমার অংশ আর আমিও তোমাদের অংশ।'

২। হাফেয আবু ইয়া'লা বলেন, জাবেরের বরাত দিয়ে পর্যায়ক্রমে শা'বী ও হাম্মাদ আমাকে বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, আহলে কেতাবদের কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে না বা তাদের কাছ থেকে কিছু জানতে চাইবে না। ওরা তোমাদেরকে কিছুতেই সঠিক পথ দেখাবে না, কেননা, তারা নিজেরাই তো গোমরাহ হয়ে গেছে। আর তোমরা তাদের কথা শুনলে হয়তো অসত্যকে সত্য বলে বুঝবে এবং সত্যকে মিথ্যা বলে মেনে নেবে, অথচ এটাই প্রকৃত সত্য কথা যে, আজ যদি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং মূসা (আ.) জীবিত থাকতেন, তাহলে তার জন্যেও আমার অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকতো না। আর অন্য আরো কয়েকটি হাদীসে কথাটা এইভাবে এসেছে, আজ যদি মূসা ও ঈসা (আ.) উভয়ে জীবিত থাকতেন তাদেরও আমার অনুসরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকতো না।'

ওরা হচ্ছে আহলে কেতাব আর তোমাদের সামনে এই যে পথ তোমরা দেখছো, এটাই হচ্ছে আল্লাহর রসূল-এর প্রদর্শিত সঠিক পথ। ও গোমরাহ কওমকর্তৃক এই দ্বীনকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়াতে ইসলামের কিছুই আসে যায় না বা এতে ইসলামের কোনো ক্ষতি হতে পারে না। ইসলামের প্রাণশক্তি ও পরিচালিকাশক্তি ঈমানের সাথে মযবুতভাবে সম্পৃক্ত থেকে এবং ঈমানী শক্তি দ্বারা বলীয়ান হয়ে জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে পুরাপুরিভাবেই এই দ্বীন কাজে লাগিয়েছে। এই দ্বীন মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টাকে মূল্যায়ন করেছে, তার আল্লাহপ্রদত্ত চেতনাশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে এবং এ বুঝ-শক্তিকে সে বরাবর মানবতার কল্যাণার্থে পরিচালনা করেছে এবং মানুষের নিরাপত্তা বিধান ও তার জীবনকে স্বচ্ছন্দ করার জন্যে ব্যবহার করেছে। তদুপরি সে জ্ঞান-রূপী নেয়ামত ও প্রকৃতির শক্তি ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার তাওফীক দেয়ার জন্যে শুকরিয়া আদায় করার কাজেও তারা একে ব্যবহার করেছে। আল্লাহর আনুগত্য করার যোগ্যতা লাভ, এ জ্ঞানকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষমতা এবং মানবকল্যাণের কাজে এ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর যোগ্যরূপী নেয়াতের শোকরগোযারির জন্যে মোমেন তার শক্তি ও ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে।

ঈমানী চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে, এই সৃষ্টিলোক ও মানব সৃষ্টিরই বা উদ্দেশ্য কি, জীবনপথে চলতে গিয়ে কোন্ পথ সে অনুসরণ করবে, কি হবে তার নিয়ম-শৃংখলা ও আইন-কানুন তার চরিত্র ও ব্যবহার পদ্ধতিই বা কি হবে– তা ভালো করে জেনে নেয়া। যেহেতু আহলে কেতাবরা নিজেরাও গোমরাহ হয়েছে, অপরদেরকেও তারা গোমরাহ করতে চায়, এই কারণেই ওমর (রা.)-এর তাওরাত সম্পর্কে জানার প্রশ্নে রসূলুল্লাহ (স.)-এর চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো। কারণ, কোরআনের তুলনায় তাওরাতের অংশবিশেষ অতি তুচ্ছ জিনিস, আর কোরআনরূপী এতো বড় নেয়ামত নিজেদের কাছে থাকা সত্ত্বেও অন্য (পরিবর্তিত) জিনিসের প্রতি কৌতুহল থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা উম্মাতে মুসলিমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

এই-ই হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নির্দেশনা ও ব্যাখ্যা। রসূল (স.)-এর এই ভূমিকার মাধ্যমে তাঁর পথ-নির্দেশনা আমাদের দেয়া হয়েছে। এখন এই ব্যাখ্যা অনুসারে আমরা যারা নিজেদেরকে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান বলে মনে করি, তাদের প্রতি নবী (স.)-এর নির্দেশ, যেন আমরা পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও সংকল্প নিয়ে কোরআন ও রসূল (স.)-এর হাদীস বুঝার চেষ্টা করি এবং পাশ্চাত্যবাদী ও তাদের শিষ্য-শাগরিদের চিন্তা-চেতনার প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখি। অথচ আজ আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জীবন ও অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যে আমাদের দর্শন ও চিন্তাধারা অমুক-তমুকের কাছ থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে– গ্রহণ করা হচ্ছে গ্রীক, রোমান, ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান দার্শনিক ও চিন্তাশীলদের কাছ থেকে। আমি দেখছি আমদের ব্যবহার পদ্ধতি, আদব-শৃংখলা চাল-চলন ও রীতি-নীতি তাদের পচা আবর্জনার স্তুপ থেকে গ্রহণ করা হচ্ছে, এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর ধারক ও বাহক হওয়ার কারণে দ্বীন ইসলামের মূল প্রাণ তথা জীবনীশক্তি আমরা আজ হারিয়ে ফেলেছি। দ্বীন ইসলাম কী জিনিস তা জানার কোনো কৌতুহল আমাদের এখন আর নেই। এতদসত্ত্বেও আমরা মনে করি, আমরা ঠিক ঠাক মতোই মুসলমান আছি। এ এমন এক ধারণা, যার অপরাধ পরিষ্কার কুফুর থেকেও মারাত্মক। এই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামী ব্যবস্থা আজ ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে তা দূর হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে, যারা এই ধরনের অপরাধজনক কাজের পক্ষে মত দিচ্ছে না, তাদের আমরা ভুল মুসলমান বলে মনে করি।

ইসলাম একটি জীবন পদ্ধতি বা জীবন ব্যবস্থার নাম, যা মানব নির্মিত অন্যান্য সকল জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আকীদা-বিশ্বাস সম্বলিত বিষয়ে চিন্তা করতে গেলে– এ ব্যবস্থা ভিন্ন। জীবনের সাথে জড়িত যতো সংগঠন আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটির জন্যে ইসলাম যে আইন-কানুন দিয়েছে এবং যে সব মূলনীতির ওপর এর সামাজিক বন্ধনগুলো গড়ে উঠেছে, তার সব দিক থেকেই ইসলাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক জীবনব্যবস্থা। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে সব ব্যবস্থা আছে সেগুলো একটার সাথে অপরটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু এ সবকিছু মিলিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষের জীবনের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বহন করার জন্যে অবশ্যই একদল লোককে এগিয়ে আসতে হবে, যারা যে ব্যবস্থা দ্বারা মানবমন্ডলীকে পরিচালনা করবে এবং এই ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষশীল যাবতীয় ব্যবস্থাকে উৎখাত করবে, যার তিক্ত দংশনে মানুষ আজ জর্জরিত।

আবির্ভাবের দিন থেকেই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য থেকেছে মানবকল্যাণ, আর এই কল্যাণ বিধানের জন্যেই ইসলামের দাওয়াতদানকারীরা আজ সর্বত্র কাজ করে যাচ্ছে। আজকের অশান্তিতে ভরা এই পৃথিবীতে মানবকল্যাণের এ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা সব থেকে বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। সামগ্রিকভাবে গোটা মানবমন্ডলী আজ এমনি একটি সংগঠনের জন্যে অপেক্ষা করে

রয়েছে। যদিও বলা হয় অন্যান্য সংগঠনের লক্ষ্যও একই, কিন্তু এটা সবাইকে আজ ভালো ভাবেই বুঝতে হবে, উদ্দেশ্য যার যা-ই থাকুক না কেন, আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা ছাড়া সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অন্য কোনভাবেই সম্ভব নয়। সকল বৈশিষ্ট্যসহ এ ব্যবস্থা আর একটি বারের মতো সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার স্বর্ণযুগকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে চায়।

প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টায় মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সাফল্য লাভ করেছে এবং অতীতের তুলনায় শিল্পকলা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করেছে। এভাবে এসব ক্ষেত্রে নতুন নতুন সাফল্যের দ্বার উদঘাটিত হয়েই চলেছে, কিন্তু মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বা নৈতিক উন্নতি সাধনে কোনো বিশেষ অবদান কেউ রাখতে পেরেছে কি?

পেরেছে কি মানুষের সৌভাগ্যটাকে একটু বাড়াতে? তাদের মধ্যে মানুষ কোনো স্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে পেরেছি কি? না, কখনও নয়। এ সব কিছু আজও অর্জিত হয়নি। বরং দেখা যায় সর্ব প্রকার সন্ত্রাস বেড়েছে, পেরেশানী এবং ভয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। যৌন ও নৈতিক উচ্ছৃংখলা এবং নানা প্রকার অপরাধপ্রবণতা বেড়েছে। এতো বেশী বেড়েছে যে তাকে হিংস্র পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। বরং বর্তমান সভ্যতায় উন্নতি ও অগ্রগতির সকল প্রচেষ্টা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মানুষকে পশু থেকেও এরা অধম বানিয়ে ছেড়েছে। আজ সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও বঞ্চনার জ্বালা দুঃখ-ক্লিষ্ট মানুষের অন্তর প্রাণকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, মানুষের শ্রান্ত-ক্লান্ত আত্মা আজ নানা প্রকার ভয় ও পেরেশানীতে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় নানা প্রকার অস্থিরতার মধ্যে থেকে এ অশান্ত আত্মা আল্লাহকে পেতে পারে না। বরং সীমাহীন সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়া মানুষেরা আল্লাহ তায়ালা থেকে আজ অনেক দূরে সরে গেছে। আজ তার মর্যাদার সাথে সংগতিপূর্ণ জ্ঞানের আলো নিয়ে সে যদি আল্লাহর পথে চলতো, তাহলে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে এমন কিছু খেদমত সে আনজাম দিতে পারতো যা তাকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য করতো। মানুষ তার আত্মাকে কুলষিত ও সংকীর্ণ করার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। যার কারণে সে জ্ঞানের সে আলো দেখতে পায় না, যা তাকে তার অস্তিত্বের তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করবে। আজ সে সে ধরনের জ্ঞানের সন্ধান পায় না, যা তার ও প্রকৃতির মধ্যে প্রাণস্পন্দন জাগাতে পারে। আজ সে তার নিজের ও বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারছে না, জানতে পারছে না তার আইন-কানুন ও প্রকৃতির রহস্য ভান্ডার সম্পর্কে, তার শক্তি ও ক্ষমতার মধ্যে যোগসূত্র কি, দুনিয়া ও আখেরাতের সেতুবন্ধন কি এর কোনোটাই সে জানতে পারবে না। যা কিছু হচ্ছে এটাই মনে হয় এখানে নিয়ম, এটাই স্বভাবিক, এটাই তার ব্যবহারের সথে সংগতিসমপন্ন এবং এতেই সে খুশী।

এই-ই হচ্ছে সেই মানবতা, যার একটি অংশ আল্লাহর দেয়া সেই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিরোধী হিসাবে কাজ করে, যা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। তারা হচ্ছে সেই সব মানুষ, যারা এ ব্যবস্থার দিকে তাকানোকে পুরাতন পন্থার দিকে ফিরে যাওয়া বা প্রগতি বিরোধিতা বলে মনে করে। ইতিহাসের কোনো একটি অধ্যায়কে আঁকড়ে ধরে থাকাকে এরা 'সেকেলে' বলে মনে করে। আসলে তাদের না জানার কারণে অথবা তাদের অসদুদ্দেশ্যের কারণে তারা মানুষকে সেই মহান ব্যবস্থার দিকে তাকাতে দিতে চায় না, যা মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথে এগিয়ে নিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যবস্থাই মানুষকে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমরা যারা এই ব্যবস্থাকে সঠিক ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বাস করি, তারা জেনে বুঝে সে পথের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা মানুষের কঠিন দুরবস্থা দেখছি, আমরা দেখছি সেই জনগোষ্ঠীকে যারা বদ্ধ ও নোংরা পানির ডোবায় পড়ে গিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আরো একটি দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেখছি মরু-মরীচিকার দিক-চক্রবাল উদীয়মান মুক্তির ঝান্ডা অন্ধকারাচ্ছন্ন দুঃখক্লিষ্ট মানুষের ঘরে

ঘরে মুঠো মুঠো আশার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, বদ্ধ জলাশয়ে ডুবন্ত মানুষের চোখে স্বচ্ছশুভ্র আলোর দীপ্ত শিখাগুলো তাদের প্রাণে আশার বারতা বয়ে আনছে। আমরা আরো লক্ষ্য করছি মানুষের নেতৃত্ব যদি এই পথে চালিত না হয়, তাহলে তা গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে অসম্মানজনক ও ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হবে।

সে পথে চলার সবচেয়ে উত্তম পদক্ষেপ হচ্ছে, অন্যান্য ব্যবস্থা থেকে এ ব্যবস্থার পার্থক্য তুলে ধরে এককভাবে এর বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এর ধারক বাহকরা ধ্বংসাত্মক জাহেলী সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে চলার কোনো পন্থা যেন অবলম্বন না করে, তা নিশ্চিত করা। এ উপায়েই এ ব্যবস্থা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং শান্তিদায়ক হয়ে ফুটে উঠবে এবং এমন এক সময় আসবে যখন গোটা মানবমন্ডলী আবার ইসলামের অধীনে এসে যাবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্যে এতো বেশী দয়াময় যে, তাদেরকে তিনি সেই সব মানবদুশমনদের হাতে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না, যারা তাদেরকে কখনও ওদিক থেকে জাহেলিয়াতের জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করার জন্যে আহ্বান জানাতে থাকে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রথম যুগের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাঁর মহান কেতাবের দিকে ডেকেছেন এবং রসূলুল্লাহ (স.) ও তাঁর কালজয়ী শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা তাদেরকে ইসলামী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে আনতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন।

আল্লাহকে ভয় করা বলতে কী বুঝায়

আহলে কেতাবদের সাথে মেলামেশা ও তাদের অনুসরণ করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা দু'টি মৌলিক পদ্ধতির দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন, যার ওপর তাদের গোটা ইসলামী ব্যবস্থা নির্ভর করছে। এই দু'টি মূলনীতির ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার দ্বারা সেই মহা দায়িত্ব পালন করা সম্ভব, যার জন্যে উম্মতে মুসলিমাহর সৃষ্টি হয়েছে। এই দু'টি মূলনীতি ও মৌলিক গুণ হচ্ছে ঈমান এবং ভ্রাতৃত্ব। ঈমান বলতে বুঝায় আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা, তাঁর ভয় এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি বান্দার সকল বিষয়ের ওপর তদারকী করছেন, সে সম্পর্কে গভীর বিশ্বাস। আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরী। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন গড়ে তোলার জন্যে অপরিহার্য এই ভ্রাতৃত্ববোধর ওপরই শান্তির প্রাসাদ নির্মিত হয়। এই বন্ধন গড়ে তোলার জন্যে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ভালো কাজের নির্দেশদান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার ধারার ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন এক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন, যা অপ্রিয় কাজ ও ব্যবহারের কদর্যতা থেকে হামেশা পবিত্র থেকেছে। এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং সঠিক অর্থে মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না ..... তারা আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে থাকবে।' (আয়াত ১০২-১০৭)

ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব এ দু'টি হচ্ছে ইসলামী জীবনের দু'টি কেন্দ্রীয় চরিত্র, যার ওপর মুসলিম উম্মাহ দাঁড়িয়ে আছে এবং এ দু'টি গুণের মাধ্যমে তারা তাদের মহা দুর্যোগকাল পার হয়ে এসেছে। এ দু'টির যে কোনো একটি হারিয়ে গেলে গোটা মুসলিম জামায়াত ভেংগে চুরমার হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে তদের আর কোনো ভূমিকাই থাকবে না।

সর্বপ্রথম, ঈমান ও তাকওয়ার কারণে মানুষের কাছে তার ব্যবহার গ্রহণযোগ্য হয়। এমন তাকওয়া যার দ্বারা সে মহান আল্লাহর হক আদায় করে ..... যে তাকওয়া মানবজীবনের প্রতিটি কথায়, কাজে ও চিন্তায় সদা জাগরূক থাকে। তার জীবনের কোনো একটি মুহূর্তও এমন যায় না যখন সে আল্লাহভীতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারে। এই পর্যায়ে এরশাদ হচ্ছে,

'হে ঈমানদাররা, আল্লাহকে এমনভাবে ভয় কর যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত।'

আল্লাহকে ভয় করে চলার কাজটি কোনো নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাবে না। তাকওয়ার এ লক্ষ্য অর্জনে তার আন্তরিক প্রচেষ্টা কখনও পরিত্যাজ্য হবে না এবং সে সাধ্যমত আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে রেখেই তার জীবনের কাজগুলো আঞ্জাম দিতে থাকবে। আর এ কারণে তার সামনে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হতে থাকবে এবং তার আগ্রহের মধ্যে সজীবতা আসবে। তাকওয়ার কারণে যখনই সে আল্লাহর নিকটবর্তী হবে, তখনই তার ঐকান্তিকতা তাকে নবতর সাফল্যের উঁচু পর্যায়ে উন্নীত করবে এবং তাকে আরো বেশী মর্যাদাবান বানাবে। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'আর মৃত্যুবরণ করো না, যতোক্ষণ না তোমরা (পুরাপুরি) মুসলিম হয়ে যাও।'

মৃত্যু এমন এক অদৃশ্য বস্তু যা কখন মানুষকে এসে পাকড়াও করবে, তা কেউ জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত নয়, তার কর্তব্য হবে সদা-সর্বদা এবং প্রতিটি মুহূর্তে শতকরা একশ ভাগ মুসলমান হয়ে থাকার চেষ্টা করা। তাকওয়া হাসিলের জন্যে উদ্বুদ্ধ করার পর ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান জানানোর মাধ্যমে এখানে এক গভীর ও ব্যাপক অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, ঈমান আনার পর মানুষকে একমাত্র আল্লাহর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর দেয়া ব্যবস্থাই মেনে চলতে হবে এবং যে কোনো ব্যাপারে তাঁর কেতাব থেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই অর্থই সূরাটির প্রতি পর্যায়ে ব্যক্ত হয়েছে।

এই হচ্ছে প্রথম একটি মৌলিক গুণ, যার ওপর গোটা মুসলিম জাতি টিকে আছে এবং তারা তাদের দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। তাকওয়ার এই গুণটির অভাবে সকল জনসমষ্টি জাহেলী জনসমষ্টিতে পরিণত হয়। মানবজীবনের জন্যে কোনো সৎ নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না— যতক্ষণ পর্যন্ত এই মহান আল্লাহভীতির গুণটি সঠিকভাবে মুসলিম নাগরিকদের মধ্যে পয়দা না হয়। এ গুণটি ছাড়া যতো বলিষ্ঠ নেতৃত্বই হোক না কেন, তা হবে জাহেলী নেতৃত্ব।

ঐক্যবদ্ধতার ওপর মুসলিম জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে

দ্বিতীয় বিশেষ লক্ষ্যনীয় বস্তু, যার ওপর মুসলিম জামায়াতের অস্তিত্ব নির্ভর করে তা হচ্ছে এর ভ্রাতৃত্ববোধ, এই ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, যাতে করে আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা পৃথিবীতে চালু করা যায়। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে মযবুত করে ধরো, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। আশা করা যায় এতে, তোমরা হেদায়াত লাভ করতে ..।' (আয়াত ১০৩)

এই হচ্ছে সেই ভ্রাতৃত্ব, যা তাকওয়া ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে উৎসারিত হয়, এটা ইসলামের প্রথম উৎস। এর মূল বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর রশিকে মযবুত করে ধরা অর্থাৎ তাঁর ওয়াদা, লক্ষ্য ও কাংখিত জীবনব্যবস্থাকে আকড়ে ধরা। অন্য কোনো ধ্যান-ধারণার ওপর এই জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না, এ উদ্দেশ্যও অর্জিত হয় না। অন্য কোনো লক্ষ্য অর্জনের পথে কাজ করার মাধ্যমে এ সম্পর্ক কখনোই স্থাপিত হয় না।

'তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে মযবুত করে ধরো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না' আল্লাহর রশিতে আবদ্ধ এই ভ্রাতৃত্ব একটি অতি বড় নেয়ামত, যার দ্বারা প্রথম যুগের মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা এহসান প্রদর্শন করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন তাদের সবাইকেই তিনি এখানে তা স্মরণ করাচ্ছেন। স্মরণ করাচ্ছেন তাদেরকে জাহেলিয়াতের যামানার করুন অবস্থার কথা। গোত্রপতি কর্তৃক শাসিত ছোট ছোট গোত্রে তারা বিভক্ত ছিলো এবং অতি তুচ্ছ কারণে তারা প্রায়ই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো এবং তাদের এই শত্রুতা শত শত বছর ধরে চলতো। এইভাবে তারা ছিলো পরস্পরের দুশমন।

এমনই দুশমনী মদীনায় অবস্থিত আওস ও খাজরাজ নামক দু'টি গোত্রের মধ্যেও বিরাজ করতো। এদের পড়শী ছিলো ইহুদীরা যারা সদা-সর্বদা এদের মধ্যে শত্রুতার আগুন প্রজ্জ্বলিত রাখার জন্যে তৎপরতা চালাতো, যার কারণে এদের পারস্পরিক বন্ধনের সম্ভাবনা পুরোপুরিভাবে ভেংগে গিয়েছিলো। এর ফলে ইহুদীরা চমৎকার এক সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলো যে তাদের উপস্থিতি ও মধ্যস্থতা ছাড়া ওদের কোনো কিছুই বুঝি মীমাংসা হতো না এবং এ কারণে ইহুদীরা ওদের এক অবিভাজ্য অংশ হয়ে গিয়েছিলো। অতপর আল্লাহ তায়ালা যখন ওই দু'টি গোত্রের মধ্যে ইসলামের বন্ধনের ওসীলায় মহব্বত দান করলেন এবং অবশ্যই এটা সত্য কথা যে, ইসলামের বন্ধন ছাড়া অন্য কোনোভাবেই এটা সম্ভব ছিলো না। আর এটাই ছিলো (ইসলাম রূপী) আল্লাহর রশি, যার দ্বারা বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলো পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং একে অপরের ভাইতে পরিণত হয়েছিলো। সেসব বিচ্ছিন্ন অন্তরগুলো জুড়ে দেয়া আল্লাহর মহব্বতে ভ্রাতৃত্বের মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই সম্ভব ছিলো না। এই ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির কারণে বংশ পরম্পরায় গড়ে ওঠা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, অপরের ক্ষতি করে নিজে বড় হওয়ার মনোভাব, গোত্রীয় প্রাধান্য হাসিল করার প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের প্রবণতা এবং বর্ণ-বৈষম্যের মাদকতা সবই তখন তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হতে লাগলো এবং সুমহান আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দ্বীনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তারা এক জাতিতে পরিণত হয়ে গেলো। তাই একথা স্মরণ করাতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

'স্মরণ করো, তোমাদের ওপর বর্ষিত আল্লাহর নেয়ামতের কথা। যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, অতপর তোমাদের অন্তরগুলোকে আল্লাহ তায়ালা জুড়ে দিলেন, অতপর তাঁর নেয়ামত লাভে তোমরা পরস্পর ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়ে গেলে।'

এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তাঁর আর একটি নেয়ামতের কথা স্মরণ করাতে গিয়ে উল্লেখ করছেন যে, কেমন করে অগ্নিগর্ভে পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বাঁচিয়ে দিলেন! হেদায়াতের আলো দিয়ে সে ধ্বংস থেকে উদ্ধার করে ইসলামের রশিতে বেঁধে তাদেরকে এক জামায়াতে পরিণত করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে এক ভালোবাসায় ভরা অভূতপূর্ব একতাবন্ধন গড়ে উঠেছিলো যার ফলে তারা ভাই-ভাইয়ে পরিণত হয়ে গেলো। এরপর আল্লাহর দ্বিতীয় নেয়ামতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি স্মরণ করাচ্ছেন,

'আর তোমরা আগুনভরা গর্তের একেবারে কিনারায় উপনীত হয়ে গিয়েছিলে, যেখান থেকে তিনি তোমাদেরকে বাঁচিয়ে আনলেন'।

কোরআনের বর্ণণাধারা মানুষের অনুভূতি ও সম্পর্ক বৃদ্ধির চেতনাকে জাগিয়ে দিতে চায়। অন্তরের মধ্যে এর কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোরআন 'ফাআল্লাফা বাইনাকুম' (অর্থাৎ 'তোমাদরকে জুড়ে দিয়েছেন' বলছে না, বরং অন্তরে গভীরে তীব্রভাবে রেখাপাত করানোর জন্যে কোরআনে করীম বলছে, 'ফাআল্লাফা বাইনা কুলূবেকুম'। (অর্থাৎ 'তোমাদের অন্তরগুলোকে জুড়ে দিয়েছেন')। এর ফলে আল্লাহ পাকের নিজ রহমতের দ্বারা মুসলমানদের অন্তরসমূহ পারস্পরিক মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থার চিত্র কোরআনে করীমে এমন নিপুনভাবে আঁকা হয়েছে যে, সে দৃশ্য পাঠকের অন্তরকে গভীরভাবে আন্দোলিত করে।

দেখুন, কোরআনে পাকের বর্ণনাভংগী, 'আর তোমরা (এমনভাবে) আগুনের গর্তের কিনারায় পৌছে গিয়েছিলে যেন মনে হচ্ছিলো যে কোনো মুহূর্তে আগুনের মধ্যে তোমরা পতিত হয়ে যাবে',

এমনই এক কঠিন মুহূর্তে অন্তরসমূহ অনুভব করে, অকস্মাৎ আল্লাহর অদৃশ্য হাত এসে যেন সজোরে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছে! আল্লাহর রশি সম্প্রসারিত হয়ে এগিয়ে এসে যেন তাদেরকে সে মৃত্যুগহ্বর থেকে উঠিয়ে নিচ্ছে। সে বিপজ্জনক অবস্থার দিকে গভীর আগ্রহে

তাকিয়ে থেকে পাঠক যেন দেখতে পাচ্ছে বিপদমুক্তি ও সফলতার মনোহরী এ অপূর্ব দৃশ্য! গতিশীল ও জীবন্ত এ দৃশ্য অবলোকনে আবেগ-বিহ্বল অন্তরসমূহ দুরু দুরু করে কেঁপে উঠছে, নাড়ীর স্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে এবং অজান্তেই তার নয়নসমূহে আনন্দাশ্রুর বান নামছে।

ইবনে ইসহাক তাঁর সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতে ইবনে হিশামে' এবং তাঁর প্রণীত অন্যান আরো কয়েকটি গ্রন্থে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আলোচ্য আয়াতটি আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, এক ইহুদী ব্যক্তি আওস ও খাযরাজদের এক সমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় উক্ত গোত্রদ্বয়ের পারস্পরিক মহব্বত ও একতার দৃশ্য তার কাছে অসহনীয় লাগে। অতপর সে হীন চক্রান্তের উদ্দেশ্যে ওদের সমাবেশে শরীক হওয়ার জন্যে এক ব্যক্তিকে পাঠায়। লোকটি এসে তাদের কথোপকথনে যোগ দেয় এবং সুযোগ মতো এই গোত্রদ্বয়ের মধ্যে অতীতে সংঘটিত 'বুআস' যুদ্ধের তিক্ত ইতিহাস তুলে ধরে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর ষড়যন্ত্র করে। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর তার এই হিংসাত্মক ষড়যন্ত্র অবশেষে সফল হয় এবং উক্ত গোত্রদ্বয়ের মধ্যে জাহেলী যুগের প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে। ফলে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়। তাদের ক্রোধাগ্নির শিখাকে উস্কিয়ে দেয়ার জন্যে তারা স্ব স্ব মর্যাদা উদ্দীপক বিভিন্ন ধ্বনি তুলতে থাকে, উভয়পক্ষে হাতিয়ার তুলে নেয়ার উপক্রম হয় এবং 'হাররা' নামক ময়দানে মোকাবেলা করার জন্যে একে অপরকে আহ্বানও জানায়। এ ঘটনাটি নবী (স.)-এর গোচরীভূত হলে তিনি অবিলম্বে সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং অবস্থার নাযুকতা যথাযথভাবে অনুভব করেন। তিনি তাদরেকে শান্ত করতে গিয়ে বলেন, 'কী আশ্চর্য, আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তোমরা জাহেলী যুগের মতো পরস্পরে শক্তি পরীক্ষার আহ্বান জানানো শুরু করেছো।' এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করতে শুরু করেন। আল্লাহর মেহেরবানী, কোরআনের সম্মোহনী আয়াতগুলো স্বীয় প্রভাব দেখাতে সক্ষম হয় এবং অচিরেই তাদের ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়। তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে হাতিয়ার নিক্ষেপ করে এবং ভীষণ লজ্জিত হয়ে যায়। তারপর প্রশান্ত বদনে এগিয়ে এসে গভীর মহব্বতের আবেগে তারা পরস্পর আলিংগনাবদ্ধ হয়। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা ও নবী রসূলদের দুশমন ইহুদী চক্রান্ত চরমভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যার ফলে তারা সঠিক পথ অবলম্বন করে এবং আয়াতের শেষভাগে উল্লেখিত আল্লাহর কথাগুলো কার্যকরী হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর আয়াতগুলোকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করছেন যেন তোমরা সঠিক পথ দেখতে পাও।'

এই হচ্ছে মহব্বতের রশিতে বাঁধা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে ইসলামের জঘন্য দুশমন ইহুদীদের হীন চক্রান্তের কদাকার দৃশ্য। আলহামদু লিল্লাহ, তৎকালীন মুসলমানরা ইসলামী ব্যবস্থার ওপর দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়েছিলো এবং এরই ফলে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো। ইহুদীদের এই মারাত্মক চক্রান্ত মুসলমানদের একতাকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্যে আজও সমভাবে ক্রিয়াশীল এবং তখনই তারা তাদের চক্রান্তের থাবা বিস্তার করার জন্যে অস্থির হয়ে যায়, যখন তারা মুসলমানদেরকে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থার ওপর আপোষহীন ও ঐক্যবদ্ধভাবে একত্রিত হতে দেখে।

এ হচ্ছে সেই কুফলগুলোর একটি যা-আহলে কেতাবদের অন্ধ অনুকরণ করার কারণে মুসলমানদের মাঝে মাঝে ভোগ করতে হয়েছে। এই চক্রান্ত প্রথম যুগে কখনও কখনও মুসলমানদেরকে কাফের পর্যন্ত বানানোর পর্যায়েও নিয়ে গেছে এবং একের বিরুদ্ধে অন্যকে এমনভাবে উস্কিয়েছে যে, তারা পরস্পরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র পর্যন্ত হাতে তুলে নিয়েছে।

এই কথাগুলো দ্বারা পূর্বে বর্ণিত আয়াতগুলোর সাথে বর্তমান আয়াতের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। তবে আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা উল্লেখিত ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আরো অনেক বেশী ব্যাপক। আয়াতটিতে ইহুদী জাতির অতীত ও ভবিষ্যতের পরিকল্পিত হীন কার্যকলাপের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে।

মদীনার তৎকালীন অবস্থায় মুসলমানদের দলে ভাংগন সৃষ্টি করার জন্যে ইহুদীরা নিরন্তর চেষ্টা জারী রেখেছে। সর্বতোভাবে তারা চেয়েছে যেন মুসলমানদের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃংখলা লেগে থাকে। এই কারণেই কোরআনে করীম তাদের ষড়যন্ত্রের জালে পা দেয়া বা তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুসলমানদেরকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছে। বিশেষ করে মদীনার ইহুদীরাই মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সব থেকে বেশী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। মদীনার মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, সন্দেহ ও পেরেশানীর বীজ বপন করাই ছিলো ইহুদীদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, মূলত সকল যামানাতেই তাদের এ চক্রান্ত সমভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছে। এ জঘন্য কাজ আজ পূর্বের মতো এখনও যেমন চালু আছে– আগামীতেও তেমনি থাকবে।

এখন মুসলিম জনগোষ্ঠীর কর্তব্য হবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের এই দ্বিমুখী আক্রমণের মোকাবেলায় নিজেদের অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। তাদের অবশ্যকরণীয় এ কাজটির লক্ষ্য হবে, পৃথিবীতে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, মানবসমাজে কল্যাণকর কাজগুলোর প্রতিষ্ঠা এবং অশান্তির কাজগুলোর পথ রোধ করা এবং মন্দের ওপর ভালোর বিজয় কেতন উড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

মুসলিম জাতির দায়িত্ব কর্তব্য

সত্যের এই বিজয়াভিযানকে এগিয়ে নেয়ার কাজ আল্লাহর হুকুমে তাঁর দেখানো পদ্ধতিতে এবং তাঁর সাহায্যক্রমেই শুরু করা হয়েছিলো। নিম্নে বর্ণিত আয়াতে সেই কথাটিই ফুটে উঠেছে।

‘তোমাদের মধ্যে একদল লোক এমন হতে হবে যারা ভালো কাজের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ ও অকল্যাণকর কাজ থেকে মানুষকে ফেরাবে।’ (যারা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করবে) তারাই হবে সাফল্যমন্ডিত।’

অতএব মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই ‘ভালো’র দিকে মানুষকে ডাকতে হবে, মানুষের জন্যে কল্যাণকর বলে জানা সকল প্রকার ভালো কাজের তারা নির্দেশ দেবে এবং যাবতীয় অন্যায় ও অপ্রিয় কাজগুলো করা থেকে মানুষকে নিষেধ করবে। এজন্যে ক্ষমতা লাভ করা অপরিহার্য, কারণ ক্ষমতা না থাকলে ভালো কাজ করার জন্যে মানুষকে আহ্বান হয়তো জানানো যায়, কিন্তু মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া যায় না। ভালো কাজের আদেশ না দিতে বা মন্দ কাজ বন্ধ করার জন্যে হুকুম করতে গেলে হাতে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকা চাই, নচেত সে নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা কেউ মানবে না। ক্ষমতার অপরিহার্যতার বিষয়টি এ আয়াত থেকেই প্রমাণিত। আলোচ্য এই আয়াতটিতে ভালো বা কল্যাণকর কাজের জন্যে আহ্বান জানানোর কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে সেখানে একইভাবে ‘সুপরিচিত’ ভালো কাজসমূহ করার নির্দেশ বা হুকুম দিতে বলা হয়েছে এবং মন্দ বা অকল্যাণকর কাজগুলো করার ব্যাপারে নিষেধ করতে বলা হয়েছে। ভালো কাজের দিকে আহ্বান জানানোর জন্যে ক্ষমতার অধিকারী না হলেও চলে, কিন্তু নির্দেশ বা নিষেধ করার কাজ ক্ষমতা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ইসলামী চিন্তা-চেতনার মধ্যে ক্ষমতা চাওয়ার তাৎপর্য এটাই। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিই কেবল নির্দেশ দিতে পারে বা নিষেধ করতে পারে। অতএব, এমন একটি শাসনকর্তৃপক্ষ প্রয়োজন, যারা পৃথিবীতে ভালো কাজের হুকুম ও মন্দ কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেবো। তারা মানুষকে কল্যাণের

দিকে আহ্বান জানাতে থাকবে এবং মন্দ কাজ বন্ধ করতে বলবে। এ দায়িত্ব যে পালন করবে সেই মযবুত একতা গড়ে তুলতে পারবে। সেই আল্লাহর সাহায্য পাবে এবং মানুষের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষমতাও পাবে।

যে ক্ষমতাবানরা এই দু'টি কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্যে কাজ করবে, তারা মানুষের জীবনে আল্লাহর ব্যবস্থা চালু করতে সফল হবে। তবে এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন আল্লাহর এই দ্বীনের পথে মানুষকে ব্যাপকভাবে আহ্বান জানানো। যার ফলে মানুষ এ সত্য সুন্দর ব্যবস্থার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবে। এরপর প্রয়োজন শাসন-ক্ষমতা, যার মাধ্যমে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়া সম্ভব হবে। তখন কল্যাণকর কাজের প্রসার হবে এবং মন্দ কাজ করা থেকে মানুষকে নিষেধ করা যাবে। এ প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, 'আমি যে কোনো রসূল পাঠিয়েছি, তাকে এই অধিকার দিয়ে দিয়েছি যেন আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই তার আনুগত্য করা হয়।' সুতরাং পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা মানে নিছক ওয়ায-নসীহত, আলাপ-আলোচনা বা বিবৃতি দেয়া নয়। অবশ্য সমগ্র কাজের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এর অপর প্রধান অংশ হচ্ছে ক্ষমতাবলে এ ব্যবস্থার আদেশ ও নিষেধগুলোকে চালু করা। যাতে করে মানুষের জীবনে 'ভালো' কাজসমূহ বাস্তবায়িত হয় এবং 'মন্দ' ও অপ্রিয় কাজগুলো বন্ধ হয়ে যায়। কল্যাণকামী এই দলকে স্বার্থপরতা ও দুশ্চরিত্রতার কবল থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এ দলকে কল্যাণকর কাজে সহায়তা দিতে হবে। এই কল্যাণকামী দলটিতে দলীয় আনুগত্যের নিশ্চয়তা তখনই আসবে, যখন কর্মীরা স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবে। কারণ ভালো দলের কর্মীরা ভালো উদ্দেশ্যে কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ বিষয়েই সাধারণত মতামত প্রকাশ করে থাকে।

ভালোর দিকে ডাকা, কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দান এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা মোটেই তুচ্ছ বা খুব সহজ কাজ নয়। মানুষের প্রকৃতির দিকে যখন আমরা তাকাই তাদের মধ্যে অবস্থিত সহজাত কু-প্রবৃত্তিরর দিকে যখন তাকাই তখন আমরা দেখি মানুষের মধ্যে নিজের সুবিধা নিশ্চিত করার এক অন্ধ আবেগ রয়েছে। যখন কারো কারো মধ্যে অহংকার ও প্রাধান্য লাভের নেশা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখন আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করি 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' এবং 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নেহী আনিল মুনকার' আল্লাহর দিক ডাকা, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করা কতো কঠিন কাজ। সমাজে বরাবরই যুলুমবাজ এমন কিছু লোক আছে যারা জোর করে নিজ প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়, রয়েছে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তা, আবার রয়েছে এমন কিছু সংখ্যক হীনমন্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যারা অন্যায়ভাবে মর্যাদাবান হতে আকাংখী। রয়েছে অতি নরমপন্থী কিছু লোক যারা কোনো ব্যাপারেই শক্ত হতে পারে না, কোনো রকম দৃঢ়তা অবলম্বন করতে পারে না। আবার শারীরিক দিক দিয়ে কিছু দুর্বল লোকও আছে, যারা সুবিচার পায় না, আছে সত্য পরিহারকারী আরো কিছু মানুষ, যারা ন্যায়নিষ্ঠ হতে পারে না। এমনিভাবে এমন বহু লোকও আছে যারা কল্যাণকর ও 'ভালো কাজের' প্রসার বরদাশত করতে পারে না, বরং মানবতাবিরোধী কাজে বেশ খুশী হয়। তারা চায় না গোটা জনপদের সবাই সুখে-শান্তিতে থাকুক এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ হোক। এমতাবস্থায় নেক চরিত্রের লোকের হাতে নেতৃত্ব দান করাই পরিত্রাণের একমাত্র উপায় এবং সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। তাহলে কল্যাণকর ব্যবস্থা ভালো বলে মানুষ তা বুঝার সুযোগ পাবে এবং মন্দকে মন্দ বলে তারা পরিহার করতে পারবে, কল্যাণকর ক্ষমতার দাবী এটিই এবং ভালো লোকের হাতে ক্ষমতা দান করার মাধ্যমে এই সব সুপরিচিতি ভালো কাজসমুহের নির্দেশ দেয়া যায় এবং মন্দ ও অকল্যাণকর কাজগুলো থেকে মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। বস্তুত এমন নেতৃত্বেরই আনুগত্য করা হয়।

'ভালো কাজ চালু করা ও মন্দ কাজ বন্ধ করা' সমাজের এ দু'টি মৌলিক দাবী প্রতিষ্ঠার জন্যে সৎ চিন্তাশীল ও একমনা একদল কর্মী প্রয়োজন, যাদের মধ্যে দু'টি মুখ্য গুণ থাকবে, আল্লাহর

প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং তাঁর রসূলের আদর্শের আপোষহীন অনুসরণ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ। তাহলেই এই ঈমান ও তাকওয়ার শক্তি এবং এর সাথে মহব্বত ও দরদ-সহানুভূতির অমিয় ধারা একত্রিত হয়ে এই হতাশাজর্জরিত এই সমাজে আবার অনাবিল শান্তি স্থাপিত হবে, যার জন্যে উম্মাতে মুসলিমার সৃষ্টি হয়েছিলো। এই দায়িত্ব পালনকেই তাদের সাফল্য লাভের চাবিকাঠি বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তাই, যারা এ কাজ শুরু করেছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা এরশাদ করেন, 'তারাই হচ্ছে সাফল্যমন্ডিত।'

আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য দাবীই হচ্ছে এমনি একটা দল প্রতিষ্ঠা করা। এই দল হচ্ছে সমাজদেহের সেই কেন্দ্রবিন্দু, যার মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত এই সুমহান ব্যবস্থা বিরাজ করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই দল হচ্ছে মানবদেহের হৃদপিন্ড, যার মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং বাস্তব জীবনে তা কিছু ভূমিকা রাখতে পারে। এই দলই কল্যাণের দিকে দাওয়াতদানের একমাত্র সহায়ক শক্তি। এর মধ্যে ভালো যে জিনিসগুলোর অস্তিত্ব মানুষ বুঝতে পারে তা হচ্ছে, এর মাধ্যমেই সমাজদেহে কল্যাণ প্রবাহকে নিশ্চিত করা যায়, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য সঠিক ব্যবহার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়। এ দলটি অপ্রিয় জেনে অন্যায় ও অকল্যাণকর কাজ কদর্যতা, মিথ্যা ও যুলুম পরিহার করবে। এ দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর মধ্যে মন্দ কাজের তুলনায় ভালো কাজ করা সহজ থাকবে, কদর্য ব্যবহারের তুলনায় সদাচার সহজলভ্য হবে, মিথ্যা থেকে সত্য কথা বলা নিরাপদ হবে এবং অবিচার থেকে সুবিচার এখানে বেশী পাওয়া যাবে। ন্যায়বান ব্যক্তি এখানে সবদিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করবে এবং মন্দ ব্যক্তিটি বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। এসবই হবে এ দলের বৈশিষ্ট্য। এ হবে এমন একটি পবিত্র ও মধুর পরিবেশ যার মধ্যে কল্যাণকামীতা প্রসার লাভ করবে। কারণ, এ দলের প্রতিটি জিনিস এবং প্রতিটি ব্যক্তি ভালো কাজের প্রবক্তাকে সবদিক থেকে সহায়তা করতে থাকবে। আর অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা যুলুম এখানে মোটেই স্থান পাবে না, যেহেতু অন্যায়কারীর প্রতিটি পদক্ষেপকে এখানকার নিয়ম-শৃংখলা কঠোরভাবে রুখে দাঁড়াবে।

জীবন ও জগত সম্পর্কে, মানুষের মর্যাদা ও তার কার্যাবলী সম্পর্কে, জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগী অনৈসলামী দৃষ্টিভংগী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং ইসলামের অনুসারী ও প্রবক্তাদের কর্তব্য হচ্ছে এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে রক্ষা করা ও অমুসলিমদের সামনে এগুলোর বিশেষ মর্যাদাকে তুলে ধরা।

ইমান ও ভ্রাতৃত্বরূপী এ দু'টি কেন্দ্রবিন্দুর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠী গোটা মানবসমাজে মধ্যমণির মতো অবস্থান করবে। সেখানে আল্লাহর ওপর ঈমানের প্রতিফলন এমনভাবে ঘটবে যে, জগতজোড়া মানুষের জন্যে তারা অনুকরণীয় আদর্শ হবে। তাদের গোটা জীবন, জীবনের মূল্যবোধ, তাদের কাজ, তাদের ব্যক্তিত্ব ও বিষয়াদি সবকিছুই অন্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং তারা হবে সবার জন্যে এমন এক আদর্শ যে, মানুষ নিজেদের অজান্তেই অনুসরণ করতে শুরু করবে।

যে নযীর তারা এ পর্যায়ে স্থাপন করবে এবং সত্য-মিথ্যার পরিমাপক হিসাবে যে মানদন্ড তারা এখানে খাড়া করবে, জীবনের সবকিছু যাচাই করার জন্যে মানুষ সেই মানদন্ডের দিকেই তাকাবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একমাত্র আইন-কানুনের দিকেই তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে। যে কোনো বিষয়ের ফয়সালা নেয়ার জন্যে তারা ব্যস্ত হয়ে এদের কাছেই ছুটে আসবে। তখন নিজেদের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা অনুসারে গড়ে ওঠা এই নেতৃত্বের দিকে তাদের মন এগিয়ে আসবে। তারা অনুভব করবে যে, শান্তি ও মানুষের মধ্যে

মহব্বত গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ভ্রাতৃত্ববোধের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুপ্ত অবস্থাতে হলেও মানবতাবোধ বর্তমান আছে। সময়-সুযোগ ও উপযুক্ত পরিবেশে তা অকস্মাৎ জেগে ওঠে। মানবতা ও মানুষের জন্যে দরদ-অনুভূতি এটা হচ্ছে মানুষের সহজাত বৃত্তি। এর বিকাশে ঘটানোর জন্যে শুধু পরিবেশ সৃষ্টি করাই মুসলমানদের কাজ। ইসলামের সম্মোহনী আদর্শ দ্বারা অশান্ত মানবতার মধ্যে স্বস্তি ও প্রশান্তির অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারলেই মানুষ পূর্ণ পরিতৃপ্তির সাথে এ মহান আদর্শকে গ্রহণ করতে শুরু করবে।

ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের এই মহান আদর্শের ছোঁয়াচে জীবন গড়ার লক্ষ্যেই মদীনার বুকে প্রথম মুসলিম জামায়াতটি কায়েম হয়েছিলো। সে সময়ে তাদের ঈমান ছিলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং ছবির মতো নবীর গুণাবলী মোমেনদের অন্তরে ভাসতো। আল্লাহর ভয় এবং তাঁর তদারকীর অনুভূতি তাদের অন্তরে সর্বদা জাগ্রত ছিলো। কদাচিত একটু গাফেল হয়ে পড়লেও মুসলমানরা সদা-সর্বদা নিজেদের মহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে পরিপূর্ণ সজাগ ছিলো। তাদের পারস্পরিক মহব্বত ছিলো সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত, তাদের সুমধুর আন্তরিকতা ছিলো বড়ই সুন্দর, তারা গভীর দরদ দিয়ে পরস্পর কুশল বিনিময় করতো এবং কারো কোনো অসুবিধা হলে একান্ত আন্তরিকতা দিয়ে তা দূর করার জন্যে এগিয়ে যেতো। সে জামায়াতটি সত্যিই সবদিক দিয়েই আদর্শ জামায়াতে পরিণত হয়েছিলো। মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে বিরাজমান মহব্বত পৃথিবী জুড়ে আজো কিংবদন্তি হয়ে আছে বরং আজকে তাদের প্রকৃত অবস্থা চিন্তা করলে মনে হয়, সে যেন সত্যিই এক স্বপ্নে পাওয়া ছবি। কিন্তু বাস্তবিকই এই ইতিহাস কোনো স্বপ্নপুরীর কাহিনী, যা পৃথিবীর বুকে সত্য সত্যই একদিন ঘটেছে। সে সোনার কাহিনী পৃথিবীর মানুষদের মনের মণিকোঠায় চিরদিন জাগরূক হয়ে থাকবে।

আর এমনি করেই সে ঈমান ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সকল যামানায় আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে মযবুতী দান করতে থাকবে।

দল উপদলে বিভক্ত হওয়ার কঠোর হুঁশিয়ারী

এই পর্যায়ে এসে প্রসংগের পুনরাবৃত্তি করে মুসলিম জামায়াতকে পুনরায় স্মরণ করানো হচ্ছে এবং সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, যেন তারা কারো ফাঁদে পা না দেয় এবং সকল প্রকার বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। তাদেরকে আবারও সতর্ক করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, যেন তারা পথভ্রষ্ট কেতাবধারী ব্যক্তিদের মতো না হয়ে যায়, যাদেরকে তাদের পূর্বে এক পবিত্র আমানত স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু তারা তা রক্ষা না করে নানা প্রকার মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়ে, ফলে তাদের থেকে আল্লাহ তায়ালা নেতৃত্বের পতাকা কেড়ে নেন এবং ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ মুসলিম জামায়াতের হাতে সে পতাকা অর্পণ করেন। সর্বোপরি পরকাল তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেদিন কিছু চেহারা থাকবে আনন্দের উজ্জ্বলতায় শুভ্র সমুজ্জ্বল আর কিছু চেহারা থাকবে কালো-কুশ্রী-কদাকার।

মোমেনদের প্রতি আল্লাহর এরশাদ,

'যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ এসে যাওয়ার পর মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে– তোমরা তাদের মতো হয়ে যেয়ো না। আর তাদের জন্যে নির্ধারিত রয়েছে মহাশাস্তি। সেদিনের কথা একবার স্মরণ করো, যখন কিছু সংখ্যক চেহারা থাকবে শুভ্র সমুজ্জ্বল এবং অন্য আরো কিছু চেহারা থাকবে কালো-কুশ্রী-কদাকার। ......আর যাদের চেহারা থাকবে আনন্দের আবেগে শুভ্র সমুজ্জ্বল, তারা আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে অবস্থান করবে, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।' (আয়াত ১০৫-১০৮)

এ পর্যায়ে এসে কোরআনে কারীমের মধ্যে উল্লেখিত বিভিন্ন দৃশ্যের একটি উজ্জ্বল, জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দৃশ্য ফুটে উঠেছে। কিন্তু আমাদের কাছে সে দৃশ্যটি এতো ভয়ানক যে, তা কোনো ভাষায়

বর্ণনা করা বা তার বৈশিষ্টের চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। তবে মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে সে দৃশ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে। যেদিন এক শ্রেণীর মানুষ এতো সুন্দর এবং এতো খুশী থাকবে আর এক শ্রেণীর মানুষ দুঃখ ভারে ভারাক্রান্ত থাকবে, চেহারাগুলো তাদের জরাজীর্ণ ও ধূলিধূসরিত হবে, তারা ভীষণ কষ্টের জ্বালায় কালো-কুশ্রী-কদাকার হয়ে যাবে এবং এ অবস্থা থেকে তারা কোনোদিনই মুক্তি লাভ করতে পারবে না। তাদের জন্যে সদা-সর্বদা তিরস্কার ও অভিশাপের দংশন-জ্বালা থাকবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হবে,

'তোমরা কি ঈমান লাভ করার পরেও কুফরী করেছিলে? তাহলে আজ তোমাদের কুফরীর দরুন নিকৃষ্ট শাস্তি ভোগ করো।'

এই ভাবে সেদিনের এই দৃশ্যটি জীবনস্পন্দনে সচল হবে। কোরআন এই কথাটিকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছে। এভাবেই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। সাথে সাথে মুসলমানদের মধ্যে ঈমান এবং ভ্রাতৃসম প্রেম বিরাজমান থাকা যে আল্লাহর এক মহা-নেয়ামত, সে কথাও তাদের বলা হয়েছে।

এমনি করেই কেতাবধারী জাতির পরিণতি মুসলমানরা যেন বাস্তবে দেখতে পায়। কারণ, ওদের প্রত্যাবর্তন স্থলে যে বেদনাদায়ক ও কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তাতে মুসলমানরা যেন শরীক না হয়, তার জন্যে তাদেরকে বারবার সতর্ক করা হয়েছে।

'সেদিন কিছু চেহারা থাকবে উজ্জ্বল এবং কিছু চেহারা থাকবে কুশ্রী-কদাকার।'

এই বিবরণ দান করার পর দু'টি দলের পরিণতি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এই বৃহৎ সূরার মধ্যে ব্যাপকভাবে সে আলোচনা পাওয়া যায়। যে সঠিক তথ্য এ সূরার মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে তাই-ই ওহী ও রেসালাতের যথার্থতার প্রমাণ দেয় এবং এ কথা বুঝতে সাহায্য করে যে, কেয়ামতের দিন প্রতিদান ও হিসাব গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। সূরাটি এ কথাও জানিয়ে দেয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দেয়াই হচ্ছে ইনসাফের দাবী। আল্লাহর একক মালিকানা আকাশমন্ডলী ও গোটা পৃথিবী জুড়ে পরিব্যপ্ত রয়েছে এবং সকল অবস্থাতেই সব কিছু তাঁর কাছে ফিরে যাবে। আল্লাহর বাণী,

'এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রেরিত আয়াত, যা আমি তোমার কাছে সঠিকভাবে পড়ে শোনাচ্ছি, আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগতে কারো ওপর যুলুম করতে চান না। আর আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় মালিকানা একমাত্র তাঁরই এবং আল্লাহর কাছেই সকল বিষয় ফিরে যাবে।'

অর্থাৎ তাঁর কাছে গিয়েই সকল কিছুর চূড়ান্ত বিচার-ফয়সালা হবে। সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতাকে বুঝানোর জন্যে আদিগন্তব্যাপী যে চিত্রগুলো দেখা যাচ্ছে, তাই পেশ করা হচ্ছে। এগুলো আল্লাহর হুকুমে দিবা-রাত্রি ঘটে চলেছে, আল্লাহকে জানার জন্যে এসব কিছুকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন 'দলীল-প্রমাণ' বলে জানিয়েছেন। বলছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নিদর্শনগুলো এবং স্পষ্ট প্রমাণসমূহ তাঁর বান্দার জ্ঞান লাভের সহায়ক হিসাবে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করছেন,

'এ সম্পর্কিত বিবরণ তোমার কাছে আমি সঠিকভাবে পড়ে শোনাচ্ছি।'

সে চিত্রগুলো এমন সত্য এমন সঠিক যে, এর মধ্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এগুলো এমন সত্য যা মানুষের প্রত্যাবর্তনস্থান ও প্রতিদান সম্পর্কে তাকে সঠিক কথা জানিয়ে দেয়। এগুলো তাঁর কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে, যিনি নাযিল করার একমাত্র মালিক এবং সব কিছুর সঠিক মূল্যায়ন করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে নিবদ্ধ। সবার গন্তব্যস্থান ঠিক করে দেয়া এবং কার প্রতিদান কী হবে তা স্থির করা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাজ। বান্দার

ওপর যুলুম হতে থাকবে আল্লাহ তায়ালা কিছুতেই তা বরদাশত করতে রাযি নন। তিনি নিজেই হুকুমদাতা, নিজেই সুবিচারক এবং যাবতীয় বিষয়ের মালিকও একমাত্র তিনি। অবশ্য ভালো-মন্দ সকল কাজের প্রতিদানের ব্যবস্থা এমনভাবে তিনি করেন যাতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সুবিচারের ব্যবস্থা চালু হয়। আহলে কেতাবদের দাবী যে, তাদের সুনির্দিষ্ট সামন্য কিছুদিন ব্যতীত স্থায়ীভাবে কোনো আগুন স্পর্শ করবে না, এটা কখনও হবার নয়।

গোটা মানবজাতিকে পরিচালনা করা মুসলিম জাতিরই দায়িত্ব

এরপর আলোচনার মধ্যে দেখা যায়, উম্মতে মুসলিমাহ যেন নিজেদের মান-মর্যাদা ও মানবমন্ডলীর মধ্যে তাদের সঠিক অবস্থান নিরূপণ করতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদেরকে আহলে কেতাবদের পূর্ববর্তী অবস্থার পরিবর্তন হয়ে তাদের যে পতন হবে– সে সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মুসলমানদের মান-মর্যাদা, কর্তব্য এবং ঈমানের দাবী পূরণের লক্ষ্যে তাদের কি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হবে তা জানানোর পর তার থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্যে তাদের মধ্যে তীব্র আকাংখা সৃষ্টি করছেন, মুসলমানদের তিনি দুশমনের দুশমনি থেকে নিশ্চিন্ত করছেন। সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ কিছুই মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা কখনও তাদেরকে কোনো সাহায্য করবে না। ওদের মধ্যে যারা সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে পরকালে আগুনের আযাব, সেখানে ঈমান ও তাকওয়া ব্যতীত কোনো নেক আমলই কোনো কাজে লাগবে না।

এরশাদ হচ্ছে, তোমরা হচ্ছ সর্বোত্তম জাতি, গোটা মানবমন্ডলীকে সঠিক পথ দেখানোর জন্যে তোমাদেরকে বের করা হয়েছে।... বরং তারা নিজেদের ওপর নিজেরাই যুলুম করে'।

আয়াতের প্রথম অংশে যে আলোচনা এসেছে তার দ্বারা গোটা মুসলিম উম্মাহর কাঁধে একটি ভারী বোঝা তুলে দেয়া হয়েছে, যা তাদের মান-মর্যাদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল এবং এ বিষয়টি মানবমন্ডলীর মধ্যে তাদের উচ্চতর অবস্থানও নিরূপণ করে। এই বিশেষ মর্যাদার একক অধিকারী একমাত্র তারাই, এ মর্যাদা অন্য কোনো জনগোষ্ঠীকে দেয়া হয়নি।

'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা মানুষকে সর্বপ্রকার ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর তোমরা নিজেরা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকবে।'

বাক্যের মধ্যে 'উখেরেজাত' শব্দটিতে কর্তার উল্লেখ নেই, অর্থাৎ কর্মবাচক পদে বাক্যটিকে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কারণে আয়াতটি গভীরভাবে চিন্তা করার দাবী রাখে এবং এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এই মুসলিম উম্মতকে আদর্শবাদী এবং আদর্শের পতাকাবাহী জাতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে এক অদৃশ্য হাত নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ (স.)-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই উম্মতকে গোটা মানবমন্ডলীর পথ-প্রদর্শক বানানো হয়েছে এবং সমগ্র মানবজাতির মধ্য থেকে এদেরকে নেতৃত্ব দান করার উদ্দেশ্যে বাছাই করে নেয়া হয়েছে। রহস্যাবৃত সে গায়েব থেকেই এদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অজানা সে রহস্যের পেছনে রয়েছে সেই চিরস্থায়ী সত্ত্বা মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যিনি অন্তরীক্ষ থেকে সব কিছু পরিচালনা করছেন। আলোচ্য বাক্যটির মাধ্যমে জানা যায় যে, এক গোপন শক্তি সব কিছুর পেছনে অতি সূক্ষ্মভাবে এবং সংগোপনে সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছে। ক্রিয়াশীল সেই মহাশক্তি এই মহান জাতিকে পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে হাযির করেছেন যারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি যুগের সূচনা করেছে, যারা বিশ্বসভায় এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করে রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে,

'তোমরাই সেই শ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে গোটা মানবমন্ডলীর জন্যে বের করা হয়েছে।'

এই কারণে মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বের দরবারে তার মর্যাদাপূর্ণ স্থান সংরক্ষণ করতে হবে এবং সেই মর্যাদার আসনে সমাসীন হওয়ার জন্যে তার সম্মানজনক অবস্থানকে বুঝতে হবে এবং তার

নিজের সঠিক পরিচয়ও জানতে হবে। তাকে আরও জানতে হবে যে, তাকে মানবতার অগ্রদূত বানানো হয়েছে এবং তাকে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব দান করা হয়েছে, সার্বিক বিবেচনায় তারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই চান যে, নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ভালো লোকের হাতে থাক এবং মন্দ লোকের হাতে তা কখনই না যাক। একমাত্র ভালো লোকের হাতে গেলেই ভালো কাজ হওয়ার আশা করা যায়, তাই তিনি তাদেরকে বাদ দিয়ে জাহেলী যুগে উত্থিত কোনো কওমের হাতে নেতৃত্ব দান করা পছন্দ করেননি। গোটা মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্যে এই আমানত চিরদিন সেই সব ঈমানদার ও বিশ্বস্ত লোকের হাতে থাকতে হবে যাদের আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা সঠিক খাতে প্রবাহিত হয়, যাদের মধ্যে সঠিক সংগঠন, সঠিক চরিত্র, সঠিক জ্ঞান সঠিক বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা বিদ্যমান রয়েছে। এই সব গুণাবলী তার অবস্থানকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করতে পারে এবং তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেও সফল করে তুলতে পারে। এই সকল গুণাবলীই তার অগ্রযাত্রাকে স্থায়ী ও সুনিশ্চিত করতে পারে এবং নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে তাকে সমাসীন করে দিতে পারে। আসলে নেতৃত্বের এই আমানত নিজস্ব গুণের দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই পাওয়ার জিনিস– এটা দাবী করে পাওয়ার বস্তু নয় এবং প্রকৃত যোগ্যতা ছাড়া কাউকে এমনি এমনিই এ দায়িত্ব দেয়াও হয় না। আন্তরিক বিশ্বাস ও সমাজ সংগঠনের গুণ হচ্ছে এর প্রধান যোগ্যতা। তবে খেলাফত বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং দেশ পরিচালনার জন্যে জ্ঞানগত যোগ্যতাও সমধিক জরুরী। অতএব, একথা স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যে, এ উম্মতকে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম করার যে গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা পালন করতে গেলে বহু জিনিসের প্রয়োজন, প্রয়োজন সেসব গুণের অধিকারী হওয়া। এসব গুণ অর্জন করতে পারলে এবং সেগুলোর দাবী পূরণ করতে পারলে অতীতের মতো আজও উম্মাতে মুসলিমাহ্র হাতে নেতৃত্বের আমানত এসে যাওয়া সুনিশ্চিত।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

নেতৃত্বের আমানত হাসিলের জন্যে যে সব গুণের প্রয়োজন, তার প্রথমটি হচ্ছে যাবতীয় আবিলতা থেকে জীবনের পরিচ্ছন্নতা। কলুষ-কালিমা থেকে জীবনকে পবিত্র রাখা এবং বিশৃংখলা ও ভারসাম্যহীনতা থেকে তাকে মুক্ত রাখা। তারপর প্রয়োজন 'আমর বিল মা'রূফ' (ভালো কাজের নির্দেশ দান) 'ওয়া নেহী আনিল মুনকার' (অপ্রিয় ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা)। সংক্ষেপে এই গুণগুলো থাকলে নিজেদের সেই উম্মত বা জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা সম্ভব, যাদেরকে মানবমন্ডলীর পরিচালক বানানোর জন্যে তৈরী করা হয়েছে। এই সর্বোত্তম জাতি বানিয়ে দেয়াটা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়। কিছু সৌজন্য বিনিময় বা ভালোবাসা বিনোদনের গুণ অথবা স্রেফ মানুষকে আকৃষ্ট করার মতো আচার আচরণ কিংবা কথার যাদু দ্বারা মানুষকে মোহান্বিত করার যোগ্যতা দিয়েও সে মহান যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়, যার দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদের ওপর নেতৃত্ব করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন মেকি ও ঠুনকো জিনিসের বিনিময়ে এতো বড় গুরু-দায়িত্বের বোঝা কাউকে দান করেন না। কিছু খেতাব বা সম্মানসূচক পদবী, উপাধি বা পদমর্যাদা দানের মাধ্যমেও সেই মহিমান্বিত গুণ অর্জিত হয় না, যা বিশ্বনেতৃত্বের আসল প্রয়োজন মিটাতে পারে। যেমন আহলে কেতাবরা বলতো, আমরা তো আল্লাহ্র ছেলে এবং তাঁর প্রিয় পাত্র। না, মোটেই ঠিক নয়, এগুলো আসলে নেতৃত্ব হাসিলের কোনো গুণ নয়। এ গুণের অধিকারী হয়ে মানবসমাজকে অপ্রিয় জিনিস থেকে রক্ষা করার জন্যে অবশ্যই ইতিবাচক কিছু ভূমিকা রাখতে হবে– ন্যায় ও সদগুণাবলীর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব কিছুর সাথে সেই বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী হতে হবে, যা ভালো কাজ করার প্রবণতাকে সুতীক্ষ্ম করে এবং মন্দ কাজ

বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই আল্লাহ তায়ালা জানাচ্ছেন, নেতৃত্ব দানের জন্যে তোমরা অবশ্যই কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেবে এবং যাবতীয় অকল্যাণকর কাজ বন্ধ করার জন্যে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে। এসব গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে তোমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর ওপর অবিচল বিশ্বাসী হতে হবে।

সর্বোত্তম জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যে অন্যান্য ক্লান্তি ও কন্টকাকীর্ণ পথে চলার যোগ্যতাসহ অবশ্যই এই গুণগুলো অর্জন করতে হবে, অর্থাৎ যা কিছু অন্যায়-অশোভন, ক্ষতিকর বা মন্দ তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং সর্বপ্রকার কল্যাণকর কাজ করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সমাজকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের কাজের গ্লানি থেকে পবিত্র রাখতে হবে। যে সকল ব্যবস্থা বিশৃংখলা বা উচ্ছৃংখলতা বয়ে আনতে পারে সেগুলোর দ্বার রুদ্ধ করে দিতে হবে, আল্লাহর দেয়া সেই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যার কারণে জীবন সুন্দর ও সজীব হয়ে উঠবে।

সমাজ জীবনে ঈমানের অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে, এর প্রতিটি স্তরে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবনের সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং বাস্তব কর্মকান্ডের মাধ্যমে ভালো ও মন্দ ব্যবস্থার পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে, নেতৃত্ব হাসিলের জন্যে সংগঠন ও সংগঠন-পদ্ধতি এবং কিছু সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য ও তৎপরতাই যথেষ্ট নয়। গোটা সমাজের বুকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা না করলে শুধু সংগঠন ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া চালু করায় সাধারণভাবে অশান্তি ও বিশৃংখলা দূর করা সম্ভব নয়। অতএব, সাংগঠনিক তৎপরতার সাথে সাথে নিজ নিজ পরিবেষ্টনীতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতিকার, গুণীজনের কদর ও হীনমন্যতা, নীচুতা ও মন্দ ব্যবহারকে দমন করা, ভালো কাজকে উৎসাহিত করা ও অপ্রিয় কাজগুলোকে দাবিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া সঠিকভাবে চালু রাখতে হবে। কারণ, যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা মানুষের গতানুগতিক ভালো মানুষীপনার থেকে তা অনেক উর্ধে। ওপরে বর্ণিত কাজ প্রতিষ্ঠা ও সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে দ্বিতীয় মাইলফলক।

ঈমান বা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ওপর অবিচল বিশ্বাস ও তাঁর শক্তি-ক্ষমতার ওপর দৃঢ় আস্থা। মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে স্রষ্টার সাথে তার সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রকৃতপক্ষে ঈমান এই কাজটাই করাতে চায়। এটিই মানবজীবনের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং সৃষ্টিজগতে তার প্রকৃত কাজ ও কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য এই-ই। সাধারণত এই চিন্তাধারা থেকেই নৈতিক চরিত্রের মূলনীতি উদগত হয় এবং এইসব মূলনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আল্লাহর গযব ও আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার আশা করা যায়। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় সংকল্প সেসব মূলনীতি জাগ্রত রাখার ওপরেই নির্ভর করে।

তারপর ঈমানের এটাও অন্যতম দাবী যে, প্রত্যেক মোমেন অন্য মানুষকে ভালোর দিকে ডাকবে, যার জন্যে বলা হয়েছে, 'তারা নেক কাজের প্রতি আহ্বানকারী এবং মন্দ কাজের প্রতিরোধকারী।' তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে এবং এ পথের সকল কষ্ট তাদের বরদাশত করতে হবে। তারা যালেম ও অহংকারী শাসকের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হক কথা বলে, আর যখন উদভ্রান্ত যৌবন তাদেরকে পাগল করে তোলে তখন তারা দুরন্ত যৌন কামনা-বাসনার মোকাবেলা করে, মোকাবেলা করে নানা প্রকার লোভ-লালসা ও উস্কানির। এর ফলে তাদের ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সবকিছুর মোকাবেলা করার জন্যে ঈমানী শক্তিই আসলে তাকে প্রস্তুত করে। তাদের সাহায্যকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালা। সব সত্যের ওপর একথা সত্য যে, ঈমান ব্যতীত অন্য সব কিছুই একদিন ফুরিয়ে যাবে এবং ঈমানের প্রস্তুতি ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রস্তুতি মায়া-মরীচিকাসম ও পথভ্রষ্টকারী। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অপর সকল সাহায্য খোকলা বা তলাবিহীন ঝুড়ির মতো।

মুসলিম জামায়াতের একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিম জনপদ থেকে একটি দলকে অবশ্যই ইসলামের দাওয়াত দান করার জন্যে আশেপাশের এলাকা ও দেশগুলোতে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ ইতমধ্যে অন্যস্থানে এসে গেছে। এই দাওয়াত দানকারীরা মানুষকে কল্যাণকর কাজের নির্দেশ দেবে এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখবে। এ দুরূহ কাজের সময় তাদের একমাত্র হাতিয়ার ও রসদ হবে আল্লাহর ওপর ঈমান। ঈমানের এ হাতিয়ার মজুদ থাকলে তাদের কাছে অন্য সবাই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে, এর অভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা আসবে না এবং ইসলামের গুণাবলীও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না।

একথার সপক্ষে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে অনেক কথা এসেছে, যথাস্থানে আলোচনার জন্যে আমরা এখানে এ প্রসংগের অবতারণা করছি না। হাদীস শরীফেও রসূল (স.)-এর নির্দেশবহনকারী একদল লোকের খবর জানা যায়, আমরা এ বিষয়ের কয়েকটি হাদীস এখানে তুলে ধরছি,

১। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে তার কর্তব্য হবে, সে যেন শক্তি দিয়ে তা দূর করে, যদি না পারে, তাহলে যেন সে তার জিহ্বা (কথা) দ্বারা তা দূর করে এবং এতোটুকু করার শক্তি-ক্ষমতাও যদি তার না থাকে, তাহলে সে যেন তার অন্তরে তা (ঘৃণা) করে। আর এটা তার দুর্বলতম ঈমানের পরিচয় বহনকারী হবে। (মুসলিম)

২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.) এরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈল জাতি অন্যায় ও গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যকার ওলামায়ে কেরাম প্রথমে তাদেরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন এবং সে সব অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু তারা অন্যায় কাজ থেকে বিরত না হলেও সেই আলেমরা তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবে উঠাবসা করতে থাকে, খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠানেও তারা তাদের সাথে শরীক হয়, এর ফলে তাদের অন্তরগুলো একে অপরের ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে এবং অন্যায়কারীদের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে দাউদ সোলায়মান ও মূসা (আ.) তাদের ভাষায় তাদের ওপর অভিসম্পাত দেয়া হয়। এতটুকু বলার পর রসূলুল্লাহ (স.) উঠে সোজা হয়ে বসলেন। এর আগে তিনি ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। তারপর বললেন, 'না, তাদের সাথে কিছুতেই মেলামেশা করা যাবে না যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাদেরকে বাঁকিয়ে সোজা পথে নিয়ে আসবে, অর্থাৎ মন্দ পথ থেকে ফিরিয়ে না আনবে।'

৩। হোযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, যার হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ রয়েছে, তাঁর কসম খেয়ে আমি বলছি, অবশ্যই তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ করতে মানুষকে নিষেধ করবে, তা না হলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি এ কাজ না করার শাস্তি স্বরূপ গযব নাযিল করবেন বলে আশংকা রয়েছে। তখন তোমরা দোয়া করতে থাকবে, কিন্তু তোমাদের দোয়া তিনি কবুল করবেন না। (তিরমিযী)

৪। উরস ইবনে উমায়রাতুল কুন্দী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (স.) এরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে কোনো অন্যায় সংঘটিত হতে থাকলে কেউ যদি তা দেখে ও অপছন্দ করে, তাহলে তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মতো, যে এই ঘটনা থেকে দূরে রয়েছে, আর যে ব্যক্তি দূরে থেকেও সে অন্যায় সম্পর্কে জানলো ও সন্তুষ্টচিত্তে তাকে মেনে নিলো তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মতো, যে এই অন্যায়কে প্রত্যক্ষ করলো অথচ কোনো প্রতিবাদ করলো না। (আবু দাউদ)

৫। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) এরশাদ করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে যালেম শাসকের সামনে 'হক' কথা বলা। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, শহীদদের এক নেতা হচ্ছেন হামযাহ আর এক নেতা সেই ব্যক্তি, যে যালেম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে হক কথা বলে, তাকে জোরালোভাবে ভালো কাজ করতে বলে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত হতে বলে, ফলে সে যালেম তাকে শাসক কতল করে দেয়। (হাকেম)

এগুলো ছাড়াও এ সম্পর্কে আরও বহু হাদীস আছে, যেগুলোর প্রত্যেকটি মুসলিম জনপদের মধ্যে এই কর্তব্যবোধ পয়দা করার জন্যে প্রেরণা জুগিয়েছে তাছাড়া মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যেও এই কর্তব্য পালন করা জরুরী। অবশ্য এজন্যে ব্যাপক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত কোরআনের শিক্ষা প্রচুর পরিমাণ থাকা সত্তেও আমরা সাধারণভাবে তা থেকে গাফেল হয়ে আছি। তার তাৎপর্য আমরা যথাযথভাবে বুঝতে পারি না।(১)

আহলে কেতাবদের চরিত্র

এবার আমরা ফিরে যাবো এই বিষয়ে আয়াতটির দ্বিতীয় অংশের আলোচনায়।

'আহলে কেতাবরা যদি ঈমান আনত তাহলে সেটা তাদের জন্যে কল্যাণকরই হতো। তদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক আছে মোমেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই হচ্ছে ফাসেক।'

আয়াতের এই অংশে বর্ণিত কথাগুলোর মাধ্যমে আহলে কেতাবদের ঈমান আনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এখানে এই যে কথা 'ফাহুয়া খাউরুল্ লাহুম' তাদের জন্যে সেটা কল্যাণকর, এ বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে থাকার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে এবং সেই সমস্ত দলাদলির কোন্দল থেকে রেহাই পাবে, যার মধ্যে তারা বিশ্বাসগত চিন্তার বিভিন্নতা হেতু আকণ্ঠ ডুবে ছিলো। এই সব দলীয় কোন্দল তাদেরকে বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে একদলে কোনোদিনই একদলে পরিণত করতে পারেনি। তাদের এই সব বিভিন্ন চিন্তাধারা তাদের সামাজিক জীবনের জন্যে একটি সমন্বিত আইন-কানুন বা ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এক হয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠনে পরিণত হতে পারেনি। কারণ, তাদের কোনো কিছুরই স্থায়ী ভিত্তি ছিলো না। যা ছিলো তা একটা খোঁড়া ব্যবস্থায় হাওয়ায় ভাসমান এক তরী, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই। অন্যান্য মানব-নির্মিত মতবাদের মতোই ছিলো তাদের সমাজ-সংগঠনের বিধি-বিধান। সেগুলো পথহারা ও সমস্যাজর্জরিত মানুষকে কোনো পথ দেখাতে না পারায় গোটা মানবসমাজের সমস্যাসমূহের কোনো স্থায়ী সমাধান তারা দিতে পারেনি। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাদের বিশিষ্ট মর্যাদাই বা কিসের জন্যে এবং তাদের এমন কি কি সুকীর্তি আছে যার কারণে আখেরাতে তারা মুক্তি পাওয়ার আশা করতে পারে! তারপর তাদের অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে বলা হচ্ছে, নেককার মানুষকে তাদের সুকীর্তির ন্যায্য বিনিময় থেকে কিছুমাত্র কম দেয়া হবে না। এরশাদ হচ্ছে,

'ওদের মধ্যে কিছু সৎলোক আছে, কিন্তু ওদের অধিকাংশ লোকই হচ্ছে ফাসেক'

অর্থাৎ গুরুতর অপরাধপ্রবণ, নানা প্রকার অপরাধে লিপ্ত। সত্য বলতে কি সে আহলে কেতাবদের মধ্যে একদল সত্যপন্থী ও সত্যাশ্রয়ী লোকও ছিলো। এরা সুন্দরভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং অত্যন্ত ভালো মুসলমানে পরিণত হয়েছিলো। এ লোকগুলো হলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, আসাদ ইবনে উবায়েদ, সা'রাবা ইবনে শু'বা এবং কা'ব ইবনে মালেক। আলোচ্য আয়াতে তাদের বিস্তারিত বিবরণও আসছে, তারা নিজ নিজ নবীর সাথে ওয়াদা করেছিলো যে, তাঁদের ভাই যখন তাঁর সে আদর্শ ও শিক্ষা নিয়ে পরবর্তীকালে আসবেন তখন তারা তাঁর প্রতি

(১) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে মোহাম্মদ কুতুব প্রণীত কেতাব 'ক্বাবাসাতুম্ মিনার রসূল' 'ক্বাবলা আন্ তাদউনী উজীবু।' পড়ুন প্রকাশনা দারুশ শারূক্ব বৈরুত।

ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যখন আল্লাহর দ্বীন নিয়ে শেষ নবী এসে গেলেন তখন তাদের কিছু লোক বাদে অনেকেই এই অজুহাতে তাঁর আনীত জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাযি হলো না যে, তিনি বনী ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করেননি। এইভাবে তারা এই রসূলের আনুগত্য মেনে নিতে তারা অস্বীকৃতি জানালো।

এ সময়ে মুসলমানদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক মদীনার ইহুদীদের সাথে আপত্তিকরভাবে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছিলো। তারা মনে করত ইহুদীরা একটি মযবুত শক্তি, সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সময়কার তাদের এই দুর্বল অবস্থার ছবি তুলে ধরতে গিয়ে কোরআনে করীম ঘোষণা করছে যে, তারা মহা অপরাধী ফাসেক, যদিও তারা মুসলমান বলে পরিচিত। আল্লাহর রসূল (স.)-এর বিনা অনুমতিতে কাফেরদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে কোরআন তাদেরকে নাফরমান, কাফের ও ফাসেক বলে অভিহিত করা হয়েছে।

মুসলমানদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি

ইহুদীরা বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা হীনতা ও কোনোদিন কোনোস্থানে স্থায়িত্ব লাভ না করার আযাব নির্ধারত করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'হে মুসলমানরা, সামান্য কিছু কষ্ট ছাড়া ওরা তোমাদের বড় রকমের কোনো ক্ষতি ওরা কিছুতেই করতে পারবে না। আর ওরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে জেনে রেখো, অবশ্যই তারা পেছন ফিরে পালিয়ে যাবে। .... আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করার কারণে তাদের ওপর নিজেদের আবাসস্থল থেকে বিতাড়নের দুঃখ চেপে বসেছে। এটা এ কারণেই যে, তারা অতীতে বহু নবীকে বিনা কারণে হত্যা করেছে। এর কারণ তাদের নাফরমানী ও অহংকার ছাড়া আর কিছুই নয়।' *(আয়াত ১১১-১১২)*

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে সাহায্য দানের জামানাত দিয়েছেন এবং তাদেরকে তাদের শান্তিপূর্ণ পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন। এ আয়াতের ঘোষণায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, মুসলমানরা তাদের প্রভু ও তাদের দ্বীনের সাথে মযবুত সম্পর্কে আবদ্ধ থাকলে যেখানেই সেসব (আহলে কেতাব) দুশমনদের সাথে মোকাবেলা হবে সেখানে অবশ্যই মুসলমানদের বিজয় হবে। আল্লাহর এ বাণী অতি স্পষ্ট,

'সামান্য ও সাময়িক কিছু কষ্ট বা সংকট ছাড়া ওরা কিছুতেই তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর তোমাদের বিরুদ্ধে ওরা যদি কোনো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে জেনে রেখো, অচিরেই ওরা পেছন ফিরে পালাবে ....।'

এতে বুঝা গেলো, যুদ্ধ-বিগ্রহের বিভীষিকা যতোই থাকুক না কেন, কোনো গভীর দুঃখ-বেদনা বা ক্ষতির সম্মুখীন মুসলমানদের হতে হবে না। এটা কোনো সুনিশ্চিত ব্যাপার নয়, এটাও ঠিক নয় যে মুসলমানদের দলে বিশৃংখলাও ঘটবে না, দুঃখের কোনো প্রভাব পড়বে না। কখনও কখনও তাদের সাময়িক কিছু বাধা-বিপত্তি বা সংকটের সম্মুখীন হতে হবে এবং সে সময় যা কিছু ব্যথা-বেদনা আসবে তা অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানেই দূর হয়ে যাবে। সুতরাং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ওরা যখনই যে অভিযান চালাবে অবশেষে সেখান থেকে পরাজয় এবং স্রেফ পরাজয়ের গ্লানিই হবে তাদের ভাগ্য লিখন। মোমেনদের বিরুদ্ধে কেউই তখন তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করবে না। আর এটাও নিশ্চিত যে, মুসলমানদের থেকে রক্ষা পাওয়ারও তাদের কোনো রাস্তা নেই। কারণ, সুনিশ্চিতভাবে তাদের জন্য অপমান ও হীনতা নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রতিটি এলাকাতেই তারা লাঞ্ছিত হবে। কেউ তাদের বাঁচাতে পারবে না। তবে তাদের আশ্রয় দান করার জন্যে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এবং মুসলমানরা যদি কোনো দায়িত্ব নেয়, তবে সেটা স্বতন্ত্র কথা। ওরা মুসলমানদের যিম্মায় যখন এসে যাবে,

তখন তাদের জান-মাল রক্ষা পাবে অবশ্য সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধী ব্যতীত। তাদেরকে সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করা হবে। এ পর্যন্ত পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে, এ ঘোষণার পর থেকে ইহুদী জাতি মুসলমানদের কাছে ছাড়া আর কোথাও কোনো দিন নিরাপত্তা পায়নি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও এটা একটা চরম সত্য যে, এই অকৃতজ্ঞ ইহুদী জাতি মুসলমানদের থেকে বেশী শত্রুতা আর কারও সাথে করেনি। এইভাবেই তারা আল্লাহর গযবকে খরীদ করে নিয়েছে এখনো তারা এ গযবের বোঝা বহন করেই চলেছে। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী আবাসস্থল থেকে বিতাড়নের গযবও তাদের ওপর সওয়ার হয়ে গেছে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ওপরে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাই একটা একটা করে ঘটে গেছে। মুসলমান ও আহলে কেতাবদের মধ্যে যতো যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে তাতে মুসলমানদের সেইভাবেই বিজয় হয়েছে যেভাবে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ বিজয় ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো যতোদিন মুসলমানরা দ্বীন ইসলামের সর্বাত্মক অনুসরণ করেছে এবং মযবুতভাবে তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় থেকেছে। তবে যেখানে মুসলমানদের কাছে তারা আশ্রয় চেয়েছে, আশ্রয় পেয়েছে।

যখন আল্লাহর গযব অবধারিত হয়

ইহুদীদের ওপর এইভাবে গযব নাযিল হওয়া কারণ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে কোরআন বলছে যে, আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার জন্যে বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। সে অপরাধগুলো যারাই করবে তাদের উপর সেসব গযব একইভাবে আসতে থাকবে– তারা নিজেদের মুসলিম দাবী করুক না কেন। সে কারণগুলো হচ্ছে নাফরমানী ও অহংকার বা সীমালংগন। এরশাদ হচ্ছে, 'এই গযব নাযিল হওয়া এই জন্যে যে, সেসব জাতি আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতো এবং বিনা কারণে নবীদেরকে হত্যা করতো।'

হ্যাঁ, গযব এসেছে এই জন্যে যে, তারা বরাবরই সীমালংঘন করেছে।

আল্লাহর আয়াতের সাথে কুফরী করার অর্থ হচ্ছে, সেগুলোকে অস্বীকার করা অথবা সেগুলোকে ধারণ না করা এবং বাস্তব জীবনে সেগুলোকে প্রয়োগ না করা। এই উভয় অর্থেই তা কুফরী হয়। আর নবীদের বিনা কারণে হত্যার মধ্যে সে সব ব্যক্তিদের হত্যাও শামিল রয়েছে যারা আল্লাহর বিধান কায়েমের জন্যে জেহাদ করতে গিয়ে দ্বীনের শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছে। যেমন আলোচ্য সূরার মধ্যে অন্য আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে। আবার নাফরমানী এবং সীমালংঘনকর কাজও গযব নাযিল হওয়ার জন্যে অন্যতম প্রধান কারণ। লাঞ্ছনা গঞ্জনা, পরাজয়, অপমান ও আবাস-ভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্যেও সে একই কারণ অর্থাৎ নাফরমানী ও অহংকার দায়ী। মুসলমানদের এই বিতাড়নের অবস্থা আজ পৃথিবীর অনেক জনপদেই ঘটছে। কারণ, তারা অবৈধভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছে। এ কারণে তারা সেই পরিণতি ভোগ করছে যা ইহুদী জাতির ভাগ্যলিপি হিসাবে তিনি তাদের জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন। এমতাবস্থায় যখন কেউ প্রশ্ন করে, আমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে কেন পরাজিত হচ্ছি? তাদের এ কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা দরকার যে, ইসলাম আসলে কী এবং মুসলমানই বা কারা? এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার পর তারা যা বলতে চায়– বলুক। আর আহলে কেতাবরা অল্প কিছু সংখ্যক হওয়া সত্তেও কেন আজ উল্টা তারাই বিজয়ী হচ্ছে এ প্রশ্নের জওয়াবে বলতে হয়, তারা তো সবাই সমান নয়। তাদের মধ্যে তো অনেক মোমেনও আছে। তাদের রবের সাথে তারা নিজেদের সম্পর্ক জুড়ে রেখেছে। যারা সত্য সঠিক মোমেন, তাদের প্রতিদান নেককার মুসলমানদের মতোই হবে। এরশাদ হচ্ছে,

'আহলে কেতাবরা সবাই সমান নয়। তাদের মধ্যে একদল লোক আল্লাহর আয়াতগুলোকে রাত্রির প্রান্তভাগসমূহে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করে এবং তারা সেজদারত হয়।'

তারা আল্লাহ তায়ালা ও আখেরাতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, ভালো কাজে নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর কল্যাণকর কাজের ব্যাপারে তারা যথেষ্ট তৎপরতা দেখায় এবং তারা নেককার লোকদের অন্তর্গত। যা কিছু ভালো কাজ করছে তারা সেগুলোকে অস্বীকারও করা হবে না এবং আল্লাহ তায়ালা মোত্তাকী-পরহেযগার লোকদেরকে জানেন।

আহলে কেতাবদের মধ্যে যারা মোমেন, তাদের স্পষ্ট ও উজ্জ্বল চেহারা এখানে ফুটে উঠেছে। এরা সত্য সত্যই গভীরভাবে ঈমান এনেছে। পরিপূর্ণতা সহকারে ঈমান এনে তারা মুসলিম দলের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে এবং এই দ্বীনের হেফাযত ও পাহারাদারীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। ঈমান এনেছে তারা আল্লাহ তায়ালা ও শেষ দিবসের প্রতি। তারা ঈমান আনার পর পরবর্তী কষ্টগুলোও ভোগ করেছে এবং সেই সময়কার উম্মাতে মুসলিমার সাথে যোগদান করে তাদের ঈমানের লক্ষণ ও চিহ্ন নিজেদের মধ্যে কায়েম করেছে— যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে গোটা মানবমন্ডলীর জন্য তাদেরকে বের করা হয়েছে। এরপর তারা 'আমর বিল মা'রূফ' ও 'নেহী আনিল মুনকার'-এর কাজে অংশ নেয়। কল্যাণকর কাজের জন্য তাদের অন্তর উদ্বেলিত থাকে। অতপর যে নেক কাজকে তারা জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে, তা অর্জন করার জন্য তারা প্রতিযোগিতা করে। এই কারণেই তাদের জন্য এই সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, তারা নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের জন্য এই সত্য ওয়াদা যে তাদেরকে তাদের পাওনা থেকে কিছুমাত্র কম দেয়া হবে না এবং তাদের কোনো প্রতিদানকেই অস্বীকার করা হবে না। এখানে ইংগীতে একথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা জানেন যে তারা হচ্ছে মোত্তাকীদের সারীর লোক।

সত্যের প্রতি এই সাক্ষ্যদানকারীদের সামনে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ওয়াদা তুলে ধরা হয়েছে, যারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন সম্পর্কে ও স্পষ্ট বুঝ নিয়ে তাঁর প্রদীপ্ত নূর হাসিল করার জন্যে পরম আগ্রহভরে এগিয়ে আসবে আল্লাহ তায়ালা তাদের দাবী নিজেই পূরণ করবেন।

এ হচ্ছে চিন্তার একটি দিক। চিন্তার আরেকটি দিক হচ্ছে, কাফের বলতে এখানে সেই সব সত্য অস্বীকারকারীদেরকে বুঝায় যাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি তাদের কোনো কাজেই লাগবে না। যা কিছু ধন-সম্পদ তারা দুনিয়ায় খরচ করেছে তাও তাদের কোনো উপকারে আসবে না। তারা তাদের দুনিয়ার খরচ করা কোনো কিছুই আখেরাতে ফিরে পাবে না, যেহেতু তারা সত্য সঠিক ও কল্যাণের রাস্তায় চলতে চায়নি। যে কল্যাণ আল্লাহর ওপর ঈমান থেকে উৎসারিত, তার ধ্যান-ধারণা স্পষ্ট, তার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং তার পথ গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেয়ার সাথে গ্যারান্টিযুক্ত। সেইটিই হচ্ছে প্রকৃত সাফল্যের পথ। এছাড়া অন্য যে সব পথ রয়েছে, সেগুলোর বাহ্যিক সাফল্য পুঞ্জীভূত অবস্থায় দেখা গেলেও তা সাময়িক, তার কোনো স্থায়িত্ব নেই, প্রবহমান বাতাসের মৃদু ঝাপটা তার পাখনাগুলোকে সহজেই ওলট-পালট করে ফেলে এবং তা আর কখনও সেই মূলের দিকে ফিরে আসে না, যার সত্যতা বিবেকের কাছে ধরা পড়ে এবং মযবুত ও পরিপূর্ণ ব্যবস্থার দিকেও সে পথ মানুষদের এগিয়ে দেয় না। তাই এরশাদ হচ্ছে,

'যারা কুফরী করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্ততি আল্লাহর কাছে কখনও কোনো কাজে লাগবে না। তারা জাহান্নামবাসী, ... এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে হিমশীতল কিছু বায়ু .....।' (আয়াত ১১৬-১৭)

এভাবেই এ সত্যটি কোরআনের চমকপ্রদ বাচনভংগীর প্রকাশের মধ্য দিয়ে একে একটি চলন্ত ও জীবন দৃশ্যরূপে অংকিত হয়েছে,

তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারবে না, তা তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তিপণ হবারও যোগ্য হবে না। তারা দোযখেরই অধিবাসী হবে। তারা নিজেদের যতো ধন-সম্পদই দান করুক না কেন তা বৃথা যাবে ও বিনষ্ট

হবে। এমনকি তারা যদি এই দান করাকে সৎ কাজ ও পুণ্য কাজ মনে করে, তবু তাতে কোনো লাভ হবে না। ঈমানের সাথে যুক্ত না হলে কোনো সৎকাজ সৎকাজ বলেই গণ্য হবে না। কিন্তু আমরা যে ভাবে এ কথাটি ব্যক্ত করি কোরআন কিন্তু সে ভাবে ব্যক্ত করে না। কোরআন এটাকে একটি জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দৃশ্যের ছবিতে অংকন করে।

কোরআনের অংকিত এ দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, আমরা যেন একটা উর্বর ও শস্য-শ্যামল ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ঠান্ডা ও তুষারময় হীমশীতল ঝড় শস্যক্ষেত্রটাকে ধ্বংস করে দেয়। এখানে ব্যবহৃত 'সেররুন' শব্দটির ধনাত্মক রূপ এমনই যেন তা প্রচন্ড জোরে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তুর ঝংকার দ্বারা তার আযাবকে বাস্তবায়িত করার দৃশ্য তুলে ধরছে, আর তাতেই যেন গোটা শস্যক্ষেত্রটি বিধ্বস্ত ও বিরান হয়ে যাচ্ছে।

এখানে এমন একটি মুহূর্তের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যাতে মুহূর্তেই সংঘটিত হয়ে যায় ধ্বংস ও বিনাশ। মুহূর্তের সর্বনাশা ঝড়ে পুরো শস্যক্ষেত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটা হচ্ছে দুনিয়াবী জীবনে কাফেরদের দানশীলতার উদাহরণ। যাকে দৃশ্যত সৎকর্ম ও পুণ্যকর্ম বলেই প্রতীয়মান হয়। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিসহ যে সব নেয়ামত তাদের অধিকারে রয়েছে তার উদাহরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এর সবই ধ্বংসের মুখে নিপতিত হবে। তা দ্বারা কোনো সুফলই পাওয়া যাবে না।

'আল্লাহ তাদের ওপর কোনো যুলুম করেননি, বরং তারাই নিজেদের ওপর যুলুম করেছে।'

কেননা, তারাই আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে যে বিধান ছিলো যাবতীয় কল্যাণ ও পুণ্যের আধার ও উৎস। যে বিধান যাবতীয় সৎকাজকে একটা সঠিক ও নির্ভুল গন্তব্যের সাথে যুক্ত করে দিয়েছিলো, যে বিধানের একটা সুবিদিত পথ ও প্রণালী রয়েছে।

তারা নিজেদের জন্যে নিজেরাই বিপথগামিতা এবং আল্লাহর অটুট রশির রক্ষাব্যবস্থা থেকে স্খলিত হওয়ার পথকে বেছে নিয়েছে। তাই যখন তাদের সকল সৎকর্ম এমনকি দৃশ্যত সৎ উদ্দেশ্যে করা সকল দান পর্যন্ত বৃথা চলে গেলো, ধ্বংস হয়ে গেলো, তখন কোনো সহায়-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর তাদের কোনোই কাজে লাগলো না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো যুলুম ছিলো না। এটা ছিলো তাদের নিজেদের ওপর নিজেদেরই যুলুম। নিজেরাই গোমরাহী ও ভ্রষ্টতাকে বেছে নিয়ে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করেছিলো।

এ কথাগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, কোনো চেষ্টা সাধনা বা কর্মকান্ডের কোনো ফল বা মূল্য থাকে না– যতক্ষণ তা ঈমানের সাথে যুক্ত না হয় এবং তার পেছনে ঈমানী প্রেরণা সক্রিয় না থাকে। এটা স্বয়ং আল্লাহর ঘোষণা। এর পর মানুষের কিছু বলার অবকাশ নেই। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত নিয়ে কেবল তারাই বাদানুবাদ করতে পারে যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে কোনো জ্ঞান, কোনো দীপ্তিময় গ্রন্থের সহায়তা ছাড়া শুধু বাদানুবাদ করতেই অভ্যস্ত।

বিধর্মীরা কখনোই মুসলমানদের কল্যাণ চায় না

পরবর্তী তিনটি আয়াত হচ্ছে আহলে কেতাব সংক্রান্ত এ আলোচনার উপসংহার স্বরূপ। এ আলোচনা শুরু হয়েছিলো আহলে কেতাবদের বিকৃতি ও বিভ্রান্তির বর্ণনা, তাদের উত্থাপিত বিতর্কে নিহিত মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাদের অপচেষ্টার স্বরূপ উদঘাটন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ফাঁস করন, মুসলমানদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হওয়ার আদেশ দান ছিলো এর অন্তর্ভূক্ত। এ কাজ করতে গিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির প্রয়াসী ফাসেক লোকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার নির্দেশ এখানে দেয়া হয়েছে। এখানে এসে সূরার এই দীর্ঘতম অংশটির শেষ হয়ে যায়। এ পর্যায়ে এসে মুসলমানদের এই মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, তারা যেন তাদের আজন্ম শত্রুদেরকে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে, তাদেরকে নিজেদেরকে গোপন তথ্য না জানায় এবং নিজেদের ভালোমন্দের খবরদারী করার কোনো সুযোগ

তাদেরকে না দেয়। কেননা, ওরা আসলে মোমেনদের দুশমন। এই সতর্কবাণী এতোটা সুদূরপ্রসারী ও চিরস্থায়ী যে আমরা প্রত্যেক যুগে এবং পৃথিবীর প্রত্যেক ভূখন্ডে এর উপযোগিতা দেখতে পাই। চিরস্থায়ী গ্রন্থ কোরআনে এই সতর্কবাণী দেয়া সত্তেও কোরআনের ধারক-বাহকরা এ ব্যাপারে উদাসীন। আর এ কারণে তারা অনবরতই দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করে চলেছে। ১১৮, ১১৯ ও ১২০ নং আয়াত পড়ুন এবং সতর্কবাণী দেখুন 'হে মোমেনরা! তোমরা তোমাদের নিজেদের লোকদের ব্যতীত আর কাউকে বিশ্বস্ত সহকারী রূপে গ্রহণ করো না....।

এ হচ্ছে একটি পূর্ণাংগ চিত্র। এতে রয়েছে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কিছু আবেগ, অনুভূতি ও বাহ্যিক প্রক্রিয়ার বিবরণ। সব কিছু মিলিয়ে এতে এমন একটি মানবীয় নমুনা তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে প্রতিনিয়ত পুনরাবির্ভূত হচ্ছে। মুসলমানরা যখন কোথাও বিজয়ী ও ক্ষমতাশালী হয়, তখন আহলে কেতাবদের প্রতি তারা প্রীতি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে, কিন্তু তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ সে ভালোবাসাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দেয়। অথচ মুসলমানরা তাদের প্রীতির হাতছানিতে প্রতারিত হয়ে তাদেরকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা মুসলমানদেরকে পথে কাটা বিছাতে ও তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে তারা বিন্দুমাত্রও পিছপা হয় না।

এ কথা সত্য যে, কোরআন এখানে যে বিস্ময়কর দৃশ্য অংকন করেছে, তা প্রাথমিকভাবে মদীনার মুসলমানদের প্রতিবেশী আহলে কেতাব গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা ও আক্রোশ লুকিয়ে ছিলো, কোরআন তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। কোরআন আরও বলেছে যে, মুসলমানরা আল্লাহর এই দুশমনদের সম্পর্কে তখনো প্রতারণার শিকার ছিলো। তখনো তারা তাদের সাথে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিলো। তারা তখনো নিজেদের অভ্যন্তরীণ গোপনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে নিরাপদ ভাবছিলো। তাদেরকে তখনো অন্তরংগ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছিলো এবং এতে যে তাদের কাছে গোপন তথ্য পাচার হয়ে যেতে পারে সে আশংকা বোধ করছিলো না। এ জন্যই এই সতর্কবাণী এসে মুসলমানদের সামনে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করে দিলো। কোরআন একথা বুঝিয়ে দিলো যে আহলে কেতাব কখনো তোমাদের শুভাকাংখী হতে পারে না এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের যতো হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও সাহায্যই দেয়া হোক না কেন, তাদের মন থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা কখনো দূর হবে না। এই চিরন্তন সতর্কবাণী কোনো নির্দিষ্ট যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। আমাদের বর্তমান যুগেও আমরা এ সত্য প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাচ্ছি।

খাঁটি মোমেনদেরকে ছাড়া আর কাউকে অন্তরংগ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করা অর্থাৎ যারা আদর্শগতভাবে নিম্নমানের ও ভিন্নপন্থী তাদেরকে কখনো বিশ্বাস না করা, তাদের কোনো গোপন তথ্য না জানানো ও তাদের সাথে কোনো পরামর্শ না করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে আদেশ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে মুসলমানরা উদাসীন থাকার কারণেই আজ অমুসলিমদেরকে মুসলমান নামধারীরা চিন্তাধারা, মতবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের উৎস ও সনদরূপে গণ্য করে।

আল্লাহর সতর্কবাণী উপেক্ষা করে মুসলমানরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কট্টর দুশমনদের সাথে মিতালি করছে এবং তাদের জন্য নিজেদের বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা প্রথম মুসলিম প্রজন্মকেই শুধু নয় বরং সকল যুগের সকল মুসলেম প্রজন্মকে বলেছেন,

'তোমাদের জন্যে কষ্টদায়ক প্রতিটি জিনিসকেই তারা ভালোবাসে। তাদের মুখ থেকে তো প্রতিহিংসা ফুটে বের হয়েছেই। আর তাদের বুকে যা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তা আরো সাংঘাতিক।'

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

'তোমরা তো তাদেরকে ভালোবাসো, অথচ তারা তোমাদেরকে ভালোবাসে না। তোমরা সকল কেতাবে বিশ্বাসী। যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাত করে, তখন বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর নিভৃতে গেলেই তোমাদের ওপর আক্রোশবশত নিজেদের আংগুল কামড়ায়।'

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে তারা দুঃখ পায়। আর তোমাদের কোনো ক্ষতি হলে তারা আনন্দিত হয়।'

বারবার অর্জিত এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদেরকে চপেটাঘাত করে। তবু আমাদের হুঁশ হয় না। বারবার আমাদের সামনে তাদের ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়। তবু আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি না। তাদের লুকানো প্রতিহিংসা বারবার তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে এতো খাতির, তোয়ায, উদারতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও সে প্রতিহিংসায় কিছুমাত্র ঘাটতি নেই। তবু আমরা তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করি, তাদের জন্যে হৃদয় উজাড় করে দেই। মানসিক পরাজয় হেতু আমাদের আকীদা ও আদর্শে এমন সংকোচ ও হীনমন্যতা বোধ করি যে, আমরা নিজেদের কথা উল্লেখ করতেই দ্বিধা বোধ করি। আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতির ব্যাপারেও আজ আমরা পরাজিত মনোভাবের শিকার। ফলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা ইসলামকে বাস্তবায়িত করি না। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিকৃতির প্রশ্নেও আমরা পরাজিত মনোভাবের শিকার। ফলে আমাদের পূর্বপুরুষ ও আহলে কেতাব গোষ্ঠীভুক্ত এই সব কট্টর দুশমনের মধ্যে যে সংঘাত ছিলো তার উল্লেখ আমরা এড়িয়ে যাই। এ সব কারণে আমাদের ওপর আল্লাহর আদেশ লংঘনকারীদের যথাযোগ্য শাস্তি নাযিল হচ্ছে। আর এ কারণে আমরা দিনে দিন দুর্বল হচ্ছি, লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হচ্ছি। আর আমাদের তথাকথিত বন্ধুদের কাছে এটাই হচ্ছে কাংখিত, আর তারা প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে নানা রকমের বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে লিপ্ত।

আল্লাহর এই মহান কেতাব সে দিনের সেই প্রথম মুসলিম সংগঠনকে যেমন শিক্ষা দিয়েছে, আজ আমাদেরকেও তেমনি শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে আমরা তাদের ষড়যন্ত্র তাদের ক্ষতি, তাদের হৃদয়ে লুকানো দুরভিসন্ধি থেকে নিষ্কৃতি পাবো। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো ও আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না .....'

অর্থাৎ তাদের ক্ষতি ও চক্রান্ত থেকে বাঁচার উপায় হলো, তারা শক্তিশালী হলেও তাদের শক্তির সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, দৃঢ় মনোবল ও ধৈর্যধারণ করা, আর তারা যদি যুদ্ধ কিংবা ষড়যন্ত্রের পথ ধরে তাহলে তাকেও দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়ানো। তাদের মৈত্রী ও বন্ধুত্ব লাভের আশায় আদর্শের ব্যাপারে আপোস করার বদলে দৃঢ়তা ও ধৈর্য অবলম্বনই মুসলমানদের বাঁচার একমাত্র পথ। সেই সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা ও আল্লাহর সাথেই সব কিছুকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আল্লাহভীরু মানুষ আদর্শের প্রশ্নে কারো সাথে আপোস করে না এবং আল্লাহর রজ্জু ছাড়া আর কোনো রজ্জু ধারণ করে না। হৃদয় যখন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তখন তা আল্লাহর শক্তি ছাড়া আর সকল শক্তিকে তুচ্ছ মনে করবে এবং এই সম্পর্ককেই সে নিজের অত্যাবশ্যকীয় বস্তু মনে করবে। এর ফলে আত্মরক্ষার্থে কিংবা সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে কোনো দুশমনকে তোয়ায করবে না।

বস্তুত ধৈর্য, আল্লাহভীরুতা, দৃঢ়তা ও আল্লাহর রজ্জু ধারণ– এই কয়টি জিনিসই হচ্ছে মুসলমানদের বাঁচার উপায়। যতোদিন মুসলমানরা একমাত্র আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং নিজেদের সমগ্র জীবনে আল্লাহর বিধানকে বাস্তবায়িত করেছে, ততদিন তারা শ্রদ্ধাভাজন থেকেছে, বিজয়ী হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাও তাদেরকে তাদের শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের আদর্শই সর্বোচ্চ আসনে আসীন হয়েছে। মুসলমানরা তাদের ইতিহাসের কোনো পর্যায়ে যখনই তদের আজন্ম দুশমন (ইহুদী, খৃষ্টান বা পৌত্তলিকদের) ধ্বজাধারী ও পদলেহী হয়েছে, তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকে উপদেষ্টা, বিশেষজ্ঞ ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের ভাগ্যে জুটিয়েছেন পরাজয় ও

লাঞ্ছনা। মুসলমানদের এই আজন্ম শত্রুরা প্রকাশ্যে হোক আর গোপনেই হোক– ইসলামী আকীদা, আদর্শ ও জীবনপদ্ধতির বিরুদ্ধে সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, আল্লাহর বাণীই চিরস্থায়ী এবং আল্লাহর নীতিই কার্যকর। আল্লাহর এই নীতির প্রতি যারা ভ্রুক্ষেপ করে না, তাদের ভাগ্য অপমান ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই জোটে না।

এখানে এসে সূরার এই অংশটি শেষ হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী অংশে আল্লাহ ও মুসলমানদের শত্রুদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ ও সর্বাত্মক বিচ্ছেদ সম্পর্কিত বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

এই পর্বটি সমাপ্ত করার আগে আর একটি বিষয় আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। সেটি হলো এমন প্রবল ও কট্টর দুশমনদের প্রতিও ইসলামের উদারতা ও মহানুভবতার নীতি সম্পর্কিত।

ইসলাম অমুসলিমদেরকে অন্তরংগ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করলেও তাদের হিংসা, ষড়যন্ত্র ও ধোকাবাজির জবাবে একই রকম ধোকাবাজি, ষড়যন্ত্র ও হিংসার আচরণ করতে অনুমতি দেয়নি। ইসলাম শুধুমাত্র মুসলিম সমাজকে সতর্ক করেছে ও অন্যদের প্রতারণা থেকে তাদের রক্ষা করেছে। মুসলমান সব সময় উদারতা, মহানুভবতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা এবং প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে সকলের সাথে ব্যবহার করবে। সে নিজে ধোকা থেকে আত্মরক্ষা করবে কিন্তু কাউকে ধোকা দেবে না। হিংসা-দ্বেষ থেকে আত্মরক্ষা করবে কিন্তু কাউকে হিংসা করবে না। তবে কেউ যদি তার জীবনবিধানের ওপর আক্রমণ চালায়, তার আদর্শ পরিত্যাগের জন্য বল প্রয়োগ করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাকে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। শত্রুর বল প্রয়োগ, আল্লাহর পথে চলার পথে বাধা ও জীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে অন্তরায়কে দূর করার জন্যে তাকেও বল প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে। এটাই আল্লাহর পথে জেহাদ– ব্যক্তিগত শত্রুতা, প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধপরায়ণতা নয়। মানবজাতিকে তাদের কল্যাণের পথে চলতে যে বাধা দেয়া হয় সেই বাধা দূর করার জন্যেই এ যুদ্ধের নির্দেশ। আধিপত্য বিস্তার ও শোষণ করার সুযোগ লাভের জন্যে নয়। এ যুদ্ধ হচ্ছে শান্তির নিশ্চয়তা দানকারী আল্লাহর নিখুঁত ও নির্ভুল বিধান বাস্তবায়নের জন্যে– বিশেষ কোনো জাতীয় পতাকা বা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়।

কোরআন ও সুন্নাহর বহু অকাট্য উক্তি এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিয়েছে এবং আল্লাহর এই বিধান অনুযায়ী প্রথম যুগের মুসলমানদের জীবন যাপন দ্বারা তার বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বস্তুত আল্লাহর এ বিধান সর্বতোভাবে কল্যাণকর। মানবজাতির জঘন্যতম দুশমন যারা, তারাই মানুষকে এ বিধান গ্রহণে নানাভাবে বাধা দেয়। মানবজাতির উচিত এই দুশমনদেরকে প্রতিহত করা এবং বিশ্ব-নেতৃত্ব থেকে হটিয়ে দেয়া। এটাই মুসলিম জাতির দায়িত্ব চিরদিনই তাকে এ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্তই তাই জেহাদ চালু থাকবে।

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا
وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدْ
نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ
رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ
آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ

রুকু ১৩

১২১. (হে নবী, স্মরণ করো,) যখন তুমি (খুব) ভোরবেলায় তোমার আপনজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মোমেনদের যুদ্ধের ঘাটিসমূহে মোতায়েন করছিলে (তখন তুমি জানতে), আল্লাহ তায়ালা সব কিছু শোনেন এবং (তাঁর বান্দাদের) তিনি ভালো করেই জানেন। ১২২. (বিশেষ করে সেই নাযুক পরিস্থিতিতে) যখন তোমাদের দু'টো দল মনোবল হারিয়ে ফেলার উপক্রম করে ফেলেছিলো, (তখন) আল্লাহ তায়ালাই তাদের উভয় দলের (সেই ভগ্ন মনোবল জোড়া লাগাবার কাজে) অভিভাবক হিসেবে মজুদ ছিলেন, আর আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের তো (সর্বাবস্থায়) তাঁর ওপরই ভরসা করা উচিত। ১২৩. (এই ভরসা করার কারণেই) বদরের (যুদ্ধে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বিজয় ও সাহায্য দান করেছিলেন, অথচ (তোমরা জানো) তোমরা কতো দুর্বল ছিলে; অতএব আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা আদায় করতে সক্ষম হবে। ১২৪. (সে মুহূর্তের কথাও স্মরণ করো,) যখন তুমি মোমেনদের বলছিলে, (যুদ্ধে বিজয় লাভ করার জন্যে) তোমাদের মালিক যদি আসমান থেকে তিন হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে তোমাদের (বিজয়ের জন্যে তা কি) যথেষ্ট হবে না? ১২৫. অবশ্যই তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং (শয়তানের চক্রান্ত থেকে) বেঁচে থাকতে পারো, এ অবস্থায় তারা (শত্রুবাহিনী) যদি তোমাদের ওপর দ্রুত গতিতে আক্রমণ করে বসে তাহলে তোমাদের মালিক (প্রয়োজনে) পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দিয়েও তোমাদের সাহায্য করবেন। ১২৬. (আসলে) এ সংখ্যাটা (বলে) আল্লাহ তায়ালা

لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ
يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

তোমাদের জন্যে একটি সুসংবাদ দিয়েছেন, (নতুবা বিজয়ের জন্যে তো তিনি একাই যথেষ্ট, আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন) যেন এর ফলে তোমাদের মন (কিছুটা) প্রশান্ত (ও আশ্বস্ত) হতে পারে, আর সাহায্য ও বিজয়! তা তো পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে, তিনিই সর্বজ্ঞ। ১২৭. আল্লাহ তায়ালা এর দ্বারা কাফেরদের এক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চান, অথবা তাদের একাংশকে তিনি এর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করে দিতে চান, যেন তারা ব্যর্থ হয়ে (যুদ্ধের ময়দান থেকে) ফিরে যায়। ১২৮. (হে নবী), এ ব্যাপারে তোমার কিছুই করার নেই, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তাদের ওপর দয়াপরবশ হবেন কিংবা তিনি চাইলে তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন, কেননা এরা ছিলো (স্পষ্টত) যালেম। ১২৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার সব হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

রুকু ১৪

১৩০. হে মানুষ, তোমরা যারা (ইসলামকে একটি পূর্ণাংগ বিধান হিসেবে) বিশ্বাস করেছো, চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। ১৩১. (জাহান্নামের) আগুনকে তোমরা ভয় করো, যা তৈরী করে রাখা হয়েছে তাদের জন্যে– যারা (একে) অস্বীকার করেছে, ১৩২. তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও (তাঁর) রসূলের কথা মেনে চলো, আশা করা যায়

وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن
رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَٰوَٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَٰظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ
إِذَا فَعَلُوا فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَجَنَّٰتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ
وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَٰمِلِينَ ﴿١٣٦﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا

তোমাদের ওপর দয়া করা হবে। ১৩৩. তোমরা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কাজে প্রতিযোগিতা করো, আর সেই জান্নাতের জন্যেও (প্রতিযোগিতা করো) যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবী সমান, আর এই (বিশাল) জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সে সব (ভাগ্যবান) লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহকে ভয় করে, ১৩৪. সচ্ছল হোক কিংবা অসচ্ছল- সর্বাবস্থায় যারা (আল্লাহর পথে) নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের অপরাধসমূহ যারা ক্ষমা করে দেয়; (আসলে) ভালো মানুষদের আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) ভালোবাসেন। ১৩৫. (ভালো মানুষ হচ্ছে তারা,) যারা- যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা (এর দ্বারা) নিজেদের ওপর নিজেরা যুলুম করে ফেলে (সাথে সাথেই) তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং গুনাহের জন্যে (আল্লাহর) ক্ষমা প্রার্থনা করে। কেননা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কে আছে যে তাদের গুনাহ মাফ করে দিতে পারে? (তদুপরি) এরা জেনে বুঝে নিজেদের গুনাহের ওপর অটল হয়েও বসে থাকে না। ১৩৬. এই (সে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত) মানুষগুলো! মালিকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতিদান হবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দেবেন, আর (তাদের) এমন এক জান্নাত (দেবেন) যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, সেখানে (নেককার) লোকেরা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে। (সৎ) কর্মশীল ব্যক্তিদের জন্যে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) কতো সুন্দর প্রতিদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে! ১৩৭. তোমাদের আগেও (বহু জাতির) বহু উদাহরণ (ছিলো- যা এখন) অতীত হয়ে গেছে, সুতরাং (এদের

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾ هَٰذَا
بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَلَا تَهِنُوا وَلَا
تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ إِنْ يَمْسَسْكُمْ
قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿١٤١﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ

পরিণতি দেখার জন্যে) তোমরা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও এবং দেখো, (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধান) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণতি কি হয়েছিলো! ১৩৮. (বস্তুত) এটি হচ্ছে মানব জাতির জন্যে একটি (সুস্পষ্ট) ব্যাখ্যা এবং আল্লাহ তায়ালাকে যারা ভয় করে এটি তাদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও সদুপদেশ (বৈ কিছুই নয়)। ১৩৯. তোমরা হতোদ্যম হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরা যদি (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। ১৪০. তোমাদের ওপর যদি (কোনো সাময়িক) আঘাত আসে (এতে মনোক্ষুণ্ন হবার কি আছে), এ ধরনের আঘাত তো (সে) দলের ওপরও এসেছে, আর (এভাবেই) আমি মানুষের মাঝে (তাদের উত্থান পতনের) দিনগুলোকে পালাক্রমে অদল-বদল করাতে থাকি, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা (এ কথাটা) জেনে নিতে পারেন যে, কে (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে এবং (এর মাধ্যমে) তোমাদের মাঝখান থেকে কিছু 'শহীদ'ও আল্লাহ তায়ালা তুলে নিতে চান, (মূলত) আল্লাহ তায়ালা কখনো যালেমদের পছন্দ করেন না। ১৪১. (এর মাধ্যমে তিনি মূলত) ঈমানদার বান্দাদের পরিশুদ্ধ করে কাফেরদের নাস্তানাবুদ করে দিতে চান। ১৪২. তোমরা কি মনে করো তোমরা (এমনি এমনি) বেহেশতে প্রবেশ করে যাবে, অথচ আল্লাহ তায়ালা (পরীক্ষার মাধ্যমে) এ কথা জেনে নেবেন না যে, কে (তাঁর পথে) জেহাদ করতে প্রস্তুত হয়েছে এবং কে (বিপদে) কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছে! ১৪৩. তোমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার আগে থেকেই তা

رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي
الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا
وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ

কামনা করছিলে, আর (এখন) তো তা দেখতেই পাচ্ছো, দেখতে পাচ্ছো তোমরা নিজেদের (চর্ম) চোখে।

রুকু ১৫

১৪৪. মোহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া (অতিরিক্ত) কিছুই নয়, তার আগেও বহু রসূল গত হয়ে গেছে (এবং তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে); তাই সে যদি (আজ) মরে যায় অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (তার আনীত হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে? আর যে ব্যক্তিই (এ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে কখনো আল্লাহর (দ্বীনের) কোনোরকম ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই কৃতজ্ঞ বান্দাদের প্রতিফল দান করবেন। ১৪৫. কোনো প্রাণীই আল্লাহর (সিদ্ধান্ত ও) অনুমতি ছাড়া মরবে না, (আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রত্যেকটি প্রাণীরই মৃত্যুর) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট (হয়ে আছে,) যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করবো, আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে আমি তাকে সে (চিরন্তন পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো এবং অচিরেই আমি (আমার প্রতি) কৃতজ্ঞদের (যথার্থ) প্রতিফল দান করবো। ১৪৬. (আল্লাহর) আরো অনেক নবীই (এখানে এসে) ছিলো, সে নবী (আল্লাহর পথে) যুদ্ধ করেছে, তার সাথে (আরো যুদ্ধ করেছে) অনেক সাধক (ও জ্ঞানবান) ব্যক্তি, আল্লাহর পথে তাদের ওপর যতো বিপদ-মসিবতই এসেছে তাতে (কোনোদিনই) তারা হতাশ হয়ে পড়েনি, তারা দুর্বলও হয়নি, (বাতিলের সামনে তারা) মাথাও নত করেনি, (এ ধরনের) ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরই

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا

وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ يٰٓاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى

اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ

النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ

اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ

وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ

আল্লাহ্ তায়ালা ভালোবাসেন। ১৪৭. তাদের (মুখে) এছাড়া অন্য কথা ছিলো না যে, তারা বলছিলো, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের যাবতীয় গুনাহখাতা মাফ করে দাও, আমাদের কাজকর্মের সব বাড়াবাড়ি তুমি ক্ষমা করে দাও এবং (বাতিলের মোকাবেলায়) তুমি আমাদের কদমগুলোকে মযবুত রাখো, হক ও বাতিলের (সম্মুখসমরে) কাফেরদের ওপর তুমি আমাদের বিজয় দাও। ১৪৮. অতপর আল্লাহ্ তায়ালা এই (নেক) বান্দাদের দুনিয়ার জীবনেও (ভালো) প্রতিফল দিয়েছেন এবং পরকালীন জীবনেও তিনি তাদের উত্তম পুরস্কার দিয়েছেন; আল্লাহ্ তায়ালা নেককার বান্দাদের ভালোবাসেন।

রুকু ১৬

১৪৯. হে মানুষ, তোমরা যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান এনেছো, তোমরা যদি (কথায় কথায়) এ কাফেরদের অনুসরণ করতে শুরু করো, তাহলে এরা তোমাদের (ঈমান) পূর্ববর্তী (জাহেলিয়াতের) অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে তোমরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। ১৫০. আল্লাহ্ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের একমাত্র (রক্ষক ও) অভিভাবক এবং তিনিই হচ্ছেন তোমাদের উত্তম সাহায্যকারী। ১৫১. অচিরেই আমি এ কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেবো, কারণ তারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক (বানিয়ে তাদের অনুসরণ) করেছে, অথচ তাদের এ কাজের সপক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা কোনো দলীল-প্রমাণ (তাদের কাছে) পাঠাননি, এদের শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে (জাহান্নামের) আগুন; যালেমদের বাসস্থান (এই) জাহান্নাম কতো নিকৃষ্ট! ১৫২. (ওহুদের ময়দানে)

تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن
يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾
إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي
أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ
وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم
مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَائِفَةٌ قَدْ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে (সাহায্য দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি পালন করেছেন, (যুদ্ধের প্রথম দিকে) তোমরা আল্লাহর অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের নির্মূল করে যাচ্ছিলে! পরে যখন তোমরা সাহস (ও মনোবল) হারিয়ে ফেললে এবং (আল্লাহর রসূলের বিশেষ একটি) আদেশ পালনের ব্যাপারে মতপার্থক্য শুরু করে দিলে, এমনকি আল্লাহর রসূল যখন তোমাদের ভালোবাসার সেই জিনিস (তথা আসন্ন বিজয়) দেখিয়ে দিলেন, তারপরও তোমরা তার কথা অমান্য করে (তার বলে দেয়া স্থান ছেড়ে) চলে গেলে, তোমাদের কিছু লোক (ঠিক তখন) বৈষয়িক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, (অপর দিকে) তখনও তোমাদের কিছু লোক পরকালের কল্যাণই চাইতে থাকলো, অতপর আল্লাহ তায়ালা (এর দ্বারা তোমাদের ঈমানের) পরীক্ষা নিতে চাইলেন এবং তা থেকে তোমাদের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মাফ করে দিলেন, আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই) ঈমানদারদের ওপর দয়াবান। ১৫৩. (ওহুদের সম্মুখসমরে বিপর্যয় দেখে) তোমরা যখন (ময়দান ছেড়ে পাহাড়ের) ওপরের দিকে ওঠে যাচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের কোনো লোকের প্রতি লক্ষ্য রাখছিলে না, অথচ আল্লাহর রসূল তোমাদের (তখনও) পেছন থেকে ডাকছিলো (কিন্তু তোমরা শুনলে না), তাই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের ওপর পতিত হয়েছে এর (কোনোটার) ব্যাপারে তোমরা উদ্বিগ্ন (ও মর্মাহত) না হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সব ধরনের কর্মকান্ড সম্পর্কেই ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ১৫৪. এর পর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ওপর এমন সন্তোষ (-জনক পরিস্থিতি) নাযিল করে দিলেন যে, তা তোমাদের একদল লোককে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে

أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط
يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ
لِلَّهِ ط يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ط يَقُولُونَ لَوْ
كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا ط قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ج
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ط
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعَانِ لا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ج
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

দেয়, আর আরেক দল, যারা নিজেরাই নিজেদের উদ্বিগ্ন করে রেখেছিলো, তারা তাদের জাহেলী (যুগের) ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অন্যায় ধারণা করতে থাকে, (এক পর্যায়ে) তারা এও বলতে শুরু করে, (যুদ্ধ পরিচালনার) এ কাজে কি আমাদের কোনো ভূমিকা আছে? (হে নবী,) তুমি (তাদের) বলো, (এ ব্যাপারে আমারও কোনো ভূমিকা নেই, ক্ষমতা ও) কর্তৃত্বের সবটুকুই আল্লাহর হাতে, (এই দলের) লোকেরা তাদের মনের ভেতর যেসব কথাবার্তা গোপন করে রেখেছে তা তোমার সামনে (খোলাখুলি) প্রকশ করে না; তারা বলে, এ (যুদ্ধ পরিচালনার) কাজে যদি আমাদের কোনো ভূমিকা থাকতো, তাহলে আজ আমরা এখানে নিহত হতাম না; তুমি তাদের বলে দাও, যদি আজ তোমরা সবাই ঘরের ভেতরেও থাকতে তবুও নিহত হওয়া যাদের অবধারিত ছিলো তারা (তাদের মরণের) বিছানার দিকে বের হয়ে আসতো, আর এভাবেই তোমাদের মনের (ভেতর লুকিয়ে রাখা) বিষয়সমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং এ (ঘটনার মাঝ) দিয়ে তিনি তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তাও পরিশুদ্ধ করে দেন, তোমাদের মনের কথা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সম্যক ওয়াকেফহাল রয়েছেন। ১৫৫. দু'টি বাহিনী যেদিন (সম্মুখসমরে) একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিলো, সেদিন যারা (ময়দান থেকে) পালিয়ে গিয়েছিলো তাদের একাংশের অর্জিত কাজের জন্যে শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দিয়েছিলো, অতপর (তারা অনুতপ্ত হলে) আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিলেন; আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম ধৈর্যশীল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا
لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ
كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ
حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿١٥٧﴾ وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ
لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

রুকু ১৭

১৫৬. হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না (তাদের অবস্থা ছিলো এমন), এ কাফেরদের কোনো ভাই (বন্ধু) যখন বিদেশ (বিভূঁইয়ে) মারা যেতো, কিংবা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হতো, তখন এরা (তাদের সম্পর্কে) বলতো, এরা যদি (বাইরে না গিয়ে) আমাদের কাছে থাকতো, তাহলে এরা কিছুতেই মরতো না এবং এরা নিহতও হতো না, এভাবেই এ (মানসিকতা)-কে আল্লাহ তায়ালা তাদের মনের আক্ষেপে পরিণত করে দেন, (আসলে) আল্লাহই মানুষের জীবন দেন, আল্লাহই মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং তোমরা (এই দুনিয়ায়) যা করে যাচ্ছো আল্লাহ তায়ালা তার সব কিছুই দেখেন। ১৫৭. তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও অথবা (সে পথে থেকেই) তোমরা মৃত্যুবরণ করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে (যে) রহমত ও ক্ষমা (লাভ করবে), তা হবে (কাফেরদের) সঞ্চিত অর্থ সামগ্রীর চাইতে অনেক বেশী উত্তম! ১৫৮. (আল্লাহর পথে) যদি তোমরা জীবন বিলিয়ে দাও, অথবা (তাঁরই পথে) তোমাদের মৃত্যু হয়, (তাহলেই তোমাদের কি করার থাকবে? কারণ,) তোমাদের তো একদিন আল্লাহ তায়ালার সমীপে (এমনিই) একত্রিত করা হবে। ১৫৯. এটা আল্লাহর এক (অসীম) দয়া যে, তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির (মানুষ, এর বিপরীতে) যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের (মানুষ) হতে, তাহলে এসব লোক তোমার আশপাশ থেকে সরে যেতো, অতএব তুমি এদের (অপরাধসমূহ) মাফ করে দাও, এদের জন্যে (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজকর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করো, অতপর (সে পরামর্শের ভিত্তিতে) সংকল্প একবার যখন তুমি করে

عَلَى اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِن يَنصُرْكُمُ اللّٰهُ
فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم
مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ وَمَا كَانَ
لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ ۚ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ
تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفَمَنِ اتَّبَعَ
رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۚ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

নেবে তখন (তার সফলতার জন্যে) আল্লাহর ওপর ভরসা করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা (তাঁর ওপর) নির্ভরশীল মানুষদের ভালোবাসেন। ১৬০. যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে কোনো শক্তিই তোমাদের পরাজিত করতে পারবে না, আর তিনিই যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তাহলে (এখানে) এমন কোন শক্তি আছে যে অতপর তোমাদের কোনোরকম সাহায্য করতে পারে! কাজেই আল্লাহর ওপর যারা ঈমান আনে তাদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত। ১৬১. (কোনো) নবীর পক্ষেই (কোনো বস্তুর) খেয়ানত করা সম্ভব নয়; (হাঁ মানুষের মধ্যে) কেউ যদি কিছু খেয়ানত করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তিকে তার (খেয়ানতের) সে বস্তুসহ (আল্লাহর দরবারে) হাযির হতে হবে, অতপর প্রত্যেককেই তার অর্জিত (ভালো মন্দের) পাওনা সঠিকভাবে আদায় করে দেয়া হবে, (সেদিন) তাদের কারো ওপর অবিচার করা হবে না। ১৬২. যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে, তার সাথে কিভাবে সে ব্যক্তির তুলনা করা যায়, যে আল্লাহর বিরোধী পথে চলে শুধু তাঁর ক্রোধই অর্জন করেছে, তার (এমন ব্যক্তির) জন্যে জাহান্নামের আগুন হবে একমাত্র বাসস্থান; আর তা (হবে সত্যিই) একটি নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল! ১৬৩. এরা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী আল্লাহর কাছে বিভিন্ন স্তরে (বিভক্ত) হবে, আল্লাহ তায়ালা এদের সব ধরনের কার্যকলাপের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। ১৬৪. আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাঁর ঈমানদার বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে আল্লাহর কিতাবের

الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾
اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ
قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٦٥﴾
وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا ۚ وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ؕ قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا
لَّاتَّبَعْنٰكُمْ ؕ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ۚ
يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
يَكْتُمُوْنَ ﴿١٦٧﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا

আয়াতসমূহ পড়ে শোনায় এবং (সে অনুযায়ী) সে তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে, (সর্বোপরি) সে (নবী) তাদের আল্লাহর কিতাব ও (তাঁর গ্রন্থলব্ধ) জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়, অথচ এরা সবাই ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলো। ১৬৫. যখনি তোমাদের ওপর (ওহুদ যুদ্ধের) বিপদ নেমে এলো তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে, (পরাজয়ের) এ বিপদ কিভাবে এলো (কার দোষে এলো)? অথচ (বদরের যুদ্ধে) এর চাইতে দ্বিগুণ (পরাজয়ের) বিপদ তো তোমরাই তাদের ঘটিয়েছিলে; (হে নবী,) তুমি বলো, এটা এসেছে তোমাদের নিজেদের কারণেই; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ের ওপর (অসীম ক্ষমতায়) ক্ষমতাবান। ১৬৬. (ওহুদের ময়দানে) দু'দলের সম্মুখ লড়াইয়ের দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিলো, তা (এসেছে) আল্লাহর ইচ্ছায়, এ (বিপর্যয়) দিয়ে আল্লাহ তায়ালা (এ কথাটা) জেনে নিতে চান, কারা তাঁর ওপর (সঠিক অর্থে) ঈমান এনেছে। ১৬৭. (এর মাধ্যমে) তাদের (পরিচয়ও) তিনি জেনে নেবেন, যারা (এই চরম মুহূর্তে) মোনাফেকী) করেছে, এ মোনাফেকদের যখন বলা হয়েছিলো যে, (সবাই এক সাথে) আল্লাহর পথে লড়াই করো, অথবা (কমপক্ষে নিজেদের শহরের) প্রতিরক্ষাটুকু তোমরা করো, তখন তারা বললো, যদি আমরা জানতাম আজ (সত্যি সত্যিই) যুদ্ধ হবে, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম, (এ সময়) তারা ঈমানের চাইতে কুফরীরই বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছিলো, এরা মুখে এমন সব কথা বলে যা তাদের অন্তরে নেই; আর এরা যা কিছু গোপন করে আল্লাহ তায়ালা তা সম্যক অবগত আছেন। ১৬৮. (এরা হচ্ছে সেসব মোনাফেক), যারা (যুদ্ধে শরীক না হয়ে ঘরে)

قُتِلُوْا ۖ قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٦٨﴾
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ۖ بَلْ
أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِيْنَ بِمَا آتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۙ
أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾
اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ
الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾ اَلَّذِيْنَ
قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

বসে থাকলো (এবং) ভাইদের সম্পর্কে বললো, তারা যদি (তাদের মতো ঘরে বসে থাকতো এবং) তাদের কথা শুনতো, তাহলে তারা (আজ এভাবে) মারা পড়তো না; (হে নবী,) তুমি (এ মোনাফেকদের) বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের থেকে মৃত্যু সরিয়ে দাও। ১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের তোমরা কোনো অবস্থাতেই 'মৃত' বলো না, তারা তো জীবিত, তাদের মালিকের পক্ষ থেকে (জীবিত লোকদের মতোই) তাদের রেযেক দেয়া হচ্ছে। ১৭০. আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যা কিছু দান করেছেন তাতেই তারা পরিতৃপ্ত এবং যারা এখনো তাদের পেছনে রয়ে গেছে, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি, তাদের ব্যাপারেও এরা খুশী, কেননা এমন ধরনের লোকদের জন্যে (এখানে) কোনো ভয় নেই এবং তারা (সে দিন কোনোরকম) চিন্তাও করবে না। ১৭১. এ (ভাগ্যবান) মানুষরা আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহে উৎফুল্ল আনন্দিত হয়, (কারণ) আল্লাহ তায়ালা ঈমানদার বান্দাদের পাওনা কখনো বিনষ্ট করেন না।

রুকু ১৮

১৭২. (ওহুদের এতো বড়ো) আঘাত আসার পরও যারা (আবার) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে আরো যারা নেক কাজ করেছে, (সর্বোপরি) সর্বদা যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, এদের সবার জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৭৩. যাদের– মানুষরা যখন বললো, তোমাদের বিরুদ্ধে (কাফেরদের) এক বিশাল বাহিনী জমায়েত হয়েছে, অতএব তোমরা তাদের ভয় করো, (এ বিষয়টাই যারা

فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَّقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوا

رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ

يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا

اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ۚ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي

যথার্থ ঈমানদার) তাদের ঈমানকে আরো বাড়িয়ে দিলো, তারা বললো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক। ১৭৪. অতপর আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা (এমনভাবে) ফিরে এলো যে, কোনো প্রকার অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করতে পারলো না, এরা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথই অনুসরণ করলো; (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল। ১৭৫. এই হচ্ছে তোমাদের (প্ররোচনাদানকারী) শয়তান, তারা (শত্রুপক্ষের অতিরঞ্জিত শক্তির কথা বলে) তাদের আপনজনদের ভয় দেখাচ্ছিলো, তোমরা কোনো অবস্থায়ই তাদের (এ হুমকিকে) ভয় করবে না, বরং আমাকেই ভয় করো, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) ঈমানদার হও! ১৭৬. (হে নবী,) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকান্ড যেন তোমাকে চিন্তান্বিত না করে, তারা কখনো আল্লাহর বিন্দুমাত্র কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; (মূলত) আল্লাহ তায়ালা এদের জন্যে পরকালে (পুরস্কারের) কোনো অংশই রাখতে চান না, তাদের জন্যে অবশ্যই কঠিন আযাব রয়েছে। ১৭৭. যারা ঈমানের বদলে কুফরী খরিদ করে নিয়েছে, তারা আল্লাহর (কোনোই) ক্ষতি করতে পারবে না, এদের জন্যে মর্মান্তিক শাস্তির বিধান রয়েছে। ১৭৮. কাফেররা যেন এটা কখনো মনে না করে, আমি যে তাদের ঢিল দিয়ে রেখেছি এটা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে, (আসলে) আমি তো তাদের অবকাশ দিচ্ছি যেন, তারা তাদের গুনাহ (-এর বোঝা) আরো বাড়িয়ে নিতে পারে, আর (তোমাদের মধ্যে) তাদের জন্যেই

لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾ مَا كَانَ اللّٰهُ
لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلٰى مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيزَ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ۚ
وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

(প্রস্তুত) রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। ১৭৯. আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর ঈমানদার বান্দাদের– তোমরা বর্তমানে যে (ভালো মন্দে মিশানো) অবস্থার ওপর আছো এর ওপর ছেড়ে দিতে চান না, যতোক্ষণ না তিনি সৎলোকদের অসৎ লোকদের থেকে আলাদা করে দেবেন; (একইভাবে) এটা আল্লাহ তায়ালার কাজ নয় যে, তিনি তোমাদের অদৃশ্য জগতের (খোঁজ খবরের ওপর) কিছু অবহিত করবেন, তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের মাঝ থেকে যাকে চান তাকে (বিশেষ কোনো কাজের জন্যে) বাছাই করে নেন, অতপর তোমরা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করো, তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথভাবে ঈমান আনো এবং নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারো, তাহলে তোমাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে।

তাফসীর

আয়াত ১২১-১৭৯

সূরার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোর বিতর্ক, আলোচনা ও সতর্কবাণী এখানে এসে সরাসরি রণাংগন তথা ওহুদের ময়দানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ওহুদের যুদ্ধ শুধু ময়দানের যুদ্ধই ছিলো না, এটি ছিলো বিবেকেরও যুদ্ধ। এটি ছিলো সবচেয়ে প্রশস্ত অংগন জুড়ে বিস্তৃত এক বড় যুদ্ধ। যে ক্ষুদ্র ময়দানটিতে সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, তা ছিলো গোটা রণাংগনের একটি অংশ মাত্র। এই রণাংগনটি ছিলো সাধারণভাবে মানুষের প্রবৃত্তি, তার ধ্যান-ধারণা, আবেগ-উদ্দীপনা, কামনা-বাসনা, উদ্দীপক ও প্রতিরোধক ইচ্ছার লীলাভূমি। সেনাপতিরা তাদের সৈনিকদেরকে রণাংগণে যেভাবে প্রশিক্ষণ দেয় ও তাদের মনকে যেভাবে প্রস্তুত করে, কোরআন তার চেয়েও কোমলভাবে, গভীর ও সক্রিয়ভাবে তার সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলো ও তাদের পরিশুদ্ধ করেছিলো।

ওহুদ যুদ্ধ ও তার প্রাসংগিক পর্যালোচনা

ওহুদে প্রথমে বিজয় এবং পরে পরাজয় সংঘটিত হয়। এই পালাক্রমিক জয় ও পরাজয়ের পর যে সর্বশেষে গিয়ে সর্বোচ্চ সাফল্য ও বিজয় অর্জিত হয়েছিলো তা এই যে, মুসলিম জাতি কোরআনে বর্ণিত মহাসত্যকে সুস্পষ্টভাবে জানতে ও বুঝতে পেরেছিলো। এই মহাসত্যের ওপর তাদের আবেগ ও প্রত্যয়ের দৃঢ়তা অর্জিত হয়েছিলো। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তারা উপযুক্ত লোক বাছাই করে আযোগ্য লোক ছাটাই করতে পেরেছিলো। অতপর চিন্তাগত বিভ্রান্তি থেকে

মুক্ত হতে পেরেছিলো। এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিলো এইভাবে যে, সমাজের মোনাফেকেরা সবাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলো। কথায়, কাজে আচরণে ও চেতনায় মোনাফেকীর ও ঈমানদারীর আলামতগুলো একে একে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ঈমানের দায়িত্ব, ঈমানের দিকে আহ্বানের দায়িত্ব ও ঈমানের আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বকে তারা স্বচ্ছভাবে বুঝতে পেরেছিলো। এর অনিবার্য দাবী স্বরূপ তারা ইসলামে ব্যক্তি গঠন ও সংগঠনের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা অর্জন করেছিলো। অতপর তাদের আনুগত্য, প্রতিটি পদক্ষেপে একমাত্র আল্লাহর ওপর তাদের নির্ভরশীলতা ও জয়-পরাজয়, জীবন-মৃত্যু তথা প্রতিটি বিষয়ে সকল ফয়সালার ভার একমাত্র আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করতে পেরেছিলো। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কোরআনের নির্দেশনা থেকে অর্জিত মুসলিম জাতির এই স্থায়ী ও বিরাট সাফল্য যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের চেয়ে তা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। মুসলমানরা যদি এই যুদ্ধে বিজয় ও গনীমত অর্জন করে ফিরে আসতো, তথাপি সেই বিজয় ও গনীমতের চেয়েও এই সার্বিক সাফল্য বেশী মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো। শুধু সে যুগের মুসলমানদের জন্যেই নয় বরং পরবর্তীকালের প্রত্যেক প্রজন্মের মুসলমানদের জন্যেও তা যুদ্ধলব্ধ বিজয় ও গনীমতের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় হতো। ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম জনতার মধ্যে দেখা দেয়া দুর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, শৈথিল্য ও ভুল বুঝাবুঝির ফলে যে সাময়িক পরাজয় তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিলো, তা আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে ছিলো স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জাতির সার্বিক ও বৃহত্তর কল্যাণই সাধন করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন যেন মুসলিম জাতি এই পরাজয়ের মধ্য দিয়েও শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, পরিপক্কতা সমন্বয় ও সংগঠনের যোগ্যতা অর্জন করে– যার মূল্য যুদ্ধলব্ধ বিজয় ও গনীমতের চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ তায়ালা চেয়েছিলেন মুসলিম জাতির পরবর্তী বংশধরেরা যেন অর্জিত এই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নির্দেশণাবলী প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারে। এমন কি এই দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা যদি যুদ্ধের পরাজয়ের বিনিময়েও অর্জিত হতো, তথাপি তা এক অমূল্য ধন বিবেচিত হতো।

রণাংগনে ওহুদ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছিলো বটে। কিন্তু কোরআন সে যুদ্ধকে পুনরারম্ভ করেছিলো এক বৃহত্তর রণাংগনে। সে রণাংগন হচ্ছে মুসলিম জাতির গোটা জীবনের সার্বিক রণাংগন। অতপর কোরআন এই জাতির জীবনে ক্রমান্বয়ে সেই সব পরিবর্তন সাধন করেছিলো, যা আল্লাহ তায়ালা নিজের সূক্ষ্মজ্ঞান, বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজেই সম্পন্ন করে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছিলেন তাই সংঘটিত হয়েছিলো। সকল তিক্ত ও কষ্টকর পরীক্ষা, নির্যাতন ও ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয়েছিলো।

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীকে নিয়ে কোরআন যে পর্যালোচনা চালিয়েছে তার সবচেয়ে লক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় দিক এই যে, সে এই যুদ্ধের ঘটনা ও পটভূমির পর্যালোচনা। এই ঘটনা ও পটভূমি উপলক্ষে প্রদত্ত আল্লাহর নির্দেশাবলী এখানে চিন্তার বিভ্রান্তি, অবৈধ কামনা-বাসনার গোলামী, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ একগুয়েমি, হঠকারিতা, মোহান্ধতা ও প্রচ্ছন্ন অভিলাষসমুহের আবর্জনা থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করার নির্দেশসমূহের এক অপূর্ব সমাবেশ এখানে ঘটিয়েছে।

সম্ভবত এর চেয়েও আকর্ষণীয় দিক এই যে, কোরআন একটি যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সুদ সম্পর্কে বক্তব্য দিয়েছে এবং পরামর্শ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে– যদিও যুদ্ধের খারাপ ফলাফল দেখা দেয়ার পেছনে এই পরামর্শের কিছুটা হাত ছিলো।

তবে যারা আল্লাহর এই বর্ণনাভংগীর প্রকৃতি উপলব্ধি করে, তারা এই বহুবিধ পর্যালোচনার সমাবেশ ও এই ব্যাপকতার কোনোটাতেই বিস্মিত হয় না। কেননা, ইসলামী আন্দোলনে যুদ্ধ কেবল অস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, অশ্ব, সৈন্য ও সমর কৌশলের সমাবেশ নয়, বরং এটি হচ্ছে বৃহত্তর

যুদ্ধের একটি অংশ মাত্র। এই আংশিক যুদ্ধ বিবেকের জগতে এবং মুসলিম জাতির সামাজিক জগতের বৃহত্তম যুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিবেকের পরিশুদ্ধি ও স্বচ্ছতা বিনষ্টকারী কলুষকালিমা থেকে তার মুক্তি এবং আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা হরণকারী বাধাবিপত্তি থেকে তাকে স্বাধীন করে দেয়ার সাথে এ যুদ্ধের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অনুরূপভাবে মুসলিম জাতি আল্লাহর নিখুঁত এ নির্ভুল বিধান মোতাবেক যে সাংগঠনিক বিধি-ব্যবস্থার ভিত্তিতে নিজের জীবন গড়ে তোলে, তার সাথেও এ যুদ্ধ ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহর এ বিধান মুসলমানদের শুধু শাসন ব্যবস্থায় নয়, বরং তা হচ্ছে সমগ্র জীবনের ব্যবস্থা।

আগেই বলেছি যে, কোরআন শুধু সশস্ত্র যুদ্ধের ময়দানের মুসলমানদের আচরণ নিয়েই আলোচনা করে না, বরং এর চেয়ে অনেক বড় যুদ্ধের ময়দানে সে তাকে পথ প্রদর্শন করে। সে ময়দান হচ্ছে মানুষের মন ও সমাজ জীবনের রণাংগন। এ কারণে সে সুদের বিষয়েও আলোচনা করে এবং গোপনে ও প্রকাশ্য দান করতে উৎসাহিত করে। ক্রোধ দমন করা, ক্ষমা করা, তাওবা করা, ক্ষমাপ্রার্থনা করা, গুনাহের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানায়। এগুলোর ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভরশীল বলে তাকে জানিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে এ কথাও বলে যে, মানুষের প্রতি রসূল (স.)-এর দয়া ও হৃদয়ের কোমলতা আল্লাহর দয়া ও করুণার প্রতীক স্বরূপ। তাছাড়া যতো কঠিন মুহূর্তই হোক পরামর্শের নীতি বাস্তবায়িত করা এবং আত্মসাত ও চুরির আদৌ অবকাশ ও সম্ভাবনা না থাকে– এমন এক আমানতদারী বজায় রাখার আহ্বান জানায়। অবশেষে ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা সম্বলিত এই পর্বের সর্বশেষ আয়াতে দানশীলতা অব্যাহত রাখা ও কৃপণতা থেকে মানুষদের সতর্ক করা হয়েছে।

এই পর্যালোচনায় এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, এগুলো হলো মুসলিম জাতিকে তার বৃহত্তম সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত করার সাজসরঞ্জাম ও হাতিয়ার। এই বৃহত্তর সংগ্রামে সশস্ত্র যুদ্ধ অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে তার মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ নয়। এই বৃহত্তম সংগ্রাম হচ্ছে প্রবৃত্তির ওপর, পার্থিব কামনা-বাসনা, লোভ ও হিংসার ওপর বিজয় লাভের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম মুসলিম সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিত করার সংগ্রাম এবং মূল্যবোধের বাস্তবায়নে সাফল্য ও বিজয় অর্জনের সংগ্রাম। আর এ বিজয় যে সবচেয়ে বড় বিজয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ পর্যালোচনায় এতো সব বিষয় এই উদ্দেশ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেন তা মানবীয় সত্ত্বা ও তার কর্মকান্ডের মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শের ঐক্যকে সংহত এবং তাকে সর্বতোভাবে একটা মাত্র কেন্দ্রের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। তা হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব এবং আল্লাহভীতি সহকারে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। তা ছাড়া সমগ্র মানবীয় সত্ত্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্যে আল্লাহর বিধানই যে একমাত্র ব্যবস্থা, তাও এর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। মানবসত্ত্বার এই সব পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের পরামর্শ দেয়ার জন্যেও এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং এ পর্যালোচনায় যে সার্বিক নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে, তা মুসলমানদের জীবন সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। কেননা, মানবসত্ত্বা সশস্ত্র সংগ্রামে বিজয়ী হতে পারবে কেবল তখনই, যখন সে সকল নৈতিক, বিধিগত ও চেতনাগত সংগ্রামে বিজয়ী হবে। যারা ওহুদ যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটে গিয়েছিলো, তাদের পিছু হটার একমাত্র কারণ ছিলো এই যে, পাপ কাজের কারণে শয়তান তাদেরকে বিপথগামী করে দিয়েছিলো। আর যারা নবীদের নেতৃত্বে আদর্শের সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে, তারা নিজেদের সকল পাপকর্ম থেকে ক্ষমা চাওয়ার এবং আল্লাহর দিকে একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ ও তার অটুট আদর্শের সাথে সম্পৃক্তির মাধ্যমে এই সংগ্রামের সূচনা করেছিলো। সুতরাং এ কথা নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে, গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া,

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া বিজয় লাভের অন্যতম উপকরণ। এটা সশস্ত্র সংগ্রামের ময়দান এথকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। অনুরূপভাবে, সুদভিত্তিক অর্থনীতিকে উৎখাত করে সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করাও বিজয়ের একটি মাধ্যম। সুদভিত্তিক সমাজের তুলনায় সমবায়ভিত্তিক সমাজ বিজয়ের বেশী নিকটতর। অনুরূপভাবে ক্রোধ দমন ও মানুষকে ক্ষমা করাও বিজয় লাভের অন্যতম উপায়। কেননা, প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা যুদ্ধের একটি শক্তি বিশেষ। আর উদারনৈতিক সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও একাত্মতা একটি কার্যকর শক্তি।

আলোচ্য পর্যালোচনায় যে ক'টি সত্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, তার মধ্যে ভাগ্য নির্ধারণে আল্লাহর চূড়ান্ত কর্তৃত্বের তত্ত্বটিও অন্তর্ভুক্ত। সেই সাথে এ বিষয়ে চিন্তাধারার পরিশুদ্ধিও জরুরী মনে করা হয়েছে। একই সাথে মানুষের বিভিন্ন চেষ্টা ও তৎপরতা, ভুল ও নির্ভুল কর্মকান্ড এবং আল্লাহর বিধানের আনুগত্য ও তাতে শৈথিল্য প্রদর্শনের কারণে যে ভালো ও মন্দ কর্মফল মানুষের পার্থিব জীবনে উদ্ভূত হয়, তার ব্যবস্থাপনায় আল্লাহর শাশ্বত নিয়মও তুলে ধরা হয়েছে। আর এ সব কিছুর পর মানুষকে আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতার নিদর্শন, তাঁর ইচ্ছা পূরণের হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যার ওপর আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করবেন তাই বাস্তবায়িত করবেন।

সর্বশেষ মুসলিম জাতিকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বিজয় অর্জনে তাদের নিজেদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। বিজয় আল্লাহরই পরিকল্পনা যা তিনি মুসলিম জাতির জন্যে জেহাদের ফল স্বরূপ নিজেই বাস্তবায়িত করে থাকেন। জেহাদের প্রতিদান তারা আল্লাহর কাছ থেকেই পাবে। পার্থিব জীবনের কোনো জিনিসকে তারা বিজয়ের ফল স্বরূপ পাওয়ার দাবী করতে পারে না। এটা তাদের কোনো অধিকার নয় যে, তারা যখন চাইবে তখনই আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দেবেন। বরং আল্লাহ তায়ালা যখন চাইবেন, তখনই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্যে তাদেরকে বিজয় দান করবেন। পরাজয়ের ব্যাপারটিও তদ্রূপ। এটা যখন আল্লাহর শাশ্বত নিয়ম অনুসারে সংঘটিত হয় তখন আল্লাহর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্যেই তা সংঘটিত হয়ে থাকে। এতে ভালো-মন্দ সৎ ও অসতের ছাঁটাই-বাছাইও হয়ে যায়।

কোনো সামরিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিজয় যতোক্ষণ না আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, ততোক্ষণ ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোনো মূল্য নেই। প্রবৃত্তির ওপর, লোভ-লালসার ওপর, কামনা-বাসনার ওপর ও বিজয় লাভ এবং মানবজীবনে আল্লাহ তায়ালা যে সত্য ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা অর্জিত হওয়া চাই। কেবল এই ধরনের কোনো বিজয় হলেই আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বিধানের বিজয়ে পরিণত হবে। নচেত সে বিজয় হবে এক জাহেলিয়াতের ওপর অপর জাহেলিয়াতের বিজয়। এ ধরনের বিজয়ে মানুষের কোনো কল্যাণ নেই। কল্যাণ কেবল এভাবেই নিশ্চিত হতে পারে যে, সত্যের জন্যেই সত্যের পতাকা উড্ডীন হবে। কেননা সত্য সর্বত্র এক। সত্য কখনো একাধিক হয় না। আল্লাহর বিধানই একমাত্র সত্য। এছাড়া এ বিশ্ব চরাচরে আর কোনো সত্য নেই। এর বিজয় ততোক্ষণ অর্জিত হতে পারে না, যতোক্ষণ তা মানুষের মন ও প্রবৃত্তির ওপর অর্জিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের ওপর অর্জিত হয়। মানুষের মন ও প্রবৃত্তি যখন স্বার্থ, লোভ-লালসা, হিংসাদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেবে, যখন নিজের সকল শক্তি ও উপকরণের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল হবে, তখনই সত্যিকার অর্থে বিজয় সাধিত হবে। যখন তার সকল জেহাদ ও বিজয়ের লক্ষ্য হবে আল্লাহর বিধানের কাছে এই শর্তহীন আত্মসমর্পণ কেবলমাত্র তখনই তার সামরিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যুদ্ধের বিজয়কে আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় বিজয় বলে গণ্য করা হবে। নচেত তা এক জাহেলিয়াতের ওপর আর এক জাহেলিয়াতের বিজয় ছাড়া আর কিছু হবে না, যা আল্লাহর কাছে একেবারেই মূল্যহীন।

ওহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনায় আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ বিষয়টিকে বারবার আলোচনা করা হয়েছে, তার কারণ এটাই। বস্তুত এই যুদ্ধকে ইসলামের বিরাট বিশাল ও প্রশস্ত রণাংগনের একটি অন্যতম অংশ বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে।

ওহুদ যুদ্ধের পটভূমি ও মোনাফেকদের বিশ্বাসঘাতকতা

ওহুদ যুদ্ধের বিস্তৃত পর্যালোচনাসম্বলিত এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা শুরুর আগে ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থাবলী থেকে এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করা সমীচীন মনে করছি, এতে করে আমরা কোরআনের পর্যালোচনার সঠিক লক্ষ্যবিন্দু নির্ধারণ করতে পারবো এবং ঘটনাবলী বর্ণনার মধ্য দিয়ে কোরআন যে প্রশিক্ষণনীতি অনুসরণ করে, তাও উপলব্ধি করতে পারবো।

মুসলমানরা বদরযুদ্ধে এমন এক বিজয় অর্জন করেছিলো, যাকে সামগ্রিক পরিমন্ডলে বিবেচনা করলে একটা অলৌকিক ঘটনা বলেই মনে হয। এই যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের হাত দিয়ে কোরায়শ গোত্রের প্রধান প্রধান নেতাকে হত্যা করান। বদর যুদ্ধে অন্য সকল নেতা নিহত হওয়ার পর আবু সুফিয়ান কোরায়শের নেতৃত্ব দিতে থাকে। সে মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের জন্যে সৈন্যসমাবেশ আরম্ভ করে। যে কাফেলাটি কোরায়শ গোত্রের পণ্যসামগ্রী বহন করছিলো, তা মুসলমানদের হস্তগত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। পরে এই সামগ্রীকে পুজি করেই মোশরেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফন্দি আঁটে।

আবু সুফিয়ান কোরায়শ, তার মিত্র গোত্রসমূহ ও বেদুইনদের মধ্য থেকে প্রায় তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ করলো। অতপর তাদেরকে নিয়ে হিজরী তৃতীয় সালের শওয়াল মাসে অভিযানে বেরিয়ে পড়লো। তারা তাদের মহিলাদেরও সাথে আনলো, যাতে তারা তাদের উস্কানি ও উৎসাহ দিতে পারে এবং যোদ্ধারা পালিয়ে না যায়। মদীনার দিকে অগ্রসর হয়ে তারা ওহুদ পর্বতের কাছাকাছি এক জায়গায় অবস্থান নিলো। রসূল (স.) স্বীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন– কাফেরদের সমাবেশ স্থলের দিকে যাবেন, না মদীনাতেই অবস্থান করবেন? স্বয়ং রসূল (স.)-এর অভিমত ছিলো এই যে, মদীনা থেকে মুসলমানরা বাইরে যাবে না, মদীনাকে দুর্গ হিসাবে গ্রহণ করে তারা সেখানে অবস্থান করবে এবং কাফেররা মদীনায় ঢুকে পড়লে মুসলিম পুরুষরা শহরের প্রতিটি গলির প্রান্তে এসে এবং নারীরা ঘরের ছাদের ওপর থেকে লড়াই করবে।

রসূল (স.)-এর এই মতের সাথে মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মতৈক্য প্রকাশ করলো। এই সময় সাহাবীদের একটি বিরাট দল প্রধানত যারা বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তারা রসূল (স.)-কে মদীনা থেকে বের হওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং এজন্যে খুব পীড়াপীড়ি করলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে, মদীনা থেকে বেরিয়ে গিয়েই কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে। রসূল (স.) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং হযরত আয়েশার ঘরে প্রবেশ করে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হলেন। তিনি যখন মুসলিম বাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন উক্ত সাহাবীদের সংকল্পে ভাটা পড়লো। তারা এই ভেবে অনুতপ্ত হলো যে, আমরা রসূল (স.)-কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনা থেকে বাইরে যেতে বাধ্য করে কী করলাম! তাই তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল, আপনি যদি মদীনাতেই অবস্থান করতে চান তবে তাই করুন। রসূল (স.) বললেন, 'কোনো নবী যখন সামরিক পোশাক পরিধান করে, তখন তার সাথে তার শত্রুদের একটা বুঝাপড়া না হওয়া পর্যন্ত সেই পোশাক খোলা তার পক্ষে শোভা পায় না।' এ দ্বারা তিনি তাদেরকে এই মহৎ শিক্ষাটি দিলেন যে, পরামর্শের জন্যে একটা সময় নির্দিষ্ট থাকে। সে সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে দৃঢ়সংকল্প সহকারে ও আল্লাহর ওপর নির্ভর করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য। তখন আর ইতস্তত করা, নতুন করে পরামর্শ করা ও জনমত যাচাই করার অবকাশ থাকে না। এরপর চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার প্রক্রিয়া চলবে এবং আল্লাহ তায়ালা যা চাইবেন তাই

হবে। ইতিপূর্বে রসূল (স.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তার তরবারি ভোতা হয়ে গেছে। তিনি দেখলেন যে, একটি গরু যবাই করা হচ্ছে এবং তিনি একটি সুরক্ষিত বর্মে নিজের হাত ঢুকিয়েছেন। পরে এই স্বপ্নের তাবীর এই বুঝলেন যে, তরবারি ভোতা হওয়ার তাৎপর্য হলো নিজ পরিবারের এক ব্যক্তির শাহাদাত লাভ, গরু যবাই হওয়ার অর্থ তাঁর সাহাবীদের একটি দলের শাহাদাত লাভ এবং বর্ম অর্থ মদীনা। এভাবে তিনি যুদ্ধের ফলাফল বুঝতে পারছিলেন। তবে এর পাশাপাশি তিনি পরামর্শ ব্যবস্থাও চালু করছিলেন। পরামর্শের পর কাজের যে বিধান রয়েছে, তাও তিনি বাস্তবায়িত করছিলেন। তিনি একটি জাতিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন। ঘটনাবলী থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকেই দিনে দিনে জাতি বেড়ে ওঠে, ঘটনাবলীর ভেতর দিয়ে তারা প্রশিক্ষণ পায় এবং তাছাড়া সেদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ভাগ্য নির্ধারিত ছিলো তাও তাঁকে কার্যকরী করতে হচ্ছিলো। তাঁকে অদৃষ্টের নির্ধারিত পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হচ্ছিলো। আল্লাহর সাথে গভীর সর্ম্পকযুক্ত মন দ্বারা সেটি তিনি ভালো করেই উপলব্ধি করতে পারছিলেন।

এক হাজার সাহাবীকে সাথে নিয়ে রসূল (স.) বেরিয়ে পড়লেন। মদীনায় যারা থেকে গেলেন, তাদের নামাযে ইমামতি করার জন্যে তিনি ইবনে উম্মে মাকতুমকে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। অতপর তিনি মদীনা ও ওহুদের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছলেন। পথিমধ্যে মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যোদ্ধাসহ এই বলতে বলতে বেরিয়ে পৃথক হয়ে গেলো যে, 'তিনি ছেলে-ছোকরাদের কথা মতো কাজ করলেন, আমার কথা শুনলেন না।' হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে তিরষ্কার করে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, তোমরা চলে এসো, হয় আল্লাহর পথে লড়াই করবে, না হয় কেবল আক্রমণ প্রতিহত করবে।' তারা বললো, আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছো, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আসতাম না।

রসূল (স.)-কে আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি পরামর্শ দিলো যে, তিনি যেন তাদের ইহুদী মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্য চান। রসূল (স.) এই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা, এ সময় ঈমান ও কুফরীর মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এর সাথে ইহুদীদের কী সম্পর্ক? সাহায্য ও বিজয় যদি আসে, তবে তা আসবে আল্লাহর কাছ থেকে– যদি তাঁর প্রতি মুসলমানদের যথার্থ ভরসা থাকে এবং অন্তরের একনিষ্ঠ আনুগত্য বিদ্যমান থাকে। তিনি বললেন, স্থানীয় এমন কোনো লোক আছে যে আমাদেরকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে? তখন আনসারদের একজন তাদেরকে পথ চিনিয়ে নিয়ে গেলো এবং তারা ওহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে এক জায়গায় অবস্থান নিলেন। রসূল (স.) সবাইকে তাঁর আদেশ ব্যতীত কোনো আক্রমণ চালাতে নিষেধ করে দিলেন।

পরদিন সকালে সাতশ' লোক নিয়ে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। এদের মধ্যে ৫০ জন ছিলো অশ্বারোহী। আর আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়রকে ৫০ জন তীরন্দাজ সৈন্যের নেতা নিযুক্ত করে একটি গীরিপথে অবস্থান নিতে নির্দেশ দিয়ে বলে দিলেন, গোটা সৈন্য বাহিনী পাখীতে ছো মেরে নিয়ে গেলেও তারা যেন তাদের স্থান ত্যাগ না করে এবং দৃঢ়ভাবে এই অবস্থান আঁকড়ে থাকে। তারা ছিলো সৈন্যবাহিনীর পেছনে। রসূল (স.) তাদেরকে বলে দিলেন যে, মোশরেকরা যাতে পেছন থেকে চড়াও হতে না পারে, তা লক্ষ্য রেখো এবং তাদেরকে তীর মেরে মেরে হটিয়ে দিও।

রসূল (স.) দুইটি বর্ম পরিধান করে যুদ্ধের জন্যে বের হলেন। মোসায়েব ইবনে ওমায়েরের হাতে পতাকা দিলেন। একদিকে যোবায়র ইবনে আওয়ামকে এবং অপরদিকে মুনযের ইবনে আমরকে অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। তিনি যুবকদেরকে পর্যবেক্ষণ করলেন। যাকে যাকে বয়সে কিশোর মনে করলেন তাকে ফেরত পাঠালেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর, ওসামা ইবনে যায়দ, উসায়দ ইবনে যোহায়র, বারা' ইবনে আযেব, যায়দ ইবনে আরকাম, যায়দ

ইবনে সাবেত, আবারা ইবনে আওস ও আমর ইবনে হেযাম। তবে এদের মধ্যে যাদেরকে তিনি শক্তিশালী মনে করলেন তাদের অনুমতি দিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সামুরা ইবনে জুনদুব এবং রাফে' ইবনে খাদীজ। এদের উভয়ের বয়স ছিলো ১৫ বছর।

কোরায়শ বাহিনী তিন হাজার যোদ্ধা নিয়ে লড়াই করতে এলো। এদের মধ্যে দু'শ ছিলো অশ্বারোহী। ডান দিকের বাহিনীর সেনাপতি ছিলো খালেদ ইবনে ওলীদ এবং বাম দিকের বাহিনী সেনাপতি ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। আবু দুজানা সাম্মাক ইবনে খাবশার কাছে রসূল (স.) নিজের তরবারিখানা সমর্পণ করলেন। কেননা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, রণকুশলী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

যুদ্ধে মোশরেকদের মধ্য দিয়ে সর্বাগ্রে এগিয়ে এলো পাপিষ্ঠ আবু আমের। কাফেররা তাকে 'রাহেব' (দরবেশ) বলতো। রসূল (স.) তাকে 'ফাসেক' (পাপিষ্ট) নামে আখ্যায়িত করেন। সে জাহেলী যুগে আওস গোত্রের নেতা ছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পর সে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মদীনা থেকে বেরিয়ে যায়। সে কোরায়শ গোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে উস্কানি দিতে থাকে। সে কোরায়শদেরকে বলে যে, তার গোত্রের লোকেরা রণাংগনে তাকে দেখেই তার অনুগত হয়ে যাবে। এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো। সে এসে তার গোত্রের লোকদেরকে ডাক দিয়ে নিজের পরিচয় দিলো। আওস গোত্রীয় মুসলমানরা তখন তাকে বললো, ওহে পাপিষ্ঠ, আল্লাহ তায়ালা যেন তোকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না করেন। সে তখন বললো, আমি চলে আসার পর আমার গোত্র বিপথে চলে গেছে। এরপর সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ চালালো।

যুদ্ধ যখন ঘোরতরভাবে শুরু হলো, তখন আবু দুজানা আনসারী, তালহা ইবনে আবদুল্লাহ, হামযা, ইবনে আবদুল মোত্তালেব, আলী ইবনে আবু তালেব, নাদার ইবনে আব্বাস, সাইদ ইবনে বারী প্রচন্ডভাবে লড়াই করে বীরত্বের পরীক্ষা দেখালেন। দিনের প্রথম ভাগে মুসলমানরা কাফেরদের ওপর বিজয়ী হলো, সত্তর জন নেতৃস্থানীয় কাফের মারা গেলো। আল্লাহর দুশনরা পরাজিত হয়ে পালালো। তাদের মেয়েরা তাদর কাপড়-চোপড় পর্যন্ত ফেলে ছুটে পালালো।

তীরন্দাজ সৈন্যরা যখন মোশরেকদের পরাজিত হতে দেখলো, অমনি তাদের কেন্দ্র ছেড়ে সরে গেলো। অথচ রসূল (স.) তাদেরকে বলেছিলেন কোনো অবস্থাতেই যেন তারা ওই স্থান ত্যাগ না করে। তারা 'গনীমাত' 'গনীমাত' বলতে বলতে কাফেরদের পরিত্যাক্ত জিনিসপত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তাদের আমীর যখন তাদেরকে রসূল (স.)-এর আদেশ স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন তারা তাতে কর্ণপাত করলো না। তারা ভাবলো, মোশরেকরা আর ফিরে আসবে না। তারা গনীমাত সংগ্রহ করতে গেলো এবং কাফেররা ওহুদ পাহাড়ের সে সুড়ংগ পথ থেকে অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ পেয়ে গেলো।

এই সময় ব্যাপারটা মোশরেকদের অন্যতম সেনাপতি খালেদ বুঝতে পারলো। সে মোশরকেদের অশ্বারোহী বাহিনীটা নিয়ে ফিরে এসে দেখলো সুড়ংগ পথ উন্মুক্ত। আর যায় কোথায়! সংগে সংগে তারা মুসলমানদের পেছন দিক দিয়ে এসে স্থানটা দখল করে নিলো। খালেদ ও অশ্বারোহীদেরকে মুসলমানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখে পরাজিত অন্যান্য মোশরেকরাও ফিরে এলো এবং মুসলমানদেরকে চারদিকে থেকে তারা ঘিরে ফেললো।

যুদ্ধের প্রাথমিক ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টে গেলো। মুসলমানদের ওপর মহাবিপদ আপতিত হলো। তাদের শৃংখলা তছনছ হয়ে গেলো। ভীতি ও ত্রাসে তারা চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগলো। তারা আদৌ কল্পনা করতে পারেনি এমন এক আপদ আকস্মিকভাবে এসে তাদের ওপর হাযির হবে। এই সময়ে নিহতের সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে গেলো। মুসলমানদের মধ্যে যাদের

ভাগ্যে শাহাদাত লেখা ছিলো, তারা শহীদ হলেন। মোশরেকরা অবাধে রসূল (স.)-এর কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র সাহাবী রসূল (স.)-কে রক্ষা করতে গিয়ে লড়াই করে শহীদ হলেন। রসূল (স.) মুখমন্ডলে আঘাত পেলেন। তাঁর ডান পাশের নিম্ন মাড়ির দাঁত ভেংগে গেলো। তাঁর শিরস্ত্রাণ আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেলো, তাঁর চোয়ালে ভাংগা শিরস্ত্রাণের দু'টো টুকরো ঢুকে গেলো। মোশরেকরা তাঁকে পাথর মেরে একটি গর্তের মধ্যে ফেলে দিলো। পাপিষ্ঠ আবু আমের এ ধরনের কয়েকটি গর্ত খুড়ে রেখেছিলো মুসলমানদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্যে।

এই ভয়ংকর ত্রাসের মধ্যে এই কুচক্রী চিৎকার করে বললো, 'মোহাম্মদ নিহত হয়েছে। মোহাম্মদ নিহত হয়েছে' এতে মুসলমানদের যেটুকু শক্তি-সামর্থ অবশিষ্ট ছিলো তাও নষ্ট হয়ে গেলো। তারা পুরোপুরি পরাভূত ও হতাশ হয়ে রণে ভংগ দিলো।

কিন্তু এ সর্বব্যাপী পরাজিত অবস্থায়ও আনাস ইবনে নাযার পরাজয় স্বীকার করেননি। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ সহ হতাশায় ভেংগে পড়া কতিপয় সাহাবীদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমরা বসে আছো কেন? তারা বললেন, 'রসূল (স.) শহীদ হয়ে গেছেন'। তখন তিনি বললেন, তাহলে তাঁর মৃত্যুর পর তোমরা বেঁচে থেকে কী করবে? ওঠো, রসূল (স.) যে জন্যে মারা গেছেন, তার জন্যে তোমরাও মরো এবং মরণপণ লড়াই করো। এরপর মোশরকেদের মোকাবেলা করতে গিয়ে যখন সা'দ ইবনে মায়াযের সাথে দেখা হলো, তখন বললেন, ওহে সা'দ! আমি ওহুদের ওদিক থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। এরপর লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদ হলেন। তার গায়ে ৭০টিরও বেশী আঘাত পাওয়া গিয়েছিলো। তার বোন ছাড়া কেউ তাকে শনাক্ত করতে পারেনি। সে আংগুল দেখে তার ভাইকে সনাক্ত করেছিলো।

এরপর রসূল (স.) মুসলমানদের দিকে এগিয়ে গেলেন। কা'ব ইবনে মালেক তাঁকে সর্বপ্রকার শীরস্ত্রাণের নিচে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'ওহে মুসলমানরা! সুসংবাদ সুসংবাদ। এই যে রসূলুল্লাহ জীবিত আছেন।' রসূল (স.) হাতের ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বললেন। তখন মুসলমানরা তাঁর কাছে জমায়েত হলো এবং তাঁকে পাহাড়ের পাশে নিয়ে গেলো। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর, ওমর ও হারেস ইবনে সাম্মা আনসারী (রা.) প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। পাহাড়ে আরোহণের সময় রসূল (স.) উদ নামক একটি ঘোড়ার ওপর সওয়ার উমাইয়া ইবনে খালাফকে দেখতে পেলেন। সে মক্কায় এই ঘোড়াটিকে লালন-পালন করতো আর বলতো, এই ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি মোহাম্মদকে হত্যা করবো।' রসূল (স.) যখন এ কথা শুনতেন, তখন বলতেন, 'বরঞ্চ আমিই ওকে হত্যা করবো ইনশাআল্লাহ'। অতপর সে নাগালের ভেতরে আসা মাত্র রসূল (স.) হারেসের বর্শাটি নিয়ে তাকে আঘাত করলেন। আঘাত খেয়ে সে ষাড়ের মতো চিৎকার করতে করতে পালালো। রসূল (স.) নিশ্চিত ছিলেন যে, সে নিহত হবে এবং বাস্তবিকই সে ফিরে যাওয়ার সময় পথিমধ্যেই মারা গেলো।

আবু সুফিয়ান পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো, 'মোহাম্মদ বেঁচে আছে নাকি?' রসূল (স.) বললেন, 'তোমরা কোনো জবাব দিও না। তারপর সে বললো, আবু কুহাফার ছেলে (আবু বকর) বেঁচে আছে নাকি? এবারও কেউ জবাব দিলো না। এরপর সে বললো, 'ওমর ইবনে খাত্তাব বেঁচে আছে নাকি?' এবারও কেউ জবাব দিলো না। সে এই তিনজন ছাড়া আর কারো কথা জিজ্ঞাসা করলো না। এরপর সে নিজের লোকদেরকে বলো, এ তিনজনকে তোমরা শেষ করে দিয়েছো।' এ কথা শুনে রসূল (স.) আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, ওরে আল্লাহর শত্রু! তুই যাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিস তারা সবাই জীবিত। আল্লাহ তায়ালা তোর জন্যে এমন পরিণতি নির্ধারিত করে রেখেছেন যা তুই খুব অপছন্দ করবি।' সে বললো, 'নিহতদের মধ্যে একজনের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আমি এর আদেশও দেইনি, আর এতে

আমি দুঃখিতও নই।' (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযার লাশের যে অবস্থা করেছিলো, একথা দ্বারা সে তার দিকেই ইংগীত দিয়েছে। ওয়াহশী হামযাকে হত্যা করার পর হিন্দা এসে তার পেট চিরে ফেলে এবং তার কলিজা বের করে চিবোয়!)

অতপর আবু সুফিয়ান শ্লোগান দিলো, উলু ইয়া হুবাল! (ওহে হুবাল (দেবতা) সমুন্নত হও।') রসূল (স.) সাহাবীদেরকে বললেন, 'তোমরা এর জবাব দিচ্ছো না কেন?' তারা বললেন, কী জবাব দেবো! রসূল (স.) বললেন, বলো, আল্লাহু আ'লা ওয়া আজাল।' (আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ)। আবু সুফিয়ান আবার বললো, আমাদের উয্যা (দেবতা) আছে, তোমাদের কোনো ওয্যা নেই।' রসূল (স.) বললেন, তোমরা জবাব দাও না কেন? তাঁরা বললেন, কী জবাব দেবো? তিনি বললেন, বলো, 'আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায়, তোমাদের সহায় নয়।' আবু সুফিয়ান বললো, আজ বদরের বদলা নিলাম। যুদ্ধে সমানে সমান বদলা হয়।' হযরত ওমর বললেন, সমান সমান হয়নি। আমাদের নিহতরা জান্নাতে, আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে?'

যুদ্ধ শেষে মোশরেকরা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে মুসলমানদের সন্দেহ হলো যে, তারা হয়তো মদীনা আক্রমণ করতে গেছে এবং ছেলেমেয়েদেরকে করা ও সম্পদ লুণ্ঠন করা তাদের উদ্দেশ্য। এ কথা ভেবে তারা ভীষণ উদ্বিগ্ন হলেন। রসূল (স.) হযরত আলীকে বললেন, 'তুমি মোশরেকদের পেছনে এগিয়ে যাও। দেখো তারা কী করে। তারা যদি ঘোড়া ছেড়ে উটে চড়ে থাকে, তাহলে তারা মক্কা অভিমুখে গেছে। আর যদি ঘোড়ায় চড়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে তারা মদীনার দিকে যাচ্ছে। আর তাই যদি হয়, তবে আল্লাহর কসম, আমি তাদের মুখোমুখী হবো এবং লড়াই করবো।' হযরত আলী (রা.) বলেন, 'অতপর আমি তাদের পিছু নিয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, তারা উটে চড়ে মক্কা অভিমুখে যাচ্ছে।'

পথিমধ্যে মোশরেকরা পরস্পরকে তিরস্কার করতে লাগলো। কেউ কেউ বললো, 'তোমরা কোনোই সাফল্য অর্জন করোনি। তোমরা তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকদেরকে নাগালে পেয়েছিলে, অথচ তাদেরকে ছেড়ে দিলে। তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা অক্ষত রয়েছে। তারা এখন তোমাদের জন্যে সৈন্য সমাবেশ করবে। চলো ফিরে যাই এবং ওদেরকে একেবারে নির্মূল করে দিয়ে আসি। রসূল (স.) এ খবর জানতে পেরে তৎক্ষণাত তিনি মুসলমানদেরকে ডাক দিলেন এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্যে রওয়ানা হতে বললেন। তিনি স্পষ্টভাবে বললেন, যারা ওহুদের লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছে তারা ছাড়া আর কেউ আমাদের সাথে যাবে না। (অর্থাৎ নতুন ও অনভিজ্ঞ লোককে এবং যুদ্ধপালানো মোনাফেকদেরকে নেয়া হবে না) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, আমি কি আপনার সাথে আসবো? রসূল (স.) বললেন, না। রসূল (স.)-এর এই আহ্বানে গুরুতর যুদ্ধাহত ও ভয়ভীতির শিকার মুসলমানরা সাড়া দিয়ে বললেন, 'আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।' ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারা সত্ত্বেও হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রসূলের সাথে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার সাথে আমি প্রতিটি যুদ্ধে থাকতে চাই। ওহুদ যুদ্ধের সময় আমার পিতা আমাকে বোনদের পাহারা দেয়ার জন্যে বাড়িতে রেখে গিয়েছিলেন। এবার আমাকে আপনার সাথে যাওয়ার অনুমতি দিন। রসূল (স.) তাকে অনুমতি দিলেন। অতপর রসূল (স.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানরা যুদ্ধাভিযানে গেলেন এবং 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। এই সময় মা'বাদ ইবনে আবি মা'বাদ নামক খাযায়া গোত্রীয় এক ব্যক্তি রসূল (স.)-এর সাথে দেখা করলো। রসূল (স.) তাকে আদেশ করলেন, যেন সে আবু সুফিয়ানের বাহিনীতে যোগ দিয়ে এবং তাকে রণে ভংগ দিতে উদ্বুদ্ধ করে। মা'বাদ রওহা নামক স্থানে গিয়ে আবু সুফিয়ানের সাথে মিলিত হলো এবং নিজের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখলো। আবু সুফিয়ান বললো, 'ওহে মা'বাদ! ওদিককার খবর কী? সে

বললো, মোহাম্মদ ও তার সাথীরা তোমদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই-এর জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং এতো বড় এক বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে যে, অতো বড় বাহিনীর সমাবেশ তারা আর কখনো ঘটায়নি। ইতিপূর্বে তার সংগী-সাথীদের মধ্যে যারা যুদ্ধে যোগ দেয়নি, তারা অনুতপ্ত হয়েছে।' আবু সুফিয়ান বললো, তাহলে তোমার অভিমত কী? সে বললো, মুসলমানদের বাহিনী ওই উচ্চ টিলাটার ওপর দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত তোমার যাত্রা করা আমি সমীচীন মনে করি না। আবু সুফিয়ান বললো, আমরা তো তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে পুনরায় আক্রমণ করতে চেয়েছিলাম। মা'বাদ বললো, ওটা করো না। আমি তোমার শুভাকাংখী হিসাবেই বলছি।' এরপর আবু সুফিয়ান সদলবলে মক্কায় ফিরে গেলে।

আবু সুফিয়ান কয়েকজন মোশরেকদের মদীনার দিকে যেতে দেখে তাদের একজনকে বললো, 'তুমি কি মোহাম্মদের কাছে আমার একটা বার্তা পৌছে দেবে? তাহলে তুমি যখন মক্কায় ফিরবে, আমি তোমাদের উট বোঝাই করে কিসমিস দেবো।' সে বললো ঠিক আছে। কী বলতে হবে বলো। আবু সুফিয়ান বললো, 'মোহাম্মদকে জানাবে যে, আমরা তাকে ও তার সংগীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছি।'

আবু সুফিয়ানের এ বার্তা যখন মুসলমানদের কাছে পৌছলো, তখন তাদের মনোবল একটুও কমলো না। আরা বললেন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল' (আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উৎকৃষ্ট অভিভাবক)। এরপর তারা তিন দিন তাদের অপেক্ষায় থেকে যখন জানলেন যে, মোশরেকরা মক্কায় ফিরে গেছে, তখন তারা মদীনায় ফিরে গেলেন।

কিছু শিক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা

ওহুদ যুদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে যুদ্ধের খুঁটিনাটি তথ্য বিশেষত শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক সব ঘটনা উল্লেখিত তাই এখানে উপসংহার হিসাবে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আমি তুলে ধরছি,

ওহুদ যুদ্ধের ময়দানে তীরন্দাজ সৈন্যরা তাদের চিহ্নিত স্থান ত্যাগ করার পর যখন কাফেররা মুসলমানদেরকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করলো, সমগ্র রণাংগনে ভয়াবহ আক্রমণে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, রসূল (স.) সম্পূর্ণ একাকী হয়ে গেলেন, 'মোহাম্মদ নিহত হয়েছে' বলে চিৎকার ধ্বনি শোনা গেলো এবং তাতে মুসলমানদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেংগে পড়লো, তখন আমর ইবনে কুমাইয়া নামক এক কাফের রসূল (স.)-এর কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলো।

এ সময় এমন এক পরিস্থিতি বিরাজ করছিলো যাতে পরম ধৈর্যশীল মানুষেরও ধৈর্যের বাঁধ টুটে যায়। এই পরিস্থিতিতে মাযেন গোত্রের উম্মে আম্মারা নুসাইবা বিনতে কা'ব নামক এক মহিলা সাহাবী রসূল (স.)-কে রক্ষা করার জন্যে প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি আমর ইবনে কুমাইয়াকে নিজ তরবারি দ্বারা বেশ কয়েকটি আঘাত হানেন, কিন্তু দু'টো বর্ম পরিহিত থাকায় সে প্রাণে বেঁচে যায়। ইবনে কুমাইয়া উম্মে আম্মারকে পাল্টা আঘাত করলে তার কাঁধ আহত হয়।

এই সময়ে আবু দুজানা নিজের পিঠকে ঢাল বানিয়ে রসূল (স.)-কে রক্ষা করেন। তার পিঠে ক্রমাগত তীর ও বর্শা পড়তে থাকে। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও নড়েননি এবং রসূল (স.)-কে মুহূর্তের জন্যেও আড়ালমুক্ত করেননি।

তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ রসূল (স.)-এর কাছে দ্রুত ফিরে আসেন এবং নিজের জীবন বাযি রেখে তাঁর ওপর থেকে আক্রমণ ঠেকাতে থাকেন। সহীহ ইবনে হাব্বানে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন সবাই রসূল (স.)-কে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো এবং আমিই সর্বপ্রথম তাঁর কাছে ফিরে আসি। দেখলাম, তাঁর সামনে এক ব্যক্তি অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করে তাঁকে রক্ষা করে চলেছে। আমি বললাম, তালহা! আমার পিতামাতা তোমার ওপর উৎসর্গ হোক। ইতিমধ্যে আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ এসে পড়লো। সে পাখীর

মতো ক্ষিপ্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং আমার সাথে যুদ্ধে যোগ দিলো। আমরা যুদ্ধ করতে করতে রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম তালহা তাঁর সামনে পড়ে আছে। রসূল বললেন, তোমাদের ভাইকে সামলাও। সে নিজের জন্যে জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে। রসূল (স.)-এর চোয়ালে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত বর্শা আঘাত হেনেছিলো এবং শিরস্ত্রাণের একটা টুকরো তাঁর চোয়ালে ঢুকে গিয়েছিলো। আমি টুকরোটা বের করে আনতে উদ্যত হলাম। এ সময় আবু ওবায়দা বললো, 'হে আবু বকর! এ কাজটি আমাকে করতে দিন।' অতপর সে বর্শার ফলাটিকে নিজের দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রসূল (স.) যাতে ব্যথা না পান, সে জন্যে অত্যন্ত আলতোভাবে ধরে টানতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত ফলাটি টেনে বের করলো। বের করতে গিয়ে আবু ওবায়দার সামনের দাঁত উপড়ে পড়লো। রসূল (স.) পুনরায় বললেন, তোমাদের ভাইকে সামলাও। সে নিজের জন্যে জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।' এবার আমরা তালহার কাছে তার ক্ষতের চিকিৎসা করতে এলাম। দেখলাম, তিনি দশটিরও বেশী আঘাত পেয়েছেন।

হযরত আলী (রা.) রসূল (স.)-এর ক্ষতস্থান ধোয়ার জন্যে পানি নিয়ে এলেন। তিনি পানি ঢালতে লাগলেন, আর ফাতেমা ধুতে লাগলেন। যখন দেখা গেলো রক্ত কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না, তখন ফাতেমা একখানা ন্যাকড়া পুড়িয়ে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরীর পিতা হযরত মালেক, রসূল (স.)-এর ক্ষতস্থান চুষে পরিষ্কার করে দিলেন। রসূল (স.) তাঁকে বললেন, থুথু ফেলে দাও। তিনি বললেন, আমি কখনো এ থুথু ফেলবো না। এরপর তিনি চলে গেলে রসূল (স.) বললেন, 'কোন জান্নাতবাসীকে দেখতে চাইলে এই ব্যক্তিকে দেখে নাও।'

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিন রসূল (স.)-এর কাছে সাতজন আনসারী ও দু'জন কোরায়শী সাহাবী ব্যতীত আর কেউ ছিলো না। কাফেররা যখন তাঁর ওপর আক্রমণ জোরদার করলো, তখন রসূল (স.) বললেন, 'জান্নাত লাভের নিশ্চয়তায় কেউ যদি আমার ওপর থেকে আক্রমণ প্রতিহত করতে চাও, তবে এগিয়ে এসো।' জনৈক আনসারী এগিয়ে এলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর আবার আক্রমন জোরদার হলো। রসূল (স.) আবার বললেন, জান্নাতে যাওয়া ও জান্নাতে আমার সাথী হওয়ার বিনিময়ে কেউ যদি আমার ওপর হামলা প্রতিহত করতে চায়, তবে সে যেন এগিয়ে আসে।' এভাবে সাতজন সাহাবী একে একে শহীদ হলেন। রসূল (স.) বললেন, আমাদের সংগীরা আমাদের প্রতি কি বিস্ময়করভাবে সুবিচার করলো।' এরপর তালহা বীর বিক্রমে লড়াই করে শত্রুদেরকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। আর আবু দুজানা কিভাবে নিজের পিঠ ঢাল বানিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করেছিলো, তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। অবশেষে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া গেলো। এই দিন রসূল (স.) এতোটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি যখন একটি পাহাড়ে আরোহন করছিলেন এবং পেছনে মোশরেকরা ধাওয়া করে আসছিলো, তখন একটি উঁচু জায়গায় উঠতে তিনি অক্ষম হলেন। তখন তালহা সেখানে বসে পড়লেন। রসূল (স.) তাঁর ওপর দিয়ে সে জায়গায় আরোহন করলেন। এই সময় নামাযের সময় হলে তিনি বসে বসে নামায পড়ালেন।

ফেরেশতাদের হাতে গোসলকৃত উপাধিপ্রাপ্ত সাহাবী হানযালা আনসারী আবু সুফিয়ানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হলে শাদ্দাদ বিন আওস হযরত হানযালাকে হত্যা করে। এই সময় হানযালার ওপর গোসল ফরয ছিলো। নিজ স্ত্রীর কাছে শায়িত অবস্থায় জেহাদের ঘোষণা শুনে তিনি তৎক্ষণাত জেহাদের ময়দানে চলে আসেন। তার শাহাদাতের পর রসূল (স.) সাহাবীদের বললেন যে, 'ফেরেশতারা হানযালাকে গোসল করাচ্ছে। তোমরা তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো, তার অবস্থা কী ছিলো। তার স্ত্রী জানালেন যে, তার ওপর গোসল ফরয ছিলো।'

যায়দ বিন সাবেত (রা.) বলেন, ওহুদের দিন রসূল (স.) আমাকে সা'দ বিন রাবীর সন্ধানে পাঠালেন। আমি নিহতদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাকে খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম, তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাত মিলে সর্বমোট সত্তরটি আঘাত নিয়ে তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় কাতরাচ্ছেন। আমি বললাম, হে সা'দ রসূল (স.) তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন এবং জানতে চেয়েছেন তুমি কেমন আছো? সা'দ বললেন, রসূল (স.)-কেও আমি সালাম জানাচ্ছি। তাকে বলো, আমি জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আনসারদেরকে বলে দাও যে, তোমাদের চোখে দৃষ্টিশক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি রসূল (স.) প্রহরাহীন অবস্থায় থাকেন, তাহলে আল্লাহর কাছে তোমরা কোনো ওযর দিতে পারবে না। এ কথা বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

একজন মোহাজের রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা জনৈক আনসারীর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, হে অমুক! তুমি কি জানো, রসূল (স.) নিহত হয়েছেন? আনসারী বললেন, মোহাম্মদ (স.) যদি নিহত হয়ে থাকেন, তবে তিনি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌঁছে দিয়েই নিহত হয়েছেন। কাজেই তোমরা তোমাদের দ্বীনকে রক্ষার জন্যে লড়াই করো।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর হারাম বলেন, আমি ওহুদ যুদ্ধের পূর্বে মুবাশশের ইবন আবদুল মুনযেরকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বললেন, তুমি কিছুদিনের মধ্যে আমাদের কাছে আসছো। আমি বললাম, আপনি এখন কোথায়? তিনি বললেন, 'জান্নাতে। যেখানে খুশী ছুটে বেড়াচ্ছি।' আমি বললাম, আপনি বদরযুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন না? তিনি বললেন, হাঁ। এরপর আমাকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। আমি এ স্বপ্নের কথা রসূল (স.)-কে জানালাম। তিনি বললেন, 'ওহে জাবেরের পিতা একেই বলে শাহাদাত।'

বদরযুদ্ধের এক শহীদের পিতা খায়সামা বলেন, আমি বদরযুদ্ধে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যাওয়া হয়নি। তবে নিজের ছেলেকে যেতে সাহায্য করেছিলাম। সে ভাগ্যবান হলো ও শাহাদাত লাভ করলো। গত রাতে তাকে স্বপ্নে দেখলাম, খুবই সুন্দর চেহারা তার। সে জান্নাতের ফলমূলের বাগানের ভেতর দিয়ে ও ঝর্ণার কিনার দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমাকে বলছে, এসো, আমাদের কাছে চলে এসো, জান্নাতে থাকবে। আমার প্রভু আমাকে যা যা দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন তা সবই দিয়েছেন। হে আল্লাহর রসূল! আমি জান্নাতে তার সংগী হতে উদগ্রীব। আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমি আমার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী। হে আল্লাহর রসূল! আপনি দোয়া করুন। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে শাহাদাত দান করেন এবং জান্নাতে সা'দের সাথে থাকতে দেন। রসূল (স.) তার জন্যে দোয়া করলেন। ফলে তিনিও ওহুদে শহীদ হন।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ওহুদের দিন দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা! আমি তোমার কসম খেয়ে কামনা করছি যেন আগামীকাল শত্রুদের মুখোমুখী হতে পারি। তারপর তারা যেন আমাকে হত্যা করে, আমার পেট চিরে ফেলে এবং নাক-কান কেটে দেয়। অতপর তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এসব কার জন্যে। আমি বলবো, হে মালিক, তোমার জন্যে।'

আমর ইবনুল জামুহ মারাত্মক ধরনের খোঁড়া লোক ছিলেন। তার চার জন যুবক ছেলে ছিলো। প্রত্যেকে রসূল (স.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো। রসূল (স.) যখন ওহুদের যুদ্ধে রওনা দিলেন, তখন আমরও যেতে চাইলেন। তার ছেলেরা তাকে বললো, 'আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছেন, আপনি থাকুন। আমরা আপনার স্থলে লড়াই করবো। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জেহাদের ফরয থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আমর ইবনুল জামূহ রসূল (স.)-এর কাছে এসে বললেন, হে রসূল (স.), আমার এই ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে জেহাদে যেতে দিচ্ছে না। আমি শহীদ হতে চাই। এই খোঁড়া পা নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই। রসূল (স.) বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জেহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

আর তার ছেলেদেরকে বললেন, ওকে যেতে দিলে তোমাদের ক্ষতি কী? আল্লাহ তায়ালা তাকে শাহাদাত দিতেও তো পারেন।' এরপর আমর রসূল (স.)-এর সাথে জেহাদে গেলেন এবং ওহুদের ময়দানে শহীদ হলেন।

যুদ্ধ চলাকালে রণাংগনে হোযায়ফা ইবনুল ইয়ামান নিজের পিতার দিকে তাকাচ্ছিলেন, মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে চাইছিলো। তারা তাকে না চেনার খারণে তাকে মোশরেকই মনে করেছে। হোযায়ফা বললেন, 'ওহে আল্লাহর বান্দারা! এতো আমার পিতা।' কিন্তু তারা হোযায়ফার কথা বুঝতে না পেরে তার পিতাকে হত্যা করে ফেললো। হোযায়ফা তার মুসলিম সাথীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করুন। রসূল (স.) এই হত্যাকান্ডের ক্ষতিপূরণ হিসাবে হোযায়ফাকে 'দিয়াত' দিতে চাইলেন। হোযায়ফা বললেন, এই দিয়াত আমি মুসলমানদের জন্যে সদকা করে দিলাম।' এটা রসূল (স.)-এর কাছে হোযায়ফার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিলো।

এই যুদ্ধে শহীদদের সরদার হযরত হামযার হত্যাকান্ড সম্পর্কে তার হত্যাকারী যোবায়ের ইবনে মোতয়ামের ক্রীতদাস ওয়াহশী নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছে,

যোবায়ের আমাকে বলেছিলো যে, মোহাম্মদের চাচা হামযাকে যদি হত্যা করতে পারো, তবে তোমাকে মুক্ত করে দেবো। তাই আমি যোদ্ধাদের সাথে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ছিলাম আবিসিনীয়। আবিসিনীয় কায়দায় বর্শা নিক্ষেপ করতাম। আমার লক্ষ্য প্রায়ই হতো অব্যর্থ। যুদ্ধের ময়দানে আমি হামযার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম। তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন একটা তরুণ উট। তারবারি দিয়ে তিনি লোকজনকে ছিন্ন করে দিচ্ছিলেন। তার সামনে কোনো বাধাই টিকে থাকতে পারছিলো না। আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম ও প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। গাছ বা পাথরের আড়ালে লুকাচ্ছিলাম যাতে তিনি আমার কাছে আসেন। এই সময় সাব্বা ইবনে আবদুল ওযযা আমারও আগে তার দিকে ছুটে গেলো। হামযা তাকে দেখা মাত্র এমন জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা উড়িয়ে দিলেন। এই সময় আমি আমার বর্শাটা নেড়ে-চেড়ে দেখলাম। যখন সন্তোষজনক মনে হলো, তাঁর ওপর ছুঁড়ে মারলাম। বর্শা তার নাড়িভুঁড়িতে গেঁথে গেলো এবং দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে বেরুলো। এরপরও তিনি আমার দিকে এগুতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। আমি তাঁকে বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় রেখে দিলাম এবং সেখানে বসে রইলাম। কেননা, হামযা ছাড়া আমার আর কারো প্রয়োজন ছিলো না। আমি স্বাধীন হবার মানসেই তাকে হত্যা করেছি। এরপর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবা এলো, তার পেট চিরলো, কলিজা বের করলো ও কলিজা চিবালো। তবে চিবিয়ে ছিঁড়তে না পেরে সে তা ফেলে দিলো।

যুদ্ধের পর যখন রসূল (স.) হামযা (রা.)-এর লাশ দেখতে এলেন। প্রচন্ড শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'প্রিয় চাচা, তোমার হত্যাকান্ডের মতো শোকাবহ ঘটনা আমার জীবনে আর ঘটবে না। আর এমন ক্রোধোদ্দীপক স্থানে আমি আর কখনো দাঁড়াইনি।' এরপর রসূল (স.) বললেন, 'হিন্দ কি হামযার কোনো অংশ খেতে পেরেছে?' সবাই বললো, না। রসূল (স.) বললেন, 'হামযার দেহের কোনো অংশকে আল্লাহ তায়ালা দোযখে নিক্ষেপ করবেন না।'

ওহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে রসূল (স.) তাদের শাহাদাতের স্থানেই দাফন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মদীনার কবরস্থানে স্থানান্তর করতে নিষেধ করেছিলেন। কোনো কোনো সাহাবী অবশ্য তাদের মৃতদেরকে স্থানান্তরিত করেছিলেন। রসূল (স.)-এর ঘোষক সেই সব মৃতদেহকে পুনরায় ওহুদ ময়দানে সমাহিত করার আহ্বান জানালে তারা ওহুদ ময়দানে ফিরিয়ে আনলেন। রসূল (স.) একই কবরে দুই-তিনজন করে শহীদদেরকে সমাহিত করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, কে বেশী কোরআনের অনুগত ছিলো? লোকেরা যখন একজনকে দেখিয়ে দিতো, তাকে আগে

সমাহিত করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল হারামকে ও আমর ইবনুল জামূহকে একই কবরে সমাহিত করেন। কেননা, তারা পরস্পরকে ভালোবাসতো। তিনি বললেন, 'এরা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালোবাসতো। এদের দু'জনকে একই কবরে সমাহিত করো।'

এ হচ্ছে ওহুদ যুদ্ধের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই যুদ্ধে পাশাপাশি বিজয় আর পরাজয় দুই-ই ঘটেছে। জয় আর পরাজয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিলো কেবল ক্ষণকালের জন্যে। এটা ছিলো নেতার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের ফলশ্রুতি। এই যুদ্ধে উন্নত মূল্যবোধ আর নীচ মানসিকতা উভয়টাই সমভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ঈমান আর নেতৃত্বের ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্তও এতে স্থাপিত হয়েছে। অনুরূপভাবে মোনাফেকী আর পরাজয়ের ক্ষেত্রেও সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, তখন মুসলিম দলে ঐক্য আর সামঞ্জস্যের কিছুটা অভাব ছিলো, কোনো কোনো মুসলমানের চিন্তাধারার অস্বচ্ছতা অপরিচ্ছন্নতাও বিদ্যমান ছিলো। তবে এ জয় পরাজয় ঘটেছিলো আল্লাহর রীতি ও তাঁরই নির্ণীত তাকদীর অনুযায়ীই। মুসলমানরা এ পরণতির স্বাদ আস্বাদন করেছিলো। তাদেরকে এজন্যে বিরাট কোরবানী বরণ করতে হয়েছিলো। এ যুদ্ধের ফলে আল্লাহর রসূলের মর্যাদা শীর্ষস্থানে উপনীত হয়। সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কেরাম এটা গভীরভাবেই অনুভব করতে পেরেছেন এবং এ যুদ্ধে তারা বিপদাপদের সম্মুখীনও হয়েছেন। মূলত একটা শিক্ষা লাভের জন্যেই তাদেরকে এ চরম মূল্য আদায় করতে হয়েছিলো। এ চরম মূল্য দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করেছেন। এ দ্বারা মুসলিম জামায়াতকে আল্লাহ তায়ালা সে বিরাট অভিযানের জন্যে প্রস্তুত করেছেন যে, যার জন্যে তাদের উত্থান করা হয়েছিলো। আর তা হচ্ছে মানবতার জন্যে নেতৃত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন স্থাপন করা এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর জীবনবিধানকে প্রতিষ্ঠা করা।

কোরআনের ক্যানভাসে ওহুদ যুদ্ধের চিত্র

এখন আমরা দেখবো, কোরআন মাজীদ কিভাবে তার নিজস্ব ধারায় এ ওহুদ যুদ্ধের দৃশ্যের চিত্র অংকন করেছে।

কোরআন মজীদ তার বর্ণনা আর উপস্থাপনার জন্যে যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের অনুসরণ করে না। এক এক করে সব ঘটনা খুঁজে বের করে আনে না, বরং কোরআন মজীদ যা খুঁজে বের করে তা হচ্ছে মনের ব্যাধি, অন্তরের আকুতি। ঘটনাপ্রবাহ থেকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপকরণ গ্রহণ করে। কোরআন মজীদ ঘটনা প্রবাহকে ঐতিহাসিক ধারা বিন্যাসের পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে না; বরং কোরআন মজীদ তা উপস্থাপন করে শিক্ষা গ্রহণের মহান উদ্দেশ্যে। তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ঘটনা প্রবাহের পেছনে যেসব মূল্যবোধ লুক্কায়িত রয়েছে তাকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। মনের ওপর বিরাজমান যাবতীয় অবস্থার চিত্র অংকন করাসহ অন্যান্য মৌলিক বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই কেবল সে ঘটনা বর্ণনা করে। এ কারণে ঘটনা হয়ে পড়ে সেখানে অনুভূতি, প্রবণতা এবং পরিণতি আর ফলাফলের কেন্দ্র বিন্দু। সেখান থেকে শুরু হয় আলোচনা, আর তাকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত হয়, আবার সেখানেই তা ফিরে আসে। অতপর তা মনের গভীরে জীবনের বৃত্তে ঘুরপাক খায়। একের পর এক এ ধারার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে এবং ঘটনার শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তা গড়িয়ে চলে। এর তাৎপর্য, যুক্তিপ্রমাণ, মূল্যবোধ, মূল্যমান আর মৌলিক উপাদানের এমন এক সমাবেশ ঘটে, যার কাছে ঘটনার বর্ণনা তখন নিছক একটা মাধ্যমে পরিণত হয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার মন মানস ঘটনা প্রবাহের ক্রিয়াকান্ড তার পরিণতি অনুভব করে। ফলে তা আরো উজ্জ্বল ও পরিশীলিত হয়ে ওঠে। সে সম্পর্কে তার মনে কোনো অস্থিরতা থাকে না। কোনো উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে না। কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব সে অনুভব করে না।

মানুষ যখন যুদ্ধের মূল ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, যুদ্ধে যা ঘটেছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। অতপর সে কোরআন মজীদের মন্তব্যের বিভিন্ন দিকের প্রতি তাকিয়ে দেখে, তখন তাকে সে আরো বিস্তৃত দেখতে পায়। স্থানকালের গণ্ডি পেরিয়ে তখন তা শাশ্বত হয়ে ওঠে। সাময়িক সে ঘটনা প্রবাহের মাঝেই নিহিত থাকে মুসলিম জাতির জন্যে স্থায়ী দিকনির্দেশনা।

ঈমানের দৌলতে ধন্য চিত্তের জন্যে কোরআন মজীদ এ সারনির্যাসকেই পুঁজি করে, সেদিকে এগিয়ে চলে এবং তাকে আহরণ করে রাখে। আর যে কোনো কালে ইতিহাসের স্তরে এটা করে। যথাস্থানে আমরাও তা উপস্থাপন করবো ইনশাআল্লাহ।

কোরআন মাজীদ এ দিয়েই যুদ্ধের প্রথম দৃশ্যকে উপস্থাপন করে। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম যাদেরকে কোরআন মাজীদ সম্বোধন করে তাদের কাছে এটা ছিলো অতি পরিচিত। এভাবেই বক্তব্যের সূচনাসহ তার প্রথম দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়। এর প্রথম বিষয় হচ্ছে এই তত্ত্বটি উদঘাটন করা যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বক্ষণ তাদের সংগে রয়েছেন। তাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে যা কিছু আবর্তিত হয়, সবকিছুই আল্লাহ তায়ালা শোনেন এবং জানেন। এটা হচ্ছে তার এমন এক মৌলিক তত্ত্ব যা কোরআন মজীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে তা জাগরুক করতে চায়। এটা হচ্ছে সে মৌল তত্ত্ব, যার ওপর ইসলামের প্রশিক্ষণপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। মানবমনে এ তত্ত্ব বদ্ধমূল না হলে কোনো অন্তরই ইসলামী জীবন ধারায় দৃঢ়মূল হতে পারে না।

এখানে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘর থেকে নবী কারীম (স.)-এর ওহুদের দিন ভোর বেলা বের হওয়ার ঘটনার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। যুদ্ধের বিষয় নিয়ে পরামর্শ করার পর যুদ্ধাস্ত্র আর লৌহবর্ম পরিধান করে তিনি বের হন। মদীনার বাইরে গিয়ে মোশরেকদের সংগে মোকাবেলা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই তিনি বের হন। এরপর নবী যুদ্ধের সারী বিন্যাস করেন, শৃংখলা বিধান করেন। পর্বতের ওপরের স্থান নেয়ার জন্যে একদল তীরন্দাজ বাহিনীকে নিযুক্ত করেন।

এতো হচ্ছে এমন দৃশ্য, যা তাদের চেনা-জানা এমন এক অবস্থান, যা তারা নিজেরাই স্মরণ করতে পারে। কিন্তু তাতে যে নতুন তথ্য তা হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজেই উপস্থিত, কি চমৎকার সে দৃশ্য, সে অবস্থান, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে অবস্থানের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কেমন ভয়ভীতি সে দৃশ্যকে আচ্ছন্ন করতে পারে! তার সংগে এসে সংমিশ্রিত রয়েছে পরামর্শের ধারা বিবরণী, মন্ত্রণাসভার বিভিন্ন মত ও যুক্তি। এ সবকিছুর অন্তর্নিহিত রহস্য তো আল্লাহর কাছে জানা। মানবমুখে যা কিছু উচ্চারিত হয় মানবমনে যেসব ভাবের উদয় হয়, সবই তো তিনি জানেন, শোনেন।

এ প্রথম দৃশ্যের চিত্রায়নের পর দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে মুসলমানদের অন্তরে সৃষ্ট দুর্বলতা আর হিম্মতহারা হওয়ার। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বিদ্রোহাত্মক আচরণের পর তাদের মনে এ ভাবের উদয় হয়েছিলো। সে নিজে ছিলো এ বিদ্রোহের নায়ক। রসূলুল্লাহ (স.) তার মত গ্রহণ করেননি। এ জন্যে সে ক্রুদ্ধ হয়ে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে কেটে পড়ে। তার অভিযোগ ছিলো যে, রসূলুল্লাহ (স.) তার মত গ্রহণ না করে মদীনার যুবকদের মত গ্রহণ করেছেন। সে এ কথা খোলাখুলিই বলেছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, তার অন্তর নিষ্ঠাবান ছিলো না। এটাও বুঝা যায় যে, তার ব্যক্তিস্বার্থ তার অন্তরকে ভরে তুলেছিলো। অথচ ঈমান আনার পর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের কোনো সিদ্ধান্তের সাথে অন্য কারো ইচ্ছার অংশিদারীত্বের অবকাশ নেই। যা কিছু আদেশ করা হয় তা সরল মনে পালন করতে হবে, যা থেকে নিষেধ করা হয় তা থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে হবে।

বোখারী শরীফে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার বর্ণনামতে এ দু'টি দল ছিলো বনু হারেসা এবং বনু সালমা। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কর্মকান্ড তাদের মধ্যে প্রভাব ফেলেছিলো। এর ফলে মুসলিম শিবিরে কিছুটা কম্পন এসে গিয়েছিলো। যুদ্ধের প্রাথমিক স্তরেই তা দেখা দিয়েছে। ফলে এ দু'টি দল হিম্মতহারা দুর্বল হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কোরআন মজীদের স্পষ্ট আয়াত অনুযায়ী এ অবস্থা আল্লাহর অভিভাবকত্ব আর তার পক্ষ থেকে তাদের অন্তরকে স্থীর সুদৃঢ় করা না হলে তারা সত্যিই হিম্মতহারা হয়ে যেতো। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি যে, এ আয়াতটি আমাদের প্রসংগেই নাযিল হয়েছে। তিনি বলেন, আমরাই হচ্ছি সে দু'টি দল– বনু হারেসা আর বনু সালমার লোক। এ আয়াত নাযিল হওয়া আমাদের জন্যে আনন্দদায়ক বিষয় ছিলো না। (বোখারী মুসলিম)

এভাবেই আল্লাহ তায়ালা মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন বিষয়সমূহকে উন্মোচিত করেন, তিনি উন্মোচিত করেন এমন বিষয়সমূহকে, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই জানে না। ক্ষণিকের তরে হলেও তাদের অন্তরে সে বিষয়টির উদয় হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেন, নিজের অভিভাবকত্ব দ্বারা তিনি তাদের সাহায্য সহায়তা করেন। ফলে তারা নিজেদের জায়গায়ই বহাল থাকে। এভাবেই কোরআন যুদ্ধের দৃশ্য আর ঘটনাকে জীবন্ত করে সে মোতাবেক মনের খটকার চিত্র অংকন করে। এবার আল্লাহ তায়ালা যে তাদের সংগে রয়েছেন, সেদিকেও ইংগীত করে, মূলত স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এসব ঘটান। তিনি তাদের মনের গভীরে একটি মৌলিক তত্ত্ব বদ্ধমূল করতে চান। অতপর কিভাবে দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তাদেরকে তা জানাতে চান। দুর্বলতা যদি তাদেরকে পেয়ে বসে, তাহলে আল্লাহর সাহায্য, অভিভাবকত্ব কিভাবে লাভ করতে হয়, সেদিকে তাদের অনুভূতিকে সজাগ করতে চান। যাতে তারা জানতে পারে কোন দিকে তাদেরকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং কার আশ্রয় নিতে হবে।

তাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে বলা হয়েছে যে, সত্যিকার মোমেন হলে কেবল আল্লাহর ওপরই তাদের ভরসা করা কর্তব্য। কেননা তাদের জন্যে এ সুদৃঢ় সূত্র ব্যতীত অন্য কোনো সূত্র নেই।

এভাবে প্রথম দু'টি আয়াতে আমরা দেখতে পাই, যে আয়াত দুটিতে কোরআন মজীদ যুদ্ধের দৃশ্য উপস্থাপন করে, তাতে ইসলামী চিন্তাধারায় দু'টি প্রধান মৌলিক ব্যাখ্যা রয়েছে। এ ব্যাখ্যা ইসলামী প্রশিক্ষণের অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকে।

যদি এ দু'টি বিষয়ে আমরা তার উপযুক্ত পরিবেশে লক্ষ্য করি, তাহলে এ আয়াত দু'টো উপযুক্ত ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে তার মূল্যবান আলো বিকিরণ করে। আর এ সময় তা গ্রহণ করার জন্যে অন্তরও প্রস্তুত। এ দু'টি আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন মজীদ কিভাবে মোমেনের অন্তরকে জীবন্ত রাখে। আর এটা ঘটনা প্রবাহের ওপর আলোচনার মাধ্যমে সে করে। এতে কোরআন মজীদ ঘটনা প্রবাহের এবং অন্যান্য ঘটনার যে ব্যাখ্যা বিবরণ পেশ করে, হৃদয়ের মধ্যে সে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু অন্যান্য উৎসের বিবরণ মানব মন কিংবা মানবজীবনকে কিছুতেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে না। কোরআন মজীদের তরবিয়ত আর দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন দ্বারা মনকে উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত করা সত্যিই সহজ।

এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ের কাছাকাছি গিয়েও বিজয়লাভ করতে পারেনি। মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মতে বিশ্বাসের ওপর ব্যক্তিগত মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার ফলেই যুদ্ধের সূচনা হয়েছিলো। তার অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করে তার ব্যক্তিগত মতকে বিশ্বাসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলো। আর মুসলমানদের দু'টি সত্যনিষ্ঠ দলকেও দুর্বলতা পেয়ে বসেছিলো। অতপর গনীমতের লোভে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে সেনাপতির হুকুম অমান্য করার মধ্যে দিয়ে ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ফলে যুদ্ধের প্রথম দিকে যে উন্নত আদর্শ স্থাপিত হয়েছিলো, তা শেষ পর্যন্ত তাদের রক্ষা করতে পারেনি। এর কারণ ছিলো দলের বিচ্ছেদ আর চিন্তার বিচ্যুতি।

বিজয়ের মূল চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে

পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধের যেসব ঘটনা প্রবাহের সমাপ্তি ঘটেছিলো, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার পূর্বে তাদের আগের সে যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে, যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিলো বিজয়ের মধ্য দিয়ে। তা হচ্ছে বদর যুদ্ধ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন, দু'টো যুদ্ধের ঘটনাকে সামনে রেখে একটার সাথে আরেকটার তুলনা করা যায়। উভয়ের কার্যকারণ আর ফলাফল সম্পর্কেও চিন্তা করা যায়, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, জয় আর পরাজয় উভয়ই হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধি লিপি। এর পেছনে এমন এক রহস্য নিহিত রয়েছে, যা জয় আর পরাজয়ের পরই প্রকাশ পায়। সর্বাবস্থায়ই পরিণতিতে বিষয়টি আল্লাহর হাতে সোপর্দ হয়।

আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, বদর যুদ্ধে বিজয়ের মধ্যে একটা মোজেযা ছিলো। এর কারণে বিজয়ের জন্যে যেসব উপকরণ জরুরী ছিলো, সে সব বস্তুগত উপকরণ ছাড়াই বদরযুদ্ধে বিজয় সূচিত হয়েছে। সে যুদ্ধে মোমেন আর মোশরেকদের সংখ্যা দু'দিক সমান সমান ছিলো না। মোশরেকদের সংখ্যা ছিলো এক হাজারের কাছাকাছি। আবু সুফিয়ানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সংগে যে কাফেলা ছিলো তার সহায়তার জন্যে তারা দলবদ্ধ ভাবে বের হয়েছিলো। তারা ছিলো রসদ সম্ভার আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তারা বের হয়েছিলো বিত্ত বিভবের লোভে, আভিজাত্য রক্ষা করার মানসে। পক্ষান্তরে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো মাত্র তিনশ'র কাছাকাছি। এহেন শক্তিশালী বাহিনীর সংগে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা মদীনা থেকে বেরও হয়নি। তারা বেরিয়েছিলো একটা নিরস্ত্র বাহিনী বরং নিছক একটা কাফেলার মোকাবেলা করার জন্যে। সংখ্যা স্বল্পতা ছাড়াও তাদের অন্যান্য প্রস্তুতিও ছিলো সামান্য। তাদের সাথে ছিলো মক্কার মোশরেকরা, যাদের গোটা শক্তি ওদের পেছনে নিয়োজিত ছিলো। আরও ছিলো মোনাফেক ও ইহুদীরা। এরা সকলেই মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলো। এতো সব কিছুর পরও জাযিরাতুল আরবে কাফের-মোশরেক দুশমনদের মধ্যে তারা ছিলো মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান। তদুপরি তারা ছিলো মক্কা থেকে বিতাড়িত মোহাজের, সে পরিমন্ডলে তারা ছিলো এক অস্থিতিশীল চারা গাছের মতো।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এসব কিছু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং এতো সব কিছুর মধ্যে তাদেরকে বিজয়ী করার প্রথম কারণ বার বার উল্লেখ করেছেন।

তিনিই আল্লাহ তায়ালা, যিনি তাদেরকে বিজয়ী করেছেন এবং যে হেকমত আর রহস্যের কারণে তাদেরকে তিনি বিজয়ী করেছেন, তা-ও এসব আয়াত সমষ্টিতে উল্লেখ করেছেন। মুসলমানরা ছিলো এমন যে, তাদের নিজেদের মধ্য থেকে এবং বাইরে থেকে তাদেরকে সাহায্য করার কেউই ছিলো না। সুতরাং তাদের যদি কাউকে ভয় করতেই হয়, তবে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। তাদের উচিত তাঁকেই ভয় করা। আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন জয়-পরাজয়ের মালিক। আল্লাহ তায়ালা একা-ই শক্তি আর কর্তৃত্বের অধিপতি। আশা করা যায় যে, আল্লাহর ভয় তাদেরকে কৃতজ্ঞতার পথে পরিচালিত করবে এবং এটা তাদেরকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামতের যথাযোগ্য শোকরিয়া আদায়ের যোগ্য করে তুলবে।

বদর যুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার ঘটনা বলা হচ্ছে। অতপর যুদ্ধের দৃশ্য এক এক করে তাদের সম্মুখে তুলে ধরা হয়।

সেদিন বদরের যুদ্ধে যে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী নবীর সংগে বের হয়েছিলো, তারা বের হয়েছিলেন নিছক বাণিজ্য কাফেলার সংগে মোকাবেলা করার জন্যে, অস্ত্রশস্ত্র সমৃদ্ধ একটা বিশাল বাহিনীর সংগে মোকাবেলা করার জন্যে নয়। সেদিন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে যা জানিয়েছিলেন, আল্লাহর নবী তা-ই তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যাতে করে তাদের অন্তর এবং

পদযুগল দৃঢ় থাকে। কারণ তারা তো মানুষ ছিলেন! সাহায্যের প্রয়োজন ছিলো। তাদের চিন্তা চেতনায় তাদের অনুভূতিতেও এটার প্রয়োজন ছিলো। তেমনিভাবে রসূল (স.) তাদেরকে এ সাহায্য লাভের শর্ত সম্পর্কেও জানিয়েছিলেন এবং তা হচ্ছে সবর ও তাকওয়া। প্রতিপক্ষের আঘাত বরদাস্ত করার জন্যে প্রয়োজন সবর। জয় পরাজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর সংগে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে দরকার তাকাওয়া।

এখানে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহর হাতে সোপর্দ। সবকিছুই বলা হয়েছে মূলত এ কথাটা বোঝানোর জন্যে সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। ফেরেশতার অবতরণ তাদের অন্তরের জন্যে সুসংবাদ ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এতে অন্তর খুশী হয়, বিজয় তো তার পক্ষ থেকে সুসংবাদ হিসাবেই আসে এবং তা তারই নির্ধারিত তকদীরের সংগে যুক্ত, অন্য কোনো মাধ্যম, কোনো কারণ আর কোনো উপকরণ এতে নাই।

এভাবেই কোরআন মজীদের বাক-ধারা তাদের সবকিছুকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করার কাজে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করে। একজন মুসলমানের চিন্তাধারায় এর বিপরীত কিছু কখনো যেন স্থান না পায়। এ মূলনীতি হচ্ছে সকল ব্যাপারে আল্লাহর নিঃশর্ত ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা। কার্যকারণ আর উপায় উপকরণকে কার্যকর বিবেচনা না করে তাকে একপাশে রেখে দেয়া। কারণ তা তো নিছক উপকরণ মাত্র, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা চলে, আল্লাহর ইচ্ছায়ই তা কার্যকর হয়।

কোরআনুল করীম ইসলামী চিন্তাধারায় এ মূলনীতিটুকুই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সকল সন্দেহ-সংশয় থেকে তাকে মুক্ত ও বিশুদ্ধ করতে চায়। এমতাবস্থায় সম্পর্ক কেবল আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর বান্দাদের মধ্যেই অবশিষ্ট থেকে যায়। সমস্ত সম্পর্ক থাকে কেবল মোমেনের অন্তর এবং আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের মধ্যে। কোন রকম অন্তরায়, মাধ্যম উপকরণ ব্যাতিরেকেই।

কোরআন মজীদে বার বার এ দিকেই তাকীদ করা হয়েছে, মোমেনদের অন্তরে এক বিস্ময়কর উপায়ে এ বাস্তব তত্ত্ব বদ্ধমূল করে তোলা হয়েছে যাতে তারা জানতে পেরেছেন যে, কেবল এক আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন মুল কর্তা। উপায় উপকরণ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করতে হবে, সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে হবে– এর কারণ হলো যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার জন্যেই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। তাই তারা এই আদেশকে শিরোধার্য করে নিয়েছেন।

এ আয়াতগুলোতে বদরযুদ্ধের দৃশ্য পেশ করা হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (স.) এতে তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসবে। তবে তাদের জন্যে সাহায্যের এ ওয়াদা তখন কার্যকর হবে, যখন তারা সবর তাকওয়া আর যুদ্ধে দৃঢ়তা স্থিরতা প্রদর্শন করবে। যখন তাদের মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টি হবে তখন এই সাহায্য আসবে। অতপর তিনি তাদেরকে জয়ের মূল উৎস সম্পর্কে অবহিত করছেন , তিনি হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, সব কিছুই যার ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের সংগে যুক্ত। তার অনুমতিক্রমেই বিজয় অর্জিত হয়। তিনি হচ্ছেন আল আযীয– শক্তিধর, দোর্দন্ড প্রতাপশালী, তিনিই বিজয় দানে সক্ষম। তিনি হচ্ছেন আল হাকীম, যিনি হেকমত প্রজ্ঞা অনুপাতে সব কিছু নির্ণয় করেন। অতপর এ বিজয়ের রহস্যও বর্ণনা করা, বর্ণনা করা হয় এ বিজয়ের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। এতে পরিস্কার করে দেখানো হয় যে, এসব কার্যকরণের কোথাও কোনো মানুষের স্থান নেই।

নির্ধারিত তাকদীরকে বাস্তবায়িত করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। রসূলুল্লাহ (স.) এবং তার সংগী-সাথী মোজাহেদদের এ বিজয়ে কারোই কোনো ব্যক্তিগত হাত নেই। তারা তো কেবল কুদরতের হাতের পুতুল। তিনি তাদের দ্বারা যা খুশী তা বাস্তবায়ন করান। তারা এ বিজয়ের কার্যকারণ নয়। নয় বিজয়দাতা, তারা এ বিজয়ের স্থপতি নয়, বিজয়ের মূল প্রাণশক্তিও তারা নয়। তারা কেবল আল্লাহর নির্ণীত তাকদীর বিশেষ।

এভাবেই যুদ্ধের ময়দানে হত্যা সংঘটিত দ্বারা তিনি মাঝে মাঝে তাদের সংখ্যা হ্রাস করান। মুসলমানদের বিজয় দ্বারা তিনি তাদের ভূমি হ্রাস করান, আর ক্রোধ দ্বারা তিনি হ্রাস করান তাদের ক্ষমতা। আবার গনীমত দ্বারা তিনি তাদের সম্পদ হ্রাস করিয়ে দেন.... তাদেরকে পরাজিত-লাঞ্ছিত হিসাবে পর্যবসিত করেন। ফলে তারা ব্যর্থ বিপর্যস্ত হয়, কহর গযবে নিপতিত হয়। কারণ মুসলমানদের এই বিজয় ও সাহায্য কাফেরদের জন্যে একটা শিক্ষা বিশেষ হয়। কাফেরদের জন্যে এটা ঈমান আর আত্মসমর্পণের দিকে ধাবিত হবার উপায়। ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কুফরী থেকে তাওবা কবুল করা হয় অথবা তাদের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করে বা তাদেরকে বন্দী করে তাদের শাস্তি দান করেন। এটা হচ্ছে তাদের কুফরীর যুলুমের শাস্তি। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা যুলুমের শাস্তি, সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণের মাধ্যমে কৃত যুলুমের শাস্তি। যে অবস্থায়ই হোক এটা একমাত্র আল্লাহর হেকমত। তাতে কোনো মানুষের হাত নেই। এমন কি আল্লাহর নবীরও নয়। এখানে বিজয় কেবল আল্লাহর ইচ্ছায়ই নির্ধারিত হয়। তার মর্যাদা হচ্ছে উলুহিয়্যাতের, যা একক যাতে অন্য কেউ শরীক নেই।

এর কারণে মুসলমানরা নিজেদের ব্যক্তিস্বত্ত্বাকেও এ বিজয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, দূরে সরিয়ে রাখেন বিজয়ের কার্যকারণ আর ফলাফল থেকেও। ফলে বিজয়ীদের অন্তরে যে গর্ব অহমিকা জেগে ওঠে, তা থেকে দূরে থাকেন, কেননা তারা জানেন এ সাফল্যে তাদের কোনো হাত নেই। শুরুতে এবং শেষে সব কিছুতেই আল্লাহর হাত রয়েছে। এর ফলে অনুগত এবং অবাধ্য সকল মানুষের ব্যাপার একমাত্র আল্লাহর হাতেই ন্যস্ত হয়। এটা কেবল আল্লাহরই শান। এটা হচ্ছে ইসলামী দাওয়াতের শান। এক্ষেত্রে অনুগত আর অবাধ্য সবাই এক সমান। নবী কারীম (স.) এবং তাঁর সংগে ঈমানদারদের নিজেদের ভূমিকা পালন করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই। এরপর ফলাফল থেকে তাদেরকে হাত ঝেড়ে ফেলতে হবে। অবশ্যই তাদের নিষ্ঠার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা প্রতিদান পাবে। প্রতিদান পাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্যে।

এখানে তাদেরকে একথা বলে দেয়ার জন্যে এটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিদ্ধান্তে আমাদের কারো কোনো হাত নেই। হাত নেই বিজয় আর পরাজয়েও। মানুষের কাছ থেকে কেবল আনুগত্য, দায়িত্ব পালনই একমাত্র কাম্য। এরপর সব কিছুই আল্লাহর হাতে ন্যস্ত থাকবে। এমনকি আল্লাহর নবীরও সে ব্যাপারে নেই কোনো হাত। ইসলামী চিন্তা-ধারার এটাই হচ্ছে মূলতত্ত্ব। মনেপ্রাণে এ তত্ত্ব স্বীকার করে নেয়াটা ইসলামী আকীদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

বদর যুদ্ধের কথা দিয়ে এ সমাপ্তি টানা হচ্ছে। চিন্তা-চেতনায় এ মূল তত্ত্বটিকে বদ্ধমূল করা হচ্ছে। জয় পরাজয় সবই নির্ভর করে আল্লাহর হেকমত আর তারই নির্ধারিত তাকদীরের ওপর। এই বড় সত্যটি অন্তরে বদ্ধমূল করার মধ্য দিয়ে এ প্রসংগের ইতি টানা হচ্ছে। গোটা বিশ্বের সমস্ত ব্যাপারই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং তা তিনি সম্পূর্ণ তার নিজের একক ইচ্ছা অনুযায়ী করেন।

আল্লাহর ইচ্ছে হচ্ছে চূড়ান্ত ইচ্ছা। নিঃশর্ত মালিকানা আর সার্বভৌমত্ব তাঁর। আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে, সব কিছুতেই তিনি তাঁর এ সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করেন। সেখানে কোনো যুলুম নেই, নেই বান্দাদের কোনো হক মারার নিয়ম, ক্ষমায়ও নয়, শাস্তিতেও নয়। এখানে সকল কাজ হেকমাত আর সুবিচারের ভিত্তিতেই সম্পাদন করা হয়, আল্লাহর মহান মর্যাদা রহমত আর মাগফেরাতের নীতি অনুযায়ী তা চলে। বান্দাদের জন্যে তার দরজা খোলা রয়েছে। যাতে বান্দারা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর মাগফেরাত আর রহমত লাভ করতে পারে। তবে সমস্ত ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে ন্যস্ত থাকবে তাঁর হাতে।

চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রসংগে কোরআনের বক্তব্য

সূরা আলে ইমরানের ১৩০ আয়াত থেকে ১৮৯ আয়াত পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধ পর্যায়ে এই আলোচনা উপস্থাপন করা এবং সে যুদ্ধের প্রবাহ সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে একটি বড় যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। এ বড় যুদ্ধ হলো মনের গভীরে ঈমান আকিদা গেঁথে দেয়ার যুদ্ধ এবং তা সত্যিকার অর্থে আমাদের গোটা জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

এবার সুদ এবং সুদী কাজ কারবার, আল্লাহর ভয়, তাঁর রসূলের আনুগত্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচনা করা হচ্ছে, সচ্ছলতা এবং অভাব অনটনের সময় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্পর্কে। বলা হচ্ছে অভিশপ্ত সুদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতে সহযোগিতামূলক ও সুষম অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে। রাগ গোসসা হযম করে মানুষকে ক্ষমা করা এং সমাজে সুকৃতির বিস্তৃতি ঘটানো সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে। সর্বোপরি পাপ তাপ, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং পাপের পুনরাবৃত্তি না করা সম্পর্কেও এখানে তাদের সাবধান করা হচ্ছে,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খাবে না এবং আল্লাহকে ভয় করে চলবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারে ....।' (আয়াত ১৩০-৩২)

যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করার আগে এ কথাগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইসলামী জীবনবিধানের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংগীত করার জন্যেই। ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবে প্রয়োগের সাথে এটা খুবই প্রযোজ্য। মানবীয় প্রকৃতির সংগেও তা পূর্ণ সাঞ্জস্যশীল। মানবপ্রকৃতির সমুদয় আচরণের সংগেও তা যথাযথ সামঞ্জস্যশীল। মানবপ্রকৃতির সমুদয় আচরণকে তা একই বৃত্তে কেন্দ্রীভূত করে। আর সেই মূল কথাটি হচ্ছে এই যে, এবাদাত হবে কেবল আল্লাহর জন্যে। দাসত্ব হবে কেবল তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সকল ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। আল্লাহপ্রদর্শিত জীবনবিধানেও এই ঐক্য ও ব্যাপকতা রয়েছে। সর্বাবস্থায় তাঁকে মানবপ্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। মানবপ্রকৃতির সকল অবস্থা আর সকল দিক ও বিভাগকেই তা পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। অতপর এসব ব্যাখ্যা সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনের বিচিত্র ধরনের কর্মকান্ড এবং সকল চেষ্টা-সাধনার চূড়ান্ত পরীক্ষাতেও যে এ সামঞ্জস্যের ক্রিয়া কার্যকর রয়েছে সেদিকেও তা ইংগীত করে। ইতিপূর্বে আমরা একথা উল্লেখ করেছি।

ইসলামী জীবনবিধান মূলত এর সমুদয় বিষয়কেই আয়ত্তাধীন করে নেয়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর গোটা জীবনকে সুশৃংখল করে। এ কারণে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের সাথে মানুষের মনমানসে শুচিতা আর পরিচ্ছন্নতার প্রতিও তা দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। লোভ লালসা আর কামনা বাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্যে মানুষকে নির্দেশ দেয়। পরস্পর ভালোবাসা আর সৌজন্যে প্রকাশ ঘটাতে বলে। এসব দিকের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে এবং এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হৃদয়ংগম করলে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, মুসলিম জামায়াতের গোটা জীবনের সংগে তার গভীর সংযোগ রয়েছে।

'হে ঈমানদাররা! চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাবে না.... তোমাদের ওপর রহম করা হয়।'

'ফী যিলালিল কোরআন'-এর তৃতীয় পারার তাফসীরে সুদ এবং সুদী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অবশ্য চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সম্পর্কে এখানে কিছুটা আলোকপাত করবো। কারণ অধুনা কিছু কিছু লোক এ বিধানকে কদর্য করার চেষ্টা করছে। তারা বলে, নিষিদ্ধ তো হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ। শতকরা পাঁচ টাকা, সাত টাকা বা নয় টাকা হারে সুদ নেয়া তো চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ নয়। সুতরাং তা এ হারামের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এ প্রসংগে আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ মূলত বাস্তব অবস্থার একটা বিবরণ মাত্র। তা এমন কোনো শর্ত নয়, যার সংগে নির্দেশটিকে

সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সূরা বাকারার আয়াত সুদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ। সেখানে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। কোনো সীমাও নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে, 'যে সুদ অবশিষ্ট রয়েছে, তোমরা তা পরিত্যাগ করো, তা যাই কিছু হোক না কেন।'

অতপর আমরা এ সম্পর্কে বলতে চাই যে, তৎকালে 'জাযিরাতুল আরব'-এ যেসব সুদী কর্মকান্ড চালু ছিলো, বাস্তবে এটা তার কোনো ঐতিহাসিক পরিচয় নয়। সেখানে কেবল তা নিষিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য ছিলো না। এটা ছিলো চাপিয়ে দেয়া সুদী অর্থব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, মুনাফার মূল্যে তার পরিমাণ যাই হোক না কেন। আর সুদী ব্যবস্থার অর্থ হচ্ছে, এ নিয়মে গোটা সম্পদের আবর্তন ক্ষুন্ন করা। আর এর অর্থ হচ্ছে, সুদী কর্মকান্ড কেবল মৌলিক এবং যৌগিকই নয়, তা হচ্ছে এমন কর্মকান্ড যা একদিক থেকেই বারবার করা হতে থাকে আবার অন্যদিক থেকে তা যৌগিকও। সময়ের আবর্তনে তা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে। যৌগিকভাবে তা যে বারবার ঘটে থাকে, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সুদী অর্থব্যবস্থায় স্বভাবতই এ গুণটি সর্বদা বিদ্যমান থাকে। তৎকালে জাযিরাতুল আরবে প্রচলিত ব্যবস্থার এ ছিলো অনিবার্য বৈশিষ্ট্য, আর এই ব্যবস্থা মনস্তাত্বিক এবং নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে ছাড়ে। তৃতীয় পারার তাফসীরে এ সম্পর্ক আমরা একথাও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি যে, মানুষের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনকে বিপর্যস্ত করাই হচ্ছে সুদী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এভাবে গোটা জাতির জীবনের সংগে সুদের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গোটা জাতির জীবনে সুদের প্রতিক্রিয়াও পরিষ্কার হয়ে যায়।

ইসলাম হচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের চালিকা শক্তি। ইসলাম চায় যে, মানুষের মনস্তাত্বিক জীবন সুস্থ, পরিচ্ছন্ন হোক। সাথে সাথে মানুষের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন স্বচ্ছ ও নিরাপদ হয়ে উঠুক। মুসলিম মিল্লাত এ উভয়বিধ দর্শনের সংঘাতের পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তা তো সবারই জানা সুতরাং যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্যের পটভূমিতে সুদ খাওয়া থেকে বারণ করা এমন একটা বিষয়, যার ফলে ইসলামের সুষম জীবনবিধানে তার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সুদ নিষিদ্ধ করার পর আল্লাহকে ভয় করে চলার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা করা হয়েছে পুরোপুরি সাফল্য লাভের আশায়। তেমনিভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, জাহান্নামকেও আগুনকে ভয় করে চলার, কেননা তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্যে, এ দু'টি বিষয়ের ওপর যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার অর্থ খুব পরিষ্কার আর তাই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে উপযুক্ত মন্তব্য। যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে, ভয় করে আগুনকে, যে আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্যে, সে তো সুদ খেতেই পারে না। সে ব্যক্তিও সুদ খেতে পারে না, সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং যে কাফেরদের দলভুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখে।

ঈমান শুধু মুখে উচ্চারণের বাক্য নয়। ঈমান হচ্ছে আল্লাহর জীবনবিধানের অনুসরণ করা, যে জীবনবিধানকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর বাস্তব জীবনে সে বিশ্বাস বাস্তবায়নের জন্যে তিনি ঈমানকে করেছেন তার ভূমিকা স্বরূপ। ঈমানের দাবী অনুযায়ী সমাজজীবন গঠন করাই হচ্ছে মুসলমানের পরিচয়।

ঈমান আর সুদী অর্থব্যবস্থা এক স্থানে সমবেত হবে– এটা অসম্ভব। যখন কোথাও সুদী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন সেখান থেকে ইসলামী জীবনবিধান সম্পূর্ণ বিদায় নেবে। সেখানে আগুন দেখা দেবে, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্যে। এক্ষেত্রে বিবাদ বিসংবাদ আর বিতর্ক কোনো কাজে আসবে না। বিরোধ আর দ্বিমতও কোনো কাজে লাগবে না।

মুসলমানদের চিন্তাধারায় এ সঠিক ধারণাটি বদ্ধমূল করার জন্যে এ আয়াতগুলোতে সুদ খেতে বারণ করা এবং আল্লাহর ভয় পোষণ করা ও কাফেরদের জন্যে নির্ধারিত আগুন থেকে দূরে থাকার কথা এক সংগে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে সুদ বর্জন এবং আল্লাহর ভয় অবলম্বন

দ্বারা কল্যাণ লাভের আশা করা যায়। আর এ কল্যাণ হচ্ছে আল্লাহভীতির স্বাভাবিক পরিণতি। মানবজীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করার জন্যেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মানবসমাজে সুদের ক্রিয়া সম্পর্কে তৃতীয় পারায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে সে আলোচনা দেখে নেয়া যেতে পারে। কল্যাণের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করার জন্যেও সে আলোচনা জরুরী। বিনাশী সুদী অর্থব্যবস্থা বর্জনের সংগে তার যে সম্পর্ক, তাও সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

অতপর চূড়ান্ত তাকীদ দিয়ে বলা হয়েছে, 'তোমরা আনুগত্য করবে আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের। এতে তোমাদের প্রতি রহম করা হবে'।

এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের আনুগত্যের সাধারণ নির্দেশ। আর এ সাধারণ আনুগত্যের সংগে দয়া বা রহমতকে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সুদ থেকে বিরত থাকার নির্দেশের পর তার এ উল্লেখ করার বিশেষ তাৎপর্য হলো, সুদী অর্থ ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে আল্লাহ তায়ালা এবং রসূলের আনুগত্য থাকতে পারে না। এভাবে সুদ নিষিদ্ধ করার পর একথার উল্লেখ করার মধ্যে এর প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যুদ্ধসংক্রান্ত যেসব বিষয়ে রসূলের নির্দেশ অমান্য করা হয় এবং সেখানে আল্লাহ তায়ালা ও রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়, সেখানেও এ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। এ হচ্ছে তারও উর্ধে এক বিশেষ সম্পর্ক। এটাকে কল্যাণ লাভের উপায় বলা হয়েছে এর মধ্যে আবার রয়েছে আশার আলো।

মোত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ও সামাজিক জীবনে এর প্রভাব

সূরা বাকারায় তৃতীয় পারায় সুদ এবং মুনাফা সম্পর্কে একই সংগে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উভয়ের মধ্যে রয়েছে দুই বিপরীতধর্মী সামাজিক সম্পর্ক। সুদী অর্থব্যবস্থা আর সহযোগিতামূলক অর্থব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে স্পষ্ট বিপরীতধর্মী দিক। ঠিক অনুরূপ এখানেও আমরা দেখতে পাই, সুদ আর সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার কথা এক সংগে বলা হয়েছে। সুদ খাওয়া থেকে বারণ করা এবং কাফেরদের জন্যে প্রস্তুতকৃত আগুন থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। পরেই তাকওয়ার কথা বলার আহ্বান জানানো হয়েছে। এটা রহমত আর কল্যাণ লাভের আশায় উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে মাগফেরাত এবং জান্নাতের প্রতি ধাবিত হওয়ার– যে জান্নাতের প্রশস্ততা, বিস্তৃতি আসমান যমীনের মতো। যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মোত্তাকী তথা আল্লাহভীরু ব্যক্তিদের জন্যে। অতপর মোত্তাকীদের প্রথম গুণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে,

'যারা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে সচ্ছলতা অসচ্ছলতা উভয় অবস্থার মধ্যে।'

যারা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খায় না, এরা হচ্ছে তাদের বিপরীত দল। অতপর তার অন্যান্য গুণ ও দিকের আলোচনা করা হয়েছে,

'আর তোমরা ছুটে যাও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা আর জান্নাতের দিকে, যার সীমা প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান-যমীন– ....।' (আয়াত ১৩৩-৩৫)

এখানে বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে এসব আনুগত্যকে এমনভাবে চিত্রিত করা যায় যে, মানবমন তা অনুভব করতে পারে। বর্ণনাধারায় তার এমন চিত্র অংকন করা হয়েছে, যা কোনো লক্ষ্য পানে বা এমন পুরস্কারের দিকে ধাবিত হয়, যে পুরস্কার পরকালেই লাভ করা যাবে। তোমরা ছুটে যাও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা আর জান্নাত পানে, যে জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান-যমীন সমতুল্য। তোমরা ছুটে যাও। সেখানে রয়েছে ক্ষমা আর জান্নাত, যে জান্নাত প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মোত্তাকীদের জন্যে। অতপর মোত্তাকীদের গুণাবলীর উল্লেখ করে বলা হয়েছে,..... যারা ব্যয় করে, সচ্ছলতা আর অভাব অনটন তাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। সচ্ছলতা তাদেরকে এতোটা উৎফুল্ল করে না যে, তারা সব কিছু বিসর্জন দেবে

আর অভাব অনটন তাদেরকে এতোটা বাধ্য করে না যে, তারা সব কিছু ভুলে বসবে, বরং কর্তব্য সম্পর্কে তারা সর্বদা সচেতন থাকে। তারা সব সময় লোভ লালসা থেকে মুক্ত থাকে।

তারা সদা আল্লাহর ধ্যানে থাকে। সব সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। অর্থের প্রতি আকর্ষণ আর ভালোবাসা মানবমনকে স্বাভাবিকভাবেই লোভাতুর করে তোলে। এটাই মনকে বৈধ যে কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন উদ্বুদ্ধ করে। অর্থের লোভ অন্য লালসার চেয়েও শক্তিশালী। কোনো মানুষ লোভের বস্তু ছাড়া মনকে আল্লাহর রাস্তায় সদা ব্যয় করায় প্রস্তুত রাখতে পারে না। লোভের প্রকোপ আর লালসার চাপ হচ্ছে 'তাকওয়া' বিনাশী। এটা হচ্ছে এক সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতি। এটা অন্তর দিয়েই অনুভব করার বিষয়। আর এ অনুভূতিই মানুষকে দুনিয়ার মোহ বিলাসের বন্ধন আর বেষ্টনী থেকে মুক্ত করতে পারে। সম্ভবত এ গুণটির উল্লেখ করার মধ্যেই যুদ্ধের পরিবেশের সংগে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধ প্রসংগে ব্যয় করার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে আমরা এটাও দেখতে পাই যে, ব্যয়ে বাধা দানকারীদেরকেও বারবার সাবধান করা হয়েছে। এতে যুদ্ধের পরিবেশের সংগেও এক বিশেষ সম্পর্কের ইংগীত পাওয়া যায়, পাওয়া যায় আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী কোনো কোনো দলের অবস্থানের প্রতিও। এ থেকে এই ইংগীতও পাওয়া যায় যে, তারা রাগকে হযম করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে।

রাগ-গোস্সার প্রতিক্রিয়া একটি স্বাভাবিক মানবীয় কর্ম। এতে মানুষের রক্ত টগবগ করে। এটা হচ্ছে মানবীয় গঠন-প্রকৃতির অন্যতম উপাদান। এটা মানুষের অন্যতম প্রয়োজনও বটে। তাকওয়া থেকে উৎসারিত সূক্ষ্ম অনুভূতি ছাড়া মানুষ রাগ গোস্সা দমন করতে পারে না। মানুষ বিস্তৃত একটা 'রূহানী' শক্তি ছাড়া মানুষ এই রাগ হযম করতে সক্ষম হয় না। রাগ হযম করা হচ্ছে একটা প্রথম পর্যায়ের কাজ। কেবল এ পর্যায়টুকুই যথেষ্ট নয়।

মানুষ কখনো রাগ হযম করে। কিন্তু মনে মনে তখন তার রাগ আরো মারাত্মক বিষয়ের দিকে মোড় নেয় এবং বাহ্যিক রাগ শেষে শত্রুতায় রূপান্তরিত হয়। অন্তরে অন্তরে শত্রুতা পোষণ করার চেয়ে রাগ গোসসা প্রকাশ করা অনেক ভালো। এ কারণে কোরআন মজীদে বারবার রাগ হযম করার কথা বলা হয়েছে। মোত্তাকী ব্যক্তিরা অন্তরে এ রাগ হযম করে। আর রাগ হযম করার অপর নাম হচ্ছে, ক্ষমা, দয়া, উদারতা এবং ভদ্রতা। রাগ হযম করা মানুষের জন্যে বেশ কঠিন। তার মনে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে অগ্নিশিখা। কিন্তু এরপরই তার মন ক্ষমা করে দেয়। অন্তর থেকে সে যখন তা মুছে ফেলে, তখন তার মন সে ভার থেকে মুক্ত হয়। তখন তার মনকে আলোর আভা ঘিরে ফেলে। শীতল পরশ অন্তরকে আচ্ছন্ন করে। মনেও শান্তি বিরাজ করে।

আল্লাহ তায়ালা নেককারদের ভালোবাসেন। 'যারা সচ্ছলতা-অসচ্ছলতায় দান করে, তারা হচ্ছে মোহসেন তথা নেককার। আর রাগ হযম করার পর যারা ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শন করে, তারা মোহসেন তথা সৎকর্মশীল। আর আল্লাহ তায়ালা মোহসেনদেরকে ভালোবাসেন। এখানে যে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে, তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এক আলোকস্তম্ভ হিসাবে, যা অন্তর থেকে উৎসারিত হয়। এক স্বচ্ছ আলোকময় সূক্ষ্ম পরিবেশের সংগে তার সাযুজ্য ও সাদৃশ্য রয়েছে। মোহসেনদের জন্যে আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বন্ধু-বান্ধবদের জন্যেও অন্তরে ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এটা নিছক সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাই নয়, বরং এ হচ্ছে ব্যাখ্যার উর্ধে এক বাস্তব সত্য। আল্লাহ তায়ালা যে দলকে ভালোবাসেন এবং যে দল আল্লাহকে ভালোবাসে, আর যে দলের মধ্যে ভদ্রতা উদারতা ও হিংসা বিদ্বেষ থেকে মুক্তি বিস্তার লাভ করে, তারাই পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ একটা সুসংহত দল, একটা শক্তিশালী দল। এ কারণে কোরআন মজীদের বাচনভংগীতে যুদ্ধের ময়দান আর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এ সম্পর্ককে একাকার করে উপস্থাপন করা হয়েছে। অতপর মোত্তাকীদের অন্যান্য গুণাবলীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে,

'এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে হঠকারিতা প্রদর্শন করে না ..... ।'

ইসলাম কতই না উদার ধর্ম, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে উদারতার প্রতি আহ্বান জানানোর আগে তিনি নিজেদের উদারতার দিকগুলো মানুষের সামনে উদ্ভাসিত করে তোলেন। যাতে মানুষ সে জন্যে আগ্রহী হয় এবং তা থেকে আলো গ্রহণ করতে পারে। মোত্তাকী হচ্ছে মোমেনদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত মানুষ। ইসলামের উদারতা এবং তার দয়া অনুগ্রহ, মানুষের প্রতি ইসলামের ভালোবাসা তাদেরকে মোত্তাকীদের পর্যায়ভুক্ত করে।

'তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে, কিংবা নিজেদের প্রতি কোনো যুলুম করে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে।'

অশ্লীল কাজ হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে বড় পাপ। কিন্তু ইসলাম ধর্মের উদারতা হচ্ছে এই যে, যারা পাপের প্রতি ধাবিত হয়, সাথে সাথেই তাদেরকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া হয় না। বরং তাদেরকেও একটা শর্ত সাপেক্ষে মোত্তাকীদের উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন। এ শর্ত ইসলামের প্রকৃতি উন্মোচিত করে তোলে। তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করে। পাপকে পাপ জেনে তারা সে জন্যে হঠকারিতা করে না, বারবার পাপের পুনরাবৃত্তি করে না। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে তারা পাপ-তাপ অপরাধ-অবাধ্যতার কাজে জড়ায় না। অন্য কথায় পরিশেষে তারা আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করে। ফলে তারা আল্লাহর সীমার মধ্যে থাকে, তাঁর ক্ষমা দয়া এবং অনুগ্রহের পরিমন্ডলে হয় তাদের অবস্থান।

ইসলাম মানুষের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত আছে। ইসলাম জানে যে, দেহের ভার কখনো কখনো মানুষকে অশ্লীলতার নিম্নস্তরে নিয়ে যায়। রক্ত মাংসের উত্তেজনার কুপ্রভাবে কখনো সে পশুর স্তরেও নেমে যায়। পশুর মতোই তখন সে আচরণ করে। লোভ লালসা আর কামনা বাসনা তাকে আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের পথে নিয়ে যায়। ইসলাম মানুষের এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানে। তাই সে তার ওপর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনো কঠোরতা আরোপ করে না। মানুষ যখন নিজের ওপর যুলুম করে, তখন তাকে আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে না। মানুষ যখন অশ্লীল কাজ করে, সে যখন বড় নাফরমানী তথা কবীরা গুনাহও করে, তখন তাড়াহুড়া করে তাকে আল্লাহর রহমত থেকে নির্বাসিত করা হয় না। তার জন্যে এটাই খুশীর বিষয় ঈমানের স্ফুলিংগ তার অন্তরে অম্লান আছে, যা কখনো নির্বাপিত হওয়ার নয়। ঈমানের সজীবতা তার অন্তরে জাগরূক রয়েছে, যা কখনো ম্লান হওয়ার নয়। আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, তাঁর এমন অনেক বান্দা আছে, যে অপরাধ করবে আর তার পালনকর্তা আছেন, যিনি তাকে ক্ষমা করবেন। তখন এ পাপী-তাপী, অপরাধী-দুর্বল সৃষ্টি সর্বদা কল্পনাভিসারী হিসাবে টিকে থাকে। সে এমন এক পথের যাত্রী যার কোনো শেষ নেই। সে এমন এক রজ্জু ধারণ করেছে, যা কখনো ছিঁড়বার নয়। দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে সে সাময়িক পদস্খলিত হবে কিন্তু চিরতরে হারিয়ে যাবে না। যতোক্ষণ সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে এবং আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করে নেবে, সর্বোপরি ততক্ষণ সে আল্লাহর সংগে সম্পৃক্ত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তার এই দুর্বল গোমরাহ বান্দার জন্যে তাওবার দরজা বন্ধ করেন না। আর তাকে ময়দানে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতেও ছেড়ে দেন না। তাকে ছেড়ে দেন না বিতাড়িত অবস্থায়। কারণ সে আশ্রয়স্থল সম্পর্কে থাকে সন্ত্রস্ত।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে ক্ষমার আশ্বাস দেন। তাকে সঠিক পথের সন্ধান দেন। নিজে বান্দার কম্পমান হস্তকে ধারণ করেন। তার স্খলিত পদযুগলকে পুনরায় সংস্থাপিত করেন। তার

জন্যে পথকে সঠিক উজ্জ্বল করে তোলেন, যাতে সে নিরাপদ আশ্রয় ফিরে পেতে পারে এবং নিরাপদ হেফাযতে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বান্দার কাছে একটা জিনিসই দাবী করেন, তা হচ্ছে এই যে, তার অন্তর কখনো আল্লাহ বিমুখ হবে না, কালিমালিপ্ত হবে না, আল্লাহকে সে ভুলে যাবে না। যতোক্ষণ সে আল্লাহকে স্মরণ করবে, ততোক্ষণ তার অন্তর নতুন আলোতে উদ্ভাসিত হতে থাকবে। সে নতুনভাবে এক নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে।

আপনার যে সন্তানটি অপরাধ করে এবং যে সন্তান জানে যে, এই ঘরে চাবুক রয়েছে, সে হয়ত বারবার পলায়ন করবে। পলায়ন করে সর্বদা সে ঘরের বইরেই থাকবে। কিন্তু সে যদি জানে যে, চাবুকের সংগে সংগে দয়ার প্রশস্ত হাতও সেখানে রয়েছে। অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইলে তার ক্ষমা মঞ্জুর করা হবে। তখন সে সন্তান অবশ্যই গৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।

ইসলাম মানুষকে যেভাবে গড়ে তুলতে চায়

মানুষের সংগে ইসলাম তেমন আচরণই করে যেমনটি করলে তার সার্বিক কল্যাণ হয়। ইসলাম একথা জানে যে, মানুষের কিছু দুর্বল দিক এবং তার কিছু শক্তিও রয়েছে। তার মধ্যে পাশবিক বৃত্তির সংগে প্রেরণাও রয়েছে। তাই দুর্বল মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি করুণা করেন। তিনি তাকে হাত ধরে উর্ধ সিড়ির পানে নিয়ে যান। পদস্খলনের মুহূর্তে তিনি তার প্রতি দয়াবান হন, যাতে নতুন করে তাকে তিনি ওপরের দিকে নিয়ে যেতে পারেন। যতোক্ষণ সে আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাঁকে বিস্মৃত করা হবে না, অপরাধকে অপরাধ জেনে তাতে সে যদি হঠকারিতা না করে, অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করে, তবে আল্লাহ তায়ালা এতো মহান যে, যদি সে এক দিনে সত্তর দফা পুনরাবৃত্তি করে থাকে তবু আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করেন।(১)

ইসলাম কিন্তু এ দ্বারা আবার তাকে ঢিলেমির দিকে আহ্বান জানায় না। নিচে নেমে যাওয়া পদস্খলনকারী কোন ব্যক্তির মর্যাদাও এতে বৃদ্ধি করে না। অপরাধীর জন্যে অপরাধকে কখনও সুশোভিত করে দেখায় না– যেমনটি করে আজকাল নানা ধর্মের নামে নানা গোষ্ঠী। ইসলাম তো কেবল দুর্বলের পদস্খলনকে সামান্য করে দেখায় মাত্র। সঠিক পথে ফিরে আসার জন্যে মানবমনে একটা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করার জন্যে এটা একান্ত জরুরী।

ইসলাম মানুষের মনে লজ্জাশীলতা সৃষ্টি করে, আর ক্ষমা তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। তিনি ছাড়া মানুষের গুনাহসমূহকে আর কে ক্ষমা করতে পারে? ক্ষমাভিক্ষা তাকে লজ্জিত করে– কিন্তু লোভাতুর করে না। মাগফেরাত তাকে ক্ষমাভিক্ষার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে, বেপরোয়া হতে বলে না। অবশ্য যারা বারবার অপরাধ করে চলে, তারা আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হয়, এই জঘন্য হঠকারীতার কারণে কেয়ামতের দিনে তাদের চেহারা কালিমালিপ্ত করা হবে।

ইসলাম এভাবে মানবতাকে অনেক উর্ধলোকে নিয়ে যায়। মানবতাকে রহমতের দিকে ডাক দেয়। কারণ, মানুষের শক্তি সম্পর্কে ইসলাম ভালো করেই জানে। ইসলাম মানুষের সামনে আশার দ্বার সদা উন্মুখ রাখে, ইসলাম মানুষের মমতার সাথে হাত ধরে তাকে শক্তির উচ্চতম শিখরে নিয়ে যেতে চায়। হাঁ প্রশ্ন হচ্ছে এসব মোত্তাকীরা সেখানে গিয়ে কী পাবে? কী রয়েছে তাদের জন্যে? এদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার এবং মাগফেরাত। আরো রয়েছে এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। যারা ভালো কাজ করে তাদের প্রতিদান কতোইনা চমৎকার, ক্ষমা ভিক্ষা সত্ত্বেও তারা কিন্তু অপরাধের নাফরমানী থেকে মুক্ত নয়। যেসব লোক সচ্ছলতা-অসচ্ছলতায়ও

(১) আবু দাউদ, তিরমিযী এবং বায্যার হযরত ওসমান ইবনে ওয়াকেহ-এর সম্বন্ধে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদে একজন সাহাবী অজ্ঞাত রয়েছেন। কিন্তু ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরে এটিকে সহী হাদীস বলেছেন। তাঁর মতে এটি হচ্ছে 'হাসান'।

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। তারা রাগ হযম করা থেকে এবং মানুষকে ক্ষমা করার মতো উদার গুণাবলীর সীমা থেকেও বাইরে নয়।

তারা তো কেবল তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনকারী কতিপয় ব্যক্তি মাত্র। 'আর যারা নেক কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে কতোইনা চমৎকার প্রতিদান।'

তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ঘোষিত এ ক্ষমা ও ভালোবাসার পর তাদের জন্যে রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে দিয়ে নহরধারা প্রবহমান। যেখানে মনের গহীনে কর্মের অবস্থান রয়েছে। সেখানে বাহ্যিক জীবনে কর্মের প্রচুর তাগদাও রয়েছে।(২)

সেখানে ময়দানের যুদ্ধের সাথে এর একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে, যে সম্পর্কে একটু পরে আলোচনা করা হচ্ছে। যেমন মুসলিম জামায়াতের ওপর সুদী অর্থব্যবস্থা অথবা সহযোগিতামূলক অর্থব্যবস্থার ভীষণ একটা প্রভাব রয়েছে। আমরা শুরুতে এর কিছু বিষয়ের প্রতি ইংগীত করেছি। সুতরাং লোভ-লালসার ওপর জয়ী হওয়া, রাগ-গোস্সার ওপর জয়ী হওয়া, অপরাধের ওপর জয়ী হওয়া, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অন্বেষন করা– যুদ্ধক্ষেত্রে দুশমনের ওপর জয়ী হওয়ার জন্যে নেহায়াত জরুরী। ময়দানের যুদ্ধে এজয়ের জন্যে এর সব কয়টি গুণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মানবরূপী এই দুশমনদের মতো লোভ লালসাও মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। কেননা, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা হচ্ছে অপরাধ-পাপাচারের উৎস। তারা আল্লাহর জীবন বিধানের আনুগত্য করতে চায় না। এ জন্যেই তাদের সাথে মোমেনদের এই দুশমনী করে এবং মোমেনদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। এজন্যেই তো যুদ্ধ, সংঘাত-সংঘর্ষ আর এজন্যেই তো জেহাদ। সেখানে অন্য কোনো কারণ নেই, যে জন্যে একজন ব্যক্তি শত্রুতা পোষণ করবে, যুদ্ধ করবে জেহাদ করবে। একজন মুসলমান যদি কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে তাও করবে আল্লাহ তায়ালার জন্যে, যেদিন যুদ্ধ করে তাও করবে আল্লাহর জন্যে, জেহাদ করে তা-ও আল্লাহর জন্যে। এসব কার্যকারণ এবং এ পর্যায়ে যুদ্ধের আলোচনা উপস্থাপন করার মধ্যে গভীর একটা সম্পর্ক রয়েছে। যেমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে তার নিজের এবং যুদ্ধের বিশেষ কর্মকান্ডের সাথে।

এসব কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে রসূল (স.)-এর নির্দেশের অমান্য করা। গনীমতের মালের প্রতি লোভ-লালসা থেকেও এটা এই প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। নিজেদেরকে এবং নিজেদের ইচ্ছা অভিপ্রায়কে মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করা থেকেও এটা সৃষ্টি হতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার সংগী সাথীদের বিরুদ্ধাচরণ এবং নিজেদের অপরাধকে ছোটো করে দেখা থেকেই পশ্চাদপসরণকারীদের মাঝে বিরুদ্ধাচরণ সৃষ্টি হয়ে ছিলো। আয়াতে এ বিষয়টি পরে আলোচনা করা হয়েছে। এতে মোমেনের সব বিষয়কে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে না দেয়ার এক প্রবণতা জন্ম হয়েছে। এ থেকেই কারো কারো মনে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে যে 'আমাদের কি নির্দেশ দেয়ার কোনো অধিকার নেই? থাকলে আমাদেরকে এখানে মরতে হতো না।'

কোরআন এক এক করে এসব বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে এবং আসল সত্য বিবৃত করেছে। মানবমনকে তা এমন সুক্ষ্মভাবে স্পর্শ করেছে যাতে সে এসব দেখে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অনুপম বাচনভংগীর কতিপয় নমুনা আমরা এই বর্ণনাধারায় দেখতে পাই।

অতপর যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সূচনাতেই এমন কিছু মৌল তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামী চিন্তাধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বর্ণনায় এসব মৌল তত্ত্বের পেছনেই যুদ্ধের পুরো ঘটনা প্রবাহটি আবর্তিত হয়েছে। এ পর্যায়ে সূচনাতেই অবিশ্বাসীদের

(২) 'বিশ্ব শান্তি ও ইসলাম' গ্রন্থে 'পাপের শাস্তি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সম্পর্কে আল্লাহর অব্যাহত নীতির প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে এ কথা বলা হয় যে, এ যুদ্ধে মোশরেকদের বিজয় লাভ করা আল্লাহর কোনো স্থায়ী নীতি নয়– এটা হচ্ছে এক সাময়িক ব্যাপার মাত্র। এর পেছনে বিশেষ হেকমত ও বিরাট রহস্য রয়েছে। অতপর তাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়, ধৈর্য ধারণপূর্বক ঈমান নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারা আঘাত আর ব্যথা পেয়ে থাকলে এই যুদ্ধে মোশরেকরাও তো অনুরূপ আঘাত আর ব্যথা পেয়েছে। দলীয় শৃংখলা এবং অন্তরকে যাবতীয় কলুষ কালিমা থেকে পাক-সাফ করার জন্যে এখানে প্রয়োজনীয় হেকমত রয়েছে। অতপর পরিণতিতে তিনি মুসলিম জামায়াতকে শক্তভাবে প্রস্তুত করার মাধ্যমেই কাফেরদেরকে বিনাশ করবেন।

'তোমাদের আগে (বহু জাতির) বহু উদাহরণ অতীত হয়েছে .... উপস্থিত দেখছো।'

এ যুদ্ধে মুসলমানরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা নিহত হয়েছে, সাময়িকভাবে পরাজিত হয়েছে। তাদের মন আর দেহকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে সত্তরজন সাহাবী নিহত হয়েছেন। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সম্মুখ ভাগের ওপরের পাটির একটা দাঁতও ভেংগে গিয়েছিলো এবং তাঁর চেহারা রক্তাক্ত হয়েছিলো। মোশরেকরা আল্লাহর রসূলকে পর্যন্ত সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিলো। এসবের পরিণতিতে তাদের অন্তর প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিলো। তারা এতে এমনই দুঃখ পেয়েছিলেন যে, বদরযুদ্ধে বিস্ময়কর বিজয় লাভের পর তারা এমন বিপর্যরে কথা ভাবতেও পারেননি। এমন কি বিপর্যস্ত হওয়ার পর মুসলমানরা বলে উঠেছিলো, কিভাবে এটা ঘটলো? আমরা তো মুসলমান, তাহলে কিভাবে আমাদের সংগে এমন কিছু একটা হতে পারে?

যুদ্ধের ফলাফল ও জয় পরাজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি

কোরআন মজীদ এখানে মুসলমানদেরকে পৃথিবীতে আল্লাহর স্বভাব-নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এমন কিছু মূলনীতির দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যে নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সব কাজকর্ম সম্পন্ন হয়। জড়-জগতে এটা নতুন কিছু নয়, কোনো অভিনব সৃষ্টি নয়। যেসব নীতি অন্য সবার জীবনকে পরিচালিত করে, তা যথারীতিই চালু আছে, তার ব্যত্যয়-ব্যতিক্রম কখনো হবে না। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবেও কোনো ঘটনা ঘটে না। সকল ঘটনাই ঘটে একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী। তারা যদি এ সবের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করতে পারে, তাহলে এসব ঘটনার পেছনে যে রহস্য এবং উদ্দেশ্য আছে তা তাদের কাছে পরিস্কার হবে। এ বিধানের পেছনে যে রহস্য লুক্কায়িত ছিলো, তারা তারও সন্ধান লাভ করবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা চলার নতুন পথের দিশা পাবে। কেবল নিজেদের মুসলমান হওয়ার ওপরই তারা ভরসা করে বসে থাকবে না। বিজয় আর তার কার্যকারণ থেকে দুরে অবস্থান করে বিজয় লাভের অহেতুক আশা পোষণ করবে না। বিজয় ও সাহায্য লাভের প্রধান শর্ত হচ্ছে আল্লাহর এবং তার রসূলের আনুগত্য– এটা তারা বুঝতে পারবে।

এখানে আয়াতে যে সব নীতির প্রতি ইংগীত করা হয়েছে এবং যে দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, তা এই যে, ইতিহাসের গতিধারা ধরেই অবিশ্বাসীদের পরিণতি হয়। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করার কতোটুকু শক্তি আছে, মানুষের মধ্যে তা পরীক্ষা করার জন্যে পালাক্রমে দিবারাত্রির আবর্তন ঘটে। ধৈর্যশীলরা বিজয় আর সাহায্য লাভের অধিকারী হয় আর অবিশ্বাসীরা ধ্বংস ও বিনাশের যোগ্য হয়।

আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন রীতি বর্ণনা করার পাশাপাশি আয়াতগুলোতে ধৈর্য অবলম্বন করার কথা বলে তাদের উদ্দীপ্ত করা হয়েছে, তাদের সুখ দুঃখ আর বিপদাপদের জন্যে সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার জন্যে সমবেদনা জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, কেবল তারাই আহত হয়নি, অনুরূপভাবেই তাদের দুশমনরাও আহত হয়েছে। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের

বিচারে তো মুসলমানরা তাদের দুশমনদের চেয়ে চিরকালই শ্রেষ্ঠ, উন্নত। পরবর্তী পর্যায়ের চিরস্থায়ী শুভ পরিণতি তো তাদের জন্যেই রয়েছে। আর চিরকালীন দুর্দিন-দুর্বিপাক কাফেরদের ওপর আপতিত হবে।

'তোমাদের আগে বহু জাতির বহু উদাহরণ অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যাবাদীদের কী পরিণতি হয়েছিলো। এ হচ্ছে মানুষের জন্যে স্পষ্ট বর্ণনা, আর যারা ভয় করে তাদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশবাণী।'

কোরআন মজীদ অতীতকে বর্তমানের সংগে এবং বর্তমানকে অতীতের সংগে সম্পৃক্ত করে দেয়। এসব কিছুর মধ্য দিয়ে সে ভবিষ্যতের কর্মসূচী বাস্তবায়নের কর্মপন্থা কী হবে সেদিকে ইংগীত করে। যে আরবদেরকে উদ্দেশ্য করে সর্বপ্রথম একথাগুলো বলা হয়েছে, ইসলাম-পূর্ব যুগে তাদের জীবন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, অভিজ্ঞতা কোনো কিছুই এতো ব্যাপক-বিস্তৃত ছিলো না-ছিলো না তেমন কোনো উন্নতি অগ্রগতির কোনো স্বর্ণালী ইতিহাস। ইসলাম এবং ইসলামের গ্রন্থ কোরআন না হলে তারা কিছুতেই বর্তমান অবস্থায় পৌছতে সক্ষম হতো না। ইসলাম তাদের মধ্যে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়েছে। ইসলাম এই কোরআন দ্বারা আরবদের মধ্য থেকে এমন এক জাতি গড়ে তুলেছে, যারা ছিলো বিশ্বনেতৃত্বের সবচেয়ে বেশী যোগ্য। তদানীন্তন আরবে যে গোত্র-প্রথা প্রচলিত ছিলো, যে গোত্র-প্রথার ছায়াতলে তারা জীবন যাপন করতো তা তেমন উন্নত কোনো সমাজব্যবস্থা ছিলো না। এমতাবস্থায় সারা বিশ্বের অধিবাসীদের সাথে সংযোগ-সম্পর্ক স্থাপন তো দূরের কথা, কেবল জাযিরাতুল আরব-এর বাসিন্দাদের নেতৃত্ব দানের কথাও তারা ভাবতে পারতো না। যে বিশ্বনীতির ভিত্তিতে সকল মানুষের জীবন ও যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ পরিচালিত হতো, তার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বিষয়টি ছিলো তখন তাদের কাছে অকল্পনীয়। জীবনের দাবী আর প্রয়োজনীয়তার সংগে কোনো পরিচয়ই তাদের ছিলো না। একমাত্র ইসলামই এ কেতাবের বদৌলতে তাদের উর্ধে উঠিয়ে দিয়েছে।

মাত্র সিকি শতাব্দী সময়ের মধ্যে ইসলাম এ কাজটি সম্পন্ন করেছে, অথচ তাদের সমকালীন অন্যান্য চিন্তাধারা কয়েক শতাব্দী ব্যায় করেও তারা এর ধারে কাছে পৌছতে পারেনি। কিন্তু যখন তারা এ বিশ্ববিধানের শাশ্বত সন্ধান লাভ করলো, তখন তারা তাদের সকল জাহেলিয়াতকে ভুলে গেলো এবং বুঝতে পারলো যে, মানুষের জীবনযাপনের সাথে আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায়েরও কোনো সংযোগ রয়েছে। তারা অনুধাবন করলো যে, সমুদয় বিষয় আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। ইসলামের ছোঁয়ায় তাদের চিন্তাধারাও ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত হয়ে ওঠে। তাদের অনুভূতিতে স্থায়ী নীতি আর আল্লাহর অভিপ্রায়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য স্থাপিত হয়। ফলে আল্লাহর স্থায়ী নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনে শান্তি সুস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

'তোমাদের পূর্বে (অনেক জাতির) অনেক উদাহরণ অতিত হয়েছে।'

এ হচ্ছে এমন নীতি যা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ও সংহত করে। আল্লাহর অভিপ্রায় এ নীতিই অনুমোদন করে। তোমাদের পূর্বে যে নীতি কার্যকর হয়েছিলো আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের সময়েও অনুরূপ ঘটবে। সুতরাং তোমাদের পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখো। গোটা পৃথিবী এক, আর গোটা পৃথিবীই মানবজীবনের পরিভ্রমণক্ষেত্র। পৃথিবী এবং পৃথিবীর জীবন হচ্ছে একটা উন্মুক্ত গ্রন্থ। শিক্ষণীয় বিষয়ে তা ভরপুর। অতপর দৃষ্টি ফেলে দেখো, অবিশ্বাসীদের পরিণতি কেমন হয়েছিলো, তাদের কী হয়েছিলো। পৃথিবীতে তাদের স্মৃতিচিহ্নই তো তাদের পরিণতির কথা সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাদের জীবনাচারই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

কোরআন মজীদের নানা স্থানে এসব স্মৃতিচিহ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও কোথাও স্থান-কাল আর ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আবার কোনো কোনো স্থানে একে চিহ্নিত কেবল তার প্রতি ইংগীতই করা হয়েছে। যাতে ক্ষুদ্র ইংগীত সংক্ষিপ্ত পরিণতিতে উপনীত হওয়া যায়।

অতীতে অবিশ্বাসীদের যে পরিণতি হয়েছিলো, বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও তাদেরকে অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এতে করে এক দিক থেকে মুসলিম জামায়াতের পরিণতির ব্যাপারে তাদের অন্তর যেমন তৃপ্ত হয়, অন্যদিকে অবিশ্বাসীদেরকেও হুশিয়ার করে দেয়া হয়। সেখানে এমন বিষয় রয়েছে, যা শান্তি-তৃপ্তির দিকে আহ্বান জানায়, ভয়-ভীতির কথা বলে সতর্কও করে। কোরআনের আয়াত এগুলোর বিবরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়,

'এ হচ্ছে মানুষের জন্যে বর্ণনা আর মোত্তাকীদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশবাণী।'

এটা হচ্ছে সমগ্র মানবমন্ডলীর তাদের পথের দিশা। এই পথপ্রদর্শন ছাড়া মানুষ সেখান পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হতো না। কিন্তু একটা বিশেষ দলই এতে হেদায়াত পাবে। পাবে তাতে উপদেশ। তারা এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং পথের দিশা পাবে। সে দলটিই হচ্ছে মোত্তাকীদের দল।

হেদায়াতের জন্যে উন্মুক্ত মোমেনদের হৃদয় ব্যতীত অন্য কেউই উপদেশ-বাণীতে ধন্য হয় না। আল্লাহভীরু একটা চিত্ত, যে চিত্ত হেদায়াত লাভের জন্যে ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত থাকে। সে ধরনের হৃদয় ছাড়া অন্য কেউ এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

খাটি শিক্ষা হেদায়াত ও গোমরাহীর জ্ঞান মানুষ খুব কম মানুষই রাখে। সত্য স্বভাবতই স্পষ্ট থাকে, সে জন্যে দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন পড়ে না। সত্যগ্রহণের ক্ষমতা কেবল ঈমানের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। একমাত্র তাকওয়াই তাকে হেফাযত করতে পারে। এ কারণে কোরআনে এ ধরনের জ্ঞানের দৃষ্টান্ত বারবার এসেছে। এতে বলে দেয়া হয়েছে যে, কোরআন মজীদে যে সত্য, যে হেদায়াত, যে নূর আর যে শিক্ষার উল্লেখ রয়েছে, তা শুধু মোমেন মোত্তাকীদের জন্যেই।

ঈমান আর তাকওয়া এমন বিষয়, যা মানুষের হৃদয়কে হেদায়াত, নূর, উপদেশবাণী আর শিক্ষার জন্যে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দেয়। এসব উপকরণ অন্তরকে আলোকিত করে। পথের যাবতীয় কষ্ট সহ্য করার জন্যে তাকে প্রস্তুত করে। এটাই হচ্ছে এখানে আলোচনা কথা। এটাই হচ্ছে সব কথার সারকথা। নিছক জ্ঞান আর তত্ত্বই যথেষ্ট নয়। এমন অনেক জ্ঞান ও তত্ত্ববিশারদ রয়েছে যারা বাতিলের চারণভূমিতেই বিচরণ করে বেড়ায়। কারণ তারা মনের কামনা-বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে, সেখানে জ্ঞান ও তত্ত্ব কোনো কাজে আসে না।

এ দীর্ঘ বিবরণের পর মোমেনদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি বাড়ানো, তাদের সান্ত্বনা দেয়া এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বলা হয়েছে।

'আর তোমরা নিরাশ এবং চিন্তিত হয়ো না, মোমেন হলে তোমরাই জয়ী হবে।'

তোমরা হীনবল হবে না, দুর্বল হবে না। তোমরাই জয়ী হবে, তোমরাই ওপরে থাকবে। কেননা, তোমরা এক আল্লাহর সামনেই মাথানত করো, তাঁর সৃষ্টির কোনো অংশের কাছে মাথা নত করা নয়। তোমাদের জীবন বিধানই সর্বোত্তম। কেননা, তোমরা জীবনযাপন করো আল্লাহর মনোনীত জীবনবিধান অনুযায়ী।

তোমাদের ভূমিকা হচ্ছে সর্বোত্তম। তোমরা গোটা মানবতার কল্যাণকামী। কোরআন বলছে, তোমরা গোটা বিশ্ব-মানবতার পথ-প্রদর্শক। তারা আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান থেকে অনেক দূরে, পথহারা, বিভ্রান্ত। পৃথিবীতে তোমাদের স্থান অনেক উন্নত। পৃথিবীর উত্তরাধিকার তোমাদের জন্যে। এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর ওয়াদা। সত্যি সত্যিই তোমরা মোমেন হয়ে থাকলে জয়ী তোমরাই হবে। তোমরা মোমেন হয়ে থাকলে কখনো হীনবল হয়ো না, দুঃখ-অনুতাপ-অনুশোচনা করো না। এটা আল্লাহর বিধান যে, তোমাদের ওপর বিপদ আপতিত হবে এবং তোমরা অন্যদেরও বিপদের সম্মুখীন করবে। জেহাদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিশুদ্ধি-পরিশীলনের পর তোমাদের জন্যেই রয়েছে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী শুভ পরিণাম। এরশাদ হচ্ছে,

'যদি সাময়ীক কোনো আঘাত থাকে, তবে এই ধরনের আঘাত তো তাদের ওপরও এসেছে। আর এভাবে দিনগুলোকে আমি (সুখে দুঃখে) মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তিত করে থাকি। .... আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান আর কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চান।' (আয়াত ১৪০-৪১)

মুসলমানদের এবং অবিশ্বাসীদেরও আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করে সম্ভবত বদরযুদ্ধের প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। এ যুদ্ধে মোশরেকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো আর মুসলমানরা নিরাপদ ছিলো। আবার এ দ্বারা ওহুদ যুদ্ধের প্রতিও ইংগীত হতে পারে। এ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলমানরা বিজয়ী হয়। মোশরেকরা পরাজিত হয় এবং তাদের সত্তর জন নিহত হয়। মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে নিয়ে গেলে মোশরেকদের পতাকা মাটিতে পড়ে যায়। পতাকা হাতে তুলে নেয়ার জন্যে কোনো পুরুষ এগিয়ে আসেনি। একজন মহিলা এগিয়ে এসে পতাকা তুলে নেয়, সে পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরে এবং পতাকা তলে সকলকে সমবেত হতে আহ্বান জানায়।

এ সময় মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী রসূলল্লাহ (স.)-এর নির্দেশ ভুলে গিয়ে তাদের অবস্থান ত্যাগ করে গনীমতের জন্যে ময়দানের দিকে এগিয়ে যায়। তাই যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুসলমানদের যা ক্ষতি হওয়ার ছিলো তাই হয়েছে। এটা ছিলো তাদের ভুলের প্রতিফল। আল্লাহর রসূলের নির্দেশ অমান্য করার পরিণতি। এটা ছিলো আল্লাহর নীতিরই অনুবর্তন, যার কখনো ব্যতিক্রম হয় না। গনীমতের মালের প্রতি লোভ-লালসা ও তাদের নবীর আদেশের প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যের অভাবে তীরন্দাজ বাহিনীর মধ্যে এ মতভেদ শুরু হয়।

আল্লাহ তায়ালা তো জেহাদের ময়দানে বিজয় অবধারিত করেছেন তাদের জন্যে– যারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জেহাদ করে, দুনিয়ার তুচ্ছ বিলাস উপকরণের প্রতি এদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া আদৌ শোভা পায় না। আসলে এই ঘটনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে একটা নীতি প্রমাণ করতে চান. আর তা হচ্ছে পালাক্রমে দিনগুলো মানুষের মধ্যে আবর্তন করা। মানুষের কর্ম আর নিয়ত অনুসারেই এটা ঘটে। আজ একদিন হবে এদের জন্যে, আর অপর দিন হবে ওদের জন্যে। এভাবে কে মোমেন আর মোনাফেক তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

'আমি পালাক্রমে মানুষের মধ্যে এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই।'

এ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জানতে চান, কারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে। সরলতার পর কঠোরতা আসে, কঠোরতার পর আসে সরলতা, সুখের পরে দুঃখ আসে, দুঃখের পরে আসে সুখ। এ দু'টি বিষয় মনের কথা বের করে দেয়, অন্তরের কলুষতা আর স্বচ্ছতার স্তর এতে স্পষ্ট হয়ে যায়। স্পষ্ট হয়ে যায় ধৈর্য আর অধৈর্যের পর্যায়টিও। কার অন্তরে আল্লাহর প্রতি কতোটুকু আস্থা আর কতোটুকু নিরাশা বিদ্যমান থাকে তাও জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ক্রমে এ থেকে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি কার কতোটুকু আস্থা আছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এতে কে মোমেন, আর কে মোনাফেক তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রত্যেকের আসল রহস্য জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

আল্লাহ তায়ালা তো জানেন মোমেন আর মোনাফেক কে। তাদের মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাও তিনি জানেন। ঘটনাবলী এবং মানুষের মধ্যে পালাক্রমে তাদের আবর্তন যে গোপন বিষয়টিকে উন্মোচিত করে তোলে, তাও তিনি আগে থেকেই জানেন। এ বিষয়টি ঈমানদারকে নিয়ে যায় কল্যাণের দিকে, তেমনি মোনাফেককেও নিয়ে যায় অকল্যাণের দিকে। মানুষের যেসব বিষয় আল্লাহ তায়ালা জানেন, একমাত্র তার ভিত্তিতেই তিনি হিসাব গ্রহণ করেন না, বরং তিনি হিসাব অন্যভাবেও নেন। পালাক্রমে কালের আবর্তন এবং সুখ-দুঃখ, সুসময় ও দুঃসময়ের পরিবর্তনে এমন একটা মানদন্ড, যাতে কখনো ভুল হয় না। এ ক্ষেত্রে কোমলতা ঠিক কঠোরতার মতোই জরুরী। এমন অনেক জীবন আছে, কষ্ট আর দুঃখ-যন্ত্রনা যাদের ললাটের লিখন হয়;

তাদেরকে সুসময় আর সুখ দ্বারা মাঝে-মধ্যে অবকাশ দেয়া প্রয়োজন। মোমেন হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে অসচ্ছলতায় ধৈর্যধারণ করে এবং সচ্ছলতার সময় সীমালংঘন করে না। উভয় অবস্থায়ই সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে এবং একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ভালো-মন্দ যা কিছু আসে, তা আল্লাহর ইচ্ছায় হয়, একান্ত তাঁরই হুকুমে হয়।

আল্লাহ তায়ালা জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই মুসলিম জামায়াতকে মানবতার নেতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করেছেন। তিনি তাদেরকে সচ্ছলতার পর অসচ্ছলতা ও কঠোরতার পর কোমলতা দ্বারা পরীক্ষা করেন। বিস্ময়করভাবে একবার বিজয় লাভের পর পরীক্ষার জন্যে তিক্ত পরাজয়ের দ্বারাও তিনি তাদের প্রস্তুত করেন। বিজয় আর পরাজয়ের ব্যাপারে আল্লাহর অব্যাহত নীতি অনুযায়ীই এসব জয়-পরাজয় ঘটে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম জামায়াত জয়-পরাজয়ের সঠিক কারণ সম্পর্কে যেন জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে যেন আল্লাহর আনুগত্য বৃদ্ধি পায়, একমাত্র আল্লাহর ওপরই যেন তাদের নির্ভরশীলতা থাকে। যাতে তারা ইসলামী জীবন বিধানের প্রকৃতি এবং তার পরীক্ষার নীতি সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শাহাদাত ছিলো কাম্য যাদের

যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছে তার হেকমত মুসলিম উম্মাহর কাছে প্রকাশ করাও এর উদ্দেশ্য। এতে তারা জানতে পারবে যে, মানুষের মাঝে কালের আবর্তন করানোর পেছনে আল্লাহর কী হেকমত কার্যকর রয়েছে। জানতে পারবে যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর নবীর নির্ধারণ করে দেয়া নিয়ম ভংগ করার পরিনতি কী হতে পারে। মোমেনদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন,

'এবং তিনি তোমদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন'।

এ হচ্ছে এক গভীর তাৎপর্যের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ। শহীদরা হচ্ছে বাছাই করা লোক। মোজাহেদদের মধ্য থেকে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বাছাই করেন এবং তিনি তাদেরকে নিজের জন্যে গ্রহণ করেন। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় জীবন দানের মধ্যে ক্ষতি কিংবা হারাবার কিছুই নেই। এ হচ্ছে আল্লাহর বাছাই ও মনোনয়ন। তাঁর দেয়া সম্মান ও মর্যাদা। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে নিজের জন্যে বাছাই করে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন, তাদের তিনি তার নিজের খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যে মোজাহেদ হিসেবে গ্রহণ করেন তাদের চেয়ে মর্যাদাবান আর কে হতে পারে! তিনি তাদেরকে একান্ত আপন নৈকট্য ধন্য করেন। এরা হচ্ছে শহীদ।

যে সত্য নিয়ে তিনি রসূলকে প্রেরণ করেছেন, সেজন্যে শহীদদেরকে তিনি সাক্ষী বানিয়ে রাখেন। তাঁরা এ সাক্ষ্যই পালন করেন, এমনভাবে পালন করেন যাতে কোন অস্পটতা থাকে না। এ সম্পর্কে কোন বিবাদ নেই। বিতর্ক নেই, আবার কারো বলবার কিছুও নেই। তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত এ দায়িত্ব পালন করেন। অমূল্য সম্পদ জীবন দিয়ে দুনিয়ার মানুষের কাছে এ সত্যকে তারা তুলে ধরেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে এ সাক্ষ্য দাবী করেন। তারা সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে যা কিছু এসেছে, তা সবই সত্য। তারা সে বিষয়ের প্রতিই ঈমান এনেছেন। এ জন্যেই তারা নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। এ সাক্ষ্য দানকেই তারা সবচেয়ে সম্মানের কাজ বলে মনে করেছেন। তারা এজন্যেও সাক্ষ্য দেন যে, আল্লাহর নবী যে জীবন ব্যবস্থা নিয়ে আগমন করেছেন, সে জীবন ব্যবস্থা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা ব্যতীত মানুষের জীবন সুস্থ সুন্দর হতে পারে না। এ সত্যের প্রতি তাদের রয়েছে অটল বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা। বাতিলের প্রতিরোধে এবং মানুষের জীবন থেকে বাতিলকে হটাবার কাজে তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। নিজেদের পরিবেশ-পরিমন্ডলে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এবং মানবজীবনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজে তারা এতোটুকুও শৈথিল্য দেখাননি। যেসব কিছুর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাক্ষী করেছেন

তারা সে সাক্ষ্য যথাযথ দান করেছেন। তাদের এ সাক্ষ্য হচ্ছে আমৃত্যু জেহাদে নিয়োজিত থাকা। এটা এমন এক সাক্ষ্য, যার সত্যতার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই, নেই কোনো বিসংবাদ। যে ব্যক্তি একথাগুলো শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু বাস্তব জীবনে এর দাবী প্রতিষ্ঠিত করে না, তার সম্পর্কে একথা বলা যাবে না যে, সে সাক্ষ্য দিয়েছে– যতক্ষণ না সে এ সত্যের দাবী ও তাৎপর্য অনুযায়ী জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিচালনা করে।

এ শাহাদাতের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহকেই কেবল ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে সে আইন ও বিধান গ্রহণ করবে না।

ইলাহ হওয়ার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বান্দাদের জন্যে আইন-বিধান প্রণয়ন করা। আর দাসত্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর রসূল হিসাবে মোহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করা এবং আইন-বিধান গ্রহণের জন্যে এ উৎস ছাড়া অন্য কোনো উৎসকে মেনে না নেয়া। এ শাহাদাতের দাবী এই যে, পৃথিবীতে কেবল এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই তারা সংগ্রাম করবে, চেষ্টা-সাধনা করবে, যেমন আল্লাহর নবী হযরত মোহাম্মদ (স.) স্বয়ং করেছেন। স্বেচ্ছায় মানুষ মেনে নেবে হযরত মোহাম্মদ (স.)-এর আনীত দ্বীন ও তাঁর আদর্শকে। এ বিধানই একদিন জয়ী হবে, এ বিধানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, সকলে এ বিধানেরই আনুগত্য করবে। এ হচ্ছে এমন জীবন বিধান, যা মানুষের গোটা জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। কোনো কিছুই তা থেকে বাদ পড়ে না। এ বিধানের দাবী হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দান করা। যে এ দাবী পালন করবে, সে হবে শহীদ। এ হচ্ছে এই বিস্ময়কর ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। 'এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকে শহীদ' গ্রহণ করবেন। আর এটাই হচ্ছে এর শাহাদাতের দাবী ও তাৎপর্য। শাহাদাতের এ দাবীতে কোনো ছাড় নেই, কোনো অবকাশ নেই– নেই গা বাঁচাবার কোনো উপায়।

'আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে ভালোবাসেন না।'

কোরআন মাজীদে এখানে যুলুমের উল্লেখ করে শেরেক বুঝানো হয়েছে। কারণ, শেরেক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম। সবচেয়ে জঘন্য ও নিকৃষ্ট যুলুম। কোরআন মাজীদে সূরা লোকমানের এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'শেরেক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম।'

বোখারী এবং মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম', ইয়া রসূলাল্লাহ কোন গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর সংগে কাউকে শরীক সমকক্ষ সাব্যস্ত করা অথচ আল্লাহ তায়ালাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

ইতিপূর্বে আয়াতে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল্লাহর নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। আর এখানে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা যালেমদেরকে ভালোবাসেন না। অন্য কথায়, এখানে গুরুত্ব দিয়ে এ প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে যে, অবিশ্বাসী যালেমদেরকে আল্লাহ তায়ালা কখনো ভালোবাসেন না। একথার মধ্যে যালেম এবং যুলুমের প্রতি ঘৃণার ইংগীত রয়েছে। এ দ্বারা যুলুম আর যালেমের প্রতি মোমেনের মনে ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তোলা হয়।

জেহাদ আর শাহাদাত পর্যায়ে আলোচনা-ধারায় এ ঘৃণার ভাবটি জাগ্রত করা হয়েছে। এর বিশেষ একটা তাৎপর্যও রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যেসব কাজ এবং যেসব মানুষকে ঘৃণা করেন, মোমেন তো সে সবের প্রতিরোধে নিজের জীবনকে পর্যন্ত বিলিয়ে দেবে। আর এটাই হচ্ছে শাহাদাতের মর্যাদা। আর এজন্যেই তো আল্লাহ শহীদদেরকে নিজের করে গ্রহণ করেন।

ওহুদের ঘটনা ও মুসলিম জাতির শিক্ষণীয়

অতপর বর্ণনাধারায় এসব ঘটনাবলীর পেছনে লুকায়িত রহস্য উন্মোচিত করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর মানসিক গঠন, তাদের লালন-পালন, তাদের পাক পবিত্র করন এবং মহান ভূমিকা

পালনের জন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে। যেন কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করার কাজে তারা আল্লাহর কুদরতের অন্যতম হাতিয়ার এবং অসীম ক্ষমতার বাহন হতে পারে।

'আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে পাক-সাফ আর কাফেরদেরকে করতে চান নিশ্চিহ্ন।'

'তামহীস' তথা পাক-সাফ করা হচ্ছে ছাঁটাই-বাছাইয়ের একটা উপায়। এ হচ্ছে এমন এক কর্ম, যা শুরু হয় মনের গভীরে, অন্তরের গহীন কোণে। এ হচ্ছে এমন এক কাজ, যা ব্যক্তিত্বের গোপন রহস্য উন্মোচিত করে, সে নিজে গোপন রহস্য নিরসনে ভূমিকা হিসাবে কাজ করে। জাহেলিয়াতের সকল কলুষ কালিমা থেকে তার অন্তরকে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন করে তোলে, সকল প্রচ্ছন্নতা-অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত করে একে সে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে।

মানুষ অধিকন্তু নিজের নফস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, অজ্ঞ থাকে নিজের নফসের বক্রতা আর গোপন বিষয় সম্পর্কে। নিজের শক্তি আর দুর্বলতার কথা সে ভুলে যায়। বিচিত্র ঘটনাবলী ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মানুষের হৃদয়কে পবিত্র করেন, কঠোরতা আর সহজতার মধ্য দিয়ে কখনো মানুষ তার মনে শক্তি অনুভব করে এবং সে নিজের মনকে লোভ-লালসামুক্ত ভাবে। অতপর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সে যখন বুঝতে পারে যে, তার মনে এখনো কলুষ-কালিমা রয়েছে, তখন সে জানতে পারে যে, বাকী দুর্বলতার উর্ধে ওঠার জন্যে কতোটা সে প্রস্তুত রয়েছে। অন্তরের এ দুর্বলতা বুঝতে পারাটা তার জন্যে বড়ই কল্যাণকর হয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা বাছাই করা মুসলিম দলকে মানবতার নেতৃত্ব দানের জন্যে লালন করেন, তাদের দ্বারা পৃথিবীর বুকে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে চান। এ কারণে তিনি তাদেরকে এভাবে পাক-সাফ করে তোলেন।

এ থেকেই ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর মধ্যে নিহীত তাৎপর্য প্রতিটি মুসলমানের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা এটা করেন, এজন্যেই যে, শয়তানের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে তারা উত্তীর্ণ হতে পারে এবং আল্লাহর অভিপ্রায় তাদের হাত দিয়েই বাস্তবায়িত হয়।

'এভাবে তিনি নিশ্চিহ্ন করতে চান কাফেরদেরকে'।

তিনি এটা প্রমাণ করতে চান যে, ন্যায় দ্বারা তিনি অন্যায়কে প্রতিহত করবেন। এটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে যখন তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। তখন তিনি মুসলিম উম্মাহকে কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত করে কোরআন মজীদ দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর রীতি সম্পর্কে মুসলমানদের চিন্তাধারাকে সংশোধন করে দেন। জয়-পরাজয় ও প্রতিদান সম্পর্কে তাদের চিন্তাধারাকে সংশোধন করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছে একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যে, জান্নাতের পথ কষ্টক্লেশে ঢাকা। আর সে পথের পাথেয় হচ্ছে সবর। কেবল আশা-আকাংখাই এ পথের পাথেয় নয়। যে ক্ষীণ আশা পথের কষ্ট সহ্য করতে অনুপ্রাণিত করে না, এটা জান্নাতের পথের পাথেয়ও নয়।

'তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করে, তিনি তা জেনে নেননি, জেনে নেননি তিনি ধৈর্যশীলদেরকে! (আয়াত ১৪২)

এখানে প্রশ্নসূচক শব্দটি মূলত অস্বীকৃতিজ্ঞাপক অর্থে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ চিন্তাধারা যে ভুল, সে সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া। 'আমি ঈমান এনেছি এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত রয়েছি' মুখে এমন কথা উচ্চারণ করেই সে ঈমানের দাবী পূরণ করতে পারে না, পারে না সে জান্নাত আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে। এ জন্যে এই দাবীর স্বপক্ষে তাকে বাস্তব প্রমাণ দিতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে। আর সে পরীক্ষা হচ্ছে জেহাদ তথা জীবন বাযি রেখে শত্রুর মোকাবেলা করা এবং বিপদের সম্মুখীন হওয়া। অতপর জেহাদের কষ্টক্লেশে ধৈর্যধারণ করতে হবে। পরীক্ষা দিতে হবে বিপদে ধৈর্যধারণের। কোরআন মজীদে তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে,

'অথচ তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করে এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তায়ালা তা জেনে নেননি'।

মোমেনরা জেহাদের কষ্ট করবে, কেবল এটাই যথেষ্ট নয়, এজন্যে তাদেরকে দাওয়াতের কষ্টক্লেশে ধৈর্যও ধারণ করতে হবে। এমন অব্যাহত কষ্টক্লেশের সম্মুখীন হতে হবে, যার ফলে জেহাদের ময়দানে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কখনো কখনো অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, ইসলামের প্রতি আহ্বানের দাবী অনুযায়ী ধৈর্যধারণের চেয়ে জেহাদের ময়দানের কষ্টক্লেশ তুচ্ছ মনে হয়। আল্লাহর দিকে আহবান করতে গিয়ে বিপদ আপদের সম্মুখিন হওয়া দ্বারা ঈমানের পরীক্ষা করা হয়। সেখানে প্রতি মুহূর্ত বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে চলতে হয়, সাধনা চালাতে হয় ঈমানের ওপর টিকে থাকার। সাধনা চালাতে হয় ঈমানের দাবী অনুযায়ী চিন্তা-চেতনা আর আচরণে টিকে থাকার। এ ক্ষেত্রে মানবীয় দুর্বলতার ওপর কঠোর ধৈর্য ধারণ করতে হয়। ধৈর্যধারণ করতে হয় নিজের ব্যাপারে, অপরের ব্যাপারে এবং দৈনন্দিন জীবনে যাদের সংগে লেনদেনের কাজ কারবার করতে হয়। ধৈর্যধারণ করতে হয় সেসব মুহূর্তে, যখন বাতিল বিভৎস রূপ নিয়ে তার সামনে হাযির হয়। ধৈর্যধারণ করতে হয় দীর্ঘ যাত্রাপথ, দুর্গম গিরি আর কান্তার মরুর অতিক্রমের জন্যে। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যে তীব্র কষ্টক্লেশ ভোগ করতে হয়, সে ক্ষেত্রে সুখ-শান্তির প্ররোচনার সামনেও তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়।

ধৈর্যধারণ করতে হয় আরো অনেক ব্যাপারে। জেহাদের ময়দান তার একটি ক্ষেত্র মাত্র। যুলুম নির্যাতন ও দুঃখ কষ্টে ভরা এই জান্নাতের পথে টিকে থাকতে গেলে অবশ্যই ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। কেবল আশা আর মুখের কথা দ্বারাই জীবনের এই চরম সফলতা অর্জিত হয় না।

'তোমরা তো ইতিপূর্বে মৃত্যু কামনা করেছিলে তার সংগে সাক্ষাতের আগে। (এখন) তোমরা তো তা স্বচক্ষে দেখতে পেলে।'

তারা যুদ্ধের ময়দানে যে মৃত্যুর মুখোমুখী হয়েছিলো, বর্ণনা দ্বারা আর একবার তাদেরকে সে মৃত্যুর মুখে উপস্থিত করা হলো। অথচ ইতিপূর্বে তারা সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কামনা করেছিলো। এতে করে তারা জানতে পারবে যে, তারা মুখে যেসব কথা উচ্চারণ করে, সেজন্যে তাদেরকে হিসাব নিতে হবে। তার আলোকে তারা এ তুলনাও করতে পারে। এভাবে তারা কঠিন বাস্তবতার আলোকে কথার মূল্য, ইচ্ছার মূল্য, ওয়াদার মূল্য বুঝতে পারে। এ থেকে তারা একথা ভালোভাবে জানতে পারে যে, শুধু মুখের উড়ো কথা আর মনের কামনা তাদেরকে কখনো জান্নাতে পৌঁছাবে না। বরং তাদের জান্নাতে পৌঁছাবে মুখের কথার বাস্তব প্রতিফলন। আল্লাহ তায়ালা তাদের কাছ থেকে এসব কিছুই বাস্তবে জেনে নেন।

আল্লাহ তায়ালা তো শুরু থেকেই তাঁর নবীকে (স.) বিজয় দানে সক্ষম ছিলেন, সক্ষম ছিলেন নবীর দাওয়াত, তাঁর উপস্থাপিত জীবনবিধান দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করতে। এজন্যে মোমেনদের কোনো কষ্ট-ক্লেশের প্রয়োজন ছিলো না। তাদের সংগে যুদ্ধ করার জন্যে ফেরেশতা তিনি পাঠাতে পারতেন। এমন কি ফেরেশতা প্রেরণ না করেও তিনি মোশরেকদের ধ্বংস করতে পারতেন, যেমন তিনি ধ্বংস করেছেন আদ-ছামূদ এবং লুত কওমকে। কিন্তু এখানে কেবল সাহায্য দানের বিষয়টিই মুখ্য নয়। বরং আসল ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম জামায়াতের তরবিয়ত প্রশিক্ষণ তথা মানসিক গঠন, যা তাদেরকে মানবতার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করবে। তারা তাদের শত দুর্বলতা আর ক্রটি-বিচ্যুতি শত লোভ-মোহ আর অজ্ঞতা-বিকৃতি নিয়ে মানবতার এ নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এটা আল্লাহ তায়ালা চান না। মানবতার জন্যে প্রয়োজন সুস্থ সবল নেতৃত্বের এবং এ জন্যেই তাদের প্রয়োজন উচ্চতর যোগ্যতা। এজন্যে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন, তা হচ্ছে সৃষ্টিগত দিক থেকে তাদের শক্ত হওয়া, সত্যের ওপর অটল অবিচল থাকা, কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্যধারণ

করা, পদস্খলন আর বিকৃতির কার্যকারণ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা। চিকিৎসার উপায়-উপকরণ অর্জন করা, অসচ্ছলতার মতো সচ্ছলতায়ও ধৈর্যধারণ করা এবং সচ্ছলতার পর পুনরায় অসচ্ছলতা এলে তাতেও ধৈর্যধারণ করা।

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জামায়াতের হাতে নেতৃত্বের চাবিকাঠি অর্পণকালে তাদেরকে এ তারবিয়ত-প্রশিক্ষণই দিয়েছেন, যাতে মহান এবং কঠিন-দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদেরকে তিনি প্রস্তুত করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা চান যে, মানবজাতিকে প্রেরণ করে পৃথিবীতে যে কাজ আ াম দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য, তার ভার মুসলিম জাতির ওপর অর্পিত হোক। এ বিশাল বিশ্বে এই মানুষকে করেছেন তাঁর প্রতিনিধি। মুসলিম জামায়াতকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আল্লাহর অভিপ্রায় তাঁর নিজস্ব ধারায় পরিচালিত হয়। পরিচালিত হয় নানা উপায়-উপকরণ সহযোগে। কখনো এ ধারা মুসলিম জামায়াতের জন্যে চূড়ান্ত সাহায্য ও বিজয় বহন করে আনে। ফলে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সাহায্য ও বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করে, নিজের সম্পর্কে তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। বিজয় লাভের পথে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তাতে ধৈর্যধারণ করেও সে আস্থা অর্জন করা যায়। অহমিকা আর আত্মগরিমা দমনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করার অভ্যাসও এখান থেকেই গড়ে ওঠে। আল্লাহর কাছে বিনয় আর শোকরিয়া আদায়ে সর্বদা নিয়োজিত থাকে। এ পথে কখনো কঠোরতা আর কঠীন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তখন সে আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় নেয়। অনুধাবন করতে পারে নিজের ব্যক্তিগত শক্তির সীমারেখা কতোটুকু। আল্লাহর বিধান থেকে সামান্য বিচ্যুত হলেও নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে, পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ অনুভব করে। এতোকিছুর পর একদিন সে বাতিলের ওপর সত্যিই বিজয় লাভ করে। কারণ, একমাত্র নিরেট সত্য তার কাছেই বর্তমান রয়েছে। ত্রুটি বিচ্যুতি আর দুর্বলতা সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারে। অবহিত হতে পারে মনস্কামনা আর পদস্খলনের কারণ সম্পর্কেও। ফলে পরবর্তী পদক্ষেপে এসব কিছুকে সে সংশোধন করার প্রয়াস চালায়। এ পথে আল্লাহর নির্ধারিত বিধি আপন পন্থায় চলে। তার কোনো ব্যতিক্রম হয় না, হতে পারে না।

সত্যিকার অর্থে এর সব কয়টিই ঘটেছে ওহুদ যুদ্ধে। কোরআন মজীদের এসব আয়াতে এ ঘটনা মুসলমানদের সম্মুখে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। মুসলিম জামায়াত এবং অনাগতকালের যে কোনো মুসলিম জাতির জন্যে এতে বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

অতপর বাকধারায় উপস্থাপন করা হয় ইসলামী চিন্তাধারার এক মহান বৈশিষ্ট্য, যা মুসলিম জামায়াতকে এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে গঠন করতে পারে। যুদ্ধের ঘটনা প্রবাহকে সামনে করেই এসব তত্ত্বকে মানুষের মন-মানসে বদ্ধমূল করা হয়েছে। কোরআন মজীদের অনুপম ধারায় মুসলিম জামায়াতের মানস গঠনের উদ্দেশ্যে এটাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

নবীর প্রতি তার সাথীদের ভালোবাসা

এ প্যারার প্রথম আয়াতে ওহুদ যুদ্ধে সংঘটিত একটা নির্দিষ্ট ঘটনার প্রতি ইংগীত করা হয়েছে। ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীকে যে স্থানে নিয়োজিত করা হয়েছিলো এ ঘটনাটি ঘটেছিলো, তাদের সে স্থান ত্যাগ করার পর। ফলে মোশরেকরা সে গিরিপথ দিয়ে মুসলমানদের ওপর হামালা চালায়। এমনকি রসূলুল্লাহ (স.)-এর সামনে পাটির একটা দাঁতও ভেংগে যায়। তাঁর চেহারা মোবারক রক্তাক্ত হয়ে যায় এবং তিনি মারাত্মভাবে আহত হন। এ বিশৃংখল অবস্থা বিরাজ করলে মুসলমানরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

একজনের অবস্থান সম্পর্কে অন্যজন কিছুই জানে না। এ সময় পাপিষ্ঠ এক কাফের চিৎকার করে ওঠে, মোহাম্মদ (স.) নিহত হয়েছেন। এ চিৎকার মুসলমানদের ওপর এক বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। নিরাশ হয়ে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে অনেকেই মদীনায় ফিরে যেতে উদ্যত হয়। এ

চরম মুহূর্তেও গুটিকতক মুসলমানসহ আল্লাহর নবী ছিলেন অটল। তিনি পলায়নপর মুসলমানদেরকে আহ্বান জানালে তারা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসে। আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরকে পুনরায় অটল-অবিচল করেন। তাদের ওপর এমন তন্দ্রাভাব নাযিল করেন যাতে তাদের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার ভাব জেগে ওঠে। (এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে)।

এ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মুসলমানরা দারুণভাবে হতবিহ্বল এবং বিচলিত হয়ে পড়ে। কোরআন মজীদ এখানে এ ঘটনাকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের উৎস হিসাবে অভিহিত করেছে। এ ঘটনাকে মুসলমানদের মনে ইসলামী চিন্তাধারা বদ্ধমূল করার অবলম্বন বলে সাব্যস্ত করে এবং জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কেও এ থেকে কিছু ইংগীত পাওয়া যায়।

'আর মোহাম্মদ একজন রসূল বৈ কিছুই নন। তাঁর আগেও অনেক রসূল গত হয়ে গেছে। তিনি মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত হলে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? ...' (আয়াত ১৪৪)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মোহাম্মদ (স.) একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর আগেও অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন। সে রসূলরা সব মৃত্যুবরণ করেছেন। মোহাম্মদ (স.) তাদের মতো একসময় মৃত্যুবরণ করবেন। এ এক চরম সত্য। তবে তোমাদের হয়েছে কী যে, আমি যখন তোমাদেরকে যুদ্ধের মুখোমুখী করি, তখন তোমরা এ বাস্তব সত্য বিস্মৃত হও? কেন তোমরা এ বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও? মোহাম্মদ অস্থায়ী, আল্লাহ তায়ালা চিরকাল থাকবেন, তাঁর মৃত্যু নেই। আল্লাহর বাণীও চিরকাল থাকবে, তারও মৃত্যু নেই। এ বাণী পৌঁছানোর জন্যে যে নবীর আগমন হয়েছে, তিনি মৃত্যুবরণ করলে কিংবা নিহত হলে মুসলমানদের পশ্চাদপসরণ করা উচিত নয়। এই বাস্তব সত্য বিস্মৃত হওয়া মুসলমানদের কখনো উচিত নয়।

মানুষ ধ্বংস হবে, কিন্তু তার বিশ্বাস টিকে থাকবে। জীবনের জন্যে আল্লাহর বিধান এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা। ইতিহাসের ধারায় নবী-রসূলরা এবং তাদের উত্তরসূরীরা এ দায়িত্ব পালন করবেন। আর একজন মুসলমান তো এমনিতেই আল্লাহর রসূলকে ভালোবাসেন। আর নবীর সাহাবীরা তো তাঁকে এমনই ভালোবাসতেন যে, মানবতার ইতিহাসে যার কোনো নযীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারা নবীর ভালোবাসায় নিজেদের জীবনকে এমনই উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর দেহে একটা কাঁটা বিঁধলে তারা নিজেদের দেহে কাঁটা বিদ্ধ হয়েছে বলে মনে করতেন।

সাহাবী আবু দুজানা সম্পর্কে আমরা জানি যে, তিনি লোহার শেকলে আবদ্ধ হয়েছেন, তার পৃষ্টদেশে পাথর দিয়ে আঘাত করা হয়েছে, কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হননি, এটুকুও নড়াচড়া করেননি। রসূলের নয় জন সাহাবী সম্পর্কেও আমরা জানি যে, তাঁদের সংগে দুশমনী করে এক এক করে তাদের সকলকে শহীদ করা হয়। রসূলের প্রতি ভালোবাসার এ পরীক্ষায় তারা এক এক করে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ ধরনের ভালোবাসা যে শুধু তখনকার মুসলমানদের মধ্যেই ছিলো তা নয়। সকল যুগের সকল স্থানে সত্যিকার মুসলমানরা এভাবেই নিজেদের নবীর প্রতি বিস্ময়কর ভালোবাসার পরিচয় দিয়েছেন, নিজেদের সর্ব সত্ত্বা আর সকল অনুভূতি দিয়ে তার আদর্শকে আকড়ে ধরেছেন। এমন কি মহানবী (স.)-এর নাম শুনেই তারা উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন।

মুসলমানরা নবীকে এমনই ভালোবাসেন। তাদের কাছে এ ভালোবাসার দাবী এই ছিলো যে, নবীর ব্যক্তিসত্ত্বা এবং যে বাণী আর বিশ্বাস মানুষের কাছে পৌঁছাবার জন্যে তার আগমন ঘটেছে এ দু'য়ের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য করবে না। এ বিশ্বাস তাদের অটুট থাকবে। কারণ, এই বিশ্বাসের সম্পর্ক হয়েছে স্বয়ং আল্লাহর সংগে– যার মৃত্যু নেই। আহ্বানকারীর চেয়ে আহ্বান অগ্রগণ্য, আহ্বায়কের চেয়ে আহ্বানের মূল্য বেশী। মোহাম্মদ (স.) একজন রসূল ছাড়া কিছুই নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল গত হয়েছেন, যারা সময়ের দাবী মোতাবেক এ দাওয়াতের বীজ বপন করার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যে বীজ বপনের ধারা চলে আসছে। পথ পরিক্রমের ধারায় যা মানুষের জন্যে হেদায়াতের পথ, শান্তির পথ, তা তারা উন্মুক্ত করেছেন।

আহ্বানকারীর চেয়ে এখানে আহ্বানের মূল্য অনেক বেশী। কারণ তা অনেক দীর্ঘস্থায়ী। আহ্বানকারীরা আসেন আর চলে যান কিন্তু এ ধারা চলতে থাকে যুগ যুগ ধরে। আর তার অনুসারীরা তার প্রথম উৎসের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে নবীদের আদর্শের ওপর টিকে থাকবে। টিকে থাকবেন আল্লাহ তায়ালা, তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। এ কারণে এতো কঠিন, এতো কঠোর এবং এতো তীব্র ভাষায় ধমকের সুরে বলা হচ্ছে,

'তবে যদি সে মৃত্যুবরণ করে কিংবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? আর যে কেউ পশ্চাদপসরণ করবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।'

এখানে 'ইরতেদাদ' তথা পশ্চাদপসরণের একট জীবন্ত ছবি আঁকা হয়েছে। বলা হয়েছে এ বিশ্বাস থেকে সরে দাঁড়ানোর অর্থ কি? যেন তা একটি চাক্ষুস দৃশ্য। যুদ্ধের ময়দানে পরাজয়ের অনুভূত চিত্র অংকন করে 'ইরতেদাদ' বুঝানো এখানে আদৌ লক্ষ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানসিক 'ইরতেদাদের' একটা চিত্র অংকন করা, কেউ একজন চিৎকার দিয়েছিলো যে, 'মোহাম্মদ (স.) নিহত হয়েছেন'। তখন কোনো কোনো মুসলমান ধারণা করে নিয়েছিলো যে, মোশরেকদের হাত থেকে বুঝি রক্ষার আর কোনো উপায় নেই। মোহাম্মদ (স.)-এর মৃত্যুতে বুঝি ইসলামের অবসান হয়ে গেছে। মোশরেকদের সংগে জেহাদ বুঝি এখানেই শেষ। এখানে ব্যাখ্যায় এ মানসিক দৃশ্যটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ফলে তার চিত্র অংকন করা হয়েছে, 'পশ্চাদপসরণ' শব্দটি দ্বারা, যেমন পশ্চাদপসরণ করা হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। নযর ইবনে আনাস (রা.) এ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ (স.) নিহত হয়েছেন-এই বলে তারা ভিন্ন কিছু চিন্তা করতে উদ্যত হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, নবী ইনতেকাল করলে তোমাদের আর বেঁচে থেকে কী হবে? তোমরা উঠে দাঁড়াও এবং যে জন্যে নবী জীবন দান করেছেন, তোমরাও সে জন্যে জীবন দাও। আর কেউ পশ্চাদপসরণ করলে সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে নিজে পথহারা হবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মুখাপেক্ষী নন, নন তাদের ঈমানের মুখাপেক্ষী। কিন্তু বান্দাদের প্রতি দয়া-রহমতবশত তিনি তাদের এ বিধানের ব্যবস্থা করেছেন তাদেরই সৌভাগ্যের জন্যে, তাদের মংগল আর কল্যাণের খাতিরে।

'আল্লাহ তায়ালা শোকরগোযার বান্দাদেরকে প্রতিদান দেবেন।'

যারা আল্লাহর নেয়ামতের কদর করতে জানে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তার বিনিময় দান করেন। যারা আল্লাহর প্রশংসা করে তার শোকরিয়া আদায় করে, তাদের সৌভাগ্যবান বলা হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের শোকরিয়ার শুভ প্রতিদান। এ জন্যে তারা পরকালেও প্রতিদানে ধন্য হবে, যা হবে আরো বড় এবং আরো স্থায়ী।

জীবন মৃত্যু সম্পর্কিত সঠিক দর্শন

এ ঘটনা এবং এ আয়াতটি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা নবীর ব্যক্তিগত সত্ত্বার সংগে মুসলমানদের সম্পর্ক ছিন্ন করে সমস্ত সম্পর্কের একমাত্র উৎসের সংগে তাদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে বলেছেন। সে উৎসের স্রষ্টা নবী নিজে নন, বরং সে উৎসের সন্ধান দেয়ার জন্যেই দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছে এবং সে উৎসের দিকেই তিনি মানুষকে আহ্বান জানান। তাঁর পূর্ববর্তী রসূলরাও সেদিকে মানুষদের আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা চান এক মযবুত রজ্জুর সংগে তাঁর বান্দাদের সম্পর্ক স্থাপন করাতে, এ রজ্জু রসূলের নিজের রজ্জু নয় স্বয়ং আল্লাহর রজ্জু, সে রজ্জুর সংগে মানুষের সম্পর্ক জুড়ে দেয়ার জন্যেই তাঁর আগমন ঘটেছে। তিনি এমন অবস্থায় তাদেরকে ছেড়ে যেতে চান, যেখানে তারা সে রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। আল্লাহ তায়ালা চান যে, ইসলামের সংগে মুসলমানদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হোক। আল্লাহর সংগে তাদের অংগীকারও হোক সরাসরি এবং দায়িত্ব আর জবাবদিহির অনুভূতিও সেখানে সরাসরি স্থাপিত হোক। তাদের

উত্তরসূরীরাও এ সরাসরি সম্পর্কের কথাটি উপলব্ধি করুক। রসূলে খোদার মৃত্যুবরণ করা বা তার নিহত হওয়া যে সম্পর্কের অন্তরায় হবে না। কারণ, তারা বায়াত করেছে আল্লাহর সংগে আর আল্লাহর সম্মুখেই তাদেরকে তার জন্যে জবাবদিহী করতে হবে।

এ 'মহান আঘাত' সহ্য করার জন্যে আল্লাহ মুসলিম জামায়াতকে প্রস্তুত করতে চান। অথচ আল্লাহ তায়ালা তো জানেন যে, এ ঘটনা তাদের সহ্যসীমার বাইরে। এ কারণে তিনি তাদের আগে থেকেই অনুশীলন করান, নিজের সংগে তাদের সংযোগ স্থাপন করতে চান। এভাবে আল্লাহ মহা-দুর্যোগের আগমনের পূর্বেই তিনি এজন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করতে চান। তারপরও বাস্তবে যখন এ ঘটনা ঘটলো, তখন তাঁরা সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়লো। এমনকি হযরত ওমর (রা.) তরবারি উঁচিয়ে বললেন, যে বলবে মোহাম্মদ (স.) মৃত্যুবরণ করেছেন, তার গর্দান আমি উড়িয়ে দেবো, এ সময় হযরত আবু বকর (রা.) ছাড়া অন্য কেউ স্থির ছিলেন না। অন্তর্যামীর সংগে তার সম্পর্ক ছিলো সুগভীর। তিনি এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলে সকলের সম্বিত ফিরে এলো। এ যেন আল্লাহর আওয়ায তাদের শোনানো হচ্ছে, যেন আয়াতগুলো এই মাত্র প্রথমবারের মতো নাযিল হচ্ছে। ফলে সবাই ফিরে এলেন। সবাই ভুল ধারণা ত্যাগ করলেন।

অতপর কোরআন মজীদের বর্ণনাধারায় মানবমনে মৃত্যুর প্রচ্ছন্ন ধারণার প্রতি ইংগীত করা হচ্ছে। এমন পন্থায় জীবন-মৃত্যুর রহস্য উপস্থাপন করা হয়, যাতে সব সন্দেহ বিদূরিত হয়ে যায়। জীবন আর মৃত্যুর পেছনে আল্লাহর যে লীলাখেলা লুক্কায়িত রয়েছে, তাও এতে ফুটে ওঠে। ফুঠে উঠেছে বান্দাদের প্রতি আল্লাহর পরীক্ষা ও প্রতিদানের বিষয়টি।

'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউই মরতে পারবে না। সেজন্যে একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময় কামনা করবে ....।' (আয়াত ১৪৫)

সকল প্রাণীর জন্যে মৃত্যুর একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। মৃত্যুর এ নির্ধারিত সময় পূর্ণ করার আগে কেউই মৃত্যবরণ করতে পারে না। সুতরাং ভয়-ভীতি কিংবা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানোর ফলে জীবনের আয়ু দীর্ঘায়িত হবে না। আর বীরত্ব এবং দৃঢ়তা আয়ুষ্কালকে সংক্ষিপ্তও করে না। সুতরাং ভীরুতা-কাপুরুষতা অর্থহীন। অবধারিত মৃত্যুর সময় এতে একটুকুও হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না।

এ থেকে যাবতীয় প্রাণীর মৃত্যুরহস্যও স্থিরীকৃত হয়। মোমেন ঈমানের দাবী পূরণ করে যাবে, এভাবেই সে লোভ-লালসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। ভয় আর আতংকের উর্ধ্বে নিজের স্থান করে নেবে। সেই আল্লাহর প্রতি তার আস্থা ও ভরসা থাকে, যিনি জীবন-মৃত্যুর একমাত্র মালিক। অতপর মনকে সে এক সিদ্ধান্তকর প্রশ্নে নিয়ে যায়। জীবনের আয়ুষ্কাল যখন নির্দিষ্ট, আর মৃত্যু যখন চূড়ান্ত তখন। মানুষের দেখা উচিত, সে কি চায় তার সকল চেষ্টা-সাধনা এ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখতে? সে কি কেবল দুনিয়ার জীবনের জন্যেই বেঁচে থাকতে চায়, না কি এর চেয়েও উর্ধজগত সম্পর্কে তার কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে, এর চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু সে কিসের জন্যে চায়? এ দুনিয়ার জীবনের চেয়েও বড় কোনো জীবন চায়? জীবন সম্পর্কে যতোই সে চিন্তা করুক, তাতে তার আয়ু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না।

'যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কার কামনা করবে, আমি তাকে তার অংশবিশেষ দেবো, আর যে কামনা করবে পরকালের বিনিময়, আমি তাকেও তা থেকে কিছু অংশ দেবো।'

উভয় জীবনের মধ্যে কতো দূরত্ব। কতো ব্যবধান উভয় আয়োজনের মধ্যে। উভয়ের পরিণতির মধ্যে কিন্তু একটা ঐক্য রয়েছে। যে ব্যক্তি কেবল এ দুনিয়ার জীবনের জন্যেই বেঁচে থাকে, কেবল দুনিয়ার জীবনেই বিনিময় কামনা করে, সে তো কীটপতংগ, পোকামাকড় আর চতুষ্পদ জন্তুর জীবনই যাপন করে। এরাও একদিন নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুবরণ করে। পক্ষান্তরে যে

ব্যক্তি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দিকে, সে তো জীবন যাপন করে সেই মানুষের মতো, যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত করেছেন, তাকে খলীফা বা প্রতিনিধি বানিয়ে মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। নির্ধারিত সময়ে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত থেকে সেও মৃত্যুবরণ করবে, 'আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো প্রাণী মৃত্যুবরণ করতে পারে না, সেজন্যে নির্ধারিত একটা সময় রয়েছে।'

'আর অচিরেই শোকর গোযার ও কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো'।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে মর্যাদার যে নেয়ামতে ভূষিত করেছেন যারা তার ফল মনে রাখে, তারাই হচ্ছে শোকর গোযার বান্দা। তারা জীব-জন্তুর পর্যায় থেকে ওপরে নিজেদের স্থান করে নেয় এবং নেয়ামতের জন্যে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে।

কোরআন মজীদ জীবন-মৃত্যুর রহস্য এভাবেই বিবৃত করে। জীবিতরা নিজেদের জন্যে যা কিছু কামনা করে, সে অনুযায়ী তাদের লক্ষ্য স্থির হয়। কেননা জীবন-মৃত্যুর কোনো নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে নেই। তার এ ব্যস্ততা কেবল নিজের মালিকানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরই মধ্যে তার এখতিয়ার-স্বাধীনতা। সুতরাং স্বীয় স্বাধীনতা দিয়েই সে দুনিয়া অথবা আখেরাতে কল্যাণ লাভ করবে। সে যে পথই অবলম্বন করবে, সে মোতাবেক আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে।

ইতিহাসের পাতায় মোমেনদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

অতপর আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্যে তাদের পূর্ববর্তী মোমেন ভাইদের দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করেন। ঈমানই হচ্ছে তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু। জীবনের চলার পথের মতোই তা দীর্ঘ প্রলম্বিত। কালের মূলেই তার ভিত প্রোথিত। সেসব মোমেনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে যারা ঈমানের দাবীর সত্যতায় উত্তীর্ণ হয়েছে, যারা নিজেদের নবীর সংগে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি। মৃত্যুকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করেছে। তারা ঈমানের দাবীকে উর্ধে তুলে ধরেছে। তারা নিজেদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করার চেয়ে বেশী কিছুই করেনি। তাদের দৃষ্টিতে তা 'এসরাফ' তথা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা আপন পালনকর্তার কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় ও দৃঢ়তা কামনা করে। এভাবেই তারা দো জাহানের কল্যাণ অর্জন করে। এটা ছিলো জেহাদের ময়দানে তাদের অটল-অবিচল থাকার প্রতিদান। তারা ছিলেন পরবর্তিকালের মুসলমানদের জন্যে দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তায়ালা দৃষ্টান্ত হিসাবে তাদের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন,

আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো অনেক নবীই (এখানে এসে) ছিলো, যারা যুদ্ধ করেছে (আল্লাহর পথে), তাদের সাথে ছিলো.... বাতিলের সামনে (কোনোদিনই তারা) মাথা নত করেনি, (এ ধরনের ধৈর্যশীল ও সাহসী) ব্যক্তিদেরই আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন। (আয়াত ১৪৬)

ওহুদ যুদ্ধের পরাজয় ছিলো প্রথম পরাজয়, মুসলমানরা অন্তরে দারুণ ব্যথা পায়। মুসলমানরা যখন দুর্বল এবং সংখ্যায় কম ছিলো, তখন বদর যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সাহায্য করেন, বিজয় দান করেন। এতে তাদের মনে হয়তো এই ভাবের উদয় হয়েছিলো যে, সর্বাবস্থায় বিজয়ই বুঝি হচ্ছে তাদের জন্যে প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধে তারা এমন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, সেখানে কোনো রকম সাহায্য ও বিজয় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। সম্ভবত এ কারণে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোরআন মজীদে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা ধারায় কখনো মুসলমানদের জন্যে সহানুভূতি দেখানো হয়েছে, কখনো তাদের সমালোচনা করা হয়েছে, কখনো উপদেশ দেয়া হয়েছে, কখনো তাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে তাদের মন-মানসিকতা গড়ে তোলার জন্যে। কেননা এই সত্যের পথে টিকে থাকতে হলে তাদের প্রায়ই সম্মুখীন হতে হবে এমন ধরনের কঠোর পরীক্ষার।

এখানে তাদের যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে সাধারণ দৃষ্টান্ত, এতে কোনো নবী কিংবা কোনো জাতির কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাদেরকে এখানে কেবল ঈমানের গুণে গুণান্বিত

করার কথা হয়েছে। কেবল মোমেনদের আদব-কায়দা তাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের পুর্বসূরীদের সংগে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, নবী-রসূলদের অনুসারীদের সংগে একই কাতারে আনা হয়েছে। যাতে তাদের অনুভূতিতে একথাটি স্থান লাভ করে যে, আকীদার বিষয়টি এক ও অভিন্ন এবং ঈমানদারদের বিশাল বাহিনীর মধ্যে তারাও অন্তর্ভুক্ত।

'আর বহু নবী ছিলেন যাঁদের সংগী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে। আল্লাহর পথে তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর পথে তারা হেরেও তখনো ক্লান্ত হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং দমেও যায়নি।'

এমন অনেক নবী আছেন, যাদের সংগে তার অনুসারী উম্মতরা একনিষ্ঠভাবে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহর রাস্তায় যে বিপদাপদ, যে পরীক্ষা আর যে আঘাত তারা পেয়েছে, তাতে তারা দুর্বল হয়নি, তাদের মন ক্লান্ত ও হীনবল হয়নি। দুঃখ-যাতনার কাছে তারা আত্মসমর্পণও করেনি। এটাই হচ্ছে মোমেনদের সত্যিকার অবস্থান। দ্বীন ও ঈমানের ব্যাপারে তারা ছিলেন অটল।

'আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন।'

আর ধৈর্যশীল তারা, যাদের অন্তর দুর্বল হয় না, যাদের শক্তি হীন হয় না, যাদের সংকল্প শিথিল হয় না, তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয় না, দমে যায় না এবং আত্মসমর্পণও করে না, ধৈযশীলদের জন্যে আল্লাহর ভালোবাসার বিরাট মূল্য রয়েছে। তা এমন এক ভালোবাসা, যা আঘাতের সময় যেমনি সমবেদনা জানায়, প্রয়োজনে তাদের আঘাত মুছেও ফেলে।

এখন পর্যন্ত বর্ণনাধারায় বিপদাপদ আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাহ্যিক চিত্র অংকন করা হয়েছে। অতপর তাদের মন আর অনুভূতির আভ্যন্তরীন চিত্র এখন পেশ করা হচ্ছে। এখানে তারা এমন ভয়াবহতার মুখোমুখী হয়, যা অন্তরকে প্রকম্পিত করে তোলে। এমন ভয়ংকর বিপদ মোকাবেলা করার জন্যে সে প্রস্তুত হয় যার সীমা-সংখ্যা নেই। কিন্তু তা মোমেনের মনকে আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হওয়া থেকে কখনোই মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত না। সাহায্যই মোমেনের প্রথম কাম্য নয়। ক্ষমা আর মাগফেরাতই মোমেনের প্রথম কাম্য। দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনা করার আগে মোমেন তার গুনাহ ও অপরাধ স্বীকার করে এবং তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে।

'তাদের অন্য কোনো কথা ছিলো না, ছিলো কেবল এটুকু হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের গুনাহ মোচন করো, আমাদের কাজে যে বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা মার্জনা করো। আমাদের পদযুগলকে দৃঢ় রাখো এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো, বিজয় দান করো।'

কোনো নেয়ামত কিংবা বিত্ত-বৈভব ও তাদের কাম্য নয়। পুণ্য আর প্রতিদানও কাম্য নয়। দুনিয়া আর আখেরাতের ছাওয়াবও তাদের কাম্য নয়। আল্লাহর সংগে তাদের এখানে আদব-শিষ্টাচার অনুপম অতুলনীয়। তারা যখন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে নিয়োজিত থাকে, তখন নিবিষ্ট মনে একমাত্র আল্লাহর কাছেই আত্মসমর্পণ করে। অপরাধ মার্জনা ছাড়া আল্লাহর কাছে আর কিছুই তারা চায় না। তারা চায় তাদের পদযুগল দৃঢ় রাখা আর কাফেরদের বিরুদ্ধে তাদের বিজয় দানের ওয়াদা করা। এমনকি এ সাহায্যও তারা নিজেদের জন্যে কামনা করে না, কামনা করে কুফরীকে পদানত করার জন্যে। আল্লাহর সাথে বান্দার এটাই হচ্ছে উপযুক্ত আদব ও যোগ্য শিষ্টাচার।

তারা নিজেদের জন্যে কোনো কিছুই কামনা করে না। তথাপিও আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে দুনিয়া অন্বেষণকারীরা যা কিছু কামনা করে তার সবটুকু, বরং তার চেয়েও বেশী কিছু তাদেরকে দান করেছেন। আখেরাতের সন্ধানীরা যা কিছু আশা করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তারও সবটুক দান করবেন। 'অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দান করেন দুনিয়ার এবং আখেরাতের ছাওয়াবের সৌন্দর্য।'

আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে এহসানের সাক্ষ্য দেন। তারা সুন্দরভাবে শিষ্টাচার পালন করেছে এবং সুন্দরভাবে জেহাদ সম্পন্ন করেছে। তাদের জন্যে তিনি নিজের ভালোবাসার ঘোষণা দিয়েছেন। আর তা যে কোনো নেয়ামতের চেয়ে বড়, যে কোনো ছাওয়াবের চেয়েও তা শ্রেষ্ঠ।

'আল্লাহ ভালোবাসেন মোমেনদেরকে-সৎকর্ম পরায়ন ব্যক্তিদেরকে।'

এভাবেই এ সম্পর্কিত চিত্র অংকন সমাপ্ত হয়। এতে ইসলামী চিন্তাধারার নিগূঢ়তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। এসব কিছুই এক সময় মুসলিম জামায়াতের লালন ও মানসগঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। আর সকল যুগের মুসলিম উম্মাহ এ ঘটনা থেকে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ লাভ করেছে। অতপর বর্ণনাধারা যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে মন্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের কাংখিত মন-মানস গঠন করা, যেসব কারণে পদস্খলন হতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক করা। মুসলিম জামায়াতকে ঘিরে যে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে সে বিষয়েও তিনি হুশিয়ার করেছেন।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় মক্কার কাফের মোনাফেক এবং মদীনার ইহুদীদের জন্যে সমালোচনার একটা সুযোগ এনে দেয়। মদীনায় তখনো খালেস ইসলামের গোড়াপত্তন হয়নি, বরং মদীনায় তখন পর্যন্ত মুসলমানরা ছিলো অনেকটা নতুন চারার মতো। বদর যুদ্ধ মদীনার অন্যান্য লোকদের কিছুটা ভয়-ভীতি দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। কারণ, বদর যুদ্ধে মুসলমানরা অভাবনীয় বিজয় লাভ করেছিলো। কিন্তু ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করলে পরিবেশ অনেকাংশে পরিবর্তন হয়ে যায়। ইসলামের দুশমনদের গোপনে দুশমনী করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুযোগ হয় তাদের সমাজে বিষ ছড়াবার। মুসলমানদের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাতে তারা ইসলাম সম্পর্কে আরো বেশী অপপ্রচারের সুযোগ পায়। বিশেষ করে শহীদ এবং আহতদের পরিবারে বেশী করে তারা চক্রান্তের জাল বুনাতে শুরু করে। যার ফলে মুসলমানদের শিবিরে বিদ্বেষ ছড়ানো দুর্বল এবং ঈমানদারদের মধ্যে হতাশা বিস্তার করা সুযোগ এনে দেয়।

কোরআন মজীদের পরবর্তী অধ্যায়ে আবার সেই একই যুদ্ধের চিত্র অংকন করা হয়েছে। যুদ্ধের দৃশ্যকে এখানে আরো খোলামেলা ও তাৎপর্যবহ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন কাফেরদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্যে। আল্লাহ তায়ালা এই যুদ্ধে কাফের-দুশমনদের ওপর সাহায্য ও বিজয় লাভের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। প্রথম যুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করেছিলেন সে কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এ অধ্যায়ে একথাটাও পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, এতে তারা যা খুইয়েছে, যা হারিয়েছে, তার কারণ হচ্ছে তাদের নিজেদের দুর্বলতা, মতবিরোধ এবং রসূলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা।

মোমেনদের দুঃসময়েও কাফের মোনাফেকদের তথ্যসন্ত্রাস

ভালো-মন্দ উভয় দিকসহ যুদ্ধের দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। অতপর আলোচনা আসছে এমন ভংগীতে, যাতে অস্থিরতা ও বিস্ময় দূরীভূত হয়ে যায়। মোনাফেকদের অন্তরকেও তা ভীতসন্ত্রস্ত করে দেয়। এভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সূক্ষ্ম পরিকল্পনা দিয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করান। বর্ণনাধারায়, বান্দাদের আয়ুর সুনির্দিষ্টতার কথা তাকে তা বারবার স্মরণ করানো হয়। শেষ দিকে তাদের চিন্তার বিভ্রান্তি এবং মৃত্যু আর শাহাদাত লাভ সম্পর্কে কাফেররা যে বিভ্রান্তি ছড়ায় তার সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এ প্রসংগে পুনরুত্থান সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করা হয়। মানুষ যেভাবেই মৃত্যুবরণ করুক মৃত্যুর মাধ্যমেই তার জীবনের সমাপ্তি ঘটবে। সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে আল্লাহর সমীপে ফিরে যেতে হবে। এরশাদ হচ্ছে,

হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো (শুনো), তোমরা যদি এই অবিশ্বাসী কাফেরদের অনুসরণ করতে ..... অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, (আর) এর ফলে (নিশ্চয়ই) তোমরা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (আয়াত ১৪৯)

উপরোক্ত আয়াতগুলোর প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাই যে, মানবজীবনে সাধারণত যেসব দৃশ্যের অবতারণা হয়, তার এক বিপুলাংশ এ আয়াতগুলোতে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ইসলামী চিন্তাধারার মৌলিকতত্ত্বও এ আয়াতগুলোতে নিহিত রয়েছে। এতে মানবজীবনের মূলতত্ত্ব এবং বিশ্ববিধানের রহস্য নিহিত রয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে, তাতে এক গভীর, জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী ভংগীতে যুদ্ধের চিত্র অংকন করা হয়েছে। যুদ্ধের কোনো দিকই এখানে বাদ দেয়া হয়নি, প্রত্যেকটিকে এমন ভংগীতে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মোমেনের অনুভূতিতে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। নিসন্দেহে এটা মানুষের মনে রেখাপাত করার মতো একটি ঘটনা। যুদ্ধের পরিবেশ-পরিস্থিতি আর ঘটনাপ্রবাহ মানবমনে বিরাট রকমের ছাপ মুদ্রিত করে। মনে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, আর স্পন্দন জাগিয়ে তোলে। অতপর আমরা দেখতে পাই যে, এসব আয়াতে নানাবিধ তত্ত্ব এমন ভংগীতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, যা মনে হবে জীবন্ত এবং ক্রিয়াশীল।

সন্দেহ নেই যে, এমন শব্দ এমন তত্ত্ব ও দৃশ্যের অবতারণা, বর্ণনাভংগী ও এর ষ্টাইল মানুষের কাছে পরিচিত নয়। অবশ্য যাদের আবার তা প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েছে তাদের কথা আলাদা।

'হে ঈমানদাররা! তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য করো .... তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক আর তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী।' (আয়াত ১৪৯-৫০)

যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজিত এবং নিহত দেখে মদীনার কাফের-মোনাফেক এবং ইহুদীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তারা ধারণা করেছিলো, এভাবে হয়তো তাদের অভিপ্রায় পূর্ণ হবে। ইসলামের অগ্রযাত্রা হয়তো চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই মোহাম্মদ (স.)-এর সংগী হয়ে পথ চলার পরিণতি সম্পর্কে তারা মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেয়ার অপপ্রচারে লিপ্ত হয়।

পরাজয়ের পরিবেশ নিসন্দেহে মনের গভীরে রেখাপাত করে, মুসলমান সমাজের মধ্যে মোনাফেকরা বিশৃংখলা আর অনৈক্য ছড়াবার চেষ্টা করে। নেতৃত্ব সম্পর্কে আস্থাহীনতা ছড়ায়। শক্তিশালী দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া থেকে দূরে সরে দাঁড়ানোকে নিরাপদ ও কল্যাণকর হিসেবে তাদের সামনে পেশ করে। যুদ্ধে যারা জয়লাভ করে তারাই নিরাপদ থাকে এমন একটা ধারণা মনে জাগিয়ে তোলা হয়। তাদের বিশ্বাসের কাঠামো চুরমার করার জন্যে চতুর্মুখি অপপ্রচার চালানো হয়।

এ কারণে কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কারণ, তাদের আনুগত্য করার পরিণতি হচ্ছে, মারাত্মক ক্ষতি আর বিনাশ। এতে কোনো লাভ নেই, কোনো কল্যাণ নেই। এদের কথা শুনলে এরা আবার তাদেরকে কুফরীর দিকেই ফিরে যেতে বাধ্য করবে। সুতরাং মোমেনকে হয় কুফরী করতে হবে আর না হয় কাফেরদের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে টিকে থাকতে হবে, অন্যথায় কাফের হিসাবেই তাকে ফিরে যেতে হবে। এর মাঝামাঝি কোনো ভূমিকা পালন করা মোমেনের জন্যে অসম্ভব। স্বীয় ভূমিকায় অটল থেকে নিজের দ্বীন ও ঈমান হেফাযত করার জন্যে কোনো মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করা তার জন্যে অসম্ভব।

বিজয়ীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সে হয়তো যুদ্ধের ময়দান থেকে কেটে পড়তে সক্ষম হবে। সে আত্মসমর্পণ আর আনুগত্য দ্বারা নিজের দ্বীন-ঈমান আর আকীদা-বিশ্বাসকে

তাদের কাছ থেকে হয়তো হেফাযত করতে পারবে বলে ধারণা করতে পারে। আসলে এটা এক বিরাট প্রবঞ্চনা বৈ কিছু নয়। এ ক্ষেত্রে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্যেই তাকে চেষ্টা-সাধনা করতে হবে। কুফরী, শেরেক, অন্যায়, অসত্য, গোমরাহী-বিভ্রান্তি আর তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে তাকে এগুতেই হবে। যে ব্যক্তির ঈমান-আকীদা তাকে কাফেরের আনুগত্য থেকে রক্ষা করে না, কাফেরদের কথা শুনতে বারণ করে না, ধরে নিতে হবে এমন ব্যক্তি শুরু থেকেই সে সত্যিকার ঈমান আর আকীদা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলো। কোনো আকীদা-বিশ্বাসের ধারক-বাহক যদি প্রতিপক্ষের বিশ্বাসের কাছে নুয়ে পড়ে তা হলে এটা হবে অবশ্যই তার পরাজয়। তাদের প্ররোচনায় কান দিলে শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুই পরাজয় থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। যদিও প্রথম পদক্ষেপে সে এটা অনুভব করতে পারবে না যে, সে ধীরে ধীরে এক নিকৃষ্ট পরাজয়ের দিকেই ছুটে যাচ্ছে। মোমেন তার আকীদা-বিশ্বাস আর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার দ্বীনের দুশমনের পরামর্শ যেন কখনো গ্রহণ না করে। এমনটি করার তার কোনো প্রয়োজনও নেই। এদের কথা শুনলে সে কুফরীর পথই অনুসরণ করবে। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে মোমেনদেরকে সতর্ক করেছেন, হুশিয়ার করেছেন। ঈমানের নাম নিয়ে তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন,

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা যদি কাফেরদের আনুগত্য করো, তারা তোমাদেরকে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, ফলে তোমরা হয়ে পড়বে ক্ষতিগ্রস্ত।'

ঈমান থেকে কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়ার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে? তাছাড়া কাফেরদের আনুগত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণ যদি হয় তাদের সহায়তা লাভ করা তবে বুঝতেই হবে যে তা নিছক ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে তাদের সাহায্য-সহায়তার রহস্য সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে,

'বরং আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের অভিভাবক। আর তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম সাহায্যদাতা'।

এ হচ্ছে এমন এক জায়গা যেখানে মোমেন বন্ধুত্ব কামনা করে, সাহায্য ভিক্ষা করে। যে ব্যক্তির অভিভাবক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তার অন্য কারো সাহায্যের কী প্রয়োজন হতে পারে! আল্লাহ তায়ালা যার সাহায্যকারী, বান্দাদের মধ্যে কারো সাহায্যের তার কী প্রয়োজন?

কাফেরদের মনে আল্লাহর ভীতি সঞ্চারণ

এরপর মোমেনদের অন্তকরণকে সুদৃঢ় ও অবিচল করার কথা বলা হয়েছে। দুশমনদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে । এই দুশমনরা আল্লাহর সংগে এমন কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তায়ালা যার জন্যে কোনো সনদ নাযিল করেননি। পরকালে যালেমদের জন্যে যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে, অন্তরের এই ভীতি ও আতংক হচ্ছে তার অতিরিক্ত।

'যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, আমি তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো। কারণ তারা আল্লাহর সংগে এমন কাউকে শরীক করেছে, যার কোনো সনদ তিনি নাযিল করেননি। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। আর যালেমদের আশ্রয়স্থল কতই না নিকৃষ্ট'!

এ ওয়াদা দেয়া হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবেন। যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিনতি পর্যন্ত তিনি একাই মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তাঁর দুশমনদের তিনি পরাজিত করে তাঁর বন্ধুদের বিজয় দানের ব্যাপারেও তিনি যিম্মাদার। আল্লাহর এ ওয়াদা চিরন্তন। তাঁর এ ওয়াদা ঈমান আর কুফরীর সংঘাতে হামেশাই সত্য হবে।

কেন কাফেররা মোমেনদের ভয় করবে? এর কারণ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের অন্তরে ঢেলে দেয়া ভীতি। কিন্তু এর জন্যে শর্ত হলো এই যে, মোমেনদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান বর্তমান থাকতে হবে। একমাত্র আল্লাহর বন্ধু হওয়ার অনুভূতিই তাদের অন্তরে বর্তমান থাকবে।

আল্লাহর বাহিনীই যে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে, এ ব্যাপারে তাদেরকে সকল সন্দেহও সংশয়মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহ যে তাঁর নিজের কাজে পরাক্রমশালী, এ ব্যাপারেও তাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে। কাফেররা দুনিয়াতে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। এ অটল বিশ্বাসও তাদের থাকতে হবে। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ যতোই এর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিক না কেন, আল্লাহ তায়ালা যে তাঁর এ ওয়াদা পূরণ করবেন, এমন বিশ্বাস মোমেনদের অন্তরে বর্তমান থাকতেই হবে। মানুষের চোখ যা কিছু দেখুক, আর তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যা কিছু বলুক না কেন, আল্লাহর ওয়াদা যে সেসব কিছুর চেয়ে বড় সত্য, এমন আস্থা আর বিশ্বাস ও মোমেনের অন্তরে বিদ্যমান থাকতেই হবে।

পক্ষান্তরে কাফেরদের মানষিক অবস্থা খুবই খরাপ। তারা সবসময় একটা অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় ভোগে। কারণ, তারা কোনো মহা শক্তিতে আস্থা রাখে না। এমন শক্তিধর কাউকেও তারা মানে না, যার হুকুম মানতে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি প্রাণী ও প্রতিটি অণুপরমাণু বাধ্য। তারা আল্লাহর সংগে এমন সব সত্ত্বাকে শরীক করে, যার কোনো সনদ প্রমাণ বা যৌক্তিকতা তাদের কাছে নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালা এমন কাউকে বিভূষিত করেননি। একথাটি এক গভীর তাৎপর্যমন্ডিত। এমনতর উক্তির সাক্ষাত কোরআন মজীদে বহুবার পাওয়া যায়। কখনো এ দ্বারা ভ্রান্ত দাবিদার ইলাহকে বিশেষিত করা হয়, কখনো এ দ্বারা আবার হয় বাতিল পাপীদের বিশ্বাসকে বিশেষিত করা হয়। এ উক্তি দ্বারা এক গভীর মৌলতত্ত্বের দিকেও ইংগীত করা হয়।

চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব আর সংগঠন যাই হোকনা কেন, তা কি পরিমাণ সময় পর্যন্ত টিকে থাকবে তা নির্ভর করে তার মধ্যে নিহিত শক্তির ওপর। এ শক্তি নির্ভর করে কার মধ্যে কী পরিমাণ 'সত্য' নিহিত রয়েছে তার ওপর। অর্থাৎ যে বিশ্ব বিধানের ওপর আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন, তার সংগে এ ব্যাপারটা যতোটা খাপ খাওয়ানো যায় ততোই এই বিশ্বাসের শক্তি ও সত্যতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানের সাথে বিশ্বাসের মিলন ঘটে– তখনই তা মহাসত্যে পরিণত হয়। এই অনুভূতির ওপরই আল্লাহ তায়ালা তাকে সত্যিকার শক্তি আর ক্ষমতায় ভূষিত করেন। এই শক্তি বিশ্ব-চরাচরে সর্বত্র কার্যকর। এছাড়া অন্য কোনো নীতিতে যতোই শক্তি প্রকাশ পাক না কেন– তা দুর্বল এবং ক্ষণস্থায়ী।

আর মোশরেকরা আল্লাহর সংগে অন্য ইলাহকে শরীক করে। নানা আকার-আকৃতিতে মূলত শেরেকের সূচনা হয় আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কাউকে খোদায়ী বৈশিষ্টের অংশ দান করার মধ্য দিয়ে। এসব বৈশিষ্ট বান্দাদের জন্যে আইন বিধান প্রণয়নের অধিকার চাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মানুষের আচার-আচরণ আর সমাজ-সংগঠনে তারা যেসব চলে, তা নির্ধারণের অধিকার গায়রুল্লাহকে প্রদানের মাধ্যমেও এটা বুঝা যায়। গায়রুল্লাহকে এসব বৈশিষ্ট্য দান করার পর তাদের রচিত আইন নেয়ার মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে।

আল্লাহ তায়ালা যে সত্যের ওপর এ বিশ্ববিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে কি এসব 'ইলাহ'-এর কোনো অধিকার রয়েছে? এক আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্ব চরাচরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তা এক আল্লাহর সংগেই সম্পর্ক স্থাপন করে, একমাত্র তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করে। তিনি এ বিশ্বলোককে সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ 'লা শরীক' আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করে নেয়, যেন নিশর্তভাবে তাঁর কাছ থেকে তারা আইন-বিধান আর মূল্যবোধ গ্রহণ করে। কোনো রকম শরীক-প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই এক আল্লাহর এবাদাতকে তারা মেনে নেয়– মেনে নেয় তাঁর শর্তহীন দাসত্ব।

ব্যাপক অর্থে যা কিছু তাওহীদের এই নীতি বহির্ভূত, তাই বাতিল, তাই সত্যের বিরোধী। এ কারণে তা অহেতুক, উদ্দেশ্যহীন এবং অর্থহীনও। তা কখনো কোনো শক্তি ও সনদ বহন করে

না। জীবন প্রবাহে প্রভাব ফেলার কোনো ক্ষমতা বা কোনো অধিকারও তার নেই। জীবনের মৌল উপাদান, জীবনের অধিকার এর কোনোটাই তার নেই। এ সব মোশরেক আল্লাহর সাথে এমন সব কিছুকে শরীক করে যার কোনো সনদ আল্লাহ তায়ালা অনুমোদন করেননি; তারা আল্লাহর সাথে অন্য দুর্বল, অক্ষম, ক্ষমতাহীন, কর্তৃত্বহীন ইলাহকে শরীক করে, শরীক করে অন্য আকীদা-বিশ্বাস আর চিন্তাধারাকে। পক্ষান্তরে মোমেনরা আশ্রয় নেয় এমন এক শক্তির, যার রয়েছে অপ্রতিহত ক্ষমতা, তাই তারা কখনো দূর্বল হয় না কোনো অবস্থাতেই তারা হীনমন্যতায় ভুগে না।

সত্য-মিথ্যার সংঘাতকালে আমরা আল্লাহর ওয়াদাকে সব সময়ই সত্য প্রতিপন্ন হতে দেখি। বহুবার এই বাতিল নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সত্যের মুখোমুখী হয়েছে, কিন্তু এতোসব কিছুর পরও বাতিল ছিলো ভীত-সন্ত্রস্ত। পক্ষান্তরে সত্য যখন অগ্রসর হয়ে এগিয়ে আসে, তখন বাতিলের শিবিরে অস্থিরতা দেখা দেয় শতধা বিভক্তি আর বিচ্ছিন্নতা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। যদিও দেখতে মনে হয় যে বাতিলের আয়োজন বিপুল, অনেক ব্যাপক, আর সত্যের পক্ষে আয়োজন-উপকরণ অতি নগণ্য, অতি সামান্য। তবু এক্ষেত্রে আল্লাহর ওয়াদাই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে বারবার।

'আমি অবিলম্বে কাফেরদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, তারা আল্লাহর সংগে এমন কিছুকে শরীক করে, যার সনদ তিনি নাযিল করেননি'।

এটা তো দুনিয়ার ব্যাপারে, আখেরাতেও তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত দুঃখজনক এবং হতাশাব্যাঞ্জক। কেননা, তারা ছিলো যালেম। 'আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। আর যালেমদের আশ্রয়স্থল কতোই না নিকৃষ্ট।'

ওহুদের সেই সংকটময় মুহূর্তটি

আল্লাহর এ ওয়াদা পূরণের ঘটনার বর্ণনাধারা তাদেরকে ওহুদ যুদ্ধের প্রান্তরে নিয়ে যায়। এ যুদ্ধের প্রথম দিকে বিজয় ছিলো মোমেনদের, তখন মোশরেক শিবিরে এমন ত্রাস সৃষ্টি হয় যে, তারা সবকিছু ফেলে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করে, তাদের হাত থেকে ঝান্ডা পড়ে যায়। তা তুলে নেয়ার জন্যে কোনো পুরুষ এগিয়ে আসেনি। অবশেষে এক মহিলা এগিয়ে এসে তা উর্ধে তুলে ধরে।

গনীমতের মালের পেছনে মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনীর মন দুর্বল হয়ে ছুটে যাওয়ার পরও এই বিজয় মুসলমানদের জন্যে পরাজয়ে পর্যবসিত হয়নি। এ নিয়ে নিজেরা বিবাদে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়নি। তাদের সেনাপতি রসূলুল্লাহ (স.)-এর নির্দেশ অমান্য করার আগে এ বিজয় কখনো পরাজয়ে পরিণত হয়নি। এখানে বর্ণনাধারা তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যায়। যুদ্ধের দৃশ্যের একান্ত কাছাকাছি, যুদ্ধের অবস্থা আর ঘটনা প্রবাহের কাছাকাছি এনে হাযির করে।

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে (সাহায্য দেয়ার) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি (অক্ষরে অক্ষরে) পালন করেছেন, (স্মরণ করো, যুদ্ধের প্রথম দিকে কিভাবে) তোমরা আল্লাহর অনুমতি (ও সাহায্য) নিয়ে তাদের ...... (মূলত এর মাধ্যমে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছ থেকে (ঈমানের দৃঢ়তার একটা) পরীক্ষা নিলেন। আল্লাহ তায়ালা হামেশাই ঈমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেন। (আয়াত ১৫২)

এখানে কোরআন মজীদের বর্ণনাধারায় যুদ্ধক্ষেত্রের পরিপূর্ণ দৃশ্য দেখানো হয়েছে। জয়-পরাজয়ের চিত্র আঁকা হয়েছে । এ এমন এক চিত্র, যা থেকে ময়দানের কোনো একটি আচরণ, কোনো একটি ছোট খাটো স্পন্দনও বাদ পড়েনি। বাদ যায়নি মনের কোনো ভাবও, চেহারার কোনো চিহ্নও– কোনো ছোটখাট ধারণা-কল্পনাও এ বর্ণনা থেকে ছাড় পায়নি। এ চিত্র অংকন করা হয়েছে এমনভাবে, যেন তা চোখের সামনে এখানে উদ্ভাসিত হয়ে আছে।

প্রতিটি স্পন্দনে একেকটা নতুন চিত্র এসে চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পর্বতে আরোহণের চিত্র, আরোহনের শব্দ, ভীত-বিহ্বল হয়ে পলায়নের চিত্র এবং যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নপর সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর নবীর আকুল আহ্বান সবই ভেসে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের জন্যে এরা যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখনকার চিত্র আঁকা হয়েছে এমনভাবে, যা মনকে সত্যিই নাড়া দেয়। ঠিক সে সময় তাদের মনের কী অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো, কী হয়েছিলো তখন তাদের প্রতিক্রিয়া, তারও নিখুঁত ছবি এতে আঁকা হয়েছে। এমন জীবন্ত চিত্র অংকন দ্বারা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা ছিলো মূলত কেবল কোরআনী বর্ণনাধারার একক বৈশিষ্ট্য। এটা কোরআন মজীদের এক অনুপম এবং বিস্ময়কর বর্ণনাধারা।

'আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্যে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদেরকে খতম করছিলে।'

এ ছিলো যুদ্ধের প্রথম দিকের অবস্থা। তখন মুসলমানরা মোশরেকদের খতম করছিলো, অর্থাৎ তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন-নিস্তেজ করে দিচ্ছিলো, অথবা তাদেরকে শেকড় থেকে উৎপাটিত করছিলো। এটা গনীমতের লোভের আবর্তে তাদের জড়িয়ে পড়ার আগের কথা। তখন আল্লাহর নবী তাদেরকে বলছিলেন, 'তোমরা ধৈর্যধারণ করলে বিজয় তো তোমাদেরই হবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর ভাষায় তাদের সংগে করা এই অংগীকার পূরণ করেছেন।

'এমনকি যখন তোমরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিলে এবং কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলে এবং তোমরা যা চাইছিলে, তা দেখার পর নাফরমানী প্রকাশ করছিলে। তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিলো দুনিয়া আর কারো কাম্য ছিলো আখেরাত'।

এ হচ্ছে তীরন্দাজ বাহিনীটির মনের অবস্থার বিবরণ। গনীমতের মালের লোভে তাদের একদল মানুষ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। রসূলুল্লাহ (স.)-এর সর্বাত্মক আনুগত্যের যারা সমর্থক ছিলেন এদের সাথে তাদের বিবাদ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি রসূলের আনুগত্যহীনতা পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়।

নিজেদের চোখের সামনে বাঞ্ছিত বিজয়ের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখার পর তারা এ বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তারা তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল চায় দুনিয়ার গনীমত আর অপর দল কামনা করে পরকালের ছাওয়াব। ফলে তাদের মাঝে আর ঐক্য থাকলো না। আকীদা-বিশ্বাসের এ দ্বন্দ্ব অন্যান্য যুদ্ধের মতো নয়, এ হচ্ছে একই সংগে ময়দানের যুদ্ধ এবং মনের যুদ্ধ। দেখা গেলো মনের যুদ্ধ বিজয়ী হওয়া ছাড়া ময়দানের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া যায় না। তাছাড়া এ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ, এ যুদ্ধে যাদের অন্তর সর্বাত্মকভাবে আল্লাহর জন্যে নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে তাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করবেন?

তারা যতোক্ষণ আল্লাহর ঝান্ডাকে রসূলের আনুগত্যকে সকল কিছুর উর্ধ্বে তুলে না ধরবে, ততক্ষণ তাদেরকে তিনি বিজয় দান করবেন না। এমন নিষ্ঠার সংগে পতাকা উর্ধে তুলে ধরতে হবে, যাতে এই পতাকা নিয়ে নিজেদের বাহাদুরী করার কিছুই না থাকে। কখনো কখনো বাতিলপন্থীরা বিজয়ী হয়। তাদেরকে সাময়িক বিজয় দান করার রহস্য আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। যারা একনিষ্ঠতার সাথে আকীদা-বিশ্বাসের পতাকা উত্তোলন করে না, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে পরীক্ষা আর যাচাই-বাছাই দ্বারা পাক-সাফ করে নেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি এটা জানতাম না যে, আল্লাহর রসূলের কোনো সাহাবীও দুনিয়া কামনা করতে পারে।(৩) এভাবে তাদের অন্তরকে তাদের সম্মুখেই উন্মোচিত করে তুলে ধরা হয় এবং তাতে কী রহস্য রয়েছে তাও প্রকাশ করা হয়। কোথা থেকে তাদের এই

(৩) ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ থেকে একাধিক সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মারদুইয়াও তাঁর বর্ণনায় এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

পরাজয় এসেছে, তা তাদের সামনে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়, যেন পরে তারা সে সব কিছু থেকে সরে থাকতে পারে। একই সময়ে তাদের সম্মুখে আল্লাহর কর্মকুশলতার একটা দিকও ব্যক্ত করা হয়। তাদের দুঃখভোগের পেছনে তাঁর যে হেকমত কার্যকর রয়েছে, সে রহস্যও তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। বাহ্যিক কার্যকারণের পেছনে যে রহস্য রয়েছে, তাও বলে দেখা হয়।

'অতপর তিনি তোমাদেরকে সরিয়ে দিলেন তাদের ওপর থেকে, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।'

মানুষের কজের পেছনে আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায় কার্যকর থাকে। তারা যখন দুর্বল হয়ে বিবাদে জড়িয়ে না-ফরমানীতে লিপ্ত হলো তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর শক্তি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন আর তীরন্দাজ দলকে পর্বতের ঘাটি থেকে এবং যোদ্ধাদেরকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে দিলেন। এবার তারা পলায়নের আশ্রয় নিলো। এসব কিছুর সূত্রপাত ঘটেছিলো তাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সবের আয়োজন ছিলো তাদেরকে পরীক্ষার জন্যেই। কঠোর বিপদাপদ, ভয়ভীতি, পরাজয় আর আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা দিয়ে তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। অবশ্য অনেক সময়ে কৌশলগত ভুল কিংবা কার্যকারণের কারণেও অনেক ঘটনা ঘটে। এ দু'য়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, নেই কোনো দ্বন্দ্ব। সূক্ষ্মদর্শী আর সর্ব বিষয়ে অবহিত মহান সত্ত্বার পক্ষ থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এরশাদ হচ্ছে,

'আর তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন তোমাদেরকে।'

তোমাদের পক্ষ থেকে যে দুর্বলতা, যে বিরোধ এবং যে না-ফরমানী প্রকাশ পেয়েছে, তিনি তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তেমনিভাবে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন তোমাদের পলায়নজনিত পরিবর্তনকে, ক্ষমা করে দিয়েছেন তিনি একান্ত নিজ অনুগ্রহে নিজের দান হিসাবে। তোমাদের মানবিক দুর্বলতার জন্যেই তিনি ক্ষমা করেছেন, কেননা এ দুর্বলতার পেছনে তোমাদের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিলো না, ছিলো না তোমাদের বারবার অপরাধ করার অভিপ্রায়। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন কারণ, ঈমানের বৃত্তে অবস্থান করে, তাঁর ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের কাছে নতি স্বীকার করে তোমরা যদি দূর্বলতাবশত কোনো অপরাধ করো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হবেন। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যে মোমেনদেরকে ক্ষমা করেন, এটা মোমেনদের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ অনুগ্রহ। যতোক্ষণ তারা আল্লাহর নিয়মনীতির গন্ডির মধ্যে অবস্থান করে, যতোক্ষণ তাঁর দাসত্ব-আনুগত্য মেনে নেয়, তাঁর ইলাহ হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্যই নিজেদের জন্যে দাবী করে না– অন্য কারো বানানো আইন কানুন গ্রহণ করে না, জীবনের মূল্যবোধ, মানদন্ড কেবল তাঁরই কাছ থেকে গ্রহণ করে, তাহলে মানবিক দূর্বলতা অক্ষমতার কারণে তারা যদি কোনো ভুল করে বসে তাহলে পরীক্ষা, নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই আর পাক, সাফ করে নেয়ার পর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভ করে।

এভাবে পরাজয়ের চিত্রকে এখানে জীবন্ত এবং স্পন্দনশীল করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

'আর তোমরা যখন ওপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছনে কারো প্রতি ফিরেও তাকাচ্ছিলে না, অথচ রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন।'

যাতে দৃশ্যের গভীরতা তাদের অনুভূতিতে জাগ্রত হয় এবং কার্যত তাদের মধ্যে লজ্জা ও অনুতাপ-অনুশোচনা জাগ্রত হয়। যেসব কারণে তাদের মধ্যে দুর্বলতা বিরোধ আর না-ফরমানী দেখা দিয়েছে, তাও এর ফলে স্পষ্ট হয়ে যায়।

একান্ত অল্পকথায় তাদের মনের একটা চিত্র আঁকা হয়েছে। তারা পলায়ন করে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পর্বতের উর্ধদেশে আরোহন করছিলো। তারা কেউ একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলো না– কেউ অন্যের ডাকে সাড়া দিচ্ছিলো না। আল্লাহর রসূল (স.) তাদেরকে ডাকছিলেন, তিনি

তাদেরকে ডাকছিলেন নিজের বেঁচে থাকা সম্পর্কে তাদেরকে নিশ্চিত ও আশ্বস্ত করার জন্যে। 'মোহাম্মদ (স.) নিহত হয়েছেন'- কেউ একজন এ বলে চিৎকার করার পর আল্লাহর নবী তাদেরকে ডাক দিলেন। পাপিষ্ঠের এ চিৎকার শুনে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, তাদের পা টলে ওঠে।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদের দুঃখ-বেদনার প্রতিবিধান করেছেন। তাদের পলায়ন দ্বারা নবী তার অন্তরে যে আঘাত পেয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিবিধান করেছেন। এ এমন এক দুঃখ যা তাদের অন্তরকে ভারাক্রান্ত করে দিয়েছিলো। এ দুঃখ ছিলো আল্লাহর হাবীব আর নিজেদের রাসূলকে এ অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ। তিনি একা দাঁড়িয়ে আছেন আর তারা তাঁকে একা ফেলে পলায়ন করলো! এর ফলে যে তাদের নবী ব্যথা পেয়েছিলেন, তাদেরকে অন্য যতো কষ্ট পেতে হয়েছে, তার মধ্যে এটা ছিলো সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে তীব্র। এ অপরাধের কারণে যে অনুশোচনা লজ্জা, দু:খ তাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছিলো, অন্য সবকিছু সে তুলনায় ছিলো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। যে কষ্ট তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে যে সম্পদ তাদেরকে হারাতে হয়েছে, তার চেয়ে এটা ছিলো অনেক বড়।

'অতপর তোমাদের ওপর এলো শোকের ওপর শোক, যাতে করে তোমরা তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ না করো যার সম্মুখীন হচ্ছ, সে জন্যে বিষন্ন না হও।' ....।' (আয়াত ১৫৩)

'তোমরা যা কিছুই করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা অবহিত আছেন।'

পরাজয়ের ভয়াবহতার পর এক অনাবিল স্বস্তির উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। যেসব মোমেন আপন পালনকর্তার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলো, এ স্বস্তি হচ্ছে তাদের অন্তরের জন্যে। এক সূক্ষ্ম তন্দ্রাভাব তাদের আচ্ছন্ন করে নেয়, তারা প্রশান্ত চিত্তে তাঁর কাছে পুনরায় আত্মসমর্পণ করে।

'অতপর তিনি তোমাদের ওপর শোকের পরে শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিলো এক ধরনের তন্দ্রাভাব, যা তোমাদের মধ্যে একটি দলকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছিলো।'

এ হচ্ছে আল্লাহর রহমতের এক বিস্ময়কর ক্ষমতা, যা তাঁর মোমেন বান্দাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয়। তন্দ্রাভাব যখন হতাশাগ্রস্ত মোজাহেদদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তা তাদের দেহ-অবয়বে যাদুর মতো কাজ করে। প্রশান্তি তাদের গোটা দেহে পরিতৃপ্তি ছড়িয়ে দেয়, যার রহস্য মানবীয় জ্ঞানের জগতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

আমি একথা একান্ত আমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোকেই বলছি, অস্থিরতা আর কঠোরতার সময় আমি নিজে এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, আল্লাহর গভীর দয়া ও রহমত আমি তখন নিজে অনুভব করেছি। অনুভব করেছি এমনভাবে, যা বর্ণনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

তিরমিযি, নসাঈ এবং হাকেম হাম্মাদ ইবনে সালমা, সাবেত, আনাস আবু তালহা (রা.)-এর সূত্রে এই হাদীস বর্ণনা করে বলেন, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমি মাথা তুলে তাকালাম। তখন তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যাকে তন্দ্রাভাব আচ্ছন্ন করে নেয়নি। আবু তালহা থেকে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের দিন আমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ছিলোাম, এসময় তন্দ্রাভাব আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে দিলো। তখন বারবার তরবারি আমার হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিলো আর আমি তা বারবার তুলে নিচ্ছিলাম।

সংকটময় মুহূর্তে দুর্বল ঈমানদারদের অবস্থা

অবশ্য অন্য দলে ছিলো দুর্বল ঈমানদার। যারা কেবল নিজেদেরকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলো। যারা তখনো জাহেলী চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেনি, পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর কথা আত্মস্থ করেনি। তাদের অন্তর তখনো পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হয়নি। তারা

তখনো এটা উপলব্ধি করতে পারেনি যে, যেসব বিপদাপদ তাদের ওপর আসে, তাদের পরীক্ষা এবং জাহেলিয়াতের পংকিলতা থেকে তাদের হৃদয়কে পাক-সাফ করার জন্যেই এ সবের ব্যবস্থা।

'আর অন্য দল নিজেদেরকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলো।'

আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তারা মুর্খদের মতো মিথ্যা ধারণা করছিলো। তারা বলছিলো, আমাদের হাতে কি করার কিছুই নেই? এ আদর্শের ধারক-বাহকরা তো জানেই যে, তাদের নিজেদের বলতে কিছুই নেই। তাদের নিজেদের সব কিছুই আল্লাহর জন্যে। তারা যখন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্যে বের হয়, তখন কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই তারা বের হয়। তারা আল্লাহর ফয়সালার কাছে নিজেদের সমর্পণ করে, এতে যা কিছু ঘটে সন্তুষ্টচিত্তে তা তারা মেনে নেয়।

পক্ষান্তরে যাদের কাছে নিজেদের চিন্তাই থাকে বড়, নিজেরাই হয় নিজেদের সকল চিন্তা কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু, তারা হচ্ছে এমন লোক যাদের অন্তরে ঈমানের তাৎপর্য তখনো পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করেনি, তখনো তাদের মনে ঈমান তেমন বদ্ধমূল হয়নি। এদের মধ্যে রয়েছে সে দলটি যাদের কথা কোরআন মজীদ এখানে আলোচনা করছে।

এরা এমন এক দল, যাদেরকে নিজেদের নানা রকমের চিন্তা পেয়ে বসেছিলো। নিজেদেরকে নিয়েই যারা ছিলো ব্যাকুল আর ব্যতিব্যস্ত। তারা আরো মনে করে যে, তাদেরকে হঠাৎ করে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধের ইচ্ছা তাদের ছিলো না এবং যুদ্ধের পরও এক এক করে তাদেরকে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ জন্যে তাদেরকে নিহত হয়ে, আহত হয়ে এবং দুঃখ-যাতনা ভোগ করে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে আল্লাহর পরিচয় তাদের জানা নেই। তাই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মূর্খদের মতো তারা অসত্য ধারণা পোষণ করে। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কথা চিন্তা করাও অসত্য যে, তিনি নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়ে ধ্বংস করছেন, যে যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের কিছুই করার নেই। আহত আর নিহত হওয়ার জন্যে তিনি যেন হঠাৎ করেই তাদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে সাহায্য করছেন, তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস করে, 'আমাদের কি কিছু করার নেই? 'তাদের এ উক্তিতে নিহিত রয়েছে যুদ্ধ আর যুদ্ধের নেতৃত্ব সম্পর্কে আপত্তিকর কথা। এরা ছিলো সে দলের অন্তর্গত, যারা মদীনা থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে রাজী হয়নি। অবশ্য এরা কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সংগে মদীনায় ফিরেও যায়নি। কারণ তাদের অন্তরে শান্তি ছিলো না। তাদের ধারণা কল্পনার পূর্ণ পরিচয় দেয়ার পূর্বেই এই বিষয়টা পরিষ্কার করা হয়, তাদের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য তুলে ধরা হয়। তাদের উক্তির প্রতিবাদ করে বলা হয়,

'বলো, গোটা ব্যাপারটি আল্লাহর হাতেই নিয়ন্ত্রিত'।

বিষয়টি তাদের বা অন্য কারো হাতেই নেই। ইতিপূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে বলে দিয়েছেন, 'নির্দেশ দেয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে জেহাদ করা, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িত করা এবং সেজন্যে অন্তরকে হেদায়াত দান করা, এসব কিছুই আল্লাহর হাতে নিহিত। এতে কোনো মানুষের হাত নেই। তারা কেবল নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে, পারে নিজেদের বায়াতের অংগীকার পূরণ করতে।

অবশেষে যা আল্লাহ তায়ালা চান এবং যেভাবে চান তাই হবে। তাদের নিজেদের কল্পনা প্রকাশ করার পূর্বেই তাদের অন্তরে চেপে রাখা বিষয়টি প্রকাশ করা হয়, 'তারা অন্তরে এমন কিছু গোপন রাখে, যা তোমার কাছে প্রকাশ করতে চায় না এবং তা আপত্তি আর অভিযোগে ভরপুর। তারা অন্যায় নেতৃত্বের বলি হয়েছে। তারা মনে করে তারা নিজেরা যুদ্ধ পরিচালনা করলে এ পরিনতির মুখোমুখী হতো না। 'তারা বলে, নির্দেশ দেয়ার কোনো অধিকার আমাদের থাকলে আমাদেরকে এখানে এমন ভাবে মরতে হতো না।' এটা ছিলো তাদের মনের ভাব। পরাজয়ের

কালে তাদের মনে তা এ ভাবে জাগ্রত হয়। তাদের ধারণা মতে পরাজয়ের জন্যে তাদের চরম মূল্য দিতে হয় । পরাজয়ের এ ফল ছিলো তাদের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশী, অনেক তীব্র। বিষয়টিকে তারা তখনো স্পষ্ট করে দেখতে পায়নি। এই বিষয়টি তাদের মনে কখনো দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূলও হয়নি। তাদের ধারণা জন্মেছিলো যে, নেতৃত্বই তাদেরকে এ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সিদ্ধান্তের ভার তাদের হাতে থাকলে এমন পরিণতি হতো না। মূলত এটা ছিলো নিছক তাদের মনের ধারণা। ঘটনাবলীর পেছনে তারা আল্লাহর হাত দেখতে পায়নি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে আল্লাহর যে রহস্য রয়েছে তা তারা বুঝতে পারেনি। গোটা বিষয়টিই তারা মনে করেছিলো কেবল ধ্বংস আর ক্ষতি। এখানে তাদের চিন্তাটাকে গভীরভাবে সংশোধন করা হয়-সংশোধন করা হয় জীবন মৃত্যুর ব্যাপারটিও। মুলত এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে একটাই রহস্য লুক্কায়িত রয়েছে।

'তুমি বলে দাও তোমরা যদি আজ নিজেদের ঘরেও বসে থাকতে, তাহলেও যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে, নিজেদের অবস্থান থেকে তারা বেরিয়ে আসতো, ...।' (আয়াত ১৫৪)

তুমি বলে দাও যে, তোমরা যদি নিজেদের গৃহেও অবস্থান করতে, নেতৃত্বের ডাকে সাড়া দিয়ে যদি যুদ্ধের জন্যে নাও বেরিয়ে আসতে, তাতেও এটা হতো তোমাদের নিজেদের ভাগ্যলিপি। যাদের ভাগ্যে মৃত্যু ছিলো অবধারিত, তারা নিজেদের অবস্থানস্থলের দিকে বেরিয়ে আসতো। কেননা মৃত্যুর একটা সময় এবং স্থান নির্ধারিত রয়েছে, যার কখনো পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি লম্বা লম্বা কদম ফেলে সেদিকেই ছুটে যায়; অথবা চলে নিজের পায়ে হেঁটে, সর্বাস্থায় সে মৃত্যুর অবস্থানস্থলের দিকেই চলতে থাকে। মৃত্যু থেকে কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। কেউ তাকে অন্য কোনো অবস্থানস্থলের দিকেও চালিত করতে পারে না।

কী চমৎকার ব্যাখ্যা কী চমৎকার বর্ণনা! বলা হয়েছে 'নিজেদের অবস্থানস্থলের দিকে তারা এগিয়ে যায়।' যেখানে অবস্থান গ্রহণ করে মানুষ শান্তি পায়, সন্তর্পণে পা ফেলে সেদিকেই সে এগিয়ে যায়, প্রতিটি ব্যক্তি সেখানে গিয়ে তার যাত্রা শেষ করে। এমন এক অজানা কারণে সে সেখানে ছুটে যায়, যা সে নিজেও বুঝতে পারে না। কেবল আল্লাহ তায়ালাই তা জানেন। তিনি তাদের মালিক। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই হস্তক্ষেপ করেন। মোমেনের অন্তরের জন্যে একটি অতি স্বস্তিদায়ক ব্যাপার। এটা আল্লাহর ফয়সালা। তার পেছনে আল্লাহর কোনো না কোনো রহস্য নিহিত রয়েছে। 'তাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তা পরীক্ষা করে দেখতে চান। যা কিছু তাদের মনে নিহিত রয়েছে তিনি তা পরিশুদ্ধ করে দিতে চান।

অন্তরের সন্দেহ পরিষ্কার করার জন্যে এবং তা বের করে আনার জন্যে— পরীক্ষার মতো বিষয় আর কিছুই নেই। পরীক্ষা দ্বারা অন্তরের খুঁত ও 'রিয়া' দূর করা হয়, নিখুঁতভাবে অন্তরের গোপন বিষয়গুলোকে পরিশুদ্ধ করা যায়। কঠিন পরীক্ষার পর অন্তরে আর কোনো খাদ থাকে না, তাতে থাকে না কোনো খুঁত। কেননা অন্তরে যা কিছু রয়েছে, এমন সব গোপন বিষয় যা মানুষের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে, অন্তরের প্রচ্ছন্ন বিষয়, যা কেবল অন্তরেই প্রচ্ছন্ন থাকে আলোতেও যা প্রকাশ পায় না, আল্লাহ তায়ালা তা ভালো করে জানেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা এখানে মানুষের কাছে প্রকাশ করতে চান। অনেক সময় তারা নিজেরাও তা জানতে পারে না।

যুদ্ধের দিন যখন দু'টি দল পরস্পর মুখোমুখী হয় এবং একটি দল যে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে সে সম্পর্কে তাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন। দুর্বল হয়েই তারা পশ্চাদাপসরণ করেছিলো। পরে সে কারণে তাদের অন্তরও প্রকম্পিত হয়েছিলো।

'যে দিন দুইটি দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলো, সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো ....।' (আয়াত ১৫৫)

এ আয়াতে তীরন্দাজ দলটির দিকে ইংগীত রয়েছে। তাদের মনে গনীমতের লোভ উদয় হয়েছিলো, তাদের মনে এমন ধারণাও জন্ম নিয়েছিলো যে, আল্লাহর নবী বুঝি তাদের পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করবেন। মূলত এটাই ছিলো তাদের অপরাধ, এভাবেই শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলো। অবশ্য এ আয়াতে মানব মনের একটি আলাদা চিত্রও অংকন করা হয়েছে। যখন মানুষ কোনো অপরাধ করে, তখন আল্লাহর সংগে তার মনের সম্পর্ক দুর্বল এবং শিথিল হয়ে পড়ে। আল্লাহর সংগে তার মনের দৃঢ়তা ও ভারসাম্য ব্যাহত হয়। আল্লাহর সংগে তাদের মনের সম্পর্ক নানা দিক থেকেই বাধাগ্রস্ত হয়ে ওঠে। আল্লাহর সন্তুষ্টির ব্যাপারে তাদের মনের আস্থা বিনষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় শয়তান তাদের মনে প্রবেশের সহজ পথ পেয়ে যায়। একের পর এক তাদেরকে পদস্খলনের দিকে চালিত করতে থাকে। নিরাপদ আশ্রয় আর মুল্য লক্ষ্য থেকে তাদের অন্তর তখন সরে যায়। এ কারণে শত্রুর মোকাবেলায় নবী-রসূলের সংগী হয়ে যারা যুদ্ধ করেছেন, এই ভুল ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা তথা 'এস্তেগফার'-এর দিকেই তারা সর্বপ্রথম মনোনিবেশ করেছেন। এই এস্তেগফার তাকে পুনরায় আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর সংগে তার সম্পর্ককে দৃঢ় করে। পাপ থেকে মনকে মুক্ত করে। প্রবঞ্চনা থেকে তাকে মুক্ত করে। যে ছিদ্র দিয়ে শয়তান প্রবেশ করে তাকে বন্ধ করে দেয়। শয়তানের পথ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা থেকে বিচ্ছিন্ন করার উপায়, আল্লাহর আশ্রয় থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার পথ। এ পথেই মানুষের মনে শয়তান প্রবেশ করে এবং একের পর এক তাদের পদস্খলন ঘটায় এবং তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রান্তে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় আল্লাহর আশ্রয় থেকে অনেক অনেক দূরে। যেখানে গিয়ে তারা তখন আর আল্লাহর আশ্রয় লাভ করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এমন সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যাতে তারা এ সত্তেও পুনরায় আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। তিনি শয়তানকে তাঁর কাছ থেকে বান্দাদের বিচ্ছিন্ন করার সুযোগ দেন না। তিনি নিজের নাম দিয়েছেন 'গাফুরুন হালীম' অতি ক্ষমাশীল, অতি ধৈর্যশীল বলে। তিনি অপরাধীকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেন না। যখন তিনি দেখেন, তাদের মন আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে যেতে চায় না, পলায়ন করতেও চায় না। তখন তিনি তাদের প্রতি আরো বেশী দয়াবান থাকেন।

জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত কখনো পরিবর্তন হয় না

জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্তের সারকথাও এখানে বিবৃত করা হয়। এ ব্যাপারে কাফের-মোনাফেকদের ভ্রান্ত ধারণাও অপনোদন করা হয়েছে। ঈমানদারদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, যেন তাদের চিন্তাধারা ওদের মতো না হয়। অবশেষে তাদেরকে এমন সব মূল্যবোধের দিকে যা তাদের দুঃখ-যাতনা লাঘব করতে সক্ষম করে। এরশাদ হচ্ছে,

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমরা অবিশ্বাসী কাফেরদের মতো হয়ো না, এই কাফেরদের কোনো ভাই (বন্ধু) যখন বিদেশ...... করে দেন (এদের জেনে রাখা উচিৎ যে,) আল্লাহ তায়ালাই মানুষের জীবন দেন, আল্লাহ তায়ালাই মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং ....। (আয়াত ১৫৬)

যুদ্ধের প্রসংগে এ আয়াতগুলোর সম্পর্ক এই যে, এটা ছিলো এমন সব মোনাফেকদের উক্তি, যারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই যুদ্ধের ময়দান থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলো এবং মদীনার সেসব মোশরেকদের উক্তি, যারা তখনো ইসলামে প্রবেশ করেনি। কিন্তু সেসব মোনাফেক আর মোশরেকদের সংগে মুসলমানদের কিছু সম্পর্ক ছিলো। উপরন্তু ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাতের ঘটনা তাদের অন্তরে আক্ষেপ-অনুতাপ সৃষ্টি করে। যুদ্ধে জীবন দেয়ার জন্যে তাদের অন্তরে দুঃখবোধ জাগিয়ে তোলে। এতে সন্দেহ নেই যে, এই বিয়োগান্ত ঘটনা মুসলিম সমাজে অনেক শোক আর

বিষাদের সৃষ্টি করে। এ কারণে কোরআন মজীদ তাদের চিন্তাধারাকে সংশোধন করে এবং এ সব যে চক্রান্তকারীদের কর্মকান্ড, এখানে তা বলে দেয়।

কাফেররা বলেছিলো, 'তারা আমাদের কাছে থাকলে মারা যেতো না, নিহত হতো না।'

তাদের এ উক্তি ঈমানদার ও কাফের ব্যক্তির চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরেছে। মানুষের গোটা জীবন এবং জীবনের সব ঘটনাবলী যে নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়, এ উক্তি সে রীতির বিরোধী। ঈমানদার ব্যক্তি আল্লাহর চিরন্তন রীতি উপলব্ধি করে, আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপ্রায়কে স্বীকার করে নেয় । সে আল্লাহর সিদ্ধান্তে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে। সে জানে যে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, সে কেবল তাই পাবে। সে এটাও জানে যে, তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্যে এখানে তাকে কোনো রকম বিপদে ফেলা হয় না। আবার আনন্দ দ্বারাও দুঃখের জন্যে তার অন্তর প্রফুল্ল হয় না। সে আক্ষেপও করে না যে, এমনটি না করলে সে এ পরিণতির সম্মুখীন হতো না। ঘটনা ঘটার পর এমন আক্ষেপ-অনুতাপ সে কোনো দিনই করে না। সুতরাং তাকদীর আর তদবীরের পর যে পরিণতিই দেখা দেয়, প্রশান্তচিত্তে সে তা মেনে নেয়। সে একথা বিশ্বাস করে যে, যা কিছুই ঘটেছে, তার মধ্যেই আল্লাহর ফয়সালা রয়েছে এবং যা কিছু ঘটেছে, তা ঘটাই ছিলো স্বাভাবিক, তা ঠেকাবার কোনো উপায় ছিলো না। যদিও সে নিজের কার্যকারণ দ্বারাই তা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এটাই হচ্ছে তার কাজ, আর তা মেনে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ইতিবাচক ভূমিকা আর তাওয়াককুলের মধ্যে ভারসাম্যের রহস্য এখানে। এতে তার মন প্রশান্ত থাকে । পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এ ধরনের সুস্থ আকীদা থেকে যার অন্তর দূরে থাকে, সে সারাক্ষণ একটা অস্থিরতায় ডুবে থাকে, সর্বদা সে 'যদি', 'যদিনা, 'হায়' এবং 'হায় আক্ষেপ' ইত্যাদির আবর্তে হাবুডুবু খায়।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা যা পেয়েছে আর যা হারিয়েছে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সতর্ক করে দিচ্ছেন তারা যেন কাফেরদের মতো না হয়। এটা বলা হয়েছিলো মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্যেই। কারণ এসব কথা দ্বারা কাফেররা আক্ষেপ আর অনুতাপই প্রকাশ করে থাকে বেশী। জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে যদি তাদের কোনো নিকটাত্মীয় মারা যায়, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় তখন তাদের অবস্থা কী হয় তা সহজেই অনুমেয়।

'হে ঈমানদাররা! তোমরা কাফেরদের মতো হয়ো না, তাদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোনো অভিযানে বের হয়, কিংবা জেহাদে গমন করে, তখন তারা তাদের সম্পর্কে বলে,

'তারা আমাদের কাছে থাকলে এভাবে নিহত হতো না'।

পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে, তার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে নিজেদের চিন্তাধারার অমূল্যায়নের কারণেই আসলে তারা এসব কথা বলে। যা কিছু ঘটে থাকে, তার আসল কারণ সম্পর্কে জানে না বলেই তারা এসব কথা বলে। তারা কেবল বাহ্যিক কার্যকারণ এবং ভাসা ভাসা দিক ছাড়া এখানে আর কিছুই দেখতে পায় না। তাদের সম্পর্কে তারা কিছু জানে না বলেই এসব কথা বলে,

'যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের অন্তরে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে'।

তাদের ধারণা যে, তাদের ভাই-বন্ধুরা জীবিকার সন্ধানে বের হওয়ার কারণে মৃত্যুবরণ করেছে, কিংবা জেহাদের অংশগ্রহণের কারণেই তারা এভাবে নিহত হয়েছে। তারা মনে করে যে, ঘরবাড়ি ছেড়ে তাদের বের হওয়াই ছিলো মৃত্যু বা নিহত হওয়ার মূল কারণ।

তারা যদি জানতে পারতো যে, এর আসল কারণ হচ্ছে তাদের মৃত্যুর ডাক আসা, তাহলে এসব কথা তারা বলতো না, বস্তুত জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহর নীতিই হচ্ছে এর মূল কারণ, এটা বুঝতে পারলে তারা আক্ষেপ-অনুতাপ কিছুই করতো না। তখন তারা একান্ত ধৈর্যের সংগে পরীক্ষার সম্মুখীন হতো এবং সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতো।

'আর আল্লাহ তায়ালাই তো জীবন-মৃত্যু দান করেন'।

জীবন দান করা তাঁর হাতেই নিহিত। তিনি যা দান করেছেন, তা ফেরত নেয়ার কাজও তাঁরই হাতে নিহিত। নির্ধারিত সময়ে এবং নিদৃষ্ট ওয়াদা অনুযায়ী তা ঘটবে। মানুষ পরিবার-পরিজনের মধ্যে থাকুক, কিংবা জীবিকার সন্ধানে বা কোনো ময়দানে জেহাদে থাকুক, উভয়টাই এক সমান। তাঁরই কাছে সে প্রতিদান পাবে এবং তাই পাবে, যা তার জ্ঞান অনুযায়ী ঠিক।

'আর তোমরা যা কিছু করো, তার সব কিছুই আল্লাহ তায়ালা দেখেন।'

তিনি যা দেখেন, সে ব্যাপারটি কেবল মৃত্যু বা হত্যার মধ্যে শেষ হয়ে যায় না। সেখানে এটাই শেষ কথা নয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেসব দানে ভূষিত করেন, সেখানে মৃত্যু কোনো শেষ বস্তু নয়-সেখানে অন্যান্য কিছু উন্নত মূল্যবোধও রয়েছে।

'তোমরা যদি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও, সর্বাবস্থায় তোমরা আল্লাহর সমীপে একত্রিত হবে।'

এ ধারণা-বিবেচনায় আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করা বা নিহত হওয়া বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম। মানুষ জীবনে যেসব সম্পদ উপকরণ, যেসব প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং পদমর্যাদা ও বিত্তবৈভব সংগ্রহ করে, তার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু অনেক শ্রেয় অনেক মূল্যবান। শ্রেয় এজন্যে যে, তার পেছনে রয়েছে আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত। বাস্তবতার মানদন্ডেও তা অনেক শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে এ মাগফেরাত আর এ রহমতের দিকেই আহ্বান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাদেরকে তাদের কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করেন না , তিনি তাদের সমর্পণ করেন এমন বিষয়ের কাছে, যা শুধু আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের সংগে তাদের অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন করেন। মানুষ যা কিছু এ দুনিয়ায় সংগ্রহ করে, মানুষের অন্তর যেসব বিষয়ের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করে, তার চেয়েও এটা অনেক শ্রেয় ও উত্তম।

পরিশেষে তাদের সকলকেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তারা বিছানায় মৃত্যুবরণ করুক অথবা পৃথিবীর অন্য কোথাও বিচরণকালে মৃত্যুবরণ করুক বা জেহাদের ময়দানে নিহত হোক, মৃত্যুর এ প্রত্যাবর্তনস্থল ছাড়া তাদের জন্যে অন্য কোনো প্রত্যাবর্তনস্থল নেই, নেই অন্য কোনো আশ্রয়স্থল। সর্বাবস্থায় পরিণতি এক এবং একই হবে। এমনি মৃত্যু আসুক বা নির্ধারিত কাজে সে নিহত হোক, আল্লাহর দিকেই ফিরে তাকে যেতে হবে। হাশরের দিন তাঁর সমীপেই তাকে সমবেত হতে হবে। তখন হয় সে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত আর মাগফেরাত লাভ করবে, অথবা সে লাভ করবে আল্লাহর গযব ও আযাব। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের জন্যে এসব ব্যাপারে খামাখা চিন্তা করে, সে হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকা। মৃত্যু তো তার সর্বাবস্থায় হবেই।

এভাবেই মানুষের অন্তরে জীবন-মৃত্যুর আসল রহস্য বদ্ধমূল হয়, বদ্ধমূল হয় আল্লাহর সিদ্ধান্তের মূল সত্যটি। আল্লাহর কার্যকর সিদ্ধান্তে তার অন্তর পরিতৃপ্ত হয় । আল্লাহর সিদ্ধান্তের পেছনে যে রহস্য রয়েছে তা সে তখন সহজেই বুঝতে পারে।

নবুওতী সত্ত্বা ও তার কোমল প্রকৃতি

অতপর কোরআন মাজীদের বাচনভংগীতে শুরু হয় এক নতুন বিবরণী। এ বিবরণীর কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে নবীর মহান নবুওত ও নবুওতী সত্তা। এতে উম্মাতে মুসলিমার প্রতি আল্লাহর রহমত এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যাতে তা এমনিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর চতুর্পার্শ্বে মুসলিম জামায়াতের জীবনকে সুসংহত এবং সুসংগঠিত করার ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনব্যবস্থার কিছু কিছু সূত্র রয়েছে, রয়েছে সংগঠনের কিছু নিয়ম-নীতি। এরশাদ হচ্ছে,

এটা আল্লাহর এক অসীম দয়া যে, তুমি এদের সাথে ছিলে কোমল প্রকৃতির, যদি তুমি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষ........ অতপর (সেই পরামর্শের ভিত্তিতে) সংকল্প যখন নিয়ে নেবে তখন (তার সফলতার ব্যাপারে) আল্লাহর ওপর ভরসা করো, আর আল্লাহ তায়ালা (হামেশাই তাঁর ওপর একনিষ্ঠ) নির্ভরশীর এই মানুষদের ভালোবাসেন। (আয়াত ১৫৯)

এ আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, এর সংগে আরো অনেকগুলো মৌলিক বিষয় এসে সম্পৃক্ত হয়েছে। সে মৌলিক বিষয় গুলো হচ্ছে, মহানবী (স.)-এর নবুওত ও তাঁর নবী স্বত্ত্বার মূলতত্ত্ব। এভাবে বড় বড় কয়টা মূলনীতিকে এখানে অতি অল্প কথায় ব্যক্ত করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরিত্রে যেভাবে আল্লাহর রহমত প্রতিবিম্বিত হয়েছিলো আমরা তার রহস্য এখানে দেখতে পাই। তার মূল তত্ত্ব আমরা জানতে পারি। মহানবী (স.)-এর কোমল স্বভাব-চরিত্রের প্রকৃতি আমরা জানতে পারি, জানতে পরি তাঁর দয়াসলুভ কল্যাণময়ী স্বভাবের বিষয়টি, যে কারণে এতো মানুষ তাঁর চারপাশ একত্রিত হয়েছিলো, তাকে কেন্দ্র করে তার পাশে এতো মানুষের সমাবেশ ঘটেছিলো।

যে মূলনীতির ওপর ইসলামী সমাজজীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সেই শূরা বা পরামর্শভিত্তিক বিধান সম্পর্কেও এখানে আমরা কিছু কথা জানতে পারি। বাহ্যত যেসব ক্ষেত্রে পরামর্শ করা কর্তব্য, সে ক্ষেত্রেই তাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ পরামর্শের ফলাফল কি তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর সূচনায়ই আমরা দেখতে পাই, পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সে সম্পর্কে দৃঢ় ও স্থির থাকতে বলা হয়েছে। এ নিয়ে কোনো দ্ব্যর্থতা এবং অস্পষ্টতা থাকতে পারে না। এর মাধ্যমেই আন্দোলন আর সংগঠনের ভিত্তি তৈরী হয়। আমরা এর দ্বারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার রহস্য উদঘাটন করতে পারি, সব কিছুকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দেয়ার উদ্দেশ্য জানতে পারি। ঘটনা পরম্পরা ও তার পরিণতির একমাত্র কর্তা আর নিয়ন্তা কেবল তিনিই। তিনি ছাড়া এতে অন্য কারো হাত নেই। গনীমতের মাল খেয়ানত করা, তা গোপন করা এবং সে সম্পর্কে লোভ-লালসার ব্যাপারে সতর্কবাণীও এখানে রয়েছে। মহানবী (স.)-এর রেসালাতে প্রতিবিম্বিত আল্লাহর এই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে আয়াতগুলোর সমাপ্তি টানা হয়েছে। মহানবী (স.) এর রেসালাত মুসলিম উম্মাহর জন্যে আল্লাহর এক অতুলনীয় দান। তাই এখানে একদিকে গনীমতের রাশি রাশি মালকেও ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে, এই দানের মোকাবেলায় সে দুঃখ-কষ্টকেও তুচ্ছ করে দেখানো হয়েছে।

'আর আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হতে পেরেছিলে। পক্ষান্তরে তুমি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতে, ...।'

আলোচনার ধারা এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মদীনার কিছু লোক সম্পর্কে তাঁর মনে কিছু শংকা ছিলো। যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার ব্যাপারে প্রথমে তারা ছিলো দৃঢ়সংকল্প। অতপর তাদের শিবিরে কিছুটা অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। এক তৃতীয়াংশ সৈন্য যুদ্ধের আগেই ফিরে যায়। এরপর কিছুলোক নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করে। গনীমতের মালের লোভের সামনে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। নবীর নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার মুখেও তারা হীনবল হয়ে পড়ে। ওদিকে নবীর সংগে ছিলো গুটিকতক লোকের একটা ক্ষুদ্র দল। অন্য লোকেরা নবীকে মারাত্মক আহত অবস্থায় ছেড়ে যায়। কিন্তু তিনি পাহাড়ের মতো অবিচল থাকেন।

এখানে নবীর কোমল ও দয়ালু চরিত্রের মধ্য দিয়ে আল্লাহর যে নেয়ামত প্রতিবিম্বিত হয়েছে, সে কথা স্বয়ং নবী এবং তাঁর সংগী-সাথীদেরকেও স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর ফলেই তাঁর চারিদিকে এতো মানুষের সমাবেশ হয়েছে। অপরদিকে নবীর মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামতের বাস্তব

তত্ত্বও তারা অনুভব করতে পেরেছে। অতপর নবীর প্রতি তাদের ক্ষমা করে দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করার জন্যেও বলা হয়। কাজে-কর্মে পূর্বের মতোই তাদের সংগে পরামর্শ করার জন্যে নবীকে নির্দেশ দেয়া হয়। নবীকে তাদের ভূমিকার কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করার জন্যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কারণ তা করা হলে ইসলামী জীবনধারার মূলনীতিই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

'আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হতে পেরেছিলে। তুমি রূঢ়ভাষী পাষাণহৃদয় হলে তারা তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো'।

এটা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর রহমত। এ রহমতই নবী লাভ করেছেন, লাভ করেছেন নবীর সংগী-সাথীরা। আল্লাহর এ রহমতই নবীকে ও তার সংগী-সাথীদের দয়ালু ও কোমল হৃদয় করেছে। তিনি যদি রূঢ়ভাষী পাষাণহৃদয় হতেন, তবে তাঁর চারিদিকে এতো মানুষ একত্রিত হতো না। কেননা দয়ালু ও কোমল দিলের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। উদার ও সহৃদয়তার প্রয়োজন তাদের রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে ব্যাপক ভালোবাসার, ধৈর্য ও সহনশীলতার। তাদের অজ্ঞতা, দুর্বলতা আর ক্রটি-বিচ্যুতিতে নবীকে সংকীর্ণমনা হলে চলবে না। এসব কাজে তাদের প্রয়োজন রয়েছে এমন এক মহাপ্রাণের, যে মহাপ্রাণ তাদেরকে শুধু দানই করে যাবে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোনো দান গ্রহণ করার তার কোনো প্রয়োজন হবে না। যিনি তাদের দুঃখের বোঝা বইবেন, কিন্তু নিজের দুঃখ তাদের ওপর কখনো চাপাবেন না। যে মহাপ্রাণের কাছে তারা সর্বদা দয়া, উদারতা, ভালোবাসা আর সন্তুষ্টিই লাভ করবে।

এমনই ছিলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হৃদয়। মানুষের সংগে তিনি তাঁর নফসের তাকীদে কখনো ক্রুদ্ধ হননি, তাদের মানবিক দুর্বলতার কারণে কখনো তাঁর মন তাদের ওপর সংকীর্ণ হয়নি। দুর্বলতার কারণে কখনো তাঁর মন এই জীবনের বস্তুনিচয় থেকে নিজের জন্যে কোনো কিছু গ্রহণ করেনি। তিনি নিজে যা কিছুর মালিক ছিলেন, উদারতা আর প্রশস্তচিত্ততার সংগে তিনি তাদেরকে তা দান করেছেন। তাঁর মহান ধৈর্য ও উদারতা, দয়া আর অনুগ্রহ ছিলো তাদের জন্যে সদা পরিব্যাপ্ত। তাদের কোনো একজন তাঁর সংস্পর্শে এলে বা তাঁকে দেখলে তার অন্তর তাঁর প্রতি ভালোবাসায় আপ্লুত না হয়ে পারতো না। নবী তাঁর হৃদয়ে যে উদার ভালোবাসা রাখতেন, এ ছিলো তারই প্রতিফল। আর এসব কিছুই ছিলো নবীর প্রতি এবং তাঁর উম্মতের প্রতি আল্লাহর রহমত। এ প্রসংগেই আল্লাহর সে রহমতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে। যাতে মুসলিম উম্মাহর সমাজ সংগঠনে সে রহমতেরই প্রকাশ ঘটে।

পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব

'সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করো এবং কাজে কর্মে তাদের সংগে (আগের মতোই) পরামর্শ করো।'

এ হচ্ছে ইসলামের অনড় বিধান। শাসন নীতিতে ইসলাম এটাকে মূলনীতি সাব্যস্ত করেছে। এমন কি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যিনি ইসলামী শাসননীতির প্রধান ব্যক্তিত্ব, তিনিও এ নীতির উর্ধে নন। এ বিধানের পর মুসলিম উম্মাহর এ ব্যাপারে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। 'শূরা' তথা পরামর্শ হচ্ছে এমন একটা মূলনীতি যার ওপর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পরিচালনা বিধান প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য শূরার ধরণ-প্রকার এবং যেসব উপায়ে শূরা সংগঠিত হতে পারে, সে ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক গঠন-কাঠামো এবং জীবনবোধ অনুযায়ী চিন্তা-গবেষণার অগ্রগতি সাধন করা যেতে পারে। যেসব উপায়ে শূরার মূলতত্ত্বটি সুসম্পন্ন হয়, তাকে কিন্তু সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত হতে হবে, নিছক শূরার বাহ্যিক প্রকাশই যথেষ্ট হবে না।

'শূরা' তথা পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদনের পরিপ্রেক্ষিতেই নবীকে এ বিধান দেয়া হয়। কিন্তু বাহ্যত ওহুদ যুদ্ধের সময় এতে একটা শংকা, একটা বিপদ দেখা দেয়। পরামর্শভিত্তিক কার্য সম্পাদনের ফলে বাহ্যত মুসলমানদের দলীয় ঐক্য ও সংহতিতে দেখা দেয় ফাটল। অধিকাংশ লোকই এমত ব্যক্ত করে যে, মুসলমানরা মদীনার অভ্যন্তরে অবস্থান গ্রহণ করে নগরী হেফাযত করবে, দুশমনরা মদীনায় হামলা চালালে সরু ও সংকীর্ণ গিরিপথের মুখে দাঁড়িয়ে তাদের সংগে কৌশলে লড়াই করবে। আলোচনার এ পর্যায়ে কিছু সংখ্যক লোক বীরত্ব প্রকাশ করে মদীনা থেকে বের হয়ে মোশরেকদের মোকাবেলা করার পরামর্শ দেয়। এ অনৈক্য-দ্বিমতের কারণে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতিতে কিছু ফাটল দেখা দেয়। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে কেটে পড়ে। শত্রুবাহিনী ঠিক তখন মদীনার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। এটা ছিলো সত্যিই এক ভয়ংকর ঘটনা। পরে জানা গেলো যে, সে সময়ে গৃহীত পদক্ষেপ মূলত সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাপদ পদক্ষেপ ছিলো না, কারণ, তা ছিলো মদীনার প্রতিরোধে প্রবীণদের বিরুদ্ধাচারণ করা। পরবর্তীকালে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানরা এর বিপরীত কর্মসূচী গ্রহণ করে। তারা মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই প্রতিরোধ করে, মুলত এ যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই পরিখার যুদ্ধে এধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করার যে ভয়ংকর পরিণতি মুসলমানরা আঁচ করতে পেরেছিলো, মহানবী (স.) সে সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। তাঁর দেখা স্বপ্নেও তিনি সে আভাস পেয়েছিলেন। তাঁর সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো। তাঁর আহলে বাইত এবং তাঁর আসহাবদের মধ্য থেকে অনেকে নিহত হবেন বলেও তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখা করেন। এ স্বপ্নে তিনি মদীনাকে সুরক্ষিত দুর্গ হিসাবেও দেখতে পান। শূরার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তাঁর ছিলো, কিন্তু শূরার সিদ্ধান্তই তিনি মেনে নিলেন। এর পেছনে যেসব খেসারত-ক্ষতি আর কোরবানীর ঝুঁকি ছিলো, তা-ও তিনি জানতেন। কারণ, সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নেয়ার নিয়ম চালু করা, গোটা জামায়াতকে তা শিক্ষা দেয়া এবং উম্মতের প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজটি সাময়িক কিছু সামরিক ক্ষতি বরণ করে নেয়ার চেয়ে অনেক বড়।

শূরার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নবীর অবশ্যই ছিলো। এক চরম সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম শিবিরে সৃষ্ট বিভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ অধিকার প্রয়োগের প্রয়োজনও ছিলো। যুদ্ধের পর যে তিক্ত পরিণতি দেখা দিয়েছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় এ অধিকার আসলেই প্রযোজ্য ছিলো। কিন্তু ইসলাম তো একটা গোটা উম্মতকে গড়ে তুলতে চায়, তাদেরকে তৈরী করতে চায়, নবী নেতৃত্ব তা কেন করেননি তা ভেবে দেখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, নানা জাতির লালন প্রশিক্ষণ আর সুস্থ-সঠিক নেতৃত্বের জন্যে তাদেরকে গড়ে তোলার উত্তম উপায় হচ্ছে 'শূরা' তথা পরামর্শের ভিত্তিতে তাদেরকে তৈরী করা। এতে হয়তো তারা মাঝে মাঝে ভুল করবে, সে ভুল যতো বড় এবং তার পরিণতি যতই তিক্ত-বিষাক্ত হোক না কেন। এই ভুলের মধ্য দিয়ে তারা জানতে পারবে পরে তা কিভাবে শোধরাতে হয়। এতে তারা আরো জানতে পারবে বিভিন্ন মতামত এবং তা বাস্তবায়নের সমস্যাকে কিভাবে সামাল দিতে হয়। ভুলে না জড়ানো পর্যন্ত তারা নির্ভুল বিষয় সম্পর্কে জানবে কি করে। একটা জাতির জীবনে ভুলকে পদস্খলন এবং ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন আসে না, সে ভুলের পরিণতিকে উপদেশের আকারে গ্রহণ করে একটা শিশুর মতো করে সে জাতিকে গড়ে তোলা হয়, আর শিশু তো অনভিজ্ঞ এবং আনাড়িই থাকে। একটা শিশুকে হাঁটতে বারণ করা ঠিক নয় যে বারবার তার পদস্খলন হবে। বারবার পড়ে গিয়ে সে হবে নির্ভয়।

ইসলাম একটা জাতি গড়ে তুলতে চায়, তাকে সুস্থ নেতৃত্বের জন্যে প্রস্তুত করতে চায়। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর জন্যে 'রুশদ' তথা সৎপথ নির্ণয় করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, আর বাস্তব জীবনের কর্মকান্ড থেকেই সর্বোত্তম সদুপদেশ পাওয়া যায়। যদিও নবীর নেতৃত্বের জন্যে শূরা তথা পরামর্শ অপরিহার্য নয়। কিন্তু মহানবী (স.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে এ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছিলো, যাতে করে এ অনুশীলন দ্বারা পরবর্তী সময়ে তারা এর সুফল লাভ করতে পারে।

এ ওহুদ যুদ্ধই বলতে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যত নির্ধারণ করে দিয়েছে। মুসলমানরা এমন এক জাতি, যারা শত্রুতা আর বিপদাপদ দ্বারা চারিদিকে পরিবেষ্টিত। চরম সংকটময় মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নেতৃত্বের জন্যে একান্ত জরুরী বিষয়। যদি উম্মতের মধ্যে সে ধরনের সুস্থ নেতৃত্বের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে এবং চরম সংকটময় মুহূর্তে কোনো পরামর্শের মুখোমুখী না হয়েই সিদ্ধান্ত দানে সে নেতৃত্ব সক্ষম হয় তবুও পরামর্শ গ্রহণ করা উচিৎ।

সেসময় মহানবী (স.) বেঁচে ছিলেন, আর তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসতো, তখন শূরা তথা পরামর্শের অধিকার থেকে নিজেরা বঞ্চিত হওয়ার জন্যে মহানবী (স.)-এর উপস্থিতিই ছিলো যথেষ্ট। বিশেষ করে যুদ্ধের তিক্ত ফলাফলের আলোকে মুসলিম উম্মাহর পরিশীলনের জন্যে তাঁর উপস্থিতিটুকুই ছিলো যথেষ্ট। কঠিন সিদ্ধান্তের সময় নিশ্চিত করে একথা বলা যায় যে, মহানবী (স.)-এর অস্তিত্ব এবং তাঁর সংগে আল্লাহর ওহীর আগমনটাই ছিলো যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, এক চরম মুহূর্তে তাদেরকে এ পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হবে। তার পরিণতি যা কিছু হোক না কেন, যতো কঠিন কোরবাণীই তাদের স্বীকার করতে হোক না কেন, তার জন্যে পরোয়া করলে চলবে না। বৃহত্তর প্রয়োজনের সামনে এটা খুবই তুচ্ছ বিষয়, সত্যাশ্রয়ী উম্মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটা কোনো বিষয়ই নয়। এসবের তখন কোনো মূল্যই থাকে না। ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহর নির্দেশ আসে।

'সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করো এবং কর্ম সম্পাদনে তাদের সংগে পরামর্শ করো।'

যাতে করে কঠিন বিপদ মোকাবেলা করার সময় এ মূলনীতি সদা কার্যকর থাকে এবং মুসলিম উম্মাহর জীবনে এ নীতির গোড়াপত্তন হতে পারে। এ নীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাদের যতোবড় বিপদেরই মুখোমুখী হতে হোক না কেন– তাদের জীবন থেকে এ নীতি মুছে ফেলার জন্যে যতো বাজে যুক্তির আশ্রয়ই নেয়া হোক না কেন, তা দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এ নীতি কার্যকর করতে গেলে যদি তা নিজেদের মধ্যে সাময়িকভাবে কিছু বিভেদও দেখা দেয়– তাও মেনে নিতে হবে। ঠিক এমনটিই ঘটেছে ওহুদ যুদ্ধে। তখন দুশমনরা একেবারেই দ্বারপ্রান্তে এসে পড়েছে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, কিছু কিছু সমস্যা হলেও শূরা কখনো জটিলতা সৃষ্টি করে না। শেষ পর্যন্ত তা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা থেকেও উম্মতকে বিমুখ করে না।

'অতপর যখন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তখন আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে। নিসন্দেহে যারা আল্লাহর ওপর নির্ভর করে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালোবাসেন।'

শূরার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে তাতে প্রদত্ব মতামতের বিভিন্ন দিক যাচাই করে দেখা, পরীক্ষা করা। উপস্থাপিত মতামতসমূহকে পরীক্ষা করে তার কোনো একটাকে গ্রহণ করা। ব্যাপারটি যখন সিদ্ধান্তের পর্যায়ে এসে উপনীত হয়, তখন শূরার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়, শুরু হয় তা বাস্তবায়ন করার পালা, আর এটা আল্লাহর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে, কঠোর দৃঢ়তার সংগেই করতে হয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে হবে। কেননা তিনি যা চান সে পরিণতির দিকেই তাকে নিয়ে যাবেন। তিনি মতামত দান করার বিষয়টি উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। চরম সংকটময় মুহূর্তে শূরার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে ঝুঁকি নিতে হয়, তাও

তো তাঁরই শিক্ষা। তেমনিভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা এবং আল্লাহর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার সবক দিয়েছেন।

অতপর রসূল (স.) যুদ্ধের ব্যাপারে বের হওয়ার পক্ষেই সিদ্ধান্ত দিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করে নিজে বর্ম পরিধান করলেন এবং উম্মতকেও তা পরিধান করার নির্দেশ দিলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি এবং তাঁর সাহাবীরা কি বিপদাপদ আর কোরবানী দিতে যাচ্ছেন, তাও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিলো। ব্যাপারটিতে ইতস্তত করায় তা বীরত্ব প্রদর্শনকারীদের মাঝে আর একবার চিন্তা করার সুযোগ এনে দেয়। তারা ভয় পেয়ে যায় যে, নবী বুঝি তাদের প্রস্তাব না পছন্দ করেছেন। তখন তারা মদীনা থেকে বের হওয়া বা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুর মোকাবেলা করার বিষয়টি তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত পালটানোর সুযোগ এলেও নবী আর ফিরে যেতে প্রস্তুত হলেন না। এই গোটা বিষয়টাতে একটা শিক্ষা দেয়াই ছিলো তাঁর ইচ্ছা, আর তা হলো, পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ শিক্ষা এবং একবার দৃঢ়সংকল্প নেয়ার পর তা কার্যকর করা। আল্লাহর ওপর নির্ভর করে এবং তাঁর হুযুরে নিজেকে পরিপূর্ণ সমর্পণ করেই এটা করতে হবে। নবী তাদেরকে এ শিক্ষাই দিতে চান যে, পরামর্শের জন্যে একটা সময় থাকে। একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে এরপর ইতস্তত করার কোনো সুযোগ থাকে না। আল্লাহ তায়ালা এই নির্ভরশীলতাকেই ভালোবাসেন।

'নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন তাদেরকে, যারা তাঁর ওপর নির্ভর করে।'

আল্লাহ তায়ালা এ স্বভাবকে ভালোবাসেন। আর যে কোনো ব্যাপারে, যে কোনো বিষয়ে তাঁর ওপর সোপর্দ করা ইসলামী জীবনধারার সর্বশেষ মানদন্ড।

জয় পরাজয়ের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে

বস্তুত এটাই ছিলো ওহুদ যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। কোনো বিশেষ যুগ বিশেষ কালে নয়, বরং সকল যুগের সকল মুসলিম উম্মতের জন্যে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধন।

আল্লাহর ওপর নির্ভর করার তাৎপর্য মন-মানসে বদ্ধমূল করার জন্যে আয়াতে একটু অগ্রসর হয়ে আরো বলা হয়েছে যে, সাহায্য পাওয়া আর অপদস্থ হওয়ার মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে আল্লাহর ক্ষমতা। সাহায্য এবং পরাজয় থেকে মুক্তি তাঁর কাছেই চাইতে হবে। তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করতে হবে, তাঁর ওপরই নির্ভর করতে হবে। পরিণতির চিন্তা-ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দিয়ে পরিণতিকে সর্বতোভাবে আল্লাহর ওপর সমর্পণ করে দিয়েই এটা করতে হবে।

'আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের সাহায্য করেন। তবে কেউই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। তিনি যদি তোমাদেরকে অপদস্ত করেন, তাহলে কে এমন আছে, যে তারপর তোমাদের সাহায্য করবে? আল্লাহর ওপর নির্ভর করাই হচ্ছে মোমেনদের কর্তব্য।'

খাঁটি ইসলামী চিন্তাধারাই মানুষের জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করে। পরিণতিকে এখানে কার্যকারণ পরম্পরায় বিন্যস্ত করা হয় এবং এর মধ্য দিয়েই শেষতক আল্লাহর নীতি কার্যকর হয়।

কিন্তু নিছক কৌশলগত বিন্যাস কিংবা বস্তুগত উপায় উপকরণ কখনো শুভ পরিণতি বয়ে আনতে পারে না। এখানে আসল কার্যকর শক্তি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ফলাফল নির্ণয় করেন। এ জন্যেই তিনি মানুষের কাছে এটা দাবী করেন যেন সে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে নিজের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে। সে যে পরিমাণে দায়িত্ব পালন করবে, তদনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা তাকে ফলাফল দেবেন এবং তার কাজ বাস্তবায়ন করবেন। এভাবেই আল্লাহর ইচ্ছার সংগে পরিণতি আর ফলাফল ঝুলে থাকে। তিনি যখন যেভাবে চান, পরিণতি আর ফলাফল সেভাবেই বাস্তবায়ীত হয়। এমনিভাবেই তিনি একজন মুসলমানের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তাই মোমেন কাজ করে, নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করে এবং তার চেষ্টা-সাধনার ফলাফলকে ছেড়ে দেয়

আল্লাহর ইচ্ছা আর তাঁর নির্ধারিত সিদ্ধান্তের ওপর। মুসলমানদের কখনো চিন্তায় ফলাফল আর কার্যকারণের ওপর চূড়ান্ত আস্থা থাকে না, থাকা উচিতও নয়।

এখানে যুদ্ধের দু'টি পরিনতি– সাহায্য ও অপদস্থ হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং একে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতের সংগে যুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যদি তাদেরকে সাহায্য করেন, তবে কেউই তাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। তিনিই যদি তাদেরকে অপদস্থ করেন, তাহলে কেউই তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। এ বিশ্বজগতে তিনিই হচ্ছেন সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একক ক্ষমতার মালিক। আল্লাহর ক্ষমতা ভিন্ন অপর কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর কুদরত থেকেই সমুদয় বস্তু আর সমুদয় বিষয়ের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু আল্লাহর এ সর্বময় কর্তৃত্ব মুসলমানদের তাদের প্রকৃতির নীতি মেনে চলা থেকে আবার অব্যাহতি দেয় না। অব্যাহতি দেয় না আবার সবকিছুকে আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে বসে থাকতে, সর্বোপরি এসব কিছু করে তাকে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা থেকেও অব্যাহতি দেয় না। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, এ দ্বারা একজন মুসলমানের চিন্তাধারা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো কাছে কিছু আশা করা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ পৃথিবীর বস্তুবাদী শক্তি থেকে তার অন্তরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে তারা যে সকল বাতিল-তুচ্ছ ও মেকী দরবারে ধরণা দেয়া তার থেকে তার হাতকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কার্য সম্পাদনকে আল্লাহর হেকমত তথা বিশেষ রহস্যের সংগে সে যুক্ত করে এবং আল্লাহর ইচ্ছার পরিণতি যা কিছুই হোক না কেন প্রশান্ত চিত্তে সে তা মেনে নিতে বলে। এ হচ্ছে এক বিস্ময়কর সামঞ্জস্য। ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও এমন সমন্বয়, এমন ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঘুষ ও খেয়ানতের পরিণাম

অতপর নবুওত এবং তার নৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যুদ্ধের ডামাডোল থেকে ব্যক্তিগত আমানতের দাবী তথা বিশ্বস্ততার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে এটা করা হয়েছে। আমানতের খেয়ানত করা যে নিষিদ্ধ, তা বুঝাবার জন্যে হিসাব-কিতাবের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া, কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই মানুষ যে স্থায়ী নীতি অনুযায়ী তার কর্মফল লাভ করবে, সে কথা জানিয়ে দেয়ার জন্যে বলা হচ্ছে,

'কোনো বিষয়ে খেয়ানত করা কোনো নবীর পক্ষে সম্ভবই নয়। আর মানুষের মধ্যে যে ব্যক্তি কিছু খেয়ানত করবে, সে কেয়ামতের দিন সেই খেয়ানত করা বস্তু নিয়েই হাযির হবে। আর যে যা করেছে, তার ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।'

আল্লাহর রসূল (স.) যুদ্ধ শেষে তাদেরকে গনীমতের মালের অংশ দেবেন না এমন আশংকায় কোনো কোনো তীরন্দাজ সৈন্য পাহাড়ে নিজেদের স্থান ত্যাগ করে চলে যায়। তেমনিভাবে কিছু কিছু মোনাফেক এমন কথাও বলতে শুরু করে যে, ইতিপূর্বে বদরযুদ্ধে গনীমতের কিছু মাল গোপন করা হয়েছিলো। এ ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স.) এর নাম উল্লেখ করতেও তারা দ্বিধা করেনি। এখানে আয়াতের সাধারণ নির্দেশে– নবীদের ব্যাপারে কোনো কিছুকে গোপন করার সামান্য আশংকাকেও প্রত্যাখান করা হয়েছে। অর্থাৎ নবীরা গনীমতের মালের কোনো অংশ গোপন কিংবা কোনো পক্ষপাতিত্ব করতেই পারেন না, কিংবা এর কোনো ব্যাপারে তাঁরা আদৌ খেয়ানত করতে পারেন না, অর্থাৎ কোনো কিছু গোপন করা নবীর কাজ নয়। আদৌ তা নবীর 'শান' নয়; তা নবীর প্রকৃতি এবং চরিত্রও নয়। এখানে নবীর জন্যে এ কাজটি সংঘটিত হওয়ার আশংকাকে সম্পূর্ণভাবে নাকচ করা হয়েছে। কেননা সুবিচার, আমানতদারী এবং পূত-পবিত্র চরিত্রই হচ্ছে নবীর প্রকৃতি।

এ শব্দটিকে আরবী ভাষার অপর এক 'কেরাত' অনুযায়ী সামান্য একটু রদবদল করে পাঠ করলে। তার অর্থ হবে খেয়ানত করা ও কোনো কিছু গোপন করা জায়েযই নয়। হযরত হাসন

বসরী পঠিত এ কেরাত থেকে অনেক কষ্ট করে এ অর্থ বের করা যায়। অতপর যারা গোপন করে, অন্যায়ভাবে কোনো কিছু যারা লুকায়, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে,

'আর যে লোক গোপন করবে, সে কেয়ামতের দিন গোপন বস্তু নিয়েই হাযির হবে। সে পরিপূর্ণভাবে তা পাবে, যা সে অর্জন করেছে, আর তাদের প্রতি কোনো যুলুম করা হবে না।'

ইমাম আহমদ সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম যুহরী এবং ওরওয়ার সূত্রে আবু হুমাইদ সায়েদী (রা.)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করে বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আযদ কবীলার ইবন লাইতা নামে জনৈক ব্যক্তিকে সদকা উসুল করার জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তিনি (সদকা উসুল করে ফিরে) এসে বললেন, এটা তোমাদের জন্যে, আর এটা আমাকে দেয়া হয়েছে উপহার স্বরূপ। (একথা শুনে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, তথা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীদের হয়েছেটা কি! তাদেরকে কোনো কাজে প্রেরণ করলে তারা ফিরে এসে বলে, এটা তোমাদের জন্যে, আর এটা আমাকে দেয়া হয়েছে হাদিয়া স্বরূপ। সে কেন তার পিতা-মাতার গৃহে অবস্থান গ্রহণ করে না? দেখা যাক তাকে কোনো হাদিয়া দেয়া হয় কি-না? মোহাম্মদের জীবন যে সত্ত্বার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি, তোমাদের কোনো ব্যক্তি সদকার মাল পাবে না। উট আওয়ায দেবে, গাভী হাম্বা হাম্বা করবে, ছাগল ভ্যাঁ ভ্যাঁ করবে। অতপর তিনি দু'হাত উত্তোলন করলেন, এমন কি আমরা তাঁর বোগল পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অতপর তিনি বললেন,

'হে আল্লাহ! আমি কি পৌছিয়ে দিয়েছি? এভাবে তিনি তিন বার বললেন। (হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে)।

ইমাম আহমদ .... আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, একদা রসূলুল্লাহ (স.) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে 'গুলুল' তথা গনীমতের মাল গোপন করার প্রসংগে আলোচনা করে তাকে অনেক বড় করে দেখালেন এবং এ কাজটি যে খুব জঘন্য অপরাধ তা উল্লেখ করে বললেন, তোমাদের কাউকে আমি যেন এমন অবস্থায় না পাই যে, কেয়ামতের দিন সে কাঁধে উট নিয়ে হাযির হবে আর উট আওয়ায দেবে। লোকটি বলবে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ফরিয়াদের জন্যে এগিয়ে আসুন। তখন আমি বলবো, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা থেকে রক্ষা করার কোনো সাধ্য আমার নেই। আমি তো তোমার কাছে (পূর্বেই) এ সতর্কবাণী পৌছে দিয়েছিলাম। তোমাদের কাউকে আমি যেন এমন না পাই যে, কাঁধে ঘোড়া বহন করে কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে আর ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনি দেবে। তখন সে বলবে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার ফরিয়াদে শরিক হোন আমাকে মুক্ত করুন। তখন আমি বলবো, আমি তো তোমাকে আল্লাহ তায়ালা থেকে বাঁচাতে পারবো না। আমি তো (আগেই) তোমাকে অবহিত করেছিলাম। তোমাদের কাউকে আমি যেন এমন না পাই যে, কেয়ামতের দিন সে কাঁধে বোবা (প্রাণী) নিয়ে উপস্থিত হবে এবং বলবে, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে বাঁচান। তখন আমি বলবো, তোমাকে বাঁচাবার কোনো ক্ষমতাই যে আমার নেই। পূর্বেই তো আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। (বোখারী ও মুসলিম)

ইমাম আহমদ আদী ইবনে ওমাইরা আল কিন্দীর সূত্রে হাদীস রেওয়ায়াত করে বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, হে মানবমন্ডলী! তোমাদের মধ্যে আমরা যদি কাউকে কোনো কাজের দায়িত্ব দেই এবং সে ব্যক্তি সুঁই বা তার চেয়েও তুচ্ছ কোনো বস্তু লুকায়, তবে তা হবে আমানতের খেয়ানত। কেয়ামতের দিন সে ব্যক্তি তা নিয়েই হাযির হবে। একথা শুনে আনসারের জনৈক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো। মোহাহিদ বলেন, লোকটি ছিলো সায়াদ ইবনে ওবাদা। আমি (এখনো) যেন তাকে দেখতে পাচ্ছি। লোকটি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে এ 'আমল' কি গৃহীত হয়েছে। রসূলুল্লাহ বললেন, তা কী? লোকটি বললেন, আমি শুনতে পেলাম,

আপনি একথা বলেছেন, রসূলুল্লাহ বললেন, এ কথা আমি এখনো বলছি, আমরা যে ব্যক্তিকে যে কাজে নিয়োজিত করবো, তা ছোট হোক বড় হোক সব কিছু এনে হাযির করবে। তা থেকে তাকে যেটুকু দেয়া হবে, সেটুকুই সে গ্রহণ করবে আর যা থেকে বারণ করা হবে, তা থেকে সে নিবৃত্ত থাকবে (মুসলিম আবু দাউদ)।

যারা ছিলেন সোনার মানুষ

কোরআন মজীদের এ আয়াত এবং নবীর এ হাদীসটি মুসলিম জামায়াতের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। তাদের মনে তা এক বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। তার ফলে অতপর এমন এক জনগোষ্ঠী সেখানে গড়ে উঠেছে, যাদের আমানতদারী পরহেযগারী আদর্শ দৃষ্টান্ত বলে তা পরিগণিত হয়েছে। গোটা মানব জাতির মধ্যে ইতিপূর্বে এমন দৃষ্টান্ত কখনো দেখা যায়নি।

মুসলিম জামায়াতে এমন লোক ছিলেন, যাদের হাতে গনীমতের এমন মূল্যবান বস্তুসমূহ এসেছে, যা তারা পূর্বে কখনো দেখেনি। কিন্তু তাঁরা সেসব মূল্যবান বস্তু এনে আমীরের হাতে সমর্পণ করেছেন। সে বস্তু সম্পর্কে তাদের মনে সামান্য কোনো ভাবেরও উদ্রেক হয়নি। কোরআন মজীদের ভয়ংকর ব্যবস্থা যেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, সে আশংকায় তারা তা থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। এক ভয়ানক লজ্জাকর অবস্থায় যাতে নবীর সম্মুখে উপস্থিত না হতে হয়, কেয়ামতের দিন যে ভয়াল-ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে নবী তাঁর হাদীসে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন, সে ভয়ে তারা তা থেকে হামেশাই দূরে ছিলেন। মুসলমানরা বাস্তবিকই এ অবস্থাকে কার্যত রূপায়িত করেছেন, এ সত্যের নিরিখেই তারা জীবন যাপন করছেন। তাদের চিন্তা-চেতনা আর অনুভূতিতে আখেরাতটাই ছিলো বড়। তারা নবীর সম্মুখে এবং পরওয়ারদেগারের সম্মুখে নিজেদের এ চিত্রই দেখাতে চাইতেন, তারা সে ভয়ংকর দশায় পতিত হওয়াকে ভয় পেতেন এবং তাতে পতিত হওয়ার ব্যাপারে সদা শংকিত থাকতেন। এর সর্বত্র তাদের আল্লাহভীতি এবং পরহেযগারীর রহস্য ও নিহিত ছিলো। তাদের সামনে আখেরাত ছিলো একটা বাস্তব সত্য, যা তারা সর্বক্ষণ নিরিক্ষণ করছিলেন, এটা তাদের কাছে কোনো দূরের প্রতিশ্রুতি ছিলো না। এ সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত। এ বিষয়ে তাঁদের অন্তরে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়ের লেশ মাত্র ছিলো না। তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ যা করবে তার ফলাফল পুরোপুরিই সে পাবে। তাদের প্রতি কোনো রকম যুলুম-অবিচার করা হবে না।

ঐতিহাসিক ইবনে জারীর তাবারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এধরনের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, মুসলমানরা 'মাদায়েনে' উপস্থিত হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহ করে একত্র করলে জনৈক ব্যক্তি তার সংগৃহীত গনীমতের মাল নিয়ে উপস্থিত হয়। লোকটাকে গনীমতের প্রধান কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করা হয়। লোকটির সংগে যারা ছিলো, তারা বললো, এমন লোক তো আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের কাছে যা কিছু আছে, তা তাকে আদৌ প্রলুব্ধ করে না। সবাই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি এ থেকে কিছু নিয়েছো? লোকটি বললো, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা না থাকলে আমি তোমাদের কাছে তা হাযির করতাম না। তখন সকলেই বুঝতে পারলো যে, লোকটি বিরাট মর্যাদাবান। সকলে জিজ্ঞেস করলো কে তুমি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কাছে আমার পরিচয় দেবো না। পরিচয় দিলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে। অন্যদেরও আমার পরিচয় দেবো না। পরিচয় দিলে তারা আমার প্রশংসা শুরু করবে। আমি কেবল আল্লাহরই প্রশংসা করবো এবং তিনি যে ছাওয়াব দেবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকবো। পরে তার পেছনে একজন লোক লাগিয়ে দেয়া হলে লোকটি তার সংগীদের এসে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো যে, লোকটি হচ্ছে আমের ইবনে আবদে কায়েস।'(৪)

(৪) তারীখে তাবারী, ৪র্থ খন্ড।

কাদেসিয়া যুদ্ধের পর হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মুখে গনীমতের মাল সমবেত করা হয়। সংগৃহীত গনীমতের মালের মধ্যে পারস্য সম্রাট কেস্‌রার তাজ এবং তার রাজ প্রাসাদের কিছু মালামালও ছিলো। হযরত ওমর (রা.) মুসলিম সেনাবাহিনীর সংগৃহীত গনীমতের মালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিস্ময়ের সাথে বললেন, যে লোকেরা তাদের আমীরের সম্মুখে এসব মহামূল্য বস্তু উপস্থিত করেছে, তারা কতোই না বিশ্বস্ত, কতোই না আমানতদার!

ইসলাম মুসলমানদেরকে এমন তারবিয়ত এমন মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়েছে যে, যার ফলে তাদের কথা আজ কিংবদন্তীর কাহিনী বলেই আমাদের কাছে মনে হয়।

গনীমতের মাল এবং এর খেয়ানত তথা গোপন করার প্রসংগ উল্লেখ করে আরো বলা হয়েছে যে এতে সত্যিকার মানবীয় মূল্যবোধের পরিচয় ফুটে ওঠে। এখানে নানা মূল্যবোধের মধ্যে তুলনামূলক একটা আলোচনাও করা হয়েছে! মানুষের নৈতিক মানের সেটাও ছিলো একটা স্তর, আর এটাও একটা। কতোই না ব্যবধান উভয় স্তরের মধ্যে!

'যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে কি তেমন লোকের মতো হতে পারে, যে আল্লাহর ক্রোধ অর্জন করেছে? বস্তুত তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, আর কতই না নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল! আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা বিভিন্ন। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তায়ালা সবই দেখেন',

এ হচ্ছে মূলত সেই এক শিক্ষা যার আলোকে গনীমতের মালকে মনে হবে অতি তুচ্ছ, তার আলোকে দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে চিন্তা করাও মনে হবে খুব তুচ্ছ। মনের পরিশীলন ও তার গুরুত্বকে সব কিছুর উর্ধে স্থান দেয়ার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে কোরআনের বিস্ময়কর জীবন বিধানের এক অনুপম স্পর্শ। এটা তার চিত্তকে যেমন প্রশস্ত করে। তেমনি ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় তার মনকেও প্রফুল্ল করে।

'যে আল্লাহর সন্তোষের অনুগত, সে কি তার মতো হতে পারে, যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? আর তার ঠিকানা তো হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা কতোই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।'

এটাই হচ্ছে আসল মূল্যবোধ আর এটা অর্জন করাটাই আসল বিষয়। এটা হচ্ছে সত্যিকার অর্থে কিছু অর্জন এবং কিছু বর্জন করার ক্ষেত্র। যে লোক আল্লাহর সন্তোষ আশা করে এবং তাতেই ধন্য ও পুলকিত হয় এবং যে আল্লাহর রোষানলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে, এদের উভয়ের মধ্যে কতোইনা দূরত্ব, কতোই না ব্যবধান! আল্লাহর রোষানল নিয়েই সে জাহান্নামে পতিত হয়, কতোই না নিকৃষ্ট সে প্রব্যাবর্তনস্থল! আল্লাহর কাছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা পাবে। কাউকে বিনা হিসাবেও ছেড়ে দেয়া হবে না, অন্যায়ভাবে কাউকে কষ্ট দেয়া হবে না। 'আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ তায়ালা তা সব কিছু দেখেন।'

অতপর মূল বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে সে প্রসংগের ইতি টানা হয়েছে, আর সে মূল বক্তব্য হচ্ছে মহানবী (স.)-এর ব্যক্তিসত্ত্বা এবং মুসলমানদের মাঝে তাঁর মহান অবস্থান।

'নিসন্দেহে মোমেনদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন ..... ।' (আয়াত ১৬৪)

নবুওত আল্লাহর এক সীমাহীন দয়া

একটি মহাসত্য উন্মোচনের মাধ্যমে এ অধ্যায়টি সমাপ্তি টানা হয়েছে, আর সেটা হচ্ছে রসূল (স.) এবং তাঁর রসূল সত্ত্বার মূল্য, মর্যাদা এবং তাঁর মাধ্যমে পাওয়া হেদায়াতরূপী আল্লাহর মহা অনুগ্রহ। মুসলিম উম্মাহর গঠনে তাঁর ভূমিকা, তাঁর শিক্ষা, তার পরিশীলন ও নেতৃত্ব। আর সত্যি বলতে কি এ উপসংহারের মধ্যে কোরআন মজীদের বিরাট ও সুগভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

গনীমতের মাল, তার লোভ-লালসা, তার খেয়ানত এবং এ ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বিষয় নিয়ে জড়িয়ে পড়ার সমালোচনা করার পরই এ মহাসত্যটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে ক্ষুদ্র বিষয়টি নিয়ে বিজয়কে পরাজয়ে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে তা নিয়ে মুসলমানরা ইতিমধ্যে অনেক কিছু করে বসেছে। মহান রেসালাতের গুরুত্ব ও তাকে সমাজে প্রতিফলিত করার মহান অনুগ্রহের দিকে ইংগীতের মধ্য দিয়ে মূলত কোরআন মজীদের বিস্ময়কর তারবিয়তের এক সুগভীর তাৎপর্য এখানে প্রকাশ পেয়েছে। কোরআন মজীদের এ অনুপম স্পর্শের ছায়াতলে এসে সব লোভনীয় বস্তু তুচ্ছ হয়ে গেছে। একজন সত্যিকার মোমেন ব্যক্তি তাতে মত্ত হওয়া তো দূরের কথা, তা নিয়ে আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতেও লজ্জা বোধ করে।

মুসলিম জামায়াত ওহুদ যুদ্ধে যে পরাজয়, যে আঘাত, যে দুঃখ আর যে ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, তার আলোচনা প্রসংগে এ তত্ত্বগুলোকে সবার সামনে উদ্ভাসিত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে আল্লাহর যে মহান অনুগ্রহটি প্রতিফলিত হয়েছে, তা হচ্ছে কোরআন মজীদের বিস্ময়কর পরিশীলনের একটি সুগভীর স্পর্শ, যার আলোকে সকল দুঃখ-যাতনা, সকল ক্ষয়ক্ষতি তুচ্ছ ও মূল্যহীন। যার ভেতরে আল্লাহর দান উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়। মুসলিম উম্মাহর জীবনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান, সবচেয়ে অগ্রগণ্য বস্তু।

অতপর মুসলিম উম্মাহর জীবনে এ অনুগ্রহের কিছু নিদর্শনের প্রতি ইংগীত করে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মোমেন বান্দাদের ওপর অনুগ্রহ করেছে। ....তিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে শোনান, তাদের পরিশোধন পরিমার্জন করেন।'

এ ইংগীতের মাধ্যমে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় এবং এক অংগীকার থেকে অপর অংগীকারের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। এ পর্যায়ক্রমিক বর্ণনার পেছনে আল্লাহর অভিপ্রায় নিহিত রয়েছে, মুসলিম উম্মাহ তা যথার্থ অনুধাবন করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা তাদের দ্বারা একটা মহান কার্য সাধন করাতে চান এবং রসূল প্রেরণ দ্বারা তিনি তার জন্যে তাদেরকে প্রস্তুত করতে চান। যে উম্মতের মর্যাদা এতোই উচ্চ যে, তাদের তুচ্ছ গনীমতের মালের পেছনে ছুটে যাওয়া আদৌ শোভনীয় নয়। সে মহান লক্ষ্যের তুলনায় গনীমতের মাল নিতান্তই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। দুঃখ-যাতনায় কাতর হওয়া আর হায়-হুতাশ করাও তাদের সাজে না। সে মহান লক্ষ্যে এসব ত্যাগ স্বীকার আর দুঃখ যাতনা ভোগ করা যে নিতান্তই সহজ কাজ তাও এতে বুঝা যায়।

এখানে এ অনুগ্রহের কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে মাত্র। এবার আমরা সংক্ষেপে বিষয়গুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করবো, আলোচনা করবো কোরআন মজীদের ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক শব্দমালায় লুক্কায়িত এরা বহুমুখী তাৎপর্যের বিষয়টিও।

মোমেনদের মধ্যে তাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করা ছিলো সত্যিই আল্লাহ তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ ও মহান দান। তাঁর করুণাসিক্ত ফয়েয ছাড়া এ দান, এ অনুগ্রহ কোনো রকমেই সম্ভব নয়। এটা আল্লাহর এমন এক নির্ভেজাল অনুগ্রহ, যার সামনে মানুষ কোনো কিছু দিয়েই এর হক আদায় করতে পারে না। তাদের প্রতি এ অনুগ্রহ যখন চরমে পৌঁছে, তখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত ও বাণী পাঠ করে শোনান। আল্লাহর অনুগ্রহ বে-হিসাব না হলে এটা তিনি করতেন না।

কোনো কোনো বিনিময় ছাড়াই আল্লাহর অনুগ্রহ সৃষ্টিকূলকে আচ্ছন্ন না করলেও এটা কখনো সম্ভব হতো না।

যখন এ কথাটা চিন্তা করা হয় যে, যে রসূল তিনি প্রেরণ করেছেন তাদের নিজেদের মাঝ থেকেই পাঠানো হয়েছে, তখন আল্লাহর এ অনুগ্রহ আরো বেশী অনুভূত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, 'তাদের নিজেদের ভেতর থেকে' কথাটার ভেতরে কোরআন মজীদের বাচনভংগীতে তাৎপর্যের দিক থেকে এর একটা সুগভীর মর্ম নিহিত রয়েছে। মোমেনদের সংগে রসূলের সম্পর্ক হচ্ছে আত্মার সম্পর্ক। জাতির সংগে ব্যক্তির সম্পর্ক নয়। বিষয়টি কেবল এ রকম নয় যে, তিনি কেবল তাদেরই একজন; বরং ব্যাপারটি তার চেয়েও অনেক গভীর। কেননা মোমেনরা ঈমানের মাধ্যমেও রসূলের সংগে তাদের সম্পর্ক গভীর করতে পারে, পারে সে সম্পর্কে আরো উন্নত করতে। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা এপর্যায়ে আরো ওপরে উঠতে পারে। এটাও মোমেনদের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট অনুগ্রহ। এ তো যেন অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ অর্থাৎ দ্বিগুণ অনুগ্রহ।

অতপর সে মহা অনুগ্রহ বা বাস্তব নিদর্শনের মধ্য দিয়ে তাদের আত্মায় তাদের জীবনে এবং তাদের মানবীয় ইতিহাসে তার প্রকাশ ঘটে।

'তিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদের পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন।'

এখানে এসে সে অনুগ্রহ আরো বড় হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। আল্লাহর আয়াত তিনি তাদেরকে পাঠ করে শোনান। মানুষ যদি কেবল এই একটা অনুগ্রহ নিয়েই চিন্তা করতো, তাহলে সে আল্লাহর বাধ্য ও অনুগত হয়ে যেতো, আল্লাহর সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার সাহস পেতো না। বরং সে আল্লাহর সামনে কৃতজ্ঞতার ভারে অবনত হয়ে যেতো।

মানুষ যদি চিন্তা করতো যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন, নিজের বাণী দ্বারা তাকে সম্বোধন করেন। তাঁর মহান সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে তাকে তিনি তার নিজের দিকে ডাকেন, উলুহিয়্যাতের তত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে তাকে সম্বোধন করেন। অতপর তাকে তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে বলেন, একথাগুলো যদি তারা ভালো করে দেখতো তাহলে তারা বুঝতো যে, মানুষ হচ্ছে এক ক্ষুদ্র-তুচ্ছ বান্দা মাত্র। আল্লাহ তায়ালাই তাকে তার নিজের জীবন তার মন-মানস তার গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করেন। তাকে এমন বিষয়ের দিকে তাকে ডাকেন, যা তার আত্মা ও অবস্থাকে সংশোধন করে। তাকে জান্নাতের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকেন যার ব্যপ্তি ও বিস্তৃতি আসমান-যমীনের সমান। আল্লাহর সর্বাত্মক দয়া ছাড়া এ দান এ অনুগ্রহ আর কি হতে পারে?

জাহেলী যুগের বিয়ে ও নারী পুরুষের সম্পর্ক

আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী নন। বরং ক্ষুদ্র-তুচ্ছ মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মহান হয়েও এ তুচ্ছ মানুষকে দয়া করেন, তাকে দান করেন, তার প্রতি কৃপাধারা বর্ষণ করে তাকে সিক্ত করেন। একের পর এক তাকে আহ্বান করেই যান। বারবার তাকে তার দিকে ডাকেন। আশ্চর্য! যিনি আদৌ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি ডাকেন নিসম্বল এসব মানুষকে! এটা তাঁর কতো বড়ো দয়া, কতো বড়ো অনুগ্রহ, কতো বড়ো দান যার শোকর আদায় করার সাধ্য মানুষের নেই।

তিনি পরিশুদ্ধ করেন তাদেরকে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে পাক-পবিত্র করেন, তাদেরকে উপরে তোলেন, পরিশীলিত ও পরিচ্ছন্ন করেন। তাদের চিত্ত, তাদের চিন্তাধারা আর অনুভূতিকে পবিত্র করেন। তাদের পরিবারকে, তাদের মান-সম্ভ্রমকে, তাদের সংগঠনকে, শেরেক মূর্তিপূজার পংকিলতা থেকে পবিত্র করেন। জীবনে যেসব চিন্তা-চেতনা, যেসব স্বভাব-অভ্যাস, যেসব

রুচি-অনুভূতি তাদের মানবতার স্তর থেকে নীচে নামিয়ে দেয় তা থেকে তিনি তাদের পবিত্র করেন। তাদেরকে পবিত্র করেন জাহেলী জীবনের যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে। মানুষের অনুভূতি-ঐতিহ্য, আর মূল্যবোধকে যা কিছু অপবিত্র করে এমন সব বিষয় থেকেও তিনি তাদেরকে পবিত্র করেন।

তাদের আশপাশের সকল জাহেলিয়াতই ছিলো পংকিলতা, অপবিত্রতা। হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব কোরায়শ প্রতিনিধিদলের বক্তব্যের জবাবে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর সম্মুখে আরব জাহেলিয়াতের পংকিলতার কিছু বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন।

'হে রাজা, আমরা ছিলাম অজ্ঞ ও বর্বর জাতি। আমরা প্রতিমা পূজা করতাম, মৃত প্রাণীর গোশত খেতাম, অশ্লীল ও গর্হিত কাজ করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর প্রতি অসদাচরণ করতাম, সবল লোকেরা আমাদের মধ্যকার দুর্বলদের গ্রাস করতো। আমাদের অবস্থা যখন এমন, তখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্য থেকে একজনকে রসূল করে প্রেরণ করেন। তাঁর বংশ, তাঁর সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা-আমানতদারী এবং নির্মল চরিত্র সম্পর্কে আমরা পূর্ব থেকেই অবগত ছিলাম। আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা এক আল্লাহকে পরিত্যাগ করে যেসব প্রস্তর আর মূর্তির পূজা করতাম, তিনি আমাদেরকে সেসবের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন। সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা স্বজনদের সংগে সুসম্পর্ক এবং প্রতিবেশীদের সংগে সদাচার করার নির্দেশ দান করলেন। হারাম কাজ আর রক্তপাত থেকে বিরত থাকার জন্যে তিনি আমাদের বললেন। মিথ্যা, অশ্লীলতা, ব্যাভিচার, পিত্রহীনদের সম্পত্তি গ্রাস করা এবং সতী-সাধ্বী রমনীদের চরিত্রে অপবাদ আরোপ থেকে নিবৃত্ত থাকতে হুকুম দিলেন। তিনি আরো বললেন, এক আল্লাহর এবাদাত করতে এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করতে। নামায কায়েম করতে, যাকাত আদায় করতে এবং রোযা পালন করতে বললেন।'

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)ও জাহেলী যুগের পংকিলতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি জাহেলী যুগে নারী পুরুষের সম্পর্কের যে বিবরণ দিয়েছেন সহীহ বোখারীতে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি যে চিত্র অংকন করেছেন তা থেকে চরম পাশবিক প্রবৃত্তির একটা চিত্র ফুটে ওঠে, তিনি বলেন,

'জাহেলী যুগে বিয়ে ছিলো চার রকমের। এক রকমের বিয়ে যা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। কোনো পুরুষ কোনো নারীর অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেবে, অতপর মোহরানা পরিশোধ করার পর তাকে সে বিয়ে করবে।

বিয়ের আর একটি প্রকার হচ্ছে এরকম, কারো স্ত্রী ঋতু থেকে পবিত্র হওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীকে বলতো তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে গিয়ে তোমার কামভাব চরিতার্থ কর। এরপর লোকটি তার স্ত্রী থেকে দূরে থাকতো, এমনকি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতো না। এভাবে তার স্ত্রী অপর এক ব্যক্তি দ্বারা গর্ভবর্তী হতো। তার গর্ভবতী হওয়া প্রতীয়মান হলে তখন তার স্বামী ইচ্ছে হলে স্ত্রীকে সংগ দিতো, তার সংগে মিলিত হতো। সন্তান উচুবংশীয় হওয়ার কামনায় এ বিয়েকে বলা হতো 'নিকাহুল ইস্তবা' বা একে অপরের কাছে কামভাব চরিতার্থ করার বিয়ে।

বিয়ের আর একটি ধরন ছিলো এমন যে, দশজনের কম সংখ্যক লোক একজন নারীর ওপর উপগত হতো এবং তাকে ভোগ করতো। নারীটি অন্তসত্ত্বা হয়ে গর্ভ খালাস করলে কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর মহিলাটি সন্তানকে তাদের কাছে প্রেরণ করতো। তাদের কেউই উপস্থিত না হয়ে পারতো না। সকলেই মহিলাটির কাছে সমবেত হতো। মহিলাটি তাদেরকে বলতো, তোমরা যা ঘটিয়েছিলে তাকে তো এখন চিনতেই পারছো। আমি এ সন্তান জন্ম দিয়েছি। হে অমুক, এ সন্তানটি তোমার, তুমি নিজের পছন্দমতো তার নাম রাখো। অতপর সন্তানটিকে তার সংগে দিয়ে দেয়া হতো এবং সন্তানকে গ্রহণ না করে লোকটির কোনো উপায় থাকতো না।

বিয়ের চতুর্থ ধরনটি ছিলো এ রকম, অনেক লোক একত্র হয়ে একজন নারীর ওপর উপগত হতো। যেসব লোক একত্র হতো, তাদের কারো হাত থেকে মহিলাটি রক্ষা পেতো না, আর এ মহিলা যে বেশ্যা এটা তার আলামত। যার সাথে ইচ্ছা হতো মহিলাটি তার সংগে মিলিত হতো। মহিলাটি যদি অন্তসত্ত্বা হয়ে গর্ভ খালাস করতো, তখন সকলে মহিলার কাছে সমবেত হয়ে সন্তানটি যে কার- তা নির্ণয় করার চেষ্টা করতো। সন্তানটিকে যার সংগে তারা সামঞ্জশীল মনে করতো তারা তাকে তার হাতে তুলে দিতো এবং তাকে তার সন্তান বলে ডাকা হতো। এ থেকে সে লোকটি নিবৃত্ত থাকতো পারতো না।

মানুষের চিন্তাধারা যে পশুত্বের নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিলো, বিয়ের এসব ধরন-প্রকরণ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্যেরও প্রয়োজন পড়ে না। একজন পুরুষ ভালো সন্তান লাভের জন্যে তার স্ত্রীকে বিভিন্ন লোকের কাছে প্রেরণ করছে। এ সব কিছু ঠিক তেমন, যেমন একজন লোক সুস্থ সবল বাছুর লাভের আশায় স্বীয় উষ্ট্রী, ঘোটকী বা পশুটাকে একটা বলিষ্ঠ বড় জাতের পাঁঠা কিংবা ষাড়ের কাছে প্রেরণ করছে।

দশজনের কম সংখ্যক পুরুষ একত্রে একজন নারীর ওপর উপগত হচ্ছে, আর তাদের সকলেই নিজ লালসার শিকার বানাচ্ছে সে নারীকে, অতপর সে নারী তার সন্তানটিকে একজন পুরুষের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে তাদের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে নিচ্ছে। মানুষের চিন্তাধারার কতো শোচনীয় পতন ঘটেছিলো, তা অনুমান করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।

চতুর্থ প্রকারের বিবরণ পাওয়া যায় বেশ্যাদের ক্ষেত্রে। তারা যেহেতু বেশ্যা তাই তাদের পাপের পরিণতি একজনের ঘাড়ে চাপানো তো তাদের জন্যে উপরি পাওনা, এতে পুরুষ লোকটি কিছুই মনে করছে না। কোনো লজ্জাও সে বোধ করছে না। আর তা থেকে নিবৃত্তও হচ্ছে না!

এ হচ্ছে সর্বগ্রাসী নীচতা, পংকিলতার গর্তে পতিত হওয়া। ইসলাম তা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করেছে। তাদেরকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করেছে। ইসলামের আবির্ভাব না ঘটলে আরবরা তাতে আজো আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকতো। জাহেলী যুগের পংকিলতা নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক চরম পর্যায়ে নেমে গিয়েছিলো। ওস্তাদ আবুল হাসান আলী নদভী তার মূল্যবান গ্রন্থ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্বের যা কিছু ক্ষতি হয়েছে' পুস্তকে বলেন,

'জাহেলী সমাজে নারীর সাথে অন্যায় আচরণকে পাইকারীভাবে বৈধ মনে করা হতো, তার অধিকার হরণ করা হতো এবং তাকে পুরুষরা নিজেদের সম্পদ মনে করতো। স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে নারীরা কিছুই পেতো না, বঞ্চিত করা হতো তাকে তার অধিকার থেকে। স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পরও নিজের পছন্দ অনুযায়ী পুনর্বিবাহ করার অনুমতি ছিলো না।(৫) অন্যান্য সম্পদের মতো ওয়ারিস সূত্রে নারীও অপরের অধিকারে আসতো।'(৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে কারো পিতা বা বন্ধু মারা গেলে সে ব্যক্তিই হতো নিহত ব্যক্তির স্ত্রীর সবচেয়ে বড় হকদার। ইচ্ছা করলে তাকে নিজের কাছে রেখে দিতো, অথবা তাকে আটক করে রাখতো। মোহরানার বিনিময়ে তাকে মুক্তি পেতে হতো, অথবা সে মৃত্যুবরণ করলে তার সম্পদ গ্রাস করা হতো। হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেন, কোনো ব্যক্তি স্ত্রী রেখে মারা গেলে জাহেলী যুগে মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজন তাদের পরিবারের সন্তান পোষার জন্যে নারীকে সে পরিবারে আটক করে রাখতো।

মোহাদ্দেস সুদ্দী বলেন,

জাহেলী যুগে কোনো ব্যক্তির পিতা, ভাই বা পুত্র যদি স্ত্রী রেখে মারা যেতো, তাহলে সে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসরা এগিয়ে এসে তার স্ত্রীর ওপর এক খন্ড কাপড় ফেলে দিতো। পরে তাকে বিয়ে

(৫) সূরা আল বাকারা ২৩২
(৬) সূরা আন নেসা ১৯

করার জন্যে সে-ই হতো সবচেয়ে বড় হকদার। এ জন্যে তাক মোহরানা দিতে হতো না। অথবা অন্যত্র তাকে বিয়ে দিয়ে সে তার মোহরানা নিজেই গ্রহণ করতো। যদি সে এদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্বজনদের মধ্যে ফিরে যেতে পারতো, কেবল তখনই সে নিজের অধিকার ফিরে পেতো।(৭) পুরুষ নিজের অধিকার কিন্তু ঠিকই ভোগ করতো, কিন্তু নারী তার অধিকার ভোগ করতে পারতো না। নারীকে যে মোহরানা দেয়া হতো, তাও সে ভোগ করতে পারতো না। বরং তার প্রতি অবিচার আর বাড়াবাড়ি করার জন্যে সে বিয়ে করতে পারতো না, তাকে আটকে রাখা হতো।(৮) নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ বা উপেক্ষার সম্মুখীন হতো, আর কোনো কোনো অবস্থায় তাকে ঝুলন্ত রাখা হতো।(৯) এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিলো, যা কেবল পুরুষের জন্যেই নির্দিষ্ট-নির্ধারিত ছিলো। নারীর জন্যে তা ছিলো হারাম।(১০) পুরুষরা যেমন খুশী বিয়ে করতে পারতো, এ ব্যাপারে তাদের কোনো সীমা-সংখ্যা ঠিক করা ছিলো না।(১১)

কন্যা সন্তানকে এতোটা ঘৃণা আর উপেক্ষা করা হতো যে, শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, তাদেরকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। আল-মায়দানীর উদ্ধৃতি দিয়ে হায়সাম ইবনে আদী বলেন, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলার ঘটনা গোটা আরবের সকল বংশ-গোত্রেই প্রচলিত ছিলো। এক বিরাট সংখ্যক লোক কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতো। ইসলামের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আরবদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন ছিলো। তারা একেকজন একেক কারণে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতো। তাদের কেউ কেউ কন্যা সন্তানের কারণে লজ্জা-শরমের কথা চিন্তা করে তাকে হত্যা করতো। হলুদ, কালো, শ্বেতবর্ণ আর আঁতুড় কন্যা সন্তানকে কেউ কেউ কুলক্ষণা মনে করে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতো। কখনো কখনো জন্মের সাথে সাথেই চরম নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে পুঁতে ফেলা হতো, যার নযীর ছিলো সর্বত্র। কখনো আবার সন্তানদের পিতা সফরে বা অন্য কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে তাদের পুঁতে ফেলার কাজটি বিলম্বিত হতো। ইতিমধ্যে কন্যা বড় হয়ে যেতো, তার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধিও হতো। আবার কেউ কেউ সুউচ্চ পর্বত থেকে নিক্ষেপ করেও কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করতো।(১২)

জাহেলী যুগের সকল পাপ-পংকিলতার মূল উৎস ছিলো শেরেক ও মূর্তি পূজা। জাহেলী যুগে আরবদের শেরেক আর মূর্তিপূজার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে ওস্তাদ আবুল হাসান আলী নদভী তার একই গ্রন্থ (মুসলমানদের পতনে বিশ্বের যে ক্ষতি হয়েছে)-এ লিখেন,

'পৌত্তলিকতা আর মূর্তিপূজায় গোটা আরবজাতিই নিমজ্জিত ছিলো। প্রতিটি গোত্র-কাবিলা, প্রতিটি নগর-বন্দরের জন্যে ছিলো বিশেষ মূর্তি। এমনকি প্রতিটি গৃহ ও পরিবারের জন্যেও ছিলো এক বিশেষ মূর্তি। কাবীল বলেন, মক্কার লোকদের জন্যে একটা বিশেষ মূর্তি ছিলো, তারা সেটা পূজা করতো। তাদের কেউ সফরে যেতে চাইলে সর্বশেষ যে কাজটি করতো, তা ছিলো মূর্তিকে স্পর্শ করা, আদর-যত্নের সংগে তার গায়ে হাত বুলিয়ে যাওয়া। আর সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে গৃহে উপস্থিত হয়েও সর্বপ্রথম যে কাজটি করতো, তা ছিলো মূর্তির গায়ে সযত্নে হাত বুলানো।'(১৩) কেউ কেউ মুর্তির জন্যে একটা ঘর নির্দিষ্ট করে রাখতো। কেউবা ঠিক করে নিতো নির্দিষ্ট জায়গা। আর এটা করা যার পক্ষে সম্ভব ছিলো না, সে হারাম শরীফের সম্মুখে অথবা অন্যত্র যেখানে তার পছন্দ হতো, একটা প্রস্তর স্থাপন করতো এবং বায়তুল্লাহর মতোই সে পাথরকে

(৭) তাফসীরে তাবারী ৪/৩০৮
(৮) সূরা বাকারা ২৩১
(৯) সূরা আন্ নেসা ১৩৯
(১০) সূরা আন্ আনআম ১৪০
(১১) সূরা আন্ নেসা ৩
(১২) সূরা আন্ নেসা ৩
(১৩) কেতাবুল আসনাম

তওয়াফ করতো। তারা এর নামকরণ করেছিলো 'আনসাব'।(১৪) কেবল এক আল্লাহর এবাদাত করার জন্যে যে কাবাগৃহের পত্তন হয়েছিলো সে কাবাগৃহের অভ্যন্তরে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিলো।(১৫)

মূর্তি আর প্রতিমার পূজা করতে করতে ধীরে ধীরে তারা বিশেষ ধরনের প্রস্তর পূজায়ও নেমে আসে। আবু রাজা আল-আতাগরিদী থেকে ইমাম বোখারী বর্ণনা করে বলেন, 'আমরা পাথর পূজা করতাম। কোনো উত্তম প্রস্তর পেলে আগেরটা ফেলে দিয়ে উত্তমটা গ্রহণ করতাম। কোনো প্রস্তর না পেলে আমরা মাটির চাকা একত্র করতাম এবং ছাগল ধরে এনে তার ওপর দুধ দোহন করে তার তওয়াফ করতাম।(১৬) কালবী বলেন, কেউ সফরে বের হয়ে কোনো মনযিলে অবস্থান করলে চারটি প্রস্তর হাতে নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তরটিকে তার 'পালনকর্তা' হিসাবে গ্রহণ করতো এবং বাকী তিনটি প্রস্তরকে মেষ চরাবার জন্য গ্রহণ করতো, আর সেখান থেকে প্রস্থানকালে প্রস্তরটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতো।(১৭)

সকল যুগ আর সকল দেশের মতো আরবদেরও উপাস্য ছিলো অনেক। ফেরেশতা, জ্বিন আর নক্ষত্র এই সব কিছুর পূজা তারা করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, ফেরেশতারা হচ্ছে আল্লাহর কন্যা। ফেরেশতারা তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তার ফেরেশতাদের নামের মূর্তির পূজা করতো।(১৮) আল্লাহর কাছে এদেরকে নিজেদের মুক্তির উপায় বলে মনে করতো। এ সংগে তারা জ্বিনকেও মনে করতো আল্লাহর কাজের অংশীদার। এদের অসীম ক্ষমতায়ও তাদের বিশ্বাস ছিলো। এ কারণেও তারা জ্বিনদের পূজা করতো।(১৯) আর ছায়েদ বলেন, হিমইয়ার গোত্র সূর্য দেবতার পূজা করতো। কেনানা গোত্র পূজা করতো চন্দ্র দেবতার আর তামীম গোত্র পূজা করতো অন্য দেবতার। বনু লখম আর বনু জুযাম গোত্র পূজা করতো বৃহস্পতি গ্রহের।। ত'াই কবীলা পূজা করতো আরেকটি গ্রহের যার প্রভাবে ইয়ামান দেশে উত্তম চামড়া তৈরী হয় বলে তাদের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত হয়ে পড়েছিলো। কায়েম গোত্র পূজা করতো শি'রা গ্রহের, আর বনু আসাদ পূজা করতো বুধ গ্রহের।(২০)

তাদের মন-মানস, চিন্তাধারা এবং বাস্তব জীবনে মূর্তিপূজার পংকিলতা কতোদূর স্থান করে নিয়েছিলো, তার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে অনুসন্ধান চালালে সে সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য জানা যায়। ইসলাম তাদের জীবনে কি বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছিলো, তাদের চিন্তা-চেতনা এবং বাস্তব জীবনে ইসলাম কি চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য। তাদেরকে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা দান করেছে। নৈতিক আর সামাজিক ব্যাধির কথা কবিতার মাধ্যমে তারা হাটে-বাজারে গর্ব করে প্রকাশ করতো, মদ আর জুয়া ছিলো তাদের নিত্যদিনের সংগী। তাদের সকল কর্মকান্ডের এসব ছিলো মৌলিক উৎস। এসব ক্ষুদ্র ভোগবাদী চিন্তা থেকে তারা উর্ধে উঠতে পারতো না। এসব নৈতিক অবক্ষয় থেকে ইসলামই তাদেরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছে।

---

(১৪) কেতাবুল আসনাম
(১৫) সহি বোখারী
(১৬) সহি বোখারী
(১৭) কেতাবুল আসনাম
(১৬) সহি বোখারী
(১৭) কেতাবুল আসনাম
(১৮) কেতাবুল আসনাম
(১৯) কেতাবুল আসনাম
(২০) কেতাবুল আসনাম

জাহেলী যুগে আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রক্তপাতের বিবরণ দিয়ে ওস্তাদ আবুল হাসান আলী নদভী উপরোক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ করেন।

'যুদ্ধ-বিগ্রহ আর রক্তপাত তাদেরকে এতোই অন্ধ ও মত্ত করে তুলেছিলো যে, তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো। ওয়ায়েলের দু'পুত্র বকর এবং তগলবের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ী হয়। তাতে অনেক মানুষের রক্ত ঝরে। সায়াদ ছিলো কুসাই গোত্রপতি। বাসূস বিনতে মুনকিল-এর উষ্ট্রীর ওলানে সে একদিন তীর নিক্ষেপ করলে তার দুধে রক্তের মিশ্রন ঘটে। এ ক্ষুদ্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে রক্তপাত ও যুদ্ধ। জাসাস ইবনে মুররা কুলাইব গোত্রের একজনকে হত্যা করে এর ফলে বনু বকর আর বনু তগলবের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কুলাইব গোত্রের ভাই মুহালহাল বলেন, 'শতশত জীবন বিনাশ হলো, মাতৃ জাতি শেষ হয়ে গেলো ও শিশুরা সব এতিম হলো। অবস্থা এমন হলো যে, অশ্রু আর বর্ষিত হতো না। মৃতের লাশগুলোও দাফন করা হতো না।'

আরেকটি বর্ণনা এসেছে অন্য গ্রন্থে, সেখানে বলা হয়েছে, যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো দাহেস ও গাবরা-এর মধ্যে। এর কারণ ছিলো অতি তুচ্ছ একটা। একদিন দাহেস কয়েস ইবনে সুহাইরের ঘোড়া নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। কয়েস ইবনে সুহাইর এবং হোযায়ফা উভয়ের মধ্যে এ দৌড় প্রতিযোগিতা নিয়ে বাজী হয়। দাহেস এতে বিজয়ী হয়। আসাদ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হোযাইফার সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং তাকে কিল-ঘুষি মারতে শুরু করে। লোকটি এতে তার অশ্ব হারিয়ে ফেলে। এটাকে কেন্দ্র করে কিছু হত্যাকান্ড ঘটে। অতপর স্বাভাবিকভাবেই রক্তের দাবী ওঠে। বিভিন্ন কবীলা তাদের নিজ নিজ লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। অনেককেই বলি দেয়া হয়। নানা গ্রোত্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার মানুষ এতে নিহত হয়।(২১)

এসব কিছু এজন্যেই সংঘটিত হয়েছিলো যে, তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না, তাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো দায়িত্ব ছিলো না, যা এধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে নিজেদের শক্তি নিঃশেষ করা থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখবে। মানবতার প্রতিও তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো না যা তাদেরকে এসব হীন ও জঘন্য কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। সর্বোপরি ছিলো না আনুগত্য করার মতো কোনো আকীদা-বিশ্বাস।

বিংশ শতাব্দির আধুনিক জাহেলিয়াত

জাহেলিয়াত তো জাহেলিয়াতই। আর সকল জাহেলিয়াতেই রয়েছে পংকিলতা, অশুচিতা। তার কাছে স্থান-কালের কোনো গুরুত্ব নেই, মানুষের মন ও তাদের চিন্তাধারা যখন আল্লাহর দেয়া আকীদা-বিশ্বাস এবং তাঁর আইন-বিধান থেকে তা মুক্ত হয়, বিশেষ করে যে শরীয়ত তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে– তখন সেখানে বিভিন্ন রূপে আর বিভিন্ন আকৃতিতে কেবল জাহেলিয়াতই অবশিষ্ট থাকে। এ ছাড়া অন্য কিছুই আর সেখানে বাকী থাকে না।

যে জাহেলিয়াতে বর্তমান সময়ে মানবতাকে ধ্বংসের অতলে নিক্ষেপ করছে তা এবং এই আরব জাহেলিয়াত এক ও অভিন্ন বস্তু। বরং আমার তো বলে মনে হয় এই জাহেলিয়াত পুরনো আরব জাহেলিয়াতকেও অনেকাংশে ছড়িয়ে গিয়েছে।

আজকাল গোটা মানবতা একটা মর্মন্তুদ আর্তনাদের মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করছে। আধুনিক কালের ফিল্ম আর ফ্যাশন শো, রূপচর্চা আর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, নৃত্যশালা, পানশালা আর বিপণী প্রচার মাধ্যমের প্রতি নযর দিলে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। নারীদেহের প্রতি

---

(২১) ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) রচিত 'মা যা খাসেরাল আলামু বেএনহেতাতিল মুসলেমিন' 'মুসলমানদের পতনে বিশ্বের যে ক্ষতি হয়েছে।' পৃঃ ৩৪

আকর্ষণ সৃষ্টির কলা-কৌশলের দিকে তাকালে বুঝা যায়, যে তারা সবাই এর পেছনে কেমন মাতাল হয়ে ছুটে চলেছে। শিল্প-সাহিত্য আর প্রচার মাধ্যম এর সর্বত্রই চলছে এক অশুভ তান্ডব। এর সাথে রয়েছে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা যার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে অর্থের প্রতি মারাত্মক এক মোহ আর অর্থ পুঞ্জীভূত করার জন্যে এক-ঘৃণ্য কৌশল, আর এসব কৌশলকে আইনের লেবাস পরাবার জন্যে রয়েছে নানা ছল-চাতুরী আর অপকৌশল।(২২)

মানুষ এখন মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছে, বরং বলা যায় তার মাথা খেয়ে তাকে সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছে। আজ মানুষ পশুর মতো ধ্বংসের দিকে উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। সে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নেমে পড়েছে। মনে হয় তাতেও বুঝি সে খুশী নয়। সে আরো নীচে নেমে যেতে চায়। সত্যি আজকের মানুষের চেয়ে পশুরা অনেক পরিচ্ছন্ন, অনেক ভদ্র এবং পবিত্র। কেননা প্রকৃতির অনুশাসন দ্বারা পশুরা পরিচালিত হয়। লোভ-লালসার পেছনে ছুটে গিয়ে মানুষ যতো নোংরামী করতে পারে, পশু তা করে না। আজকের মানুষ কোনো নৈতিক বিধিবিধান মেনে চলে না, যে জাহেলিয়াত থেকে একদিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে মুক্ত করেছিলেন, আজ মানুষ সেদিকেই আবার ছুটে চলেছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মোমেন বান্দাদেরকে সে জাহেলিয়াত থেকে পবিত্র করার জন্যেই এ আয়াতে বর্ণনায় বলেছেন, 'তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন কেতাব ও ও হেকমত।'

এ আয়াতে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা ছিলো নিরক্ষর এবং জাহেল। তারা কলম আর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও উম্মী ছিলো। বিশ্বের পরিচিত মানদন্ডের মতো মূল্যবান কোনো জ্ঞান তাদের ছিলো না। তাদের জীবনে এমন কোনো বড় চিন্তা দর্শনও ছিলো না, যা তাদের মধ্যে এমন কোনো জ্ঞান সৃষ্টি করতে পারে, যা বিশ্বের কোনো না কোনো পর্যায়ে মূল্যবান বলে সাব্যস্ত হতে পারে। কিন্তু শেষ নবীর রেসালাত তাদেরকে বিশ্বের শিক্ষক আর জ্ঞানীর আসনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাস, চিন্তা, সমাজ আর সংগঠনের ক্ষেত্রে তারা এমন এক বিধানের অধিকারী হয়েছিলেন, যে এর ভিত্তিতে তারা তৎকালীন গোটা মানবতাকেই জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি দান করেছিলেন। অনাগত ভবিষ্যত আধুনিক জাহেলিয়াত থেকে মুক্তিলাভের জন্যেও মানবজাতিকে বারবার তাদেরই প্রতীক্ষা করতে হবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের আধুনিক এবং প্রাচীন জাহেলিয়াতের সব কয়টি বৈশিষ্ট্যই বর্তমান রয়েছে। নৈতিক আর সামাজিক সকল দিকেই এ উভয় জাহেলিয়াতের মধ্যে পুরোমাত্রায় সাদৃশ্য বিদ্যমান। মানবজীবনের লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যের মধ্যেও উভয়ের মাঝে রয়েছে প্রচুর মিল। বর্তমান কালের বস্তুগত জ্ঞানের বহুমূখী অগ্রগতি সত্ত্বেও উভয় জাহেলিয়াতের বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন।

যদিও তারা আগে থেকেই নিমজ্জিত ছিলো স্পষ্ট গোমরাহীতে, এ গোমরাহী ছিলো আকীদা-বিশ্বাসে, গোমরাহী ছিলো জীবনের অর্থ ও তাৎপর্যে, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে, স্বভাব-চরিত্রে আর আচরণে, গোমরাহী ছিলো নিয়ম-নীতি আর বিধানে।

ইসলামই আরব জাতির উত্থান ঘটিয়েছে

যে আরবদেরকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা নিসন্দেহে জানতো যে, ইসলাম ছাড়া তারা সেখানে কোনোদিনই পৌঁছাতে পারতো না। মানবজাতির ইতিহাসে এ পরিবর্তনের কোনো নযীরও তারা স্থাপন করতে পারতো না। তারা জানতো যে, ইসলাম এবং কেবল ইসলামই তাদেরকে গোত্রবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে। এজন্যে যাতে তারা যামানার কোনো ভূমিকা আর হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমন একটা জাতিতে পরিণত হতে পারে, যে জাতি মানবতার

(২২) দেখুন, তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' (৩১৮-৩২৮) ও ওস্তাদ আবুল আলা মওদূদী (র.) রচিত 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং'।

নেতৃত্ব দিতে পারে, পারে মানব জাতির জন্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। মানবজাতির সামনে এমন এক নযীর স্থাপন করতে পারে, দীর্ঘ ইতিহাসে যার কোনো নযীর নেই।

তারা একথাও জানতো যে, ইসলাম এবং কেবল ইসলামই তাদেরকে জাতীয় অস্তিত্ব দানে ধন্য করেছে, তাদের রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক পরিচয় দিয়েছে। অবশ্য তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাদের মানবীয় পরিচয়, যা তাদের মানবতা এবং মনুষ্যত্বকে সুউচ্চ করেছে। এ সম্মান এ মর্যাদার ওপরই স্থাপিত হয়েছে তাদের গোটা জীবনের বিধান। এই বিধান তাদের মহান পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের অনুগ্রহ স্বরূপ এসেছে। অতপর এ জীবনবিধানকেই গোটা দুনিয়ার ওপর তারা ছড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহর শেখানো নিয়ম অনুযায়ী কিভাবে মানুষকে মর্যাদা দিতে হয়, তারা তাও মানুষদের শিক্ষা দিয়েছে। এক্ষেত্রে কেউই তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারেনি, জাযিরাতুল আরবে তো নয়ই বরং দুনিয়ার অন্য কোনো স্থানেও নয়। ইতিপূর্বে উল্লেখিত সূরায়ও এ বিধানের কিছু ইংগীত রয়েছে। তাতে তারা ভালো করেই দেখতে পেয়েছে, তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ আসলেই কতো বেশী ছিলো।

তারা আরো জানতো যে, ইসলাম এবং কেবল ইসলামই তাদেরকে এমন দায়িত্ব দিয়েছে, যা তারা বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে। ইসলাম তাদেরকে একটা জীবন দর্শন দিয়েছে। এ দর্শন গোটা মানবতাকে জীবনের সফলতার জন্যে অতুলনীয় এক জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে। এ দর্শন আর এ জীবনবিধান সম্বলিত কোনো জাতি মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে দ্বিতীয় আর একটি পাওয়া যায় না, যারা মানুষের সম্মুখে এমন কোনো জীবন দর্শন উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। মানবজীবনের জন্যে ইসলামের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভংগী রয়েছে, রয়েছে একটা সমাজবিধান, রয়েছে একটি আদর্শভিত্তিক ইতিবাচক জীবনবিধান। এ জীবনবিধান এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়, যার আলোকে তারা সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে। ইসলামের এ বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে আরবরা তাকে বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরেছে। বিশ্ববাসী তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে, এক পর্যায়ে তাদের হাতে দুনিয়ার নেতৃত্ব তুলে দিয়েছে।

এখন তাদেরকে কেবল এ বাণীই বহন করতে হবে, কেননা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারে এমন অন্য কোনো বাণী আর কারো কাছে নেই। হয় তাদেরকে তা ভালো করে তুলে ধরে মানবতাকে তার সংগে পরিচয় করাতে হবে, নয় এমনভাবে তাকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে, যেন মনে হবে যে কেউ কোনোদিন তাদেরকে কখনো চিনতোই না। এ বাণী ছাড়া মানবতার সামনে আর কোনো বাণী তারা কি পেশ করতে পারে? শিল্প-সাহিত্য আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা কি মানবতার সামনে নতুন কিছু উপস্থাপন করতে পারে? সে যোগ্যতা কতোটুকুই বা তাদের আছে তাদের পূর্বেও বিশ্বে নানা জাতি উন্নতি করেছে, কই তারা তো এমন কিছুই রেখে যেতে পারেনি। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাই এখন আর কেউ অপেক্ষায়ও নেই। মানবতার সামনে কি তারা উন্নত শিল্প উৎপাদন উপস্থাপন করতে পারে, যা দুনিয়ার সামনে তাদের চেহারাকে উজ্জ্বল ঝলমলে করে তুলবে, অমুসলিম বাজারসমূহকে নতুন কিছুতে সয়লাব করে দেবে। তাদের কাছে যে শিল্প উৎপাদন রয়েছে তা দিয়ে কি তারা অন্যদের আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারবে। তারা কি মানবতার সামনে নিজেদের রচিত নিজেদের চিন্তাধারাপ্রসূত ধর্ম ও সমাজ দর্শন উপস্থাপন করতে পারে? অথচ এসব ধর্ম আর দর্শনেই বিশ্ব আজ ভারাক্রান্ত হয়ে চিৎকার করছে, এ ব্যাপারে তারা চরমভাবে হতাশ আর হতভাগ্য হয়ে পড়েছে।

এর কোথাও মুসলমানদের যখন কিছু দেয়ার নেই তাহলে তারা কোন জিনিসটির সংগে আজ অন্য মানুষদের পরিচয় করিয়ে দেবে? উন্নত হওয়া এবং বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়ার জন্যে কোন বিষয়টির তাদের কাছে তারা নিয়ে যাবে? এ মহান বাণী এ অনন্য জীবনবিধান ছাড়া তাদের

দেয়ার মতো তো আর কিছুই নেই। যে অনুগ্রহ আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন, সে দানে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিভূষিত ও সম্মানিত করেছেন, তাছাড়া আর কিছুই তাদের নেই। আজ মানবতা দুর্ভাগ্য, বিস্ময়, অস্থিরতা আর দারিদ্র্যের আবর্তে নিপতিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ অবস্থায় ইসলামী জীবনবিধান ও মূল্যবোধ হচ্ছে এমন এক মূলধন, যা অতীতেও মুসলমানরা অন্য মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছিলো, মানুষরা তা গ্রহণ করে ধন্যও হয়েছিলো। নিজেদের তৃষ্ণাও তারা নিবারণ করেছিলো। আজও বিশ্ব মানবতার সম্মুখে তাদের তাই উপস্থাপন করতে হবে। একমাত্র তাতেই তাদের মুক্তি ও নাজাত নিহিত রয়েছে।

এই বাণী প্রতিটি জাতির জন্যেই। আর যে জাতির কাছে সেই মহান বাণী রয়েছে, সে জাতিই পৃথিবীতে এককভাবে জীবনের জন্যে একটি উন্নত মতাদর্শ পেশ করতে পারে। এক সময় আরবরা ছিলো এ বাণীর বাহক, এ বাণীর অধিকারী। এ ক্ষেত্রে তারাই ছিলো মূল, অন্যরা ছিলো তাদের শরীক ও অংশীদার মাত্র। এক মহান রসূলের মাধ্যমে আল্লাহর এ দান, এ অনুগ্রহ একসময় সত্যিই তাদের জন্যে মহান বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ দান থেকে তাদেরকে বিরত রাখা শয়তান ছাড়া আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এ ব্যাপারে শয়তানকে বিতাড়িত করার ক্ষমতাও আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে দান করেছেন।

আল্লাহর ইচ্ছাই সর্বত্র কার্যকর হয়

অতপর আয়াতে যুদ্ধের ঘটনা সেসব ঘটনা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের মন্তব্যসমূহও উপস্থাপন করা হয়। সেসব ঘটনাদৃষ্টে তাদের মনের ভীতি-বিহ্বলতার কথা এখানে উল্লেখিত হয়েছে। মুসলমানদের সংগে যা ঘটেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ রয়েছে। কারণ তারা মুসলমান, তাদের সংগে আচরণ করা হবে আল্লাহর নিয়ম-নীতি অনুযায়ী– এ স্বাভাবিক। যে ব্যক্তি নিয়ম-নীতি মেনে চলে না, বাস্তবতা তার সংগে কখনো পক্ষপাতিত্ব করে না।

এ কারণেই তাদেরকে এখানে এনে এক কঠিন উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড় করানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের সমনে একথা ব্যক্ত করতে চান যে, যা কিছু ঘটেছে, তা ঘটেছে তাদের নিজেদের কর্মদোষেই। তা ছিলো তাদের কর্মেরই স্বাভাবিক ফল! কিন্তু তিনি তাদেরকে এখানে এনে এমনিই ছেড়ে দেননি। বরং কার্যকারণ আর পরিণতির পেছনে আল্লাহর যে ইচ্ছাটুকু নিহিত রয়েছে, তার সংগে এর মাধ্যমে তিনি তাদের সংযোগ স্থাপন করেন। ঘটনাপ্রবাহের পেছনে আল্লাহর যে অভিপ্রায় কার্যকর রয়েছে, তার সংগে এখানে তিনি তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেন। এখানে যা কিছু ঘটেছে তার রহস্য তিনি তাদের সম্মুখে খোলাখুলিভাবে তুলে ধরেন, যেন এর দ্বারা তাদেরকে পরবর্তী পর্যায়ের জন্যে তিনি প্রস্তুত করতে পারেন, তাদের অন্তরকে পাক-সাফ করতে পারেন। সর্বোপরি তাদের দলকে মোনাফেকদের থেকে পৃথক করে দিতে পারেন। কেননা ঘটনা প্রবাহ এখানে এসে মোনাফেকদের মুখোষ সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছিলো। এভাবে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর তদবীর ও ভাগ্যলিপির দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। কোরআন মজীদের এ সূক্ষ্ম ও ধীর বিশ্লেষণ দ্বারা এ সূত্রটি তাদের মন-মানসে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এরশাদ হচ্ছে,

যখনি তোমাদের ওপর (ওহুদ যুদ্ধের) এই বিপদ নেমে এলো, তখনি তোমরা বলতে শুরু করলে (পরাজয়ের) এই বিপদ কিভাবে এলো .... এটা তোমাদের নিজেদের (কর্ম দোষের) কারণেই এসেছে। আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ের ওপর অসীম ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।০(আয়াত ১৬৫)

আল্লাহর বন্ধু ও তাঁর পতাকাবাহী বিশ্বাসের ধারক-বাহকদের সাহায্য করা আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন। কিন্তু এ সাহায্যকে তিনি তাদের অন্তরে ঈমানের তত্ত্বকে বদ্ধমূল করা, তাদের সংগঠন আর আচার-আচরণে ঈমানের দাবীকে যথাযথভাবে পূরণ করার চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করার সংগে যুক্ত করেছেন। এটাই আল্লাহর শাশ্বত নীতি। এ নীতি

কখনো নড়চড় হয় না, তাতে রদবদলও হয় না। যখন তারা এসব ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম দেখবে তখন তাদেরকে মেনে নিতে হবে যে, এটা হচ্ছে তাদেরই ত্রুটির পরিণতি। তারা মুসলিম বলে তাদের জন্যে প্রকৃতির নীতি লংঘন করা হবে, তা হতে পারে না। অপরদিকে তারা মুসলমান বলে শুধু শুধু তাদেরকে ছেড়েও দেয়া যেতে পারে না।

তাদের আত্মসমর্পণ আর আত্মনিবেদন হবে শুধু আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর পতাকা উর্ধে তুলে ধরার জন্যে। তাঁর আনুগত্যে দৃঢ়সংকল্প থাকার জন্যে এবং তাঁর জীবনবিধান কঠোরভাবে মেনে চলার জন্যে তারা নিবেদিত হবে, আর আল্লাহর শান হচ্ছে মানুষের ভুল–ভ্রান্তি আর ত্রুটি-বিচ্যুতিকে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ ও বরকতে পরিণত করে দেয়া, তবে তা কিছু ভুলের কিছু মাসুল দেয়ার পর। ভুলভ্রান্তি আর তার পরিণতি থেকে আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কিছু অভিজ্ঞতা নিতে এবং কিছু শিক্ষা দিতে চান। উপরন্তু এর দ্বারা তিনি তাদের আকীদা-বিশ্বাসকেও স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন করেন। সর্বশেষে তিনি তাদেরকে আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য লাভের যোগ্য করে তোলেন। এভাবেই তারা কল্যাণ আর বরকত লাভের উপযুক্ত হয়। আল্লাহর হেফাযত আর তাঁর দান-অনুগ্রহ থেকে মুসলমানদেরকে কখনো সরিয়ে দেয়া হয় না, বরং পথ চলার নানা সম্বল দিয়ে তাদের সাহায্য করা হয়। এটা তখনই অর্জিত হয়– যখন তারা পথ চলতে গিয়ে বারবার আঘাত পায়, পথের সংকীর্ণতা তারা বারবার অনুভব করে।

এমনই স্পষ্টতা আর দ্ব্যর্থহীনতা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মুসলিম জামায়াতকে নিজের করে গ্রহণ করেন। যা কিছু এখানে তাদের ওপর ঘটে গেছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তাদের কাজের ছোটো ছোটো কারণগুলোও তিনি তুলে করেন। ভয়-ভীতি আর ঘরে বসে থাকা কখনো মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না– এসত্যও তাদের তাদের বুঝিয়ে দেন।

'যখন তোমাদের ওপর একটা মুসীবত এসে পৌঁছালো এবং তোমরা বললে, এটা কোথা থেকে এলো? বলে দাও যে, এটা এসেছে তোমাদের নিজেদেরই পক্ষ থেকে।'

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের ওপর বিপদ আপতিত হয়েছে। আহতদের ছাড়াও সত্তর জন সাথী তারা হারিয়েছে। সে দিন তারা ভীষণ বিপদাপদে নিপতিত হয়েছিলো। সেসব বিপদ সব আল্লাহর ইচ্ছায়ই এসেছিলো। তারা যে মুসলমান তারা যে জেহাদ করে আল্লাহর রাস্তায় তা প্রমাণ করাই ছিলো আল্লাহর ইচ্ছা। তাদের দুশমনরা হচ্ছে মোশরেক, আল্লাহর দুশমন। অপরদিকে এটাও তো ঠিক যে, সেদিন মুসলমানদের ওপর যে বিপদ এসেছিলো, অনুরূপ বিপদ বদর যুদ্ধে এসেছিলো মোশরেকদের ওপর। সেদিন কোরায়শরা তাদের সত্তর জন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে হারিয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের শুরুর দিকেও মুসলমানরা ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়েছিলো। প্রথম দিকে তারা আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহর রসূলের নির্দেশের ওপর অটল ছিলো। গনীমতের মালে প্রলুব্ধ হয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রদর্শন করার আগে তারা ঠিক এমনটিই করেছিলো। যখন তাদের মনে এমন এক ভাবের উদয় হয়, যা কোনো মুসলমানের অন্তরেই উদয় হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের এখানে এসব কিছু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। সেদিন যা কিছু ঘটেছে, তার ছোট ছোট কারণও তিনি এখানে উল্লেখ করছেন।

'বলো, তা তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই'

তোমাদের মনেই তা জড়িয়ে পড়েছিলো। দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর বিবাদ বিসংবাদে তোমাদের অন্তরে লোভ-লালসা উদয় হয়েছিলো। তোমাদের মন রসূলের নির্দেশের নাফরমানী করেছিলো এবং রসূল যুদ্ধের যে ছক এঁকেছিলেন তোমরা সে ছকের তোমরা বিরোধিতা করেছো। এসব কিছুকে অস্বীকার করে আজ তোমরা বলছো, কিভাবে এটা হলো? অথচ এসব হয়েছে তোমাদের নিজেদের কারণেই, আল্লাহর চিরন্তন নীতি অনুযায়ীই এটা হয়েছে। তোমরাই তো সেজন্যে নিজেদেরকে

আল্লাহর সামনে পেশ করেছিলে। মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর বিধির বিধানের সামনে পেশ করে, তখন তার যথাযথ প্রয়োগ না হয়ে পারে না, তা সে মুসলমান হোক কিংবা মোশরেক। কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে আল্লাহর নিয়ম চলে না। মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে শুরু থেকেই আল্লাহর বিধির দাবী অনুযায়ী মনকে তৈরী করা। এটাই হচ্ছে ইসলামের পরিপূর্ণতা, এটাই ইসলামের সৌন্দর্য! নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। আর তাঁর শক্তির দাবীই হচ্ছে তার নিজের নীতি-বিধানকে যথাযথ কার্যকর করা। নিজের আইন-প্রয়োগ করার দাবী অনুযায়ী সবকিছুর সমাধান করা– যে নিয়ম-নীতির ওপর তিনি সব কিছুকে পয়দা করেছেন। গোটা সৃষ্টির ঘটনা প্রবাহে যে নিয়ম তিনি সর্বত্র বেঁধে দিয়েছেন, তা অকেজো করে ফেলে রাখা আল্লাহর কাজ নয়। সমস্ত ঘটনার পেছনে আল্লাহর একটা রহস্য রয়েছে, যা শুধু তিনিই জানেন। গোটা সৃষ্টিলোকের সব কিছুর পেছনে, সকল আন্দোলন সকল স্পন্দন, সকল জড়তা আর স্থবিরতার পেছনে তাঁর ইচ্ছা-ই শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়।

'আর যেদিন দু'টি দল মুখোমুখী হয়েছিলো, সেদিন তোমাদের ওপর যা কিছু আপতিত হয়েছিলো, তা হয়েছিলো আল্লাহর হুকুমেই।'

এটা হঠাৎ করে ঘটেনি, বে-হিসাবেও হয়নি, অকারণেও ঘটেনি। সৃষ্টিলোকের সকল নড়াচড়া আর সকল স্পন্দনই বিশ্ববিধানের এক কঠোর নিয়মে বাঁধা। প্রত্যেকটির জন্যে নির্ধারিত এক পরিণতি রয়েছে। তা সবই সংঘটিত হয় স্থায়ী নিয়ম-নীতির অধীনে। কখনো তা লংঘিত হয় না, তাতে কারো প্রতি কোনো পক্ষপতিত্বও হয় না। তার পেছনে গোপন রহস্য নিহিত থাকে। এর মধ্য দিয়েই বিশ্ববিধানের চূড়ান্ত বিধির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়।

এক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তাধারার ব্যাপকতা আর সামঞ্জস্য এমন এক সমন্বিত স্থানে পৌঁছে, যেখানে মানবতার ইতিহাসের অন্য কোনো চিন্তাধারাই পৌঁছতে পারেনি। সেখানে এক স্থায়ী বিধান ও চূড়ান্ত নিয়ম-নীতি রয়েছে এবং চূড়ান্ত নীতির পেছনে রয়েছে আবার এক কার্যকর ইচ্ছা। সে আইন-বিধান আর নিয়ম-নীতি এবং ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের পেছনেও রয়েছে আরেক চূড়ান্ত রহস্য, যা সব কিছুকে ঠিকমতো পরিচালিত করে। আর জানা কথা যে, এসব কিছুর মধ্যে মানুষও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানুষ তার নিজের কর্মকান্ড দ্বারা এ নিয়মের সম্মুখেই এসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হয় তার নিজেরই কর্মধারা, যা সে নিজেই ঘটায়, নিজের চিন্তা আর তদবীর অনুযায়ী যার ফল নির্ধারিত হয়। সর্বোপরি এসব কিছুই হচ্ছে আল্লাহর নিয়ম-নীতি আর তার বিধানের অংশ। সেখানে তিনি যা করার তাই করেন, তাঁরই তকদীর ও তদবীর অনুযায়ী যা প্রতিপন্ন করার তা-ই তিনি প্রতিপন্ন করেন। সেখানকার কোনো কিছুই নিয়ম-নীতির বাইরে নয়, নিয়মনীতির বিরোধীও নয়। তা নিয়মের প্রতিপক্ষ নয়, নিয়মের ক্রিয়ার সংগে সাংঘর্ষিকও নয়। এক শ্রেণীর লোক-যারা আল্লাহর ইচ্ছা এবং তকদীরকে এক পাল্লায় স্থাপন করে আর বিপরীত পাল্লায় মানুষের ইচ্ছা ও তার কর্মতৎপরতাকে স্থাপন করার এমন ধারণা করে নিসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট। ইসলামী চিন্তাধারায় এ ব্যাপারটি আদৌ এরকম নয়।

মানুষ আল্লাহর সমকক্ষ নয়, তেমনি প্রকৃতিগতভাবে তার দুশমনও নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা যখন মানুষকে অস্তিত্ব, চিন্তা, তদবীর এবং পৃথিবীতে একটা কিছু করার ক্ষমতা দান করেছেন, তখন এসবের কোনো কিছুকেই তিনি তাঁর নিয়ম-নীতির সংগে সাংঘর্ষিক করেননি, কোনোটাকে আবার তাঁর ইচ্ছার পরিপন্থীও করেননি। বরং তিনি এ নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন যে, মানুষ তকদীর মানবে, আবার পূর্ণোদ্যমে তদবীরও করবে। সে অনুযায়ী চেষ্টা সাধনা করবে, ক্রিয়াকান্ড চালাবে এবং কোথায়ও আল্লাহর ভিন্ন নিয়ম-নীতির মুখোমুখী হলে তা তার ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অবশ্য তেমন কিছু হলে তিনি এর পুরোপুরি প্রতিদানও তাকে দেবেন।

ওহুদ যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছিলো, আমরা বলি ইসলামের সর্বাত্মক চিন্তাধারা অনুযায়ী-ই তা ঘটেছিলো। আল্লাহ তায়ালা তো মুসলমানদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা আল্লাহর দেয়া জয়ের শর্তের বিরোধিতা করেছিলো। ফলে তাদেরকে দুঃখ আর আঘাতের মুখোমুখী হতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি তো এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। এ বিরোধিতা আর দুঃখের পেছনে মোনাফেকদের থেকে মোমেনদেরকে পৃথক করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরটিই হচ্ছে বড়ো কথা। ক্রটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা এ চিন্তাধারার ক্ষেত্রে মোমেনদের অন্তরে যেসব কলুষ কালিমা রয়েছে, তা দূর করে তাদের অন্তরকে পাক সাপ করাও ছিলো এর উদ্দেশ্য। এসব দুঃখকষ্টের পেছনে মূলত মুসলমানদের জন্যে কল্যাণই যে নিহিত রয়েছে, সেটাই প্রমাণিত হলো। তারা এরপর আল্লাহর নিয়ম-নীতি মেনে চলবে এবং তার সামনে আত্মসমর্পণ করবে এটাই আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করবেন, তাদের চূড়ান্ত মঙ্গল আর কল্যাণের মাধ্যমে তিনি তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিকে দূর করবেন। যদিও মাঝখানে এজন্য তাদেরকে কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। সত্যিকার মুসলমানদের পদযুগল এ কঠিন সময়টি অতি সতর্কতার সংগেই অতিক্রম করে। তাদের মন স্থির, নিশ্চিত থাকে। মনে কোন অস্থিরতা-চঞ্চলত থাকে না, থাকে না কোনো বিস্ময়। কেননা তারা সবাই আল্লাহর তকদীরেরই সম্মুখীন। তারা এটাও মনে করে যে, তকদীরের হাতে তারা কিছু সংখ্যক গুটি মাত্র, আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ভাগ্যের গুটির সংগে যা ইচ্ছা তাই জড়িয়ে দেন। ভুল আর নির্ভুল যে পরিণতিই তারা লাভ করে, তা আল্লাহর তকদীর আর হেকমতের সংগে পুরোপুরিই সামঞ্জস্যশীল। যতোক্ষণ তারা সঠিক পথে থাকবে, ততক্ষণ তা তাদের জন্য কল্যাণই বয়ে আনবে।

মোনাফেকী চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন

(ওহুদের ময়দানে) দু'দলের সম্মুখ লড়াইয়ের এই দিনে যে (সাময়িক) বিপর্যয় তোমাদের ওপর এসেছিলো...... জেনে নিতে চান, কারা তার ওপর ঈমান এনেছে। (আয়াত ১৬৬)

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল এবং তার সংগীদের ভূমিকার প্রতি ইংগীত করছেন এবং তারা মোনাফেকী করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে তাদের মুখোশকে পুরোপুরি উন্মোচিত করা হয়েছে। ইসলামী কাফেলাকে তিনি তাদের থেকে পৃথক করেছেন এবং এমন এক সময় তিনি তাদের সত্যিকার অবস্থান তুলে ধরলেন যখন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর বেশী কাছাকাছি এসে পড়ে গিয়েছিলো। তারা বলেছিলো যে, মুসলমান এবং মোশরেকদের মধ্যে যুদ্ধ হবে জানলে আমরা সেখানে যেতাম না। এ যুক্তিতে তারা মোটেই নিষ্ঠাবান নয়, আসলে এটাই তাদের একমাত্র কারণ ছিলো না। মূলত তারা মুখে এমন কিছু কথা বলছে, যা তাদের অন্তরে নেই, তাদের অন্তরে ছিলো মোনাফেকী।

মোনাফেকদের নেতা ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। রসূলুল্লাহ (স.)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা তাকে নেতা বানাবার কথা দিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর আগমন তাকে নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করে এবং সে নেতৃত্ব এনে দেয় আল্লাহর দ্বীন আর সে দ্বীনের ধারক-বাহকদের হাতে। নেতৃত্ব হারানোর একথা তার মনে ঠিক মতোই জাগরূক ছিলো, এজন্যেই ওহুদ যুদ্ধের দিন সে ময়দান থেকে ফিরে যায়।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের লজ্জিত করলেন, তারা যা গোপন করছে আল্লাহ ভালো করেই তা জানেন। অতপর মুসলমানদের মনে তাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রয়াস উন্মোচিত করে আয়াতে বলা হয়,

'তারা হলো সেসব লোক, যারা নিজেরা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে বলে যে আমাদের কথা শুনলে তারা নিহত হতো না।'

তারা কেবল পেছনে পড়ে থেকেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এই কঠিন নাযুক অবস্থায় তাদের এ পেছনে পড়ে থাকার ফল কি দাঁড়িয়েছে তাও সবার জানা আছে। মুসলমানদের শিবিরে বিষয়টা প্রবল কম্পন ধরিয়েছিলো। বিশেষ করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিলো তখনও সে জাতির নেতা, তখনো তার মোনাফেকী পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি, আল্লাহ তায়ালা তখনো এভাবে তার কথা সবার কাছে জাহির করেননি, এ আয়াতের ফলে মুসলমানদের মধ্যে তার স্থান কিছুটা নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এমনকি যুদ্ধের পর শহীদ পরিবারের লোকজনের মনেও সে অনুতাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। সে এবং তার সংগীরা বলে, 'আমাদের কথা শুনলে তারা মরতো না', তারা এর দ্বারা মূলত তাদের পেছনে সরে দাঁড়াবার যুক্তি খুজে বার করার চেষ্টা করে এবং আল্লাহর রসূলের আনুগত্যকে ক্ষতিকর প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তাছাড়া ইসলামী চিন্তাধারায় আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরকেও তারা এর মাধ্যমে বিপর্যস্ত করার অপচেষ্টা করে।

'বলো তাহলে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। তাহলে তোমাদের নিজেদের ওপর থেকে মৃত্যুকে হটিয়ে দাও',

মোজাহেদ আর বসে থাকা লোক, বীর আর কাপুরুষ সকলকেই মৃত্যু স্পর্শ করবে। কোনো লোভ, শংকাই মৃত্যুকে রদ করতে পারে না। বসে থাকা ব্যক্তিও মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারে না এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীর মৃত্যুও দ্রুত এগিয়ে আসে না। কোরআন মজীদ এ বাস্তবতার দিকেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মোনাফেকদের হীন চক্রান্তকে প্রত্যাখ্যান করে। কোরআন সত্যকে যথাস্থানে স্থাপন করে আর মোমেনদের অন্তরকে দৃঢ় করার মাধ্যমে তাতে শান্তি, স্থিতি ও বিশ্বাস আনয়ন করে। এখানে যুদ্ধ প্রসংগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ঘটনাকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে সে এবং তার সংগীরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই ময়দান থেকে কেটে পড়েছিলো। ঘটনাটি পরে উল্লেখ করার মধ্যেও কোরআন মজীদের-পরিশীলন পদ্ধতির একটি বিশেষ ধারা নিহিত রয়েছে। ইসলামী চিন্তাধারার মূল ভিত্তিটা আগে স্থাপন করা, মানবমনে তার সত্যিকার অনুভূতি জাগ্রত করার জন্যেই সে ঘটনার উল্লেখ পরে করা হয়েছে। এভাবে উল্লেখ করায় তাদের এসব কর্মকান্ড যে সঠিক চিন্তাধারা থেকে কতটা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে, তা অনুধাবন করা যায়। এমনি করেই মুসলমানদের মন মানসে ঈমানী মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে এবং ব্যক্তির কর্মকান্ডকে এই মূল্যবোধের মানদন্ডে যাচাই করতে হবে। অতপর ঈমানের সত্যিকার অনুভূতি নিয়ে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

কোরআন মজীদের এ অনন্য জীবনবিধানে আরো কিছু দিকও তাতে মজুদ রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিলো মদীনার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যুদ্ধের ব্যাপারে মহানবী (স.) তার মতামত গ্রহণ না করায় সে ক্ষুব্ধ হয়। কারণ শূরার সাধারণ দাবী হচ্ছে কোনো ব্যাপারে অধিকাংশের মতামত গ্রহণ করা। এ মোনাফেকের কর্মকান্ডটি মুসলমানদের দলে দারুন অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে নিহতদের সম্পর্কে তার কিছু উক্তি জন মানুষের মনে কিছু আক্ষেপও জাগিয়ে তোলে। বলা হয়েছে যে, এ অবস্থায় তার কর্মকান্ড এবং তার উক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই হবে ইসলামী জীবন বিধানের ধারকদের জন্যে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। যেসব কর্মকান্ড নিয়ে সে দলটি সমাজে পরিচিত হবে, তাদের সঠিক পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে,

'যারা মোনাফেকী করেছে?'

এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তাদের কর্মকান্ডে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের সবার নাম এবং তাদের ব্যক্তিত্বকে এখানে যদিও প্রকাশ করা হয়নি, তবুও শব্দের ভেতরে তা প্রকাশিত হয়ে গেছে। বলা হয়েছে, তার মতো কাজ যারা করে তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। পূর্বের আয়াতে ঈমানের যে মানদন্ড স্থাপন করা হয়েছে সে ঈমানের পাল্লায় এর মূল্য একই সমান।

বিশ্বপ্রকৃতিতে নিহিত আল্লাহর নীতির বাস্তবায়ন এবং কর্মকান্ডে আল্লাহর তাকদীর ব্যবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ, তকদীর আর তদবীরের পেছনে নিহিত আল্লাহর হেকমতের মূল তত্ত্ব তুলে ধরার পর এবার নির্ধারিত মৃত্যুর পেছনে যে মৌলিক সত্য লুকিয়ে রয়েছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। যাতে তাদের মন পরিতৃপ্ত হতে পারে। মৃত্যুকে কোনো তদবীর করে যেমন পেছানো যাবে না, তেমনি কোনো কারণেই তা নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত আগেও আসবে না।

শহীদরা মৃত নয় জীবিত

আয়াতে অপর একটি মহাসত্য ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে বিরাট তত্ত্বকথাটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রাস্তায় যারা জীবন দান করেছে তারা মৃত নয়, বরং তারা জীবিত। পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে তারা রীতিমতো জীবিকা লাভ করে। মুসলিম জামায়াতের জীবন আর ঘটনাপ্রবাহ থেকে তারা মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। বরং এর দ্বারা তারা প্রভাবিত হয়। আসলে প্রভাবিত করা আর প্রভাবিত হওয়া এটা হচ্ছে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। ওহুদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে এবং তাদের শহীদ হওয়ার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে এক গভীর ও ঘনিষ্ট যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। অতপর মোমেনদের ক্ষুদ্র দলটির অবস্থান ও ভূমিকার চিত্র অংকন করা হয়। দারুণভাবে আহত হওয়ার পরও এখানে তারা আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কোরায়শরা পুনরায় মদীনার ওপর চড়াও হতে পারে। এ আশংকা সত্তেও কোরায়শদের সম্মিলিত শক্তিকে তারা কোনো পরওয়াই করেননি। একমাত্র আল্লাহর ওপর ছিলো তাদের ভরসা। এ ভূমিকা পালন করেই তাঁরা ঈমানের এই বড়ো তত্ত্বটি প্রমাণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে,

'যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদের তোমরা কোনো.... তাদের মালিকের পক্ষ থেকে তাদের (উত্তম) রেযেক দেয়া হয়। (আয়াত ১৬৯)

আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের অন্তরে তাকদীরের মতো মৃত্যুর রহস্যও বদ্ধমূল করেছেন। শহীদদের সম্পর্কে মোনাফেকরা নিজেদের উক্তি দ্বারা মোমেনদের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় অস্থিরতা আর আক্ষেপ-অনুতাপ সৃষ্টি করেছিলো তা চ্যালেঞ্জ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'বলো, তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে নিজেদের থেকে মৃত্যুকে হটাও তো দেখি!'

মোমেনচিত্তকে প্রশান্ত করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে আরো প্রশান্তি আরো নিশ্চিন্ততা-নিরাপত্তায় ভরে তুলতে চান। শহীদদের শুভ পরিণতিকে তিনি তাদের সম্মুখে স্পষ্ট করে তোলেন। শহীদ হচ্ছেন তারা, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। সত্যিকার অর্থে মনকে সবকিছু থেকে মুক্ত ও নির্মল করে আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া শহীদ হওয়া যায় না। যারা এভাবে জীবন উৎসর্গ করেন, তারা শহীদ তারা জীবিত। তাদের রয়েছে জীবিতদের মতোই বৈশিষ্ট্য। তাদের পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে তারা জীবিকা লাভ করেন। অন্য মোমেনদের পরিণতি দেখে তারা খুশী হন। তাদের পশ্চাতে তাদের ভাইদের কর্মকান্ডেও তারা যোগ দেন। অথচ এটা তো সম্পূর্ণ জীবিতদের বৈশিষ্ট্য। তারা প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ লাভ করে তাতে আনন্দ বোধ করেন, নিজেরা প্রভাবিত হন আর অন্যদেরও প্রভাবিত করেন। সুতরাং তাদের বিচ্ছেদে আক্ষেপ অনুতাপের কী আছে? আল্লাহর কাছে জীবিকা আর মর্যাদা লাভ এবং অনুগ্রহধন্য হওয়া ছাড়াও তারা এসব কর্মকান্ডেও জীবিতদের সংগে যুক্ত ও জড়িত রয়েছেন।

এ কথাগুলোর কিছু ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে, অনেক বড়, অনেক বেশী। নানা বিষয় সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে এ মহাতত্ত্বটি মানুষের চিন্তাধারায় একটা ভারসাম্য স্থাপন করে। এ তত্ত্ব সার্বিকভাবে মুসলিম জীবনের সংগে যুক্ত, তা থেকে মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। মৃত্যুই কোনো মানুষের শেষ কামনা নয়, মৃত্যু তার পরবর্তী সময়ের পথে অন্তরায়ও নয়। এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক নতুন

দৃষ্টিভংগী। মোমেনের অনুভূতিতে এ চিন্তার প্রভাব অনেক ব্যাপক। তারা অনেক বড় ব্যক্তি যারা আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করেন, তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করবে না, বরং তারা তো জীবিত। পরোয়ারদেগারের কাছে তারা রীতিমতো জীবিকাও লাভ করেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদেরকে কোনো অবস্থায়ই মৃত মনে না করার জন্যে আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা যে জীবিত এবং পরোয়ারদেগারের কাছ থেকে জীবিকা লাভ করেন সে কথাও এ আয়াতে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এ নশ্বর পৃথিবীতে বাস করে শহীদরা যে জীবন লাভ করেন, তার ধরন-প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না। অবশ্য তার কিছুটা পরিচয় আমরা সহীহ হাদীসে পাই। মহাজ্ঞানী আল্লাহর স্পষ্ট বাণী জীবন আর মৃত্যুর তাৎপর্য অনুধাবনে আমাদের জন্যে যথেষ্ট। নানা বস্তুকে বাহ্যত আমরা যেমন দেখি, আসলে তা ঠিক নয়, একথা বুঝার জন্যেও আল্লাহর স্পষ্ট বাণী আমাদের জন্যে যথেষ্ট। বাহ্য বস্তুর সাহায্যে আমরা নানা বিষয়ে যেসব তত্ত্ব আহরণ করি, সত্যিকার জ্ঞান লাভ করার জন্যে কেবল তা-ই যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা যে তত্ত্ব যে বিবরণ দিয়েছেন, তার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করাই আমাদের উচিত।

মূলত তারা আমাদেরই মধ্যকার লোক। তারা যে জীবন উৎসর্গ করেন, যে জীবন তাদের সংগ ত্যাগ করে চলে যায়, সে জীবনের বাহ্যদিকটাই কেবল আমরা জানতে পারি। কিন্তু তারা তো জীবন উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর রাস্তায়, ক্ষুদ্র তুচ্ছ সকল বস্তু আর সকল মোহ ত্যাগ করেছেন তারা, তাদের রূহ আল্লাহর সংগে গিয়ে মিলিত হয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় তাঁরা রুহকে দান করেছেন। কেননা আল্লাহর পথেই তারা নিহত হয়েছেন। রসূল (স.) এর সহীহ হাদীসের মাধ্যমেও আমরা জানতে পারি যে, শহীদরা মৃত নয়। তাঁদেরকে মৃত মনে করতেও তিনি আমাদের বারণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে জোর দিয়ে বলছেন যে, জীবিতরা যেমন জীবিকা পায়, তেমনি আল্লাহর কাছ থেকে তারাও জীবিকা পায়। তাদের জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। তাদেরকে যে রেযেক আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন, তাতে তারা খুশী। কারণ, তাঁরা জানে যে, এটা হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহরই দান। তাদের প্রতি আল্লাহর এ অনুগ্রহ একথার প্রমাণ যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা তারা জীবন দিয়েছেন আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহর যে জীবিকার মধ্যে তাঁরা সন্তুষ্ট আছেন, তার চেয়ে বেশী কোনো বস্তু তাদেরকে খুশী করতে পারে না।

তারা তাদের পেছনের ভাইদের নিয়েও চিন্তা করেন। তাদের জন্যে তারা সুসংবাদ বহন করেন। কারণ, তারা জানেন মোমেন মোজাহেদদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। তাদের যেসব ভাই এখনো তাদের সংগে মিলিত হয়নি, তাদেরকে তারা এ মর্মে সুসংবাদ দেন যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তাদেরকে দুঃখিত হতে হবে না। 'তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত আর অনুগ্রহের সুসংবাদ দেয়, এ মর্মেও তারা সুসংবাদ দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা কখনো মোমেনদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না, তাদের যেসব ভাই এখনও তাদের সংগে মিলিত হয়নি, তাদের থেকে ওরা বিচ্ছিন্ন নয়। ওদের সংগে তাদের সংযোগ-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। দুনিয়া-আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন। সুসংবাদ দিচ্ছেন এ মর্মে যে, তাদেরও কোনো ভয় নেই, কোনো শংকা নেই। তারা তাদের পরোয়ারদেগারের এ কথাটা বুঝতে পেরেছে এবং তা বিশ্বাসও করেছে। তারা এটাও বিশ্বাস করেছে যে, সত্যিকার মোমেনদের সংগে এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ আচরণ। তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের বিনিময় মোমেনদের পাওনা বিনষ্ট করেন না, বিফল করেন না।

যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ করেছে, সেসব শহীদের আর কোনো বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হতে কি বাকী থাকে? তাদের যেসব ভাই এখনো তাদের সংগে মিলিত হয়নি, তাদের সংগে মিলিত হতে কোনো বস্তু কি তাদের বাধা দেবে? মূলত এটা সবার ঈর্ষা, সন্তুষ্টি, ভালোবাসা ও কামনার বস্তু হওয়া উচিত। তারা তো কেবল আল্লাহর সান্নিধ্যেই প্রস্থান করেছেন।

কোরআন মজীদের এ আয়াত মুসলমানদের অন্তরে জীবন মৃত্যু সম্পর্কে যে নতুন অর্থ এবং নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চায়, তার সংগে মোজাহেদরা সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলে। যুদ্ধসম্পর্কিত আলোচনার শুরুতে আমরা যে কয়টি নমুনার উল্লেখ করেছি তা ছিলো একথারই স্পষ্ট প্রমাণ।(২৩)

বিপর্যয়ের পরও শাহাদাতের উদ্যমে জেগে ওঠা

এ মহান তত্ত্বটি বিশ্লেষণের পর মোমেনদের সম্পর্কে কিছু কথা এখানে বলা হচ্ছে। শহীদরা তাদের পাওয়ারদেগারের কাছে তাদের জন্যে যা সঞ্চয় করা আছে, সে সম্পর্কে সুসংবাদ দান করেন। পালনকর্তার কাছে তাদের কাহিনী বিবৃত করা হয়। এরশাদ হচ্ছে,

(ওহুদের শোচনীয়) বিপর্যয় আসার পরও যারা (সাথে সাথে আবার) আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে ....সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে, এদের সবার জন্যে রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে এক) মহা পুরস্কার। (আয়াত ১৭২)

এরা হচ্ছে সে সব লোক, রসূলুল্লাহ (স.) যাদের একটি কঠিন যুদ্ধের পরদিন ভোরবেলায়ই পুনরায় কাফেরদের মোকাবেলায় বের হওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন তারা ছিলো আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এবং ক্ষতবিক্ষত। গতকালকের যুদ্ধে তারা অতিকষ্টে নিজেদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে এসেছে। পরাজয়ের গ্লানি আর আঘাতের তীব্রতা তারা তখনো বিস্মৃত হয়নি। যুদ্ধে তারা তাদের অনেক আপনজনকেও হারিয়েছিলো, যদিও তাদের সংখ্যা ছিলো কম। কিন্তু আল্লাহর নবী তাদেরকে ডাকছেন, কেবল তাদেরকেই। যারা যুদ্ধ থেকে দুরে সরেছিলো, তাদেরকে তিনি ডাকেননি। এদের সংগে তাদেরকে তিনি আসার অনুমতিও দেননি। যারা ওহুদে তার সংগে ছিলো তিনি ডাকছেন শুধু তাদেরকেই।

তারা ঠিকমতোই এতে সাড়া দিয়ছে, সাড়া দিয়েছে তারা রসূলের আহ্বানে। কারণ রসূলের আহ্বান তো আল্লাহরই আহ্বান। তারা রসূলের আহ্বানকে আল্লাহর আহ্বান বলেই জানতো। তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। নিজেরা মারাত্মকভাবে আহত এবং আঘাতে জর্জরিত হওয়ার পরও। আল্লাহর রসূল (স.) তাদেরকে ডাকছেন, হ্যাঁ ডাকছেন কেবল তাদেরকেই। এ আহ্বানে সাড়া দান ছিলো সত্যিই কঠিন ব্যাপার, অনেক বড় কথা। সেসব বড় বড় কয়টা কথার কিছু অংশের প্রতি আমরা এখানে ইংগীত করছি,

সম্ভবত রসূলুল্লাহ (স.) চেয়েছিলেন যে, পরাজয় আর আঘাতের অনুভূতিই মুসলমানদের অন্তরে শেষ কথা হয়ে বদ্ধমূল না থাকুক। এ কারণে কোরায়শদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্যে তিনি মুসলমানদেরকে উজ্জীবিত করেন, যাতে তাদের মনে এ ভাবটা জাগে যে, আগের ব্যাপারটা ছিলো নিছক পরীক্ষা। পরাজয়ই শেষ কথা ছিলো না। এরপর তারাই হবে শক্তিশালী আর তাদের ওপর সাময়িক বিজয়ী দুশমনরা দুর্বল হবে। একবার তাদের সামান্য যে পরাজয় হয়েছিলো তা কেটে যাবে, মোটেই তা স্থায়ী হবে না। দুর্বলতা আর অবসাদ ঝেড়ে ফেলে আল্লাহ তায়ালা ও আল্লাহর রসূলের আহ্বানে সাড়া দিতে পারলে পুনরায় তারা দুশমনদের ওপর হামলা করতে পারবে।

অন্যদিকে সম্ভবত রসূলুল্লাহ (স.) এটাও চেয়েছিলেন যে, মনে মনে বিজয়ের ধারণা আর গৌরব নিয়ে কোরায়শরাও ফিরে যাওয়ার সুযোগ না পাক। তাই গতকালকের যুদ্ধে অংশ

(২৩) মূল তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এ ১ম খন্ড। পৃঃ৪৬২-৪৬৫

গ্রহণকারীদের নিয়ে রসূলুল্লাহ (স.) কোরায়শদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করলেন। যাতে কোরায়শদের মনে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, মুসলমানদের কাছ থেকে এ যুদ্ধে তারা আসলে গর্ব করার মতো কিছুই অর্জন করতে পারেনি। তারা যেন বুঝতে পারে যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো কিছু ব্যক্তি অবশিষ্ট রয়েছে, যারা তাদের পশ্চাদধাবন করতে পারে এবং পারে কোরায়শদের ওপর হামলা চালাতে। সীরাত গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তাই সত্যে পরিণত হয়েছে।

সম্ভবত রসূলুল্লাহ (স.) মুসলমানদেরকে এবং তাদের পেছনের গোটা দুনিয়াকে একথাও বুঝাতে চেয়েছেন, পৃথিবীতে নতুন করে সবচেয়ে আদি মতবাদটি আবার প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। তিনি তাদের অনুভূতিতে একথা বদ্ধমূল করাতে চেয়েছেন যে, মুসলমানদের অন্তরে একটা বিশ্বাস রয়েছে এবং সে বিশ্বাসই হচ্ছে তাদের কাছে সব কিছু। দুনিয়ায় তাদের আর কোনো ধরনের বৈষয়িক প্রয়োজন নেই, তাদের জীবনে নেই অন্য কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও। কেবল সে বিশ্বাসের জন্যেই তারা বেঁচে থাকে। এ বিশ্বাসের জন্যে তারা সব কিছুকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

তখনকার বিশ্বে এটা ছিলো সম্পূর্ণ এক নতুন বিষয়। মোমেনরা এ সত্যই গ্রহণ করেছে, বিশ্বের তা গ্রহণ না করে গত্যন্তর নেই। এ নতুন বিষয়টি বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবেই। মুসলমানদের অস্তিত্বের বিনিময়ে হলেও এ মহাসত্য এখানে কায়েম হবে।

আহত হওয়ার পরও আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহর রসূলের আহ্বানে সাড়া দান করে বের হওয়ার মধ্য দিয়ে এ মহাসত্যটিরই জন্ম হয়েছে। তারা সেদিন বজ্রকঠিন রূপ ধারণ করে নিবিষ্ট মনে বের হয়েছিলো। একমাত্র আল্লাহর ওপরই ছিলো তাদের ভরসা। লোকের কথা আর কোরায়শদের কোনো পরওয়া তারা করেনি। যেমন আবু সুফিয়ানের দূত ভয় দেখিয়ে তাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলো। মোনাফেকরাও কোরায়শদের ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছিলো।

'তারা সেসব লোক, যাদেরকে কিছু মানুষ বলেছিলো যে, লোকেরা তোমাদের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পেলো এবং তারা বলেছিলো যে, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।'

এ-ভয়ংকর চিত্রটি ছিলো এ মহাসত্যের বলিষ্ঠ ঘোষণা। মহানবী (স.)-এর নবীসুলভ প্রজ্ঞাপূর্ণ পদক্ষেপ এ সত্যের প্রতিই ইংগীত করে। এ চরম আঘাত আর এ এতে মুসলমানদের সাড়া দানের ধরন সম্পর্কে সীরাত গ্রন্থের দু'একটি বর্ণনা উল্লেখ করছি,

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত আয়েশা বিনতে ওসমানের দাস আবু সালেব সূত্রে আমাকে এই হাদীসটি শুনিয়েছেন যে, বনু আবদুল আশহাল-এর জনৈক ব্যক্তি, যিনি মহানবী (স.)-এর সাহাবী ছিলেন, যিনি বদরযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন, আমি এবং আমার ভাই ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (স.)-এর সংগে অংশ নিয়েছিলাম। আমরা দু'জনই আহত অবস্থায় যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি। রসূলুল্লাহ (স.)-এর মোয়াযযেন তথা আহ্বানকারী শত্রুর সন্ধানে বের হওয়ার আহ্বান জানালে আমি আমার ভাইকে বললাম, অথবা আমার ভাই আমাকে বললেন, রসূলুল্লাহ (স.)-এর সংগে যুদ্ধে যাওয়া কি আমাদের ভাগ্যে হবে না? আল্লাহর কসম, আরোহণ করার মতো কোনো পশু আমাদের ছিলো না আর আমাদের মধ্যে কেউই মারাত্মক আহত ছাড়া অক্ষত ছিলো না। তারপরও আমরা রসূলুল্লাহ (স.)-এর সংগে বের হলাম। আর আমি ছিলাম আমার ভাইয়ের চেয়ে কম আহত। সে চলতে অক্ষম হয়ে পড়লে আমি তাকে বহন করে আকাবায় পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা সেখানে পৌঁছি, যেখানে অন্যান্য মুসলমানরাও পৌঁছেছিলো।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৫ই শাওয়াল শনিবার। পরদিন রোববার ১৬ই শাওয়াল রাত অতিক্রান্ত হলে রসূলুল্লাহ (স.)-এর মোয়াযযেন শত্রুর সন্ধানে বের

হওয়ার জন্যে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়। মোয়াযযেন এ ঘোষণাও প্রচার করে যে, গতকাল আমাদের সংগে উপস্থিত ছিলো না, এমন কেউ যেন আজ বের না হয়। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম আহবানকারীর কথাগুলো বলেন। তিনি বলেছিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার সাতটি বোনের দেখাশুনা করার জন্যে পিতা আমাকে রেখে গিয়েছিলেন। তাই আমি পেছনে থেকে তাদের দেখাশুনা করি। অতপর রসূলুল্লাহ (স.) তাকে অনুমতি দিলে তিনি পরদিন তার সাথে বের হন।

এ মহাসত্যের ঘোষণার পর এমন চিত্র আরো অনেক পাওয়া গেছে। এ চিত্র পাওয়া গেছে তাদের অন্তরে, যে অন্তর আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কাউকে অভিভাবক হিসাবে চিনে না। কেবল তাঁর ওপরই সন্তুষ্ট হয় এবং এটাকেই তাদের জন্যে যথেষ্ট মনে করে। এর ফলে কঠিন-কঠোর মুহূর্তে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তাদেরকে অন্য লোকদের ভয় দেখানোর জবাবে তারা বলে,

'আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক। 'অতপর আল্লাহর নেয়ামত আর অনুগ্রহে তারা ফিরে এলো। কোনো অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শও করলো না। অতপর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা মহা অনুগ্রহশীল'।

তারা নাজাত পেলো, কোনো ক্ষতি কোনো অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করলো না। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করলো এবং তারা মুক্তি আর সন্তুষ্টি নিয়ে ফিরে এলো।

এখানে আল্লাহর দানের প্রথম এবং প্রধান কারণটির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহে ধন্য করেন। রসূল (স.) এখানে গোটা ব্যাপারটিকে আল্লাহর নেয়ামত এবং অনুগ্রহের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ এটাই হচ্ছে দানের বড় উৎস। সকল অনুগ্রহ শেষ পর্যন্ত এ মহা উৎসের দিকেই ফিরে যায়। আর তাদের আজ যা কিছু হয়েছে, তাতে আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন মহা অনুগ্রহের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর চিরন্তন কালামে এ বিধানই দিয়েছেন যা গোটা বিশ্বের পরতে পরতে কার্যকর রয়েছে, এটা গোটা বিশ্ব বিধানকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এটাই হচ্ছে তাদের সঠিক পরিচয়, এটাই হচ্ছে তাদের সঠিক অবস্থান। এ পরিচয়টি অতি উঁচু, এ অবস্থান অতি মহান! মানুষ এ পরিচয়ের দিকে, এ অবস্থানের দিকে বারবার তাকায়, আর সে অনুভব করে যে, দলের কাঠামোতে যেন রাতারাতি পরিবর্তন এসে গেছে। তা পরিপক্ক হয়েছে, আরো সুসংহত হয়েছে। যে ভূমিতে তার অবস্থান ছিলো, তা এখন অনেক স্থির-শান্ত। তার চিন্তাধারা থেকে কুয়াশার সব ঘোর কেটে গেছে। গোটা ব্যাপারটা তাদের কাছে স্বচ্ছ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মাত্র গতকাল তাদের সৈন্য শিবিরে যে চঞ্চলতা, যে অস্থিরতা বিরাজ করছিলো আজ আর তা নেই, আজ তা দূর হয়ে গেছে। ঘটনাবলী তাদেরকে চরমভাবে নাড়া দিয়েছে। সব কুয়াশা দূর করে দিয়েছে, অন্তরকে জাগ্রত করেছে, পদযুগলকে স্থির করেছে আর মনকে ভরে তুলেছে দৃঢ় ইচ্ছা আর সিদ্ধান্তে। এ তিক্ত পরীক্ষা শেষে আল্লাহর এই অনুগ্রহ মহান!

শয়তান মোমেনদের মনে ভীতি সৃষ্টি করতে চায়

পরিশেষে ভয়-ভীতি, হায়-হুতাশ আর অস্থিরতার কারণগুলো একে একে বর্ণনা করে এ প্রসংগের ইতি টানা হয়েছে। আসলে শয়তান তো চেষ্টা চালায় মোমেনরা যেন তার চেলাদের ভয় করে। শয়তান তাদের ওপর ভয়-ভীতির একটা আবরণ চাপিয়ে দেয়। শয়তানের এ চক্রান্ত সম্পর্কে মোমনেদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। শয়তানের বন্ধুদেরকে ভয় করলে চলবে না; বরং ভয় করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে। কেবল এক আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন পরম পরাক্রমশালী।

'এরাই হচ্ছে শয়তান এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না, বরং ভয় করবে আমাকে– যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো।'

শয়তান তার বন্ধুদের শক্তিকে বড় করে দেখায়, তাদের শক্তি-ক্ষমতাতে কৃত্তিম পোশাক পরিধান করায়, মনে এমন ভাবের সৃষ্টি করে যে, তারা বুঝি সব দন্ডমুন্ডের অধিকারী, শক্তিধর। ক্ষতি আর উপকারেরও বুঝি মালিক তারাই। শয়তান এভাবে তার বন্ধুদের দ্বারা নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে। তাদের অনিষ্ট সাধন করতে থাকে। তাই মানুষ তাদের সামনে প্রতিবাদের আওয়ায তুলতে পারে না। শয়তানকে প্রতিরোধ করার কথা কেউ চিন্তাও করতে পারে না, পারে না শয়তানের বন্ধুদের বিপর্যয় আর অনিষ্ট-অনাচার থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখতে।

শয়তান মিথ্যা ছড়ায়, অন্যায়কে বড় করে দেখায়। নিজেকে সে প্রবল পরাক্রমশালী আর দোর্দন্ড প্রতাপশালী বলে জাহির করে। তার সামনে কোনো প্রতিরোধ টিকতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না কেউ। প্রতিরোধকারীদের কেউ তাকে পরাভূত করতে পারে না। বিষয়টাকে এভাবে বিশাল করে পেশ করার ক্ষেত্রে তার কোনো জুড়ি নেই। ভয়-ভীতির আবরণে আর ধর-পাকড় করে শয়তানের সাংগোপাংগোরা পৃথিবীতে এমনসব কান্ড কর বসে, যা দেখে শয়তানের নিজেরই চক্ষু শীতল হয়ে যায়। তারা ন্যায়কে করে অন্যায় আর অন্যায়কে করে ন্যায়। সত্যের আওয়াযকে স্তব্ধ করে দেয়। তারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে খোদা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে, তারা অন্যায়ের সহায়তা করে, ন্যায়কে প্রতিহত করে। কেউ তাদেরকে নেতৃত্বের আসন থেকে হটাতে পারে না। তারা যে অন্যায় অনাচারের প্রচলন ঘটায়, তা ঠেকাবার সাহসও কেউ করতে পারে না। যে সত্যকে তারা নিশ্চিহ্ন করে, তাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার কেউ থাকে না।

শয়তান সব সময়ই প্রতারক, প্রবঞ্চক, ধোকাবাজ। বন্ধুদের পেছনে সে আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তারা শয়তানের প্ররোচনাকে পাত্তা দেয় না, শয়তান তাদের অন্তরে যে ভীতি ছড়ায় এখানে আল্লাহ তায়ালা তাকে উম্মেচিত করেন, তাকে নগ্ন করে ময়দানে এনে হাযির করেন। আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে আসল ব্যাপারটি অবহিত করেন, তার চক্রান্ত আর প্রতারণার রহস্য সম্পর্কে তাদের জানানো। যাতে তারা সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে পারে। তাই মোমেনরা শয়তানের বন্ধুদেরকে ভয় পায় না। মোমেনদের কাছে শয়তান সব সময়ই দুর্বল থাকে। মোমেনদের জন্যে তাকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। কেননা তারা ঝুঁকে পরওয়ারদেগারের দিকে, আশ্রয় নেয় তাঁর শক্তির কাছে। ভয় করার মতো একমাত্র শক্তি হচ্ছে সে শক্তি, যা উপকার ও ক্ষতি করার অধিকার ও ক্ষমতা রাখে, আর সে শক্তি হচ্ছে আল্লাহর শক্তি। ইমানদাররা সে শক্তিকেই ভয় পায়। যখন তারা কেবল এক আল্লাহকে ভয় করে, তখন তারা শক্তিশালীর চেয়েও শক্তিশালী হয়। তাদের সামনে বিশ্বের কোনো শক্তিই তখন টিকতে পার না, দাঁড়াতে পারে না-শয়তানের নিজের ও তার বন্ধুদের শক্তিও। 'তোমরা ভয় করো না তাদেরকে, ভয় করবে কেবল আমাকে, যদি তোমরা মোমেন হয়ে থাকো।'

অবশেষে কুফরীর দিকে কাফেরদের ছুটে যাওয়া এবং লক্ষ্যের প্রতি প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে তাদেরকে সেদিকে নিয়ে যাওয়া, যার কারণে মহানবী (স.)-এর অন্তরে দুঃখ-বেদনা জাগতে পারে– এসব কিছু শেষে আয়াতের পরিসমাপ্তিতে সে সম্পর্কে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। কারণ এটা ছিলো আল্লাহর নির্ধারিত একটা পরীক্ষা। তাদের কুফরী সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা জানেন যে, এটা তাদেরকে পরকালে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য ও উপযুক্ত করবে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন কুফরীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যাওয়ার জন্যে। আল্লাহ তায়ালা তো তাদের সামনে হেদায়াতের পথকে উন্মুক্ত করে তুলে ধরেছিলেন, কিন্তু তারা হেদায়াতের ওপর কুফরীকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্বাচ্ছন্দ, আর সচ্ছলতায় আল্লাহ তায়ালার এভাবে ছেড়ে দেয়াও তাদের ওপর একটা দন্ড– একটা পরীক্ষা।

ক্রমাগত কুফরীর পরিণতি

সমস্ত ঘটনার পেছনে আল্লাহর যে কর্মকুশল কার্যকর রয়েছে সবশেষে তাও এখানে বলা হয়েছে। মোমেনদেরকে পরীক্ষায় ফেলা আর কাফেরদেরকে ঢিল দেয়ার পেছনেও আল্লাহর হেকমত রয়েছে। এর মাধ্যমে পবিত্র আর অপবিত্রকে তিনি পৃথক করেন। আর এটাও করা হয় একটি বিধিবদ্ধ পরীক্ষার মাধ্যমে। এটা একটা গায়েবী বিষয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অবহিত করেন না। অবশ্য এ গায়েবকে মানুষ নিজেরা জানতে পারে, বুঝতে পারে। তাই তো মোমেনদেরকে পরীক্ষা করা হয় আর কাফেরদেরকে ঢিল দেয়া হয় যাতে অপবিত্র থেকে পবিত্র বিষয়গুলো পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানদারদের ঈমান নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পায়। এরশাদ হচ্ছে,

(হে নবী, আজ) যারা দ্রুতগতিতে কুফরীর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের কর্মকান্ড যেন তোমাকে চিন্তিত না করে............পরকালে (পুরস্কারের) কোনো অংশই (নির্দিষ্ট করে) রাখতে চান না, তাদের জন্যে অবশ্যই (জাহান্নামের) কঠিন আযাব রয়েছে। (আয়াত ১৭৬)

যে যুদ্ধে মুসলমানরা এ ধরনের বিপদে পতিত হয়েছিলো, সে যুদ্ধের দৃশ্য অংকন করার জন্যে এ পরিসমাপ্তিটুকুই ছিলো সবচেয়ে বেশী উপযোগী। মোশরেকরা সে যুদ্ধ থেকে বিজয় নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো। তাদের সে জয়ের ব্যাপারটি সত্যপন্থীদের কারো কারো মনে মিথ্যা আকাংখা বা কোনো সন্দেহ জাগাতে পারে। সত্য-মিথ্যার সংঘাতে এ ধরনের সন্দেহ আর এ ধরনের আকাংখা জাগাটা নিতান্তই স্বাভাবিক। কারণ, যে সংঘাত থেকে সত্য এ ধরনের বড় একটি বিপদ নিয়ে আর মিথ্যা জৌলুস ও শওকত নিয়ে ফিরে যায়, সেখানে এ আশংকা জাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

হে পরওয়ারদেগার! এর কী কারণ? কী কারণে সত্য এখানে বিপদে পড়ে আর মিথ্যা বিপদমুক্ত হয়? কেন সত্যের বাহকরা বারবার পরীক্ষায় পতিত হয়? সত্যমিথ্যার সংঘাতে সবসময়ই সত্য কেন বিজয়ী হয় না? কেন বিজয় আর গনীমত নিয়ে সত্য ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তন করে না? কেন বাতিল সত্যের ওপর এ হামলা চালাবে? কেন সত্য-মিথ্যার সংঘাতে মিথ্যা ফিরে যাবে বিজয় নিয়ে? সত্যের বিজয়ী হওয়া কি উচিত ছিলো না?

ওহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে একথাগুলোই ভাবছিলো। এটা কেমন করে সম্ভব হলো! শেষদিকে এসে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ শেষ বিবৃতি দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের হত-বিহ্বল চিত্তকে প্রশান্ত করেছেন। এ দিক থেকে তার মনে যেসব ভাবের উদয় হতে পারে তা থেকে তিনি তাদের মুক্ত করেছেন, অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যতের সকল ব্যাপারে আর সকল বিষয়ে আল্লাহর নিয়ম-নীতি, তাঁর তকদীর এবং তদবীরও এই প্রসংগে বলে দিয়েছেন।

কোনো একটি যুদ্ধে মিথ্যার মুক্তি পেয়ে যাওয়া এবং একটা নিকৃষ্ট কিছু সময়ের জন্যে প্রভাবশালী হয়ে যাওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাকে ছেড়ে দিয়েছেন, অথবা তা সত্যের জন্যে চূড়ান্তভাবে ভীতিকর। কোনো যুদ্ধে সত্যের পরীক্ষায় পতিত হওয়া এবং কিছু সময়ের জন্যে তার হীনবল হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তায়ালা সত্যের প্রতি অবিচার করেছেন, অথবা সত্যকে মিথ্যার হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

না, তা কখনো হতে পারে না। সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্বে আল্লাহর হেকমত ও তাঁর তদবীর কার্যকর রয়েছে। তিনি মিথ্যাকে ঢিল দেন, যাতে তা চরমে পৌঁছতে পারে, এক নিকৃষ্ট পাপে পতিত হতে পারে, যাতে করে তা সবচেয়ে ভারী বোঝা বহন করে কঠোর শাস্তি লাভের উপযুক্ত হয়। তিনি সত্যকে পরীক্ষা করেন, যাতে অপবিত্র থেকে তা পবিত্র ও পৃথক হয়ে যায়। এই

পরীক্ষার পর যে টিকে থাকবে সে এতে করে বড় ধরনের বিনিময় পাবে। পরিশেষে এখানে এসে সত্য বিজয়ী হয় আর মিথ্যা হয় পরাজিত।

'আর যারা কুফরীর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে, তারা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে। তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ....তাদের জন্যে কঠোর আযাব।'

এতে নবী করীম (স.)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। তাঁর মনে যে দুঃখ দেখা দিয়েছিলো তা দূর করা হয়েছে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, কাফেররা আরো কুফরীর পানে দ্রুত ছুটে চলেছে, ছুটে চলেছে তীব্রগতিতে। মনে হয় সেখানে তাদের জন্যে কোনো কাংখিত বস্তু রাখা হয়েছে, যা লাভ করার জন্যে সেদিকে তারা দ্রুত ছুটে চলেছে। এ হচ্ছে এক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সচিত্র ব্যাখ্যা। কুফরী, মিথ্যা আর পাপের পথে এমনভাবে ছুটে যায় যেন সত্যিই এরা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এমন বীরত্ব আর সাহসিকতার সংগে এরা ছুটে চলেছে, যেন সম্মুখ থেকে কেউ তাতে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্যে ডাকছে।

সেসব বান্দার জন্যে নবী মনে দুঃখবোধ করতেন। তিনি দেখছেন যে, তারা দ্রুত জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে, কিন্তু তিনি তাদেরকে ফেরাতে পারছেন না, তারাও তাঁর কোনো সতর্কবাণীর প্রতি কোনো তোয়াক্কা করছে না। আল্লাহর আহ্বানকে পশ্চাতে ফেলে তাদেরকে কুফরী ও জাহান্নামের দিকে ধাবিত হতে দেখে আল্লাহর নবীর অন্তর ব্যথিত হয়। তারা আবার এমন সব মানুষের ভেতর দিয়ে তারা ছুটে চলেছে, যারা কোরায়শদের সংগে তাদের যুদ্ধের ফলাফল দেখার অপেক্ষায় রয়েছে। মনোভাব এই যে, এ যুদ্ধে যারা জয়ী হয় কোরায়শরা তাদের সংগেই যোগ দেবে। কোরায়শরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে আত্মসমর্পণ করে, তখন লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। সন্দেহ নেই যে, এ সবের ফলে আল্লাহর নবীর অন্তরে ভীষণ দুঃখ ছিলো। তাই আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে প্রবোধ দিচ্ছেন। তাঁর মন থেকে দুঃখ মুছে ফেলছেন, ওরা কুফরীর পানে ছুটে চলেছে, সেজন্য তোমার অন্তরে যেন দুঃখ-বেদনা না জন্মে। তারা কস্মিনকালেও আল্লাহর কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। এসব দুর্বল বান্দা আল্লাহর কোনো অনিষ্ট সাধনের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। আল্লাহর কাছে বিশ্বাসের বিষয়টি একান্ত তাঁর নিজের বিষয়। আর মোশরেকদের সংগে যুদ্ধ তাঁর নিজেরই যুদ্ধ। রসূল (স.)-এর কাঁধ থেকে আকীদা-বিশ্বাসের বোঝা এবং সমস্ত মুসলমানদের কাঁধ থেকে যুদ্ধের বোঝা দূর করাই হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা। যারা কুফরীর পানে ছুটে চলেছে, তারা আল্লাহর সংগে যুদ্ধ করছে। তারা এতোই দুর্বল যে, আল্লাহর কোনো ক্ষতিই তারা সাধন করতে পারবে না। সুতরাং তারা আল্লাহর দ্বীনের এবং তার বন্ধুদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। যতোই উস্কানি দিক না কেন, কুফরীর দিকে তারা যতোই ছুটে যাক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে কেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মুক্ত হতে দেন? কেন তাদেরকে বিজয়ী করেন? তারা তো সবাই আল্লাহর দুশমন। এর কারণ আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে আখেরাতে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন যা চরম অবমাননাকর। 'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আখেরাতে কোনো হিসসা দিতে তিনি চান না।'

তিনি চান যে, তাদের সব সম্বল দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাক। সকল আযাব-সকল শাস্তিরই উপযুক্ত হোক তারা। কুফরীর পথে ছুটতে ছুটতে তারা শেষ সীমান্তে গিয়ে পৌছুক।

'আর তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।'

কিন্তু কেন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে এ অবমাননা চান? আসলে তিনি চান এ জন্যে যে, ঈমানের পরিবর্তে কুফরী ক্রয় করে তারা নিজেরাই অবমাননাকর পরিণতির উপযুক্ত হয়েছে।

সাময়িক বিজয়ে উল্লাসিত না হওয়া

'আর যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফরী ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহর কোনো অনিষ্টই সাধন করতে পারবে না। তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'

ঈমান ছিলো তাদের হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে, ঈমানের প্রমাণ ছিলো মহাবিশ্বের পাতায় পাতায়। তাছাড়া এ বিস্ময়কর মহাবিশ্বের সুসংহতকরণের মধ্যে ঈমানের লক্ষণ সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলো। ছিলো শিল্পসমৃদ্ধ কুশলী হাতের অনুভূতির মধ্যে। এতোসব কিছুর প্রমাণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ঈমানের প্রতি আহ্বান ছিলো স্বয়ং রসূলে খোদার যবানে।

মূলত ঈমান ছিলো তাদের জন্যে একটি উন্মুক্ত-অবারিত প্রান্তর। কিন্তু তারা সে ঈমানকে বিক্রয় করে দিয়েছে আর তার পরিবর্তে তারা কুফরীকে খরীদ করে নিয়েছে। ঈমানের সকল প্রমাণ দেখেও এ কাজটা তারা জেনে শুনেই করেছে। তখন থেকেই তারা তাদেরকে কুফরী পানে ছুটে যাওয়ার জন্যে ছেড়ে দেয়ার যোগ্য হয়েছে। যাতে তারা এ পথে নিজেদের সবটুকু পুঁজি নিঃশেষ করে ফেলতে পারে, পরকালের ছাওয়াবের কোনো হিসাবই তাদের জন্যে অবশিষ্ট না থাকে। তারা পরিপূর্ণ গোমরাহী-বিভ্রান্তিতে লিপ্ত, তাদের সংগে সত্যের লেশমাত্রও নেই। তারা আল্লাহর বন্ধু ও আল্লাহর আহ্বানের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

'আর তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ দন্ড'।

সে দন্ড এমনই মর্মন্তুদ, যা ধারণা-কল্পনাও করা যায় না, মোমেনদেরকে তারা যে কষ্ট দেয়, তার সংগে এ দন্ডের কোনো তুলনাই চলে না।

'যারা কুফরী অবলম্বন করেছে, তারা যেন কখনো মনে না করে যে, আমি যে তাদেরকে ঢিল দিচ্ছি, তা তাদের জন্যে মঙ্গলকর। .... তাদের জন্যে রয়েছে লজ্জাকর শাস্তি।'

এ আয়াতে একটা খটকা দূর করা হয়েছে, একটা সংশয় অপনোদন করা হয়েছে যা কারো কারো মনে উদয় হতে পারে। খটকাটি এই যে, প্রায়ই দেখা যায়, আল্লাহর দুশমন ও সত্যের দুশমনদের এভাবেই ছেড়ে দেয়া হচ্ছে, কোনো আযাব তাদের স্পর্শই করছে না। বাহ্যত তারা শক্তি, দাপট, অর্থ বিত্ত আর পদমর্যাদা ভোগ করে যাচ্ছে। এর ফলেই মানবমনে এক সময় খটকা জাগে, আর দুর্বল ঈমানের লোকেরা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে অন্যায়-অসত্য চিন্তা-ভাবনা করে। মূলত এ সবই হচ্ছে জাহেলী চিন্তা। তারা মনে করে যে, অন্যায় অসত্য, মন্দ অস্বীকৃতি আর ঔদ্ধত্য দেখানোর পরও আল্লাহ তায়ালা বুঝি তাদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন (নাউযু বিল্লাহ)! এ জন্যে মিথ্যার দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আল্লাহ তায়ালা বুঝি হস্তক্ষেপ করেন না। মিথ্যাই বুঝি সব। তা না হলে কেন আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাকে পরিপুষ্ট হতে, বড় হতে এবং বিজয়ী হতে ছেড়ে দেন? তারা ধারণা করে যে, পৃথিবীতে সত্যের ওপর বিজয়ী হওয়াই বুঝি মিথ্যার অধিকার। আল্লাহ তায়ালা বাতিলপন্থী, মিথ্যার পতাকাবাহী যালেম, ঔদ্ধত্য পরায়ন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে এভাবে ছেড়ে দেন যে, তারা কুফরীতে ছুটাছুটি করে। গোটা দুনিয়াটাই অরাজকতায় ডুবে যায় এবং মনে হয় সব কিছু বুঝি তাদের দখলে! তাদের সম্মুখে টিকতে পারে এমন শক্তি বুঝি পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। এ সবই বাজে চিন্তা, আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এগুলো অসত্য ধারণা। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন ধারণা করার কারণে তিনি কাফেরদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। দুনিয়াকে ভোগ করার জন্যে তিনি তাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। আজ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের বস্তু নিয়ে তারা যে মেতে উঠেছে, তা তো কেবল তাদের জন্যে পরীক্ষা মাত্র। মূলত এ হচ্ছে এক সূক্ষ্ম ফাঁদ, তার মাধ্যমেই পর্যায়ক্রমে তাদের পাকড়াও করা হবে।

'কাফেররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি যে ঢিল দিচ্ছি, তা তাদের জন্যে কল্যাণকর। আমি তো কেবল এ জন্যেই তাদের ঢিল দিচ্ছি, যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায়।'

আল্লাহ তায়ালা তাদের অকল্যাণ চান, আর তারা তো ঈমানের বিনিময়ে কুফরীকেই ক্রয় করে নিয়েছে কুফরীর পেছনে ছুটে চলেছে, তারা সেজন্যে চেষ্টা-সাধনাও করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা দ্বারা নেয়ামত আর ক্ষমতার ঘোর থেকে জাগিয়ে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনবেন, এর যোগ্য তারা হয়নি।

'আর তাদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর আযাব।'

তারা যে স্থান, আর যে সুখ-সম্ভোগে রয়েছে, এ অবমানানা হচ্ছে তার বিপরীত। আর এখান থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান না, কেবল তাকেই তিনি নেয়ামত দ্বারা পরীক্ষা করেন। আল্লাহর বন্ধুরা যখন নেয়ামত লাভ করেন, তখন তারা তা লাভ করেন এ জন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের কল্যাণ চান। যদিও তারা তাদের কর্মকান্ডের মাঝ দিয়েই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে রয়েছে অদৃশ্য হেকমত, আর আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে তাঁর মোমেন বন্ধুদের ওপর। এমনিভাবেই তাদের অন্তর শান্ত হয়, আত্মা পরিতৃপ্ত হয় আর ইসলামের স্পষ্ট ও সোজা সরল চিন্তাধারায় এসে সত্য তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

মোনাফেকদের আল্লাহ তায়ালা আলাদা করে দেন

আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের কল্যাণ কামনা করেন, তাদেরকে মোনাফেকদের থেকে পৃথক করতে চান, যারা নানা কৌশলে মুসলিম শিবিরে প্রবেশ করেছে, ইসলামের ভালোবাসার সংগে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।(২৪) তাই ওহুদ যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ ঈমানদার বান্দাদেরকে এ পরীক্ষায় ফেলেন। এভাবে পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করার জন্যেই তিনি এটা করেছেন।

'না-পাককে পাক থেকে পৃথক না করে তোমরা যে অবস্থায় আছো, সে অবস্থায় তোমাদেরকে ছেড়ে দেবেন-আল্লাহ তায়ালা এমন নন......... তোমরা যদি ঈমান আনো এবং পরহেযগারী করো, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে মহা প্রতিদান।' (আয়াত ১৭৯)

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, খারাপ থেকে ভালো আর ভালো থেকে খারাপ পৃথক না করে মিশ্র অবস্থায় ছেড়ে দেয়া মহান আল্লাহর নীতি নয়। তাঁর উলুহিয়্যাত বা ইলাহ হওয়ার দাবীও এটা নয়। তিনি মুসলিম দলকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না যে, ঈমানের দাবী নিয়ে এগিয়ে এসে তার পেছনে মোনাফেকরা লুকিয়ে থাকবে।

সারা বিশ্বের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্যেই আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে সৃষ্টি করেছেন। তারা বিশ্বের বুকে এক অনন্য নমুনা সৃষ্টি করবে, সৃষ্টি করবে এক নতুন ব্যবস্থা। এ মহান ভূমিকা সব নির্মলতা, নির্লিপ্ততা, স্বচ্ছতা এবং সত্যকে আঁকড়ে থাকা দাবী করে। এটা আরো দাবী করে যে, মুসলিম দলের বুনিয়াদে কোনো ফাটল থাকবে না। সংক্ষিপ্ত কথায় এর দাবী হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের দিক থেকে মুসলিম উম্মার প্রকৃতি এমন হবে, যে বিশ্বের বুকে মুসলিম উম্মাহর জন্যে আল্লাহ তায়ালা যে মহান ভূমিকা নির্ণয় ও নির্ধারণ করেছেন, তাকে সে ভূমিকার যোগ্য ও উপযুক্ত হতে হবে। আর আখেরাতে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে যে স্থান ও মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছেন, তারও যোগ্য তাকে হতে হবে। এসব কিছুর দাবীই হচ্ছে অস্বচ্ছ-অপবিত্র কিছুকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে তাকে স্বচ্ছ ও পবিত্র করা। এ কারণে আল্লাহর শান হচ্ছে এই যে, তিনি পবিত্র থেকে অপবিত্র বিষয়কে পৃথক করেন। এ মহান দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বে মোমেনরা যে অবস্থায় ছিলো, সে অবস্থায় তাদেরকে ছেড়ে দেয়া আল্লাহর কাজ নয়।

অনুরূপভাবে গায়েব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা–যাকে তিনি নিজেই গোপন করে রেখেছেন, এটাও আল্লাহর শান নয়। আল্লাহ তায়ালা যে প্রকৃতি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সে

(২৪) তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এ ১ম খন্ড। পৃঃ ৩১

প্রকৃতি অনুযায়ী অদেখা বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সে যোগ্য নয়, সেজন্যে তারা প্রস্তুতও নয়। এক বিশেষ হেকমতের কারণে পৃথিবীর বুকে খেলাফাত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করার জন্যেই তাকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, এভাবে সংহত করা হয়েছে তার প্রকৃতিকে। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্যে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার কোনো প্রয়োজনই তার নেই। মানুষের প্রকৃতিগত যোগ্যতার কাছে গায়েবকে উন্মুক্ত-উন্মোচিত করা হলে তা ধ্বংস হয়ে যেতো। কারণ, গায়েবের যে পরিমাণ জ্ঞানের মাধ্যমে তার রূহ স্রষ্টার সংগে মিলিত হয়, তার সত্ত্বা যুক্ত হয় মহাবিশ্বের সত্ত্বার সংগে, সে পরিমাণ গায়েবের জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুর জন্যে সে প্রস্তুতও নয়। কেবল এটুকু গায়েবের জ্ঞান দিয়েই সে তার পরিনতি সম্পর্কে জানতে পারে।

এ কারণে মানুষকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করা মহান আল্লাহর শান নয়, এটা তাঁর হেকমতের দাবীও নয়। এতে আল্লাহর কোনো নীতিও কার্যকর হয় না। তাহলে আল্লাহ তায়ালা কিভাবে পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করবেন? কিভাবে তিনি মুসলিম জাতিকে কুফরী থেকে মুক্ত করবেন? কিভাবে তাকে মুক্ত করবেন মোনাফেকী থেকে? যে মহান ভূমিকা পালন করার জন্যে ইসলামী উম্মাহকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিভাবে তাকে সে কাজের জন্যে প্রস্তুত করা হবে?

'কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন'।

অতপর এই রসূলের মাধ্যমে, তাদের ওপর ঈমান আনার মাধ্যমে, সর্বোপরি এই পথে জেহাদ করার মাধ্যমে রসূলের সাথীদের পরীক্ষার ব্যাপারে আল্লাহর নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর ঠিক এভাবেই তিনি পবিত্র থেকে অপবিত্রকে পৃথক করেন, তাদের অন্তরকে পাক-সাফ করেন। আসলে যা হওয়া আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত করে রেখেছেন শেষতক তাই হয়।

'সুতরাং তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্যে মহা পুরস্কার, মহা প্রতিদান রয়েছে।'

ইসলাম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারনার অপনোদন

এই ব্যাখ্যার পর এ উৎসাহ প্রদান, ওহুদযুদ্ধের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে মন্তব্যের উত্তম একটা পরিসমাপ্তি ঘটবে। ওহুদযুদ্ধের ঘটনাবলী এবং সে সম্পর্কে কোরআন মজীদের মন্তব্য থেকে আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফুটে ওঠে। এর বিস্তারিত আলোচনা নয়; বরং আমরা তার মধ্যে কয়েকটি বড় বড় দিকের প্রতি ইংগীত করেই আলোচনা শেষ করবো। এ থেকে যুদ্ধের সার্বিক বিষয় সম্পর্কে একটা অনুমান করা যাবে। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাগ্রহণ করা ও সে সম্পর্কিত উদাহরণ দেয়ার জন্যে ওহুদ যুদ্ধের প্রসংগ উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং সে সম্পর্কিত মন্তব্য থেকে ইসলামের একটি বড় মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায়। ইসলাম হচ্ছে মানবজীবনের জন্যে আল্লাহর বিধান। মানবজীবনের সব কর্মধারা ইসলামেই নিহিত রয়েছে। এটাই হচ্ছে এখানে প্রথম মূলনীতি। কিন্তু মানুষ প্রায়ই এ তত্ত্বটি বিস্মৃত হয়, অথবা শুরুতেই সে সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে ইসলাম সম্পর্কে তার মনে বড় ভুলের জন্ম হয়। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের পৃথিবীতে ইসলামের ভূমিকার ব্যাপারেও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। আমাদের কেউ কেউ ইসলামের দিকে এ দৃষ্টিতে তাকায় যে, তা মানব জীবনে অলৌকিকভাবে ক্রিয়া করে বসবে। এরা মানুষের মানবীয় প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে না, বিবেচনা করে না তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও জীবনের নানা ব্যাপারে মানুষের বাস্তব বস্তুগত ভূমিকার বিষয়টিও তারা বিবেচনা করে দেখে না।

যখন তারা দেখতে পায় যে, এ পদ্ধতিতে মানুষ কাজ করতে চায় না, বরং তারা চায় অলৌকিক কিছু। তখন সে ক্রিয়া বিপরীত হয়ে তাদের মন মানসিকতাকে মাটির বোঝার মতো

বসিয়ে দেয়, লোভ-লালসা আর মনস্কমনার আকর্ষণ তাকে দ্বীনের আহ্বানে সাড়া না দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে। তখন তারা এই জীবনবিধানের বাস্তবতা নিয়ে নানা সন্দেহে পতিত হয়।

একটি মাত্র ভুল থেকেই এসব কিছুর উদ্ভব হয় । তা হচ্ছে ইসলামের প্রকৃতি এবং তার পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা। অর্থাৎ এ প্রাথমিক তত্ত্বটি ভুলে যাওয়া যে, ইসলাম হচ্ছে মানুষের জন্য। মানবজীবনেই মানুষের চেষ্টা-সাধনার বদৌলতে ইসলাম বাস্তব রূপ লাভ করে। আবার সে চেষ্টা-সাধনাকেও হতে হবে মানুষের শক্তি-সামর্থের সীমার মধ্যে। শক্তি-সামর্থে যতোদূর কুলোয়, তা নিয়েই সে সাফল্যে উপনীত হবে।

মানুষের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, সে তার স্বভাব-প্রকৃতি, তার শক্তি-সামর্থ এবং তার বস্তুগত অবস্থানের কথা কোনো অবস্থায় বিস্মৃত হয় না।

এ সকল ভুলের সূচনা হয় যেমন ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে মূলত ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কে না জানার বা তা বিস্মৃত হওয়ার কারণেই। ভুলের সৃষ্টি হয় অলৌকিক এমন কর্মকান্ডের প্রতীক্ষায় করতে থাকার কারণে, মানুষের বাস্তব জীবনের সংগে যার কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, তার ঝোঁক-আকর্ষণ, তার যোগ্যতা-প্রতিভা-ক্ষমতা এবং তার বস্তুগত অবস্থানের সংগে মূলত এ সব অলৌকিক কর্মকান্ডের কোনোই সম্পর্ক নেই।

ইসলামের আগমন কি আল্লাহর কাছ থেকে হয়নি? দ্বীনের আগমন কি সে শক্তির কাছ থেকে হয়নি, যাকে কোনো বস্তুই অক্ষম ও পরাভূত করতে পারে না! তা হলে তা এখানে শুধু বস্তুগত শক্তি-সামর্থের সীমার মধ্যে কাজ করবে কেন? কেন ইসলাম সব সময় বিজয়ী হবে না? কেন মানবীয়-কামনা এবং বস্তুগত দিকসমূহ কোনো কোনো সময় তার ওপর বিজয়ী হয়? কেনই বা মিথ্যার ধারক-বাহকরা কখনো কখনো সত্যের ধারক-বাহকদের ওপর বিজয়ী হয়?

আসলে ইসলামী জীবনবিধানের প্রকৃতি, তার মূলতত্ত্ব এবং যে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা অথবা তা বিস্মৃত হওয়ার কারণেই এসব প্রশ্ন তার মনে সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা স্বভাবতই সর্বশক্তিমান। মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহর আছে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই তার এ ক্ষমতা ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চাননি, বরং তিনি চেয়েছেন তাকে এ স্বাভাবিক মানবীয় প্রকৃতি দিয়ে সাজাতে। তিনি চেয়েছেন মানুষকে তার ইচ্ছা আর আহ্বানে সাড়া দেয়ার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করতে। তিনি চেয়েছেন মানুষের প্রকৃতি সর্বদা কার্যকর থাকুক, তা নিশ্চিহ্ন ও অকেজো হয়ে না যাক। তিনি এটাও চান যে, মানুষের সমাজে ইসলামী জীবনবিধানের বাস্তবায়ন মানুষের চেষ্টা-সাধনার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হোক। তিনি এটাও চান যে, মানুষ এসব কিছুর মাধ্যমেই সাফল্যের চরমে পৌঁছুক। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কেউ তাঁকে এ প্রশ্ন করতে পারে না যে, কেন তিনি এটা চান? কারণ, মানুষের কাছে সে সর্বাত্মক বিধানসম্পর্কিত কোনো জ্ঞান নেই। আর এ বিধানের পেছনে যে রহস্য কার্যকর রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই।

তবে কেন হয়? এ প্রশ্ন কোনো সত্যিকার মোমেন তুলতে পারে না। কারণ সে আল্লাহর সংগে সবচেয়ে বেশী আদব-শিষ্টাচার বজায় রাখে। মোমেনের অন্তর আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে জানে। মোমেন এটাও অন্যের চেয়ে বেশী জানে যে, এ ক্ষেত্রে আর কাফের-নাস্তিক ছাড়া অন্য কেউ এ প্রশ্ন তুলতে পারে না। কারণ, তারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে জানে না। কেবল কোনো বাচালই এ প্রশ্ন করতে পারে, যে সত্যিকার মোমেন নয়।

আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ-জাহেল ব্যক্তিই এমন প্রশ্ন করতে পারে। এ জাহেলের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে আগে আল্লাহর পরিচয় তার সামনে তুলে ধরতে হবে, যাতে সে জানতে পারে, আল্লাহ তায়ালা কে। আল্লাহর এ পরিচয় মেনে নিলেই সে মোমেন, আর মেনে না নিলে সে

নাস্তিক ও কাফের হবে । ঝগড়া এখানেই শেষ হয়ে যায়। তারপরও কেউ বিতর্ক করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। সৃষ্টির কোনো ব্যক্তিরই আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, মানবসত্ত্বাকে কেন তিনি এ প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করলেন? কেন তিনি প্রকৃতিকে এভাবে কাজ করার জন্যে ছেড়ে দিলেন? কেন তিনি এটা চেয়েছেন যে, এই ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজটা মানুষের নিজেদের চেষ্টা-সাধনার পথ ধরেই বাস্তবায়িত হোক, মানবীয় শক্তি-সামর্থের সীমার বাইরে কিছু দিয়ে নয়, একথার জবাব তিনিই দিতে পারবেন।

এই যে আল্লাহর বিধান আমরা যাকে ইসলাম বলে জানি, মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স.)-ই তা উপস্থাপন করেছেন। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে বলেই মনে করা যাবে না যে তা পৃথিবীতে মানুষের জীবনে এমনি এমনিই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। কেবল মানুষের কাছে প্রচার করা আর তাবলীগ করার ফলেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে না। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিক্রমণের ক্ষেত্রে আল্লাহর স্বাভাবিক একটি বিধান কার্যকর রয়েছে, সেখানে কোনো চেষ্টার প্রয়োজন পড়ে না। এখানে নিয়মটা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা হচ্ছে একদল লোক ইসলামকে নিয়ে উত্থিত হবে, তারা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান পোষণ করবে এবং নিজেদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী ঈমান-ইসলামের ওপর অটল অবিচল থাকবে। তারা ইসলামকেই নিজেদের জীবনে মিলন ক্ষেত্র এবং সকল-আশা-আকাংখার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবে।সে দলটি এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্যে এমনভাবে জেহাদ করবে, চেষ্টা-সাধনা করবে, যাতে কোনো শক্তিই তার সামনে না টিকতে পারে। তারা এক সাথে মানবীয় কামনা-বাসনার সংগে সংগ্রাম করবে, সংগ্রাম করবে নিজেদের এবং অন্যদের মানবীয় অজ্ঞতার সংগে। এ পথে অজ্ঞতা, দুর্বলতা আর কামনা-বাসনার বাঁধ সৃষ্টি করে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে চাইবে, তারা তাদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করবে। তারা তাবলীগ করবে, প্রচার করবে এ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের সাধ্যে যতোটুকু কুলোয় ততোটুকু দিয়ে, তাবলীগ আর প্রচার তাকে চরমে পৌছাবে।

এ তাবলীগ করতে হবে তাদের মধ্যে, যারা বাস্তব জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অমনোযোগী নয়। যারা বাস্তবতার দাবী সম্পর্কেও অমনোযোগী নয়। আসলে কেবল এ পথেই ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অতপর এ দলটি জয়ী হবে নিজেদের নাফসের ওপর। জয়ী হবে তাদের সংগী-সাথীদের নফসের ওপর। কখনো তারা যুদ্ধে পরাজিত হবে নিজেদের নফসের সংগে, কখনো পরাজিত হবে অন্যদের নফসের সংগে। যে পরিমাণ চেষ্টা-সাধনা তারা নিয়োজিত করবে, যে পরিমাণ বাস্তব কর্মকৌশল তারা আয়ত্বে আনতে পারবে- সে অনুপাতেই এ জয়-পরাজয় হবে। সে দলটি কেবল একটি মাত্র লক্ষ্যের জন্যেই নিবিষ্ট ও একনিষ্ঠ হবে। এ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজেদের জীবনে আগে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। ইসলামী জীবনবিধানের মালিক আল্লাহ তায়ালার সংগে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করবে। কেবল তাঁর প্রতিই আস্থা স্থাপন করবে এবং কেবল তাঁরই ওপর তাওয়াক্কুল করবে। এটাই হচ্ছে ইসলামের মূলতত্ত্ব, এটাই হচ্ছে ইসলামের পথ। আর এটাই হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা, ইসলামী আন্দোলনের উপায় উপকরণও এটা। যখন এ দলটি কোন যুদ্ধে ইসলামের মূলতত্ত্বের বাস্তব উদাহরণ পেশ করতে সক্ষম হয়, তখন তারা এ মৌল তত্ত্ব সম্পর্কে অমনোযোগী থাকে অথবা এই মূল বিষয়টি তারা ভুলে যায় এবং এ কারণে তারা মনে করে যে, নিছক মুসলমান হওয়ার কারণেই তারা নিশ্চিত বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা তখন পরাজয়ের মুখোমুখী হওয়ার জন্যে তাদেরকে ছেড়ে দেন। তারা তখন পরাজয়ের তিক্ত গ্লানি ভোগ করে। কোরআন মজীদের মন্তব্য এ বাস্তবতার প্রতিই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'যেদিন দু'টি দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলো, সেদিন তোমাদের ওপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছিলো, তা হয়েছিলো আল্লাহ্‌রই নির্দেশক্রমে, তাঁরই হুকুমে। যাতে জেনে নেয়া যায় কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মোনাফেকী করেছে।'

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যে অবস্থায় ছিলে, সে অবস্থায় মোমেনদেরকে ছেড়ে দেয়া আল্লাহর কাজ নয়। যতোক্ষণ না তিনি পবিত্র থেকে অ-পবিত্রকে পৃথক করেন।'

অতপর তিনি ঘটনাবলী আর কার্যকারণের পেছনে আল্লাহর হেকমতের দিকে আহ্বান জানান। ঈমানের বড় বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন, এরশাদ হয়েছে,

'আঘাত তোমাদেরকে স্পর্শ করে থাকলে অনুরূপ আঘাত তাদেরকেও স্পর্শ করেছিলো। আর আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ তায়ালা জানতে চান, তোমাদের মধ্যে কারা ঈমান এনেছে।...... এ কারণে তাদেরকে পাক-সাফ করতে চান, যারা ঈমান এনেছে এবং কাফেরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চান।' (আয়াত ১৪০-৪১)

সর্বশেষে সেখানে আল্লাহর তকদীর এবং তাঁর হেকমত কার্যকর হয়। ঘটনাপ্রবাহ আর আন্দোলনের মাধ্যমেই এটা কার্যকর হয়। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের সর্বাত্মক চিন্তাধারা।

ওহুদের ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ

২. যুদ্ধ এবং যুদ্ধসম্পর্কিত মন্তব্যটি মানবীয় স্বভাবপ্রকৃতি এবং তার চেষ্টা সাধনার প্রকৃতি সম্পর্কেও একটি মৌল তত্ত্ব উপস্থাপন করে। খোদায়ী জীবন বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সে প্রকৃতি যতোদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, এটা তার সারনির্যাস উপস্থাপন করে। মানবমন কখনো পূর্ণাংগ নয়। পূর্ণাংগ না হলেও প্রবৃদ্ধি আর বিকাশ সে গ্রহণ করতে পারে। এভাবে পৃথিবীতে তার জন্যে যে পরিমাণ পরিপূর্ণতা নির্ধারিত রয়েছে, সে ইচ্ছা করলে তার চরমে পৌঁছতে পারে।

আমরা কিছু সংখ্যক মানুষকে দেখতে পাই– তারা যে হোক, তাদের প্রকৃতি যাই হোক– দলের মধ্যে তারা দৃষ্টান্ত আদর্শ হিসাবে সব সময়ই উন্নত থাকে। এই ধরনের মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্যে যাদের সৃষ্টি।' তারা হচ্ছে মোহাম্মদ-(স.)-এর সাহাবী, সর্বকালের সর্বযুগের মানবতার জন্যে তাঁরা আদর্শ নমুনা। এখানে আমরা দেখতে পাই একদল লোক, যাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে, ত্রুটি আছে। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যেদিন দু'টি দল মুখোমুখী হয়েছিলো, সেদিন তোমাদের মধ্যে থেকে, যারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো শয়তান সেদিন তাদেরই কিছু কর্মের দরুন তাদের পদস্খলিত করেছিলো। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মার্জনা করে দিয়েছেন।' (আয়াত ১৫৫)

আবার তাদের মধ্যে কেউ এমন পর্যায়েও পৌঁছেছিলো, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'এমনকি যখন তোমরা ছত্রভংগ হয়ে পড়েছিলে এবং কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলে, তোমরা যা ভালোবাসতে, তা তোমাদেরকে দেখানোর পরও তোমরা না-ফরমানী করেছিলে। তোমাদের মধ্যে কারো কাম্য দুনিয়া, আর কারো কাম্য ছিলো আখেরাত। অতপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে সরিয়ে দিলেন।' (আয়াত ১৫২)

আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো, অথচ আল্লাহ তায়ালা ছিলেন তাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই ভরসা করা মোমেনদের উচিত।' তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলো, যারা পরাজয় বরণ করেছে, স্পষ্ট পরাজয় তাদের এমন পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছিলো, যার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যখন তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং কারো প্রতি ফিরেও তাকাচ্ছিলে না, অথচ রসূল তোমাদেরকে ডাকছিলেন পেছন দিক থেকে। অতপর তোমাদের ওপর নেমে এলো শোকের ওপর শোক, দুঃখের ওপর দুঃখ, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না করো? আর যে অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছো তোমরা সেজন্যে বিমর্ষ না হও।'

এ দলের সকলেই ছিলো মোমেন-মুসলিম। ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা সচেষ্ট ছিলো। নিজেদেরকে তারা আল্লাহর হাতে সমর্পণ করেছিলো। আল্লাহর বিধানের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করেছিলো। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর আশ্রয় থেকে বিতাড়িত করেননি। তাদের পক্ষ থেকে এতোসব অপ্রিতিকর ঘটনার পরও তিনি তাদের প্রতি রহম করেছেন, তাদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্যে তিনি নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাদের কর্মের পরিণতি আস্বাদন করার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন তবে তা ছিলো কঠিন-তিক্ত পরীক্ষা। কিন্তু তিনি তাদেকে সম্পূর্ণ বাইরে তাড়িয়ে দেননি এবং তাদেরকে একথাও বলেননি ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়ার পর তোমরা এখন ইসলামের কোনো ব্যাপারে যোগ্য এবং উপযুক্তই নও। বরং ক্ষমা করে দিয়ে এমন কিছুর দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত থাকে। তাদের প্রতি ক্ষমা আর উদারতা নিয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যেমন বড়রা ছোটদের প্রতিপালন করে। শিশুরা তো বারবার আগুনের দিকে ছুটে যায়। তারা আগুনে পোড়ার জন্যে ঝাঁপ দিতে চায়। কিন্তু বড়রা তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করে।

আল্লাহ তায়ালা তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন তবে তা তাদের লজ্জিত করার জন্য কিংবা লাঞ্ছিত করার জন্যে নয়। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার জন্যে নয়। তাদের ওপর এমন বোঝা চাপাবার জন্যেও নয়-যে বোঝা বহন করার ক্ষমতা তাদের নেই। বরং তিনি তাদের হস্ত ধারণ করেন এবং তাদেরকে নিজেদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে নির্দেশ দেন, নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান না করতে বলেন, যতোক্ষণ তারা আল্লাহর সুদৃঢ় রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততক্ষণ মনযিলে মকসুদে পৌঁছার ব্যাপারে নিরাশ না হওয়ার জন্যেও তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন।

অতপর তারা মনযিলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যায়। তাদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, যুদ্ধের শুরুতে যাদের সংখ্যা ছিলো আংগুলে গণনা করার মতোই কম। এভাবেই তারা বের হয়ে পড়ে। তারা বের হয় রসূলুল্লাহ (স.)-এর সংগে। তাদের ভয়-ভীতি নেই, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। কারো ভীতি প্রদর্শনে তারা লজ্জিত হয় না। শেষ পর্যন্ত তারা আল্লাহর এ বাণীর উপযুক্ত হয়,

'যাদেরকে লোকেরা বলে, তোমাদের জন্যে লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো। তখন তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট এবং তিনি কতোই না উত্তম অভিভাবক!

অতপর তারা একটু একটু করে বড় হতে থাকে এবং একপর্যায়ে তাদের বিষয়টা অন্য রকম হয়ে দাঁড়ায়। এখন তাদের পরীক্ষা করা হয় বয়স্ক লোকদের মতো। শিশুর মতো তাদের প্রতিপালন করার পরই তাদের এ বড় পরীক্ষা নেয়া হয়। পরে সূরা বাকারাতে তবুক যুদ্ধ প্রসংগে আলোচনা হয় এবং পেছনে পড়ে থাকা একটা ক্ষুদ্র দলকে আল্লাহ তায়ালা এবং আল্লাহর রসূল পাকড়াও করেন, সে পাকড়াও ছিলো সত্যিই কঠিন, তখন এ উভয়ের আচরণে বিরাট পার্থক্য ধরা পড়ে।

ওহুদ যুদ্ধের দিন লোকদের মধ্যে এ পার্থক্য দেখা দিয়েছিলো, লোকেরা এ পার্থক্য তবুক যুদ্ধের দিনও দেখতে পায়। অথচ তারা তো ছিলো একই লোক। কিন্তু আল্লাহর প্রশিক্ষণ প্রতিপালন তাদেরকে তখন শীর্ষদেশে পৌঁছে দেয়। এরপরও তারা মানুষ ছিলো। তাদের মধ্যে

ছিলো দুর্বলতা, ছিলো ত্রুটি আর ভুল-ভ্রান্তি। এরপরও সেখানে ছিলো ক্ষমা প্রার্থনা, ছিলো তাওবা এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন। কেননা ইসলামী জীবনবিধান মানবীয় প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে না, অকেজো করে রাখে না, সাধ্যের অতীত বোঝাও তার ওপর চাপায় না।

মানবতাকে স্থায়ী আশা দেয়ার জন্যে এ তত্ত্ব সত্যিই মহামূল্যবান। একটি অনন্য জীবনবিধানের আশ্রয়ে চেষ্টা-সাধনা করে উন্নতির শীর্ষদেশে পৌঁছার জন্যে তা মূল্যবান। এ শীর্ষদেশেই একদিন সে দলটি পৌঁছেছিলো। অথচ তাদের যাত্রা নীচে থেকেই শুরু হয়েছিলো। আল্লাহর নবী সেখান থেকে তাদেরকে ওপরে তুলে এনেছিলেন। একদল মানুষেরাই এ কঠিন পথে নতুন পদযাত্রা শুরু করেছিলো। জাহেলী যুগে যারা সর্বক্ষেত্রেই ছিলো অনগ্রসর-পশ্চাৎপদ। আর এসব কিছুকেই ধ্বংস করে ইসলাম একদিন মানবতাকে চূড়ান্ত শীর্ষদেশে পৌঁছার সম্ভাবনা করে দেয়। এ প্রগতিশীল দলটি এমন এক ব্যতিক্রমী অলৌকিক ঘটনা সৃষ্টি করে, যা ইতিহাসে বারবার ঘটে না। এ দলটির সৃষ্টি নিছক কোনো অলৌকিক ও বিস্ময়কর ঘটনা ছিলো না। এ দলটি ইসলামী জীবন বিধানেরই ফলশ্রুতি। মানুষের চেষ্টা-সাধনার বদৌলতেই এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য সে চেষ্টা-সাধনা মানুষের শক্তি-সামর্থের সীমার মধ্যেই ছিলো। অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এটাও দেখতে পেয়েছি যে, মানুষের শক্তি-সামর্থ প্রয়োজনে অনেক কিছুই গ্রহণ করতে পারে।

শূন্য থেকে একটা দলকে নিয়ে ইসলামী জীবনবিধানের কাজ শুরু হয়। অতপর তা নিয়ে তারা ওপরে আরোহণ করতে শুরু করে, সিকি শতাব্দীরও কম সময়ে তাকে নিয়ে তারা চরম শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। এ জন্যে শর্ত ছিলো কেবল একটাই, দলকে রসূলের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। একদল মানুষকে প্রথমত ইসলামী জীবনবিধানের প্রতি ঈমান আনতে হবে, এ জীবন বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এটাকেই নিজেদের জীবনের ব্রত চালিকাশক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। দুর্গম পরিক্রমায় এটাই হবে তাদের একমাত্র পাথেয়।

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা এবং সে সম্পর্কিত মন্তব্য থেকে তৃতীয় আরেকটি সত্য প্রকাশ পেয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর জীবনবিধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং দলের মধ্যে একটা গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে। যে কোনো ময়দানের যুদ্ধে এ সম্পর্ককে অটুট রাখতে হবে। এ সম্পর্ক থাকবে বিশ্বাস আর চিন্তায়, চরিত্র আর আচরণে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনে। জয় আর পরাজয় যাই হোক না কেন, তাতে এসবই থাকবে এর মৌলিক উপাদান।

এ বিধান মানুষের জীবনে বিস্ময়কর এক প্রভাব বিস্তার করে। কর্মক্ষেত্র, কর্মসূচী আর কর্মপদ্ধতিতেও এখানে বিস্ময়কর মিল থাকে। তারা একে অপরের পরিপূরক হয়। পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দিলে তাদের চিন্তাধারা, কর্মসূচী এবং কর্মপন্থায়ও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এ হচ্ছে জীবনবিধানের একটি সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। যে জীবনবিধান গোটা মানবজীবনকে একটা একক হিসাবে গ্রহণ করে। জীবনকে সে পৃথক পৃথক করে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে না। এ বিধান সকল দিক থেকে ব্যক্তি আর সমষ্টির জীবনকে এক করে দেখে, জীবনের সকল সূত্রকে একই খুঁটির মধ্যে এনে বেধে দেয়। অতপর তাকে এক সংগেই নিয়ে চলে।

এ কোরআনে ঐক্য আর গভীর সম্পর্কের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোরআনের বক্তব্যে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয় যে, যারা পেছনে পড়েছিলো, তাদের দুর্বলতার কারণে শয়তান ওদের ওপর চেপে বসে, 'যেদিন দু'টি দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিলো, সেদিন তোমাদের মধ্যে যারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো, তাদেরই কর্মফলের কারণে শয়তান তাদেরকে পদস্খলিত করেছিলো।' কোরআন এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত করে যে, যারা নবী-রসূলদের সাথে থেকে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সংগে লড়াই করে, তারাই হয় আদর্শ মানুষ। মোমেনদের এপথ অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা তারা এর সূচনা।

'এমন অনেক নবী ছিলো, যাদের সংগী হয়ে অনেক আল্লাহওয়ালা লোকেরা লড়াই করেছে।' আল্লাহ তায়ালার পথে তাদের কিছু বিপদ এসেছে বটে, কিন্তু তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্ত হয়নি। আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন। তারা এছাড়া আর কিছুই বলেনি, যে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপ মোচন করো এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে আমাদের পদ যুগল দৃঢ় রাখো এবং কাফের জাতির ওপর আমাদের সাহায্য করো। অতপর আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করেন, তাদেরকে দুনিয়ার ছাওয়াব এবং পরকালের ছাওয়াবের সৌন্দর্য দান করলেন। আর আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'

কোরআন মজীদে মুসলিম জামায়াতে তাদের দুর্বলতা প্রদর্শন করার দুঃখ করা থেকে বারণ করা হয়েছে এবং ক্ষমাপ্রার্থনার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে,

'তোমরা ছুটে যাও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা আর জান্নাতের পানে, যার ব্যাপ্তি আসমান-যমীনের সমান এবং যা সেই মোত্তাকীদের জন্যে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে যারা সচ্ছল অসচ্ছল সব সময় ব্যয় করে আর রাগ হযম করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, ...।' (আয়াত ১৩৩-৩৫)

আহলে কেতাবদের লাঞ্ছনা আর পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এর কারণ ছিলো তাদের ক্ষমাহীন বাড়াবাড়ি এবং অশ্লীল পাপ কর্ম। তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের ওপর অপমান ও লাঞ্ছনা আরোপ করা হয়। তবে আল্লাহর রজ্জু এবং মানুষের রজ্জু দ্বারা (এ অপমান থেকে রেহাই পেতে পারে)। তাদের ওপর দারিদ্র চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতের সংগে কুফরী করে এবং সীমালংঘন করে নবীদেরকে না-হক হত্যা করে।

তেমনিভাবে আমরা আলোচনায় দেখতে পাই যে, যুদ্ধের ঘটনাবলীতে অপরাধ আর তাওবার কথা বলা হয়েছে। তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা এবং মোত্তাকীদের অবস্থার চিত্রও এসেছে। গোটা সূরার স্থানে স্থানে বারবার এ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। গোটা সূরার বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও তাতে সর্বত্র মিশে রয়েছে তাকওয়া সম্পর্কে আলোচনা, মিশে আছে তা যুদ্ধের গোটা পরিবেশের সংগে। তেমনি আমরা দেখতে পাই, সুদ পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরে যাওয়ার, মানুষকে ক্ষমা করা, রাগ হযম করা এহসান করার আহ্বান। আর এসবই মানুষের মনকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন করে সামাজিক কাঠামোকে পরিচ্ছন্ন করে।

৪. চতুর্থ তত্ত্বে ইসলামী প্রশিক্ষণের পদ্ধতি বলা হচ্ছে। এতে মুসলিম জামায়াতকে যুদ্ধের ঘটনাবলী থেকে তাদের মনে যে অনুভূতি আসে তা স্মরণ করানো হয়েছে। অতপর বিভিন্ন মন্তব্য দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করা হয়। কোরআন মজীদের এ মন্তব্য মানবমনের সকল দিককে স্পর্শ করেছে, সর্বত্রই যুদ্ধের ঘটনার প্রতিক্রিয়া বোঝা গেছে। এই প্রতিক্রিয়াকে বিশুদ্ধ করার লক্ষ্যে কোনো একটা পদক্ষেপকেও কোরআন মজীদ ছাড়েনি। ঘটনার সম্মুখে মানবমনকে একেবারে নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এভাবেই মনের আবিলতা থেকে তাকে পাক-সাফ করে দেয়।

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলী সম্পর্কে মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা তাতে একই সাথে সুক্ষ্মতা গভীরতা আর ব্যাপকতার সমন্বয় দেখতে পাই। এ সুক্ষ্মতত্ত্বে যুদ্ধের সকল অবস্থান, সকল স্পন্দন আর মনের কোণে উদিত সকল ভাবকেও আমরা দেখতে পাই। আমরা এতে যুদ্ধের কারণ আর পরিণতি সম্পর্কে গভীর এবং ব্যাপক বিশ্লেষণসহ যুদ্ধসংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয় দেখতে পাই। এটা আমাদের মূলত সে ঘটনাস্থলে নিয়ে হাযির করে। সেখানে আমরা দেখতে পাই খন্ডচিত্র, যুদ্ধের বাস্তব ও প্রাণবন্ত কিছু ছবি। ব্যাখ্যা আর ছবির সংগে অনুভূতি তীব্রভাবে জেগে ওঠে। মনে হয় এক একটি এক জীবন্ত বর্ণনা।

৫. এই পঞ্চম তত্ত্ব এ জীবনবিধানের বাস্তবতা প্রমাণ করে। এই বাস্তবতা প্রমাণের জন্যে এ জীবনবিধানের অন্যতম উপকরণ হচ্ছে কাজের সংগে এর বাস্তব মিল। নিছক কোনো দর্শন দিয়ে তা দেখা যায় না। যুদ্ধক্ষেত্রেই এ জীবনবিধানের বাস্তবতার এই উজ্জ্বল নিদর্শনটি দেখা দেয়।

এ যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা তা থেকে মুসলিম জামায়াতকে দূরে রাখার সাধ্য রসূলের অবশ্যই ছিলো। চারিদিক থেকে মদীনা শত্রুদের পরিবেষ্টিত হওয়ার পরপরই এটা বুঝা গিয়েছিলো। তখন দুশমনরা একেবারে মদীনার নগর প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফেলেছে।

হ্যাঁ একথা ঠিক এ যুদ্ধে যে বিপর্যয় এসেছিলো, মুসলিম জামায়াতকে তা থেকে দূরে রাখার সাধ্য রসূলের ছিলো। তিনি চাইলে তাদের এথেকে দূরে রাখতে পারতেন, যদি তিনি যুদ্ধের ক্ষেত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর দেখা সত্য স্বপ্নের আলোকে নিজের মতামত কার্যকর করতে চাইতেন। মদীনা যে একটা সুরক্ষিত দুর্গ, সে ইংগীত তাঁর স্বপ্নে ছিলো। তিনি সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ না করলে বা তাদের মতামত মেনে না নিলে এ তিক্ত পরিণতি থেকে হয়তো তিনি তাদের রক্ষা করতে পারতেন। এখানে যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাহাবীদের মতামত ছিলো নবীর মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি এ মত গ্রহণ থেকে ফিরে আসার সুযোগও তাঁর ছিলো। কিন্তু তিনি বর্ম পরে বেরিয়ে আসার পর এ মতের সমর্থকদের তিনি দেখতে পেলেন তারা লজ্জিত। তারা বুঝতে পারলেন যে, নবীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মত প্রদান করা ঠিক হয়নি।

কিন্তু তিনি 'শূরা' তথা পরামর্শভিত্তিক পদ্ধতিকে বাস্তবায়িত করলেন। শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্যকর করলেন। যাতে মুসলিম জামায়াত দলীয় সিদ্ধান্তের ফলাফল নিজেরা বাস্তবে অবলোকন করতে পারে। তারা যেন শিখে নেয় যে, কিভাবে সম্মিলিত মতামতের ফলাফলকে মেনে চলতে হয়। দৈহিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে দূরে থাকার চেয়ে এটাই দলের জন্যে বেশী জরুরী ছিলো। তিনি যে ইসলামী জীবনবিধান বাস্তবায়িত করছেন, তারও এটা ছিলো নিয়ম। মুসলিম জামায়াতকে তা থেকে দূরে রাখার অর্থ ছিলো বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা।

উম্মত যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রচেষ্টার জন্যে প্রস্তুত না হয়, ততক্ষণ ইসলাম তার জন্যে ফায়সালার সময় নির্ণয় করে না। ইসলাম জানে যে, কার্যত তার মুখোমুখী না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনো সেজন্যে প্রস্তুত হবে না। আর জীবনের মূলনীতির ক্ষেত্রে তার মুখোমুখী হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া মোটেই অভিপ্রেত নয়। যেমন শূরার কথা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়। শূরার পরিণতি যাই কিছু হোক না কেন, এ নীতিই আল্লাহর নীতি বলে গৃহীত হবে,

'সুতরাং, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্যে মাগফেরাত কামনা করো এবং কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাদের সংগে পরামর্শ করো।'

মহানবী (স.) তাই একবার স্থির সিদ্ধান্তে অটল হওয়ার পর তা থেকে ফিরে আসতে অস্বীকার করলেন। তাঁর এ আচরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, শুষ্ক দর্শনের চেয়ে বাস্তব কর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী। এতে শূরার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব বুঝা যায়। শূরায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পর ইতস্তত করার কোনো অবকাশ নেই। এ প্রসংগে নবীর তরবিয়তসুলভ উক্তিটি দেখুন,

'আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া উম্মতের জন্যে বিধান দেয়া কোনো নবীর কাজ নয়।' অতপর সত্যি সত্যিই আল্লাহর নির্দেশ আসে,

'যখন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তখন (তার বাস্তবায়নের জন্যে) আল্লাহর ওপর তাকওয়াক্কুল করবে।'

এ যুদ্ধে মুসলিম জামায়াতের ভূমিকা সম্পর্কে কোরআন মজীদের মন্তব্য থেকে আমরা সর্বশেষ এই তত্ত্বটি অবগত হই। যারা রসূলে খোদার সংসর্গ-সাহচর্য লাভ করে ছিলেন তারা ছিলেন মুসলিম উম্মার সেরা মানুষের নমুনা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা জানতে হবে যে, ইসলামী

জীবনবিধান স্থির-অটল। অটল এ জীবনবিধানের মূল্যবোধ আর মানদন্ড। মানুষ চিন্তা আর আচরণের রীতি-নীতিতে ভুল করবে, আবার তারা মাঝে মাঝে নির্ভুল কাজও করবে। কিন্তু তাদের কোনো ভুলই ইসলামী জীবনবিধানের স্থায়ী মূল্যবোধ আর মানদন্ডকে পরিবর্তন করতে পারবে না।

মানুষ যখন চিন্তা আর আচরণে ভুল করে, তখন তাকে ভুল বলা হয়। আর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করে, তখন তাকে বক্রতাই বলা হয়। তাদের মর্যাদা যতো বড়ই হোক না কেন, তাদের এসব ভুল আর বক্রতা থেকে কখনো চক্ষু বন্ধ করে নেয়া যায় না।

এ থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ বলা, আর গোটা জীবনবিধানের বিকৃতি সাধন করা নিন্দা করা এক কথা নয়। এ থেকে আমরা এটাও জানতে পারি যে, ইসলামী জীবনবিধানের মূলনীতি অক্ষত, অবিকৃত, নির্ভেজাল এবং দ্ব্যর্থহীন থাকাটা মুসলিম উম্মাহর জন্যেই কল্যাণকর। যারা ভুল করবে এবং বিকৃতি সাধন করে মুসলিম উম্মাহ থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে, তাদের ভুল আর বিকৃতিকে কিছুতেই ভালো বলা যাবে না সে যেই হোক না কেন। তাদের এ বিকৃতি হতে পারে জীবন বিধানের ক্ষেত্রে, হতে পারে বিধান, মূল্যবোধ ও মানদন্ড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। ইসলামী জীবন বিধানে ব্যক্তির চেয়ে মূল্যবোধ অনেক বড়, অনেক দীর্ঘস্থায়ী।

এ কারণে মুসলমানরা যা কিছুই করেছে, যা কিছুর প্রচলন করেছে, তা সবই ইসলামের ইতিহাস নয়, নয় তা ঐতিহাসিক সত্য– ইসলামী জীবনবিধান, তার স্থায়ী মূলনীতি আর মূল্যবোধের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে মুসলমানরা যেসব কাজ করেছে কেবল সেগুলোই হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক সত্য, অন্যথায় তা ভুল অথবা বিকৃতি। তাকে ইসলাম বা ইসলামের ইতিহাস বলে মেনে নেয়া যাবে না, তাকে কেবল মুসলমানদের কাজ বলা হতে পারে, আর যে মুসলমান যে বিশেষণের যোগ্য, সে বিশেষণেই তাকে বিশেষিত করতে হবে। তারা ভুল করলে, ইসলামকে বিকৃত করলে এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত জীবনধারা অবলম্বন করলে ইতিহাসের প্রয়োজনে তাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

মুসলমানদের ইতিহাসে ইসলামের সঠিক চিন্তাধারা, আচার আচরণ, জীবন কাঠামো এবং সমাজ সংগঠনে ইসলামী নীতিমালার সত্যিকার বাস্তবায়নই কেবল ইসলামের ইতিহাস বলে গণ্য হবে। ইসলাম হচ্ছে একটা স্থির খুঁটি ও একটা স্থায়ী বৃত্ত। মানুষের জীবন এ খুঁটির চারিদিকের এই স্থায়ী সীমারেখা থেকে যখন দূরে সরে দাঁড়ায়, অথবা তারা যখন এ খুঁটিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, তখন ইসলাম নামের এই খুটির সংগে তাদের আর কী সম্পর্ক থাকতে পারে? তখন কেন তাদের কর্মকান্ডকে ইসলাম বলে স্বীকার করা হবে? কেন সে সব কর্মকান্ড দ্বারা ইসলামকে বদনাম করা হবে? তারা যখন ইসলামী জীবনবিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে নিজেদের জীবনে ইসলাম প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে, তখন নিজেদেরকে মুসলমান বলার কোনো অধিকারই তাদের আর থাকে না। তারা মুসলমান এ জন্যে যে, নিজেদের জীবনে তারা ইসলামী জীবন বিধানের অনুশীলন করে। এজন্য তারা মুসলমান নয় যে, মুসলমানের মতো নাম তারা ধারণ করেছে। কিংবা মুসলমান দাবীদার কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে।

আল্লাহ তায়ালা মুসলিম উম্মাহকে একথাটিই জানিয়ে দিতে চান। তিনি মুসলিম জামায়াতের ভুলভ্রান্তি তাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তাদের তিনি ভুলভ্রান্তি আর দুর্বলতায়ও ফেলেন, অতপর তাদের প্রতি তিনি রহম করেন। তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। ত্রুটি আর দুর্বলতার হিসাব খাতা থেকে মুছে ফেলেন। যদিও পরীক্ষাক্ষেত্রে তাদের তিনি এসব ভুল আর দুর্বলতার পরিণামফল কিন্তু ভোগ ঠিকমতোই করান!

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۸۰﴾ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۱۸۱﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۱۸۲﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ

১৮০. আল্লাহ তায়ালা নিজের অনুগ্রহ দিয়ে তাদের যে প্রাচুর্য দিয়েছেন যারা তা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে– তারা যেন কখনো এটা মনে না করে, এটা তাদের জন্যে কোনো কল্যাণকর কিছু হবে; না, এ কৃপণতা (আসলে) তাদের জন্যে খুবই অকল্যাণকর। কার্পণ্য করে তারা যা জমা করেছে, অচিরেই কেয়ামতের দিন তা দিয়ে তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে, আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহ তায়ালার জন্যেই, আর তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে অবগত রয়েছেন।

রুকু ১৯

১৮১. আল্লাহ তায়ালা সেই (ইহুদী) লোকদের কথা (ভালো করেই) শুনেছেন, যখন তারা (বিদ্রূপ করে) বলেছিলো (হ্যাঁ), আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই গরীব, আর আমরা হচ্ছি ধনী, তারা যা কিছু বলে তা আমি (তাদের হিসেবের খাতায়) লিখে রাখবো, (আমি আরো লিখে রাখবো) অন্যায়ভাবে তাদের নবীদের হত্যা করার বিষয়টিও, (সেদিন) আমি তাদের বলবো, এবার এই জাহান্নামের স্বাদ উপভোগ করো। ১৮২. এ (আযাব) হচ্ছে তোমাদের নিজেদেরই হাতের কামাই, যা তোমরা (আগেই এখানে) পাঠিয়েছো, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর নিজ বান্দাদের প্রতি অবিচারক নন। ১৮৩. যারা বলে, (স্বয়ং) আল্লাহ তায়ালাই তো আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা কোনো রসূলের ওপর ঈমান না আনি, যতোক্ষণ না সে আমাদের কাছে এমন একটা কোরবানী এনে হাযির করবে, যাকে (গায়ব থেকে এক) আগুন এসে খেয়ে ফেলবে; (হে মোহাম্মদ,) তুমি (তাদের বলো, হ্যাঁ

تَأْكُلُهُ النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَٰتِ

وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٨٣﴾ فَإِن

كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِالْبَيِّنَٰتِ

وَالزُّبُرِ وَالْكِتَٰبِ الْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا

تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ

الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۚ

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾ وَإِذْ

আমার আগেও তোমাদের কাছে বহু নবী রসূল এসেছে, তারা সবাই উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়েই এসেছিলো, তোমরা (আজ) যে কথা বলছো তা সহই তো তারা এসেছিলো, তা সত্ত্বেও তোমরা তাদের হত্যা করলে কেন? আজ যদি তোমরা এতোই সত্যবাদী হও (তাহলে কেন এসব আচরণ করলে?) ১৮৪. (হে মোহাম্মদ,) এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে (তাহলে এ নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, কারণ), তোমার আগেও এমন বহু নবী রসূল (নবুওতের) সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল করা হেদায়াতের দীপ্তিমান গ্রন্থমালা নিয়ে এসেছিলো, তাদেরও (এমনিভাবেই) অস্বীকার করা হয়েছিলো। ১৮৫. প্রত্যেক প্রাণীই মরণের স্বাদ ভোগ করবে; (অতপর) তোমাদের (জীবনভর) কামাইর প্রতিফল কেয়ামতের দিন আদায় করে দেয়া হবে, যাকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে; সেই হবে সফল ব্যক্তি। (মনে রেখো,) এই পার্থিব জীবন কিছু বাহ্যিক ছলনার মাল সামানা ছাড়া আর কিছুই নয়। ১৮৬. (হে ঈমানদার ব্যক্তিরা,) নিশ্চয়ই জান মালের (ক্ষতি সাধনের) মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে। (এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে) তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়– যাদের কাছে আল্লাহর কিতাব নাযিল হয়েছিলো এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করেছে, তাদের (উভয়ের) কাছ থেকে অনেক (কষ্টদায়ক) কথাবার্তা শুনবে; এ অবস্থায় তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে তা হবে অত্যন্ত বড়ো ধরনের এক সাহসিকতার ব্যাপার। ১৮৭. (স্মরণ করো,) যখন আল্লাহ তায়ালা এই

أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ
بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا
تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

কিতাবধারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, (তিনি তাদের বলেছিলেন) তোমরা একে মানুষদের কাছে বর্ণনা করবে এবং একে তোমরা গোপন করবে না, কিন্তু তারা এ প্রতিশ্রুতি নিজেদের পেছনে ফেলে রাখলো এবং অত্যন্ত অল্প মূল্যে তা বিক্রি করে দিলো; বড়োই নিকৃষ্ট ছিলো (যেভাবে) তারা সে বেচাকেনার কাজটি করলো! ১৮৮. এমন সব লোকদের ব্যাপারে তুমি কখনো ভেবো না যারা নিজেরা যা করে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে, আবার নিজেরা যা কখনো করেনি তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তুমি কখনো ভেবো না যে, এরা (বুঝি) আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে, (মূলত) এদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। ১৮৯. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব এককভাবে আল্লাহর জন্যে; আল্লাহ তায়ালাই সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।

তাফসীর

আয়াত ১৮০-১৮৯

সূরার এ পর্যায়ে এসে ওহুদযুদ্ধের বর্ণনাটি শেষ হয়ে গেছে।(২৫) কিন্তু মুসলিম জামায়াতের দুশমন যারা মদীনাকে চারিদিক থেকে বেষ্টন করে রেখেছিলো এবং মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের সাথে এ যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। বিবাদ, বিতর্ক, সন্দেহ সংশয়, মানসিক দ্বন্দ্ব, চক্রান্ত ষড়যন্ত্র–বর্তমান সূরার এক বিরাট অংশ জুড়ে এ যুদ্ধের বর্ণনাও রয়েছে।

মহানবী (স.) বনু কাইনুকাকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। এই বহিষ্কারের ঘটনাটি ঘটেছিলো বদর যুদ্ধের পর। ইহুদীদের উষ্মা, চক্রান্ত, মুসলমানদের পেছনে শিকারীর মতো তাদের লেগে থাকা সর্বোপরি আল্লাহর নবীর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভংগ করার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটি ঘটেছিলো। নবী মদীনায় আগমন করে আওস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে শান্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তখনো এখানে বনু নযীর, বনু কোরায়যা গোত্রের ইহুদীরা বসবাস করছিলো। আর অন্যান্য

(২৫) একটি বর্ণনা মতে বর্তমান পাঠের প্রথম আয়াত ওহুদ যুদ্ধ উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। সে মতে এ নিয়ে ওহুদ যুদ্ধ সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা মোট ৭০। কিন্তু আমাদের মতে আয়াতটি বর্তমান পাঠের সংগেই যুক্ত। এ কারণে আমরা আয়াতটিকে এখানে সন্নিবিষ্ট করেছি।

ইহুদীরা বসবাস করছিলো আরবের বিভিন্ন এলাকায়। এদের সকলেই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলতো, মদীনার মোনাফেকদের সংগে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিলো, মুসলমানদের বিরুদ্ধে এরা চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলো।

সূরা আলে ইমরানের শুরুতে ইহুদীদের সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের হাতে মোশরেকদের যে দশা হয়েছিলো, তাদেরও সেই দশা হবে।

'কাফেরদেরকে বলে দাও, খুব শিগগিরই তোমরা পরাভূত হবে। তোমাদের জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তা কতোই না নিকৃষ্ট অবস্থান।'

'নিশ্চয়ই দু'টো দলের মোকাবেলার মধ্যে তোমাদের জন্যে নিদর্শন ছিলো। তাদের একটা দল যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়। অপর দল ছিলো কাফেরদের আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাঁর সাহায্য দিয়ে শক্তি দান করেন। আর এতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে।'

তাদের কর্মকান্ডের প্রতিবাদে মহানবী (স.) তাদেরকে এ সতর্কবাণী জানিয়ে দিলেন তারা তাকে স্বাগত না জানিয়ে বরং তার খেলাফ পরিকল্পনা করে। তারা বলে, 'হে মোহাম্মদ (স.) কোরায়শদের কিছু আনাড়ী লোক যুদ্ধ করতে তারা জানতো না, তাদেরকে হত্যা করে তুমি মনে মনে প্রতারিত হয়ো না। আল্লাহর শপথ, আমাদের সংগে লড়াই করলে তুমি বুঝতে পারতে আমরা কেমন মানুষ। আমাদের মতো লোকদের সংগে তোমার সাক্ষাৎ হয়নি।' এরপর তারা চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যায়, যার কিছু বিবরণ এ সূরায় বিভিন্ন জায়গায় দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মহানবী (স.)-এর সংগে তাদের সম্পাদিত চুক্তি ভেংগে যায়। মহানবী (স.) তাদেরকে অবরোধ করে রাখলে তারা তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে। পরে নবী তাদেরকে মদীনা থেকে নানা স্থানে নির্বাসিত করেন। বাকী থাকে অপর দু'টি দল– বনু কোরায়যা ও বনু নযীর। তারা মদীনায় বিভ্রান্তি আর ফেতনা-বিপর্যয় ছড়ায়, ইহুদীদের ইতিহাস যার বর্ণনায় ভরপুর। তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর কেতাব সত্য প্রতিপন্ন হয় গোটা বিশ্ববাসী অভিশপ্ত ইহুদী জাতির পরিচয় জানে।

ইহুদীদের কিছু কীর্তি আর কিছু উক্তির এখানে উল্লেখ রয়েছে, এতে মুসলমানদের সংগে বেঈমানী করার পর মহান আল্লাহর সংগেও তাদের বেয়াদবী প্রকাশ পায়। মহানবী (স.)-এর সংগে সম্পাদিত অর্থনৈতিক চুক্তি পালন করতেও তারা কার্পণ্য করে। আরো অগ্রসর হয়ে তারা বলতে শুরু করে, আল্লাহ তায়ালা তো ফকীর, আমরাই 'ধনী'। এ উক্তি থেকে তাদের চূড়ান্ত বিকৃত মানসিকতা প্রকাশ পায়। এ থেকে তাদের ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধাচরণটাও প্রকাশ পায়, যা সকলের অল্প বিস্তর জানা আছে। তারা তো আল্লাহর সংগে করা অংগীকারও ভংগ করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা যে সত্য প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা গোপন করে সামান্য মূল্যের বদলে বিক্রয় করে দিয়েছে। নবীদেরকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো। অথচ এসব নবীরা তাদের দাবী অনুযায়ী অলৌকিক ঘটনাও ঘটিয়েছিলেন, তাদের জন্যে স্পষ্ট নিদর্শনও নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারা সেসবই প্রত্যাখ্যান করে।

নিজেদের নবীর সংগে ইহুদীদের এসব লজ্জাজনক আচরণ আর আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের এসব জঘন্য উক্তি প্রমাণ করে যে, মুসলিম জামায়াত সম্পর্কে তাদের ধারণা কতো নিম্ন প্রকৃতির। তারা মোশরেকদের সাথে মিলে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেবে এবং তাদের চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তৎপর হয়ে উঠবে। মুসলিম জামায়াতকে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাধীনে গঠন করার দাবী হচ্ছে, তারা আশপাশের ঘটনা সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। যে মাটিতে তারা কাজ করছে, সে মাটির প্রকৃতি, যে ঘাটিতে যে ফাঁদ পাতা হয়েছে, তার প্রকৃতি আর ধরন সম্পর্কেও তারা জানবে এবং এ পথে তাদের যেসব কষ্ট আর কোরবানী দিতে হবে, সে সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান থাকতে হবে। মুসলিম জামায়াতের প্রতি মক্কায় মোশরেকদের দুশমনীর চেয়ে মদীনায়

ইহুদীদের চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র ছিলো বেশী ক্ষতিকর, বেশী ভয়ংকর। সম্ভবত ইতিহাসের ধারায় মুসলিম দলগুলোর প্রতি ইহুদীদের চক্রান্ত সকল স্থানে এমনি ভয়ংকরই হয়। আমরা দেখতে পাই যে, স্থায়ী মূল্যবোধ আর অস্থায়ী মূল্যবোধের প্রতি মুসলমানদের কিভাবে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন মৃত্যু দ্বারা সীমাবদ্ধ। সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আসল প্রতিদান পাওয়া যাবে পরকালে। লাভ-ক্ষতির হিসাবও হবে সেখানে।

'জাহান্নাম থেকে দূরে থেকে যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, সেই নিশ্চিত সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছুই নয়। জান আর মাল দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে এবং তাদের দুশমন মোশরেক আহলে কেতাবদের পক্ষ থেকে তাদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে।'

বস্তুত তাকওয়া ছাড়া কিছুই তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। সবর, তাকওয়া এবং ইসলামী জীবনধারা অনুশীলন– কেবল এগুলোই মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারে!

মদীনায় মুসলিম জামায়াতের প্রতি আল্লাহর যে দৃষ্টিভংগী ছিলো তা কিন্তু মদীনায়ই শেষ হয়ে যায়নি, অনন্ত কাল ধরে সর্বত্র সে দৃষ্টিভংগীই বহাল থাকবে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং আল্লাহর ছায়াতলে ইসলামী জীবন শুরু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিটি দলকে সতর্কতার সংগে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। শত্রুদের সম্পর্কে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। সে শত্রু যারাই হোক না, কেননা শত্রু তো শত্রুই। তারা মোশরেক, নাস্তিক, আহলে কেতাব হোক, ইহুদীবাদ, ক্রুশেডার, আর কমিউনিষ্ট চক্র– যে কেউই হোক না কেন, তাদের পাতানো প্রতিটি ফাঁদ, ঘাটি ইত্যাদির প্রকৃতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এ মহান উদ্দেশ্যে তাদের জান-মালের পরীক্ষা, কষ্ট আর মৃত্যুকে আল্লাহ তায়ালা খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে আজো আহ্বান করে বলেন, যেমনি আহ্বান করে তিনি বলেছিলেন প্রথম মুসলিম জামায়াতকে,

'সকল জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের প্রতিদান কেয়ামতের দিন পুরোপুরিই দেয়া হবে। অতপর যাকে জাহান্নাম থেকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম হয়েছে।' (আয়াত ১৮৫-৮৬)

এই কোরআন হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জন্যে আল্লাহর চিরন্তন কেতাব। তাদের পূর্ণাংগ সংবিধান ও পথ-প্রদর্শক। যারা একে বিশ্বাস করে না তারা মুসলিম উম্মাহর দুশমন।

কৃপণতা একটি ইহুদী চরিত্র

এখানে উল্লেখিত প্রথম আয়াত সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, এই আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে। কৃপণ বলে কাদেরকে এখানে তিরস্কার করা হয়েছে। কেয়ামতের দিনের পরিণতির ভয়ই বা কাদের দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখানে আয়াতটির পর্যায়ক্রমিক সন্নিবেশ করা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তী আয়াতগুলোর সংগেই মূলত এ আয়াতটি যুক্ত। এতে বুঝা যায় যে, আয়াতটি হচ্ছে ইহুদীদের প্রসংগে। এরা হচ্ছে সেসব লোক, আল্লাহ তায়ালা যাদেরকে মন্দ বলেছেন। তারা সেসব লোক, যারা বলে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন ফকীর, আমরাই তো ধনী। এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা বলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সংগে অংগীকার করেছেন যে, আমরা কোনো রসূলের প্রতি ঈমান আনবো না, যতোক্ষণ না তিনি আমাদের জন্যে কোনো কোরবানী নিয়ে আসবেন এবং কোরবানী আগুন খেয়ে ফেলবে।

আসলে এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে ইহুদীদের সম্পর্কে। মহানবী (স.)-এর সংগে সম্পাদিত চুক্তি মতে ইহুদীদের ওপর যে অর্থ আদায়ের বাধ্যবাধকতা বর্তায়, তা মেনে চলার জন্যে

মহানবী (স.)-এর তাদের প্রতি আহ্বান জানান, অনুরূপভাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বানও জানানো হয়, আর এই প্রসংগের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

এ আয়াতে হুমকিসুলভ ভীতির সাথে রয়েছে মোহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ইহুদীদের ঈমান না আনার নানা অজুহাত বিষয়ক আলোচনা। আল্লাহর সংগে তাদের বেয়াদবী এবং তাদের নানাবিধ অজুহাত প্রকাশের প্রতিবাদে এটা নাযিল হয়েছে। এতদসংগে তাদের অবিশ্বাসের ফলে মহানবী (স.) যে মনোকষ্ট পেয়েছেন তার জন্যে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার কথাও আয়াতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। তার পূর্ববর্তি রসূলদের সংগে তাদের জাতি কেমন আচরণ করেছিলো তাও আলোচনায় এসেছে। স্পষ্ট নিদর্শন আর মোজেযা নিয়ে আসার পরও বনী ইসরাঈলীরা সে সব নবীকে হত্যা করেছিলো। আয়াতগুলোর পটভূমিকায় এসব কিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আয়াতটির অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাপক। ইহুদীরা অংগীকার পূরণে কার্পন্য করেছিলো। তারা যেমন এই আয়াতের তাৎপর্যের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি অন্যদের মধ্যে যারা আল্লাহর অনুগ্রহ অনুযায়ী দান করতে কার্পন্য করে এবং মনে করে যে, এ কার্পন্য বুঝি তাদের জন্যে কল্যাণকর- তারাও এর অন্তর্ভুক্ত। যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে কোরআন মজীদের স্পষ্ট এ উক্তি তাদেরকে এ মিথ্যা ধারণা থেকে বারণ করে। এতে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা যা পুঞ্জীভূত করছে জমা করে রেখেছে, কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের তবক বানিয়ে তাদের গলায় ঝুলানো হবে। এটা সত্যিই এক ভয়াল-ভয়ংকর ভীতি বলা হয়, 'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে অনুগ্রহ দান করে, তাতে তারা কার্পন্য করে।'

কার্পন্য জঘন্য একটা নিন্দনীয় কাজ। তারা নিজেদের সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করে। অথচ জীবনে পদার্পণ করার সময় তারা তো কোনো কিছুরই মালিক ছিলো না, এমনকি নিজেদের দেহের চামড়াটিরও না। অতপর আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তাদের অনেক কিছুই দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁরই দেয়া ফসল থেকে কিছু অংশ দান করার দাবী করেন, তখন তারা ভুলে যায় যে, এ তো আল্লাহরই দান। তারা সামান্য দান করতেও কার্পন্য করে এবং ধারণা করে যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার মধ্যেই তাদের জন্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অথচ তাদের জন্যে এতে রয়েছে জঘন্য অকল্যাণ। এসব কিছুর পরও বলা হয়, আল্লাহ তায়ালাই হবেন সে সম্পদের ওয়ারিস-উত্তরাধিকারী,

'আর আসমান যমীনের উত্তরাধিকার তো আল্লাহর জন্যেই।'

এ পুঞ্জীভূত সম্পদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে। অতপর সবকিছুই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে যা ব্যয় করেছে, তা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। তাই আল্লাহর কাছে তাদের হিসাবের খাতায় জমা থাকবে এবং নেক কাজে ব্যয় করা সম্পদ কেয়ামতের দিন তাদের গলায় তবক বানিয়ে ঝুলানো হবে না, বরং তা হবে তাদের জন্যে আল্লাহর এক অফুরন্ত দান।

ইহুদীদের চরম ধৃষ্টতা

এরপর কোরআন ইহুদীদের একটি ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির নিন্দা করে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলো। আল্লাহ তায়ালা অনেক অনুগ্রহে তাদেরকে বিপুল বিত্ত বৈভবের মালিক করেছিলেন। আর সেই অগাধ সম্পদ পেয়ে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতো। তারা মনে করতো তারা মোটেই আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। পরকালীন পুরস্কারেরও তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহর পথে যারা দান করে তাদের জন্যে তিনি যে বহুগুণ বেশী প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দেন তারও তাদের প্রয়োজন নেই। আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে তারই পথে করা দানকে আল্লাহ তায়ালা তাকে দেয়া ঋণ নামে অভিহিত করেন, অথচ ইহুদীরা ঔদ্ধত্যের সাথে বলতো, আল্লাহর

কী হয়েছে যে, তিনি আমাদের ধন-সম্পদ থেকে ঋণ চান এবং আমাদেরকে এই ঋণের বহু গুণ বেশী প্রতিদান দিতে চান? অথচ তিনি আমদেরকে কয়েকগুণ বেশী লেনদেন তথা সুদ খেতে নিষেধ করেন। এসব উক্তির ভেতরে আসলে আল্লাহর প্রতি তাদের বেয়াবদী ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেতো। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে বলছেন,

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এ সকল লোকের বক্তব্য শুনেছেন, যারা বলেছে, আল্লাহ তায়ালা তো দরিদ্র, আমরাই হলাম বিত্তশালী। তাদের কথিত এসব কথাবার্তা এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করার বিষয়টি আমি অচিরেই লিখে রাখবো..... ।'

ইহুদীদের বিকৃত গ্রন্থাবলীতে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে তাদের অনেক খারাপ মনোভাবের উল্লেখ রয়েছে। তবে এখানের এই কথায় শুধু খারাপ মনোভাবই প্রকাশ পায়নি, বরং সেই সাথে চরম বেয়াবদীও প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্যে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে,

'আমি অচিরেই তাদের এসব কথাবার্তা লিখে রাখবো... ।'

অর্থাৎ এ কথার জন্যে তাদের কৈফিয়ত তলব করার জন্যে লিখে রাখবো। কেননা এমন ঔদ্ধত্য ক্ষমার অযোগ্য। একে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না। এসব বেয়াদবী ছাড়া তাদের পূর্বেকার আরো অনেক অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। সে সব অপরাধ তাদের সকল প্রজন্মের স্বজাতির। পাপাচারে ও নাফরমানীতে তারা সবাই আসলে একই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত।

'অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করা .... ।'

বস্তুত বনী ইসরাঈলের ইতিহাস নবীদের হত্যাকান্ডের ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। এই অপরাধ তালিকার সর্বশেষ ঘটনা হচ্ছে হযরত ঈসা (আ.)-কে হত্যার অপচেষ্টা। তারা মনে করে যে, তাকে তারা হত্যা করেছে। এই বীভৎস অপরাধের জন্যে তারা গর্বও প্রকাশ করে থাকে!

'আমি বলবো, আগুনে দগ্ধীভূত হবার স্বাদ এখন তোমার উপভোগ করো।'

আসলে 'দগ্ধীভূত হওয়া' শব্দটি স্পষ্ট করে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো উক্ত আযাবের ভয়াবহতা তুলে ধরা- যা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করার ন্যায় জঘন্য অপরাধসহ এবং 'আল্লাহ তায়ালা দরিদ্র ও আমরা ধনী' এই ঘৃণ্য উক্তি করার নিকৃষ্ট প্রতিফল।

'এটা তোমাদের কৃত কর্মেরই ফল... ।' অর্থাৎ এটা কৃতকর্মের পরিমিত ও উপযুক্ত ফল। এতে কারো কোনো যুলুম বা নিষ্ঠুরতা নেই।

'আর আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের ওপর যুলুমকারী নন।'

এখানে 'বান্দাদের' কথাটা বলে আল্লাহর সামনে তাদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ কথা দ্বারা তাদের অপরাধের বীভৎসতা ও বেয়াদবীর নিকৃষ্টতাকে আরো স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা এই নগণ্য বান্দারা কত বেয়াবদ হলে বলতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা দরিদ্র এবং আমরা ধনী, আর কত অসভ্য হলে তারা তাঁর প্রিয় নবীদেরকে হত্যা করতে পারে।

এ দূরাচার, বেয়াদব ও নবী হন্তারাই দাবী করেছিলো যে, তারা মোহাম্মদ (স.) এর ওপর ঈমান আনবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা নিজেই নাকি তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কোনো রসূলের প্রতিই যেন তারা ঈমান না আনে, যতোক্ষণ না তিনি একটি জন্তু কোরবানী করেন এবং আকাশ থেকে আগুন এসে তাকে জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে তারা বনী ইসরাঈলের কোনো কোনো নবীর প্রদর্শিত মেজেযা সংঘটিত হোক তাই দেখতে চেয়েছিলো।

এখানে কোরআন তাদের বাস্তব ইতিহাস দ্বারাই জবাব দিচ্ছে। কোরআন বলছে যে, তাদের ইচ্ছামত মোজেযা প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন আনয়নকারী নবীদেরকেও তো তারা হত্যা করেছিলো। কোরআন বলছে, 'যারা বলেছে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কোনো রসূলের প্রতি ঈমান না আনি .... ।'

এটা তাদের কথার এক দাঁত ভাংগা জবাব বটে। এতে তাদের মিথ্যাচার ও কুফরীর ওপর জিদ ধরার মুখোস উন্মোচন করে দেয়া হয়েছে। উপরন্তু তারা আল্লাহর ওপর কতো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করতে পারে ও কতো স্পর্ধা দেখাতে পারে তাও প্রকাশ করা হয়েছে।

পরবর্তী আয়াতে কোরআন রসূল (স.)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তাদের দুর্ব্যবহারকে হাল্কাভাবে গ্রহণের জন্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। আর এখানে শুধু মোহাম্মদ (স.) একা নন। যুগ যুগ ধরে তাঁর ভ্রাতৃপ্রতীম নবীরাও তাদের কাছ থেকে এই একই আচরণ পেয়ে এসেছেন,

'তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে (তোমার চিন্তিত হওয়া উচিত নয়) তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরও এভাবে অস্বীকার করা হয়েছিলো........।'

সুতরাং তিনি একাই বনী ইসরাঈলের প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতির শিকার নন, যুগ যুগ ধরে বনী ইসরাঈলীদের আচরণ এ রকমই ছিলো। নবীরা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের ন্যায় উজ্জ্বল বৃহৎ গ্রন্থ এবং অলৌকিক ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ মোজেযা এনেছিলেন। মোজেযা উপস্থাপন করাই নবীদের পথ। এই পথের যতো উপেক্ষা, অবজ্ঞা– এ সবই হচ্ছে নবীদের পথের অনিবার্য স্তর।

জীবন মৃত্যু সম্পর্কে কোরআনের দর্শন

পরবর্তী আয়াত থেকে সাধারণ মুসলমানদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। তাদেরকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে তারা এগুলো অর্জনে আগ্রহী হয় এবং এর জন্যে ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়। এই সাথে তাদেরকে একথাও জানিয়ে দিয়েছে যে ইসলামের পথে যতো বাধাবিপত্তি ও দুঃখ কষ্ট রয়েছে তার মোকাবেলায় তাদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে,

'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতে হবে .... যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও তাকওয়া অবলম্বন করো .... '

বস্তুত এ সত্যটি প্রত্যেকের মনে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল থাকা চাই যে, পৃথিবীর জীবনটা সীমাবদ্ধ, তার একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। সে মেয়াদ শেষে মৃত্যু আসা অবধারিত। ভালো লোক ও মন্দ লোক, জেহাদে অংশ গ্রহণকারী ও জেহাদ থেকে পলায়নকারী, ইসলামী আদর্শকে উচ্চে উত্তোলনকারী ও আল্লাহর বান্দাদেরকে নির্যাতন নিপীড়ণকারী সবাইকে একদিন মরতে হবে। যালেম ও মযলুম এবং যে কোনো মূল্যে বেঁচে থাকার জন্যে লালায়িত উচ্চাকাংখী ও উচ্চাভিলাসী– এরা সবাইও মৃত্যু বরণ করবে।

'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।'

অর্থাৎ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণে প্রাণীজগতে কোনো ভেদাভেদ নেই। সবার জন্যেই তা অবারিত। ভেদাভেদ যদি থেকে থাকে তবে তা অন্যত্র। আর তা হচ্ছে শেষ পরিণতি বা প্রতিফলের ক্ষেত্র,

'কেয়ামতের দিনই তোমরা তোমাদের প্রতিফল পাবে। যে ব্যক্তিকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে সে সফলকাম।'

এটাই হচ্ছে সেই শেষ পরিণতি, যেখানে একজন আর একজন থেকে ভিন্ন। এটা সেই শাশ্বত মূল্যবোধ। এটাই সেই ভীতিপ্রদ পরিণতি, যার জন্যে বারবার চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন।

আয়াতের এই অংশে 'ঝুহঝেহা' একটি শব্দ রয়েছে। এ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুকে পর্যায়ক্রমে দূরে সরানো। এ শব্দের ঋণাত্মক উপস্থিতি থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, দোযখের আগুনের এমন এক প্রচন্ড শক্তি রয়েছে যে, যে ব্যক্তি তার নাগালের ভেতরে আসবে, তাকে সে প্রচন্ড শক্তিতে গ্রাস করবে। তাই এমন কোনো শক্তির প্রয়োজন, যা তাকে ধীরে ধীরে আগুন

থেকে এবং তার প্রবল আকর্ষণ থেকে রক্ষা করবে এবং তাকে দূরে সরিয়ে দেবে। এই আগুনের আকর্ষণ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সৌভাগ্য যার হবে সে-ই সফলকাম হবে।

এটি একটি শক্তিমান ও জীবন্ত দৃশ্য। এতে গতিময়তা, প্রচন্ডতা ও আকর্ষণের তীব্রতা রয়েছে। আগুনের যেমন আকর্ষণ রয়েছে, তেমনি পাপেরও একটা আকর্ষণ রয়েছে। তাই মানুষের বিবেকে এমন কোনো সত্ত্বার উপস্থিতি প্রয়োজন, যে সত্ত্বা তাকে পাপের মোহনীয় আকর্ষণ এবং দোযখ থেকেও মুক্তি দেবে। মানুষের সদা সচেষ্ট ও সচেতন থাকা সত্তেও তার সৎ কাজের পরিমাণ কম থাকে। কেবল আল্লাহর অনুগ্রহই তার সৎ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়ে থাকে। এই অনুগ্রহ তাকে দোযখ থেকেও বাঁচায়।

'দুনিয়ার জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয়।'

বস্তুত দুনিয়ার জীবন হচ্ছে একটি উপকরণ মাত্র। কোনো উদ্দেশ্য নয় বরং উপকরণ। এ উপকরণ মানুষকে ধোকা দেয়। এ কথাও বলা যায় যে, এটি হচ্ছে ধোকা ও প্রতারণা সৃষ্টিকারী উপকরণ। তবে সত্য ও ন্যায়ের যে উপকরণ তা হচ্ছে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

এই তত্ত্বটি যখন মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, যখন মানুষের মন দুনিয়ার জীবনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। সর্বাবস্থায় সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণে বাধ্য, এ সত্য যখন তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরকে জান ও মালের অবধারিত পরীক্ষার কথা জানান এবং তার জন্যে তাদের মনকে প্রস্তুত করেন। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'তোমরা অবশ্যই জান ও মালের পরীক্ষার সম্মুখীন হবে .... '

বস্তুত সকল মতবাদ ও সকল দাওয়াতেরই এটা হচ্ছে চিরন্তন রীতি। পরীক্ষা এখানে অবধারিত। জান ও মালের কষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সংকল্পের দৃঢ়তা হচ্ছে মোমেনের অপরিহার্য মূলধন। এটা জান্নাতের পথ। জান্নাত হচ্ছে কষ্টকর জিনিস দিয়ে আবৃত, আর দোযখের চারপাশে রয়েছে প্রবৃত্তির কামনা সাধনা।

ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী ও দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রশিক্ষণদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্যে এটাই হচ্ছে একমাত্র পথ। এই পথেই সুপ্ত শক্তি, প্রতিভা ও সহনশীলতার স্ফুরণ ঘটে। এই পথে অগ্রসর হয়েই মানবজাতি বস্তুগত উপায় উপকরণের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং মানুষ ও জগতের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন থাকে। যতো কঠিন পরিস্থিতিই সামনে আসুক, যতো যুলুম নির্যাতনই নেমে আসুক, তার মোকাবেলা করার শক্তি এই পথেই অর্জিত হয়। এই কষ্ট নির্যাতন, ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ তিতীক্ষার মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, ইসলাম কতো প্রিয়, কতো মূল্যবান ও মর্যাদাবান জিনিস। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই তারা এর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না।

পরীক্ষা ও ত্যাগ তিতীক্ষার জন্যে প্রস্তুত থাকার এই সতর্কবাণী উচ্চারণের উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী দাওয়াতের ঝান্ডাবাহী সংগঠন ও ব্যক্তিদেরকে দুর্জয় শক্তিতে উজ্জীবিত করা। বস্তুত পরীক্ষা ও দুঃখ নির্যাতনের মোকাবেলা ছাড়া মানুষের সুপ্ত শক্তি, প্রতিভা ও সম্ভাবনা জাগ্রত হয় না। নবাগত ইসলামী দাওয়াত ও সংগঠনের জন্যে এই সুপ্ত শক্তির স্ফুরণ প্রয়োজনীয় ছিলো। কেননা এর ওপরই নির্ভরশীল ছিলো তার ভিত্তির দৃঢ়তা। মানবপ্রকৃতির গভীরে সত্যের জন্যে যে বিপুল উর্বর শক্তিসম্পন্ন ভূমি রয়েছে, তার সাথে তার সংযুক্তি সাধন করাও প্রয়োজন।

এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মোমেনরা নিজেদের প্রকৃতি ও স্বত্ত্বাকে বুঝতে পারে, জীবন সংগ্রামে কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারে। হৃদয়ের সুপ্ত শক্তিকে ও সমাজের সুপ্ত শক্তিকে চিহ্নিত করতে পারে। ইসলামের মূলনীতিগুলো কিভাবে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও শয়তানের বিভ্রান্তিকর প্ররোচনার মোকাবেলা করে, তাও তারা বুঝতে পারে।

এর মাধ্যমে একদিন ইসলামের শত্রুরাও হয়তো বুঝতে পারবে যে, এতো দুঃখ নির্যাতন সহ্য করেও যারা আপন লক্ষ্যে অবিচল আছে, তাদের দাওয়াতে নিশ্চয়ই কোনো কল্যাণ আছে কোনো রহস্য আছে। অতপর এক সময় হয়তো তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করবে।

এটা হচ্ছে ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের চিরন্তন রীতি। নির্যাতন সহ্য করা, তিক্ত সংঘর্ষে তাকওয়ার মাধ্যমে টিকে থাকা, আক্রমন প্রতিরোধ করা। কিন্তু পাল্টা আক্রমন চালানো থেকে বিরত থাকা হচ্ছে এ নীতির প্রাথমিক অংশ। দুঃখ নির্যাতনে আল্লাহর সাহায্য ও রহমত সম্পর্কে হতাশ না হয়ে এই দাওয়াতের ঝান্ডাবাহীরা এভাবেই ধৈর্যের পরিচয় দেয় ....

মদীনার ইসলামী সংগঠনটি তাদের জন্যে অবধারিত জানমালের ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখকষ্ট, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ত্যাগ-তিতীক্ষার কথাগুলো এভাবে আগেভাগে জেনে তাদের মনকে প্রস্তুত করে নিতে পেরেছিলো। ফলে তারা কখনো পৃষ্ট প্রদর্শন করেনি, কাপুরুষতা দেখায়নি। কেননা, তাদের বিশ্বাস ছিলো আখেরাতের পুরস্কার প্রাপ্তিতে, বিশ্বাস ছিলো জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতিতে। জান্নাত লাভেই যে সব সাফল্য, দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী ও ধোকায় পরিপূর্ণ, তাও তারা বুঝতে পেরেছিলো। তাই তারা বাতিলের বিরুদ্ধে এমন শক্ত, অনড় ও অজেয় অবস্থান নিতে পেরেছিলো। তারা জানতো যে, এ দাওয়াতের বিরোধিতা নতুন কিছু নয়-এটা একটা চিরন্তন ব্যাপার। এ দাওয়াতের যারা শত্রু তারা মুসলমানদের শত্রু– তা সে যে যুগেই হোক না কেন। শাশ্বত কোরআন চিরদিন অম্লান থেকে এই সত্য ঘোষণা করতে থাকবে।

সময় ও যুগের পার্থক্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা, যুলুম-নির্যাতনের আকৃতি প্রকৃতি ও উপায় উপকরণের পার্থক্য ঘটে। ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, তার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা এবং তার চরিত্র বৈশিষ্টের ক্ষতিসাধন করার জন্যে শত্রুদের রীতি নীতিতেও পরিবর্তন আসতে পারে। কিন্তু মৌলিকভাবে তার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সবসময়ই এক ও অভিন্ন।

এই সূরায় আহলে কেতাব ও মোশরেকরা তথা ইসলামবিরোধীরা ইসলামের মূলনীতি এবং ইসলামী নেতৃত্বের ব্যাপারে সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টির নানা রকমের যে অপচেষ্টা চলে তার বিবরণও দেয়া হয়েছে। এ সব অপচেষ্টা যুগের আবর্তনের সাথে সাথে এগুতে থাকে। এগুলো সবই মূলত পরিচালিত হয়ে থাকে ইসলাম ও মুসলমানদের– বিশেষত ইসলামী দাওয়াত দানকারী সংগঠন ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে।

সুতরাং কোরআন এখানে পরীক্ষা ও নির্যাতনের ব্যাপারে যে সতর্কবাণী ও পথনির্দেশিকা দিয়েছে, তা প্রত্যেক যুগের ইসলামী সংগঠনের জন্যে একটি মূল্যবান পাথেয়। এ পাথেয় চিরদিন তাদের কাজে লাগাবে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিয়োজিত হলেই তাদের জন্যে পরীক্ষা ও নির্যাতন অবধারিত হয়ে দেখা দেবে। এই সতর্কবাণী ও পথনির্দেশিকা তখন তাদের পদে পদে পথপ্রদর্শন করবে। এতে করে পরীক্ষা আসলে সে কখনো বিচলিত হবে না, বরং এ সব কিছুকে চিরন্তন ও অবধারিত জেনে অবিচল কদমে তার মোকাবেলা করবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা তো আগেই তাদের এসব বাধা বিপত্তি ও নির্যাতনের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

সত্য গোপন করা একটি ক্ষমাহীন অপরাধ

এরপর কোরআন আহলে কেতাবদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহর অংগীকার ও আল্লাহর কেতাবের মর্যাদা রক্ষায় তারা কত শোচনীয় শৈথিল্য দেখিয়েছে,

'সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তায়ালা আহলে কেতাবদের কাছ থেকে অংগীকার নিয়েছিলেন তোমরা আল্লাহর কেতাবকে অবশ্যই জনগণের কাছে প্রকাশ করবে এবং গোপন করবে না। কিন্তু আহলে কেতাবরা এই অংগীকারকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলো .....।'

এই সূরা আহলে কেতাব গোষ্ঠীর বহু অপকর্ম ও কু-উক্তির বর্ণনা দিয়েছে। তন্মধ্যে তাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অপকর্ম হলো, জেনেশুনে সত্যকে গোপন করা এবং সত্যের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটানো, যাতে ইসলামের বিশুদ্ধতায়, কোরআন ও পুর্ববর্তী ঐশী বিধানসমূহের মধ্যকার মৌলিক ঐক্য সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা যায়। অথচ তাওরাত থেকে তারা জানতো যে, মোহাম্মদ (স.)-এর দ্বীন সত্য এবং তার উৎস ও তাওরাতের উৎস এক ও অভিন্ন।

যখন জানা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালা আহলে কেতাবদের কাছ থেকে অংগীকার নেয়া সত্ত্বেও তারা পবিত্র গ্রন্থ তাওরাতকে প্রচার করেনি এবং তাদের অংগীকার ভংগ করেছে তখন তারা যে কত নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ তা স্পষ্ট হয়ে গেলো।

'তারা স্বল্প মূল্যে তা বিক্রী করেছে।'

বস্তুত ইহুদী জাতীয়তাই হোক কিংবা ইহুদী ধর্ম যাযকদের ব্যক্তিত্ব পূজাই হোক– তারা আল্লাহর দ্বীন ও কেতাবকে যে কারণেই পেছনে ফেলে রাখুক না কেন, তা অত্যন্ত হীন ও ঘৃণ্য স্বার্থের বিনিময়ে আল্লাহর কেতাব বিক্রী করারই শামিল। কেননা আল্লাহর অংগীকার ও আল্লাহর প্রতিদানের তুলনায় গোটা পৃথিবীর রাজত্ব, পৃথিবীর সকল সম্পদই তুচ্ছ ও মূল্যহীন।

বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের বরাত দিয়ে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূল (স.) ইহুদীদের কাছে তাদের ধর্মীয় বিধানের কোনো একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা প্রকৃত সত্য গোপন করে অন্য কথা বললো। অতপর এ রকম ভাব দেখিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলো যে, রসূল (স.) যা জানতে চেয়েছেন, তার জবাব তারা দিয়েছে এবং এ জন্যে তারা তাঁর প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু মনে মনে এ জন্যে খুব খুশী হলো যে, তারা আসল ব্যাপারটা লুকাতে পেরেছে। এ সম্পর্কেই পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হয়।

'যারা নিজেদের প্রদত্ত জিনিস নিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে, যা করেনি তা নিয়ে প্রশংসা কামনা করে, তাদেরকে তুমি আযাব থেকে মুক্ত ভেব না। তাদের জন্যে যন্ত্রাণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।'

বোখারীর ওপর এক বর্ণনায় আবু সাইদ খুদরী বলেন, রসূল (স.)-এর আমলে একদল মোনাফেক ছিলো, রসূল (স.) কোনো যুদ্ধে গেলে তারা তা থেকে দূরে থাকতো এবং এতে তারা বেশ আনন্দ বোধ করতো। অতপর রসূল (স.) ফিরে এলে তাঁর কাছে এসে নিজেদের নানা রকম ওযর বাহানা পেশ করতো, আর যুদ্ধে না যাওয়াতেও তাদের বাহবা দেয়া হোক-এটা তারা আশা করতো। তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এখানে একটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট আয়াত নযিল হওয়ার বিষয়টি কোনো অকাট্য ও নিশ্চিত ব্যাপার নয়। অনেক সময় একটি ঘটনা কোনো আয়াতের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক বলতে গিয়ে উক্ত আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করে, অথবা আয়াত উক্ত ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে প্রমাণ করে। এ কারণেও বলা হয় যে, আয়াতটি অমুক ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। তাই এ দু'টো বর্ণনায় কোনোটি সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারি না।

তবে যদি প্রথমোক্ত বর্ণনা সঠিক হয়, তাহলে তাকে আহলে কেতাব কর্তৃক আল্লাহর কেতাবকে গোপন করা, ধোকা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়া এবং মিথ্যা ও ধোকাবাজীর জন্যে প্রশংসা লাভের প্রত্যাশা ইত্যাকার অপকর্মের সাথে আয়াতের বর্ণনার সামঞ্জস্যতা পরিদৃষ্ট হয়।

আর যদি দ্বিতীয় বর্ণনা সঠিক হয়, তাহলেও এ আয়াতটি প্রাসংগিক। এ সূরায় মোনাফেকদের বিবরণ রয়েছে এবং তার সাথে এ আয়াত সংযুক্ত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আয়াতটি

রসূল (স.)-এর আমলের এক শ্রেণীর মানুষের নমুনা পেশ করে। এ ধরণের মানুষ সকল যুগেকই পাওয়া যায়। একটি আকীদা ও আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করলে যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রয়োজন, এ ধরনের লোকেরা তা থেকে বঞ্চিত থাকে। এ কারণেই সে আদর্শের জন্যে সংগ্রাম থেকে তারা পিছিয়ে থাকে। যারা সংগ্রাম করে তারা যদি হেরে যায়, তাহলে এরা ধীরে ধীরে আবার মাথা তোলে এবং নিজেদের বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। আর তারা জয় লাভ করলে তারা এসে বড় বড় বুলি আওড়াতে থাকে যে, তারাও তাদের এই পরিকল্পনার সমর্থক ছিলো, এই বিজয়ে তাদেরও অবদান আছে এবং কিছু না করা সত্তেও তারা প্রশংসা কামনা করে।

কাপুরুষতা ও অসার বুলি আওড়ানোই এ ধরনের মানুষের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (স.)-কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাচ্ছেন যে, এই শ্রেণীর মানুষ আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে।

এই আযাবের হুমকি খোদ আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে দিচ্ছেন, যিনি আসমান ও যমিনের মালিক, সর্ব বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। সুতরাং তাদের নাজাতের আশা কোথায় এবং নাজাতের উপায়ই বা কী? একথাই বলা হচ্ছে নিম্নের আয়াতে,

'আল্লাহর জন্যেই আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব। আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান ও পরাক্রান্ত।'

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا
وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهٗ ۖ
وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ
لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا

রুকু ২০

১৯০. নিসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের (নিখুঁত) সৃষ্টি এবং দিবা রাত্রির আবর্তনের মধ্যে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ১৯১. (এই জ্ঞানবান লোক হচ্ছে তারা) যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের এই সৃষ্টি (নৈপুণ্য) সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে (এবং স্বতস্ফূর্তভাবে তারা বলে ওঠে), হে আমাদের মালিক, (সৃষ্টি জগত)-এর কোনো কিছুই তুমি অযথা বানিয়ে রাখোনি, তোমার সত্তা অনেক পবিত্র, অতএব তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে নিষ্কৃতি দাও। ১৯২. হে আমাদের মালিক, যাকেই তুমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমানিত করবে, (আর সেই অপমানের দিনে) যালেমদের জন্যে কোনোরকম সাহায্যকারীই থাকবে না। ১৯৩. হে আমাদের মালিক, আমরা শুনতে পেয়েছি একজন আহ্বানকারী (নবী মানুষদের) ঈমানের দিকে ডাকছে (সে বলছিলো, হে মানুষরা), তোমরা তোমাদের মালিক আল্লাহর ওপর ঈমান আনো, (হে মালিক, সেই আহ্বানকারীর কথায়) অতপর আমরা ঈমান এনেছি, হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও, (হিসাবের খাতা থেকে) আমাদের দোষত্রুটি ও গুনাহসমূহ মুছে দাও, (সর্বশেষে তোমার) নেক লোকদের সাথে তুমি আমাদের মৃত্যু দাও। ১৯৪. হে আমাদের মালিক, তুমি তোমার নবী রসূলদের মাধ্যমে যেসব (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছো তা আমাদের দান করো এবং কেয়ামতের দিন তুমি আমাদের অপমানিত করো

عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿١٩٤﴾

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّىْ لَآ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ

ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا

مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَأُكَفِّرَنَّ

عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ قف

ثُمَّ مَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

না; নিশ্চয়ই তুমি কখনো ওয়াদার বরখেলাপ করো না। ১৯৫. অতএব তাদের মালিক (এই বলে) তাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন যে, আমি নর-নারী নির্বিশেষে তোমাদের কোনো কাজ কখনো বিনষ্ট করবো না, (আমি সবার কাজের বিনিময়ই দেবো) এবং তোমরা তো একে অপরেরই অংশ, অতএব (তোমাদের মাঝে) যারা (নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে) হিজরত করেছে এবং য়ারা নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমারই পথে যারা নির্যাতিত হয়েছে, (সর্বোপরি) যারা (আমার জন্যে) লড়াই করেছে এবং (আমারই জন্যে) জীবন দিয়েছে, আমি তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো, অবশ্যই আমি এদের (এমন) জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বইতে থাকবে, এ হচ্ছে (তাদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পুরস্কার, আর উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহ তায়ালার কাছেই রয়েছে! ১৯৬. (হে মোহাম্মদ,) জনপদসমূহে যারা আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করেছে, তাদের (দাম্ভিক) পদচারণা যেন কোনোভাবেই তোমাকে বিভ্রান্ত করতে না পারে। ১৯৭. (কেননা এসব কিছু হচ্ছে) সামান্য (কয়দিনের) সামগ্রী মাত্র, অতপর তাদের (সবারই অনন্ত) নিবাস (হবে) জাহান্নাম; আর জাহান্নাম হচ্ছে নিকৃষ্টতম আবাসস্থল! ১৯৮. তবে যারা নিজেদের মালিককে ভয় করে চলে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে আছে (সুরম্য) উদ্যানমালা, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা অনাদিকাল থাকবে, এ হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে (তাদের জন্যে) আতিথেয়তা, আর আল্লাহ

نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٠﴾

তায়ালার কাছে যা (পুরস্কার সংরক্ষিত) আছে, তা অবশ্যই নেককার লোকদের জন্যে অতি উত্তম জিনিস! ১৯৯. (ইতিপূর্বে) আমি যাদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছি, সেসব কিতাবধারী লোকদের মাঝে এমন লোক অবশ্যই আছে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তোমাদের এই কেতাবের ওপর তারা (যেমনি) বিশ্বাস করে (তেমনি) তারা বিশ্বাস করে তাদের ওপর প্রেরিত কেতাবের ওপরও, এরা আল্লাহর জন্যে ভীত সন্ত্রস্ত ও বিনয়ী বান্দা, এরা আল্লাহর আয়াতকে (স্বার্থের বিনিময়ে) সামান্য মূল্যে বিক্রি করে না, এরাই হচ্ছে সেসব ব্যক্তি, যাদের জন্যে তাদের মালিকের কাছ থেকে অগাধ পুরস্কার রয়েছে, নিসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী। ২০০. হে মোমেনরা, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, (ধৈর্যের এ কাজে) একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, (শত্রুর মোকাবেলায়) সুদৃঢ় থেকো, একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করো, (এভাবেই) আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হতে পারবে!

তাফসীর
আয়াত ১৯০-২০০

এ হচ্ছে সূরা আলে ইমরানের শেষ আলোচনা। এখানে ইসলামী ধ্যান-ধারণার সে সব মৌলিক বিষয়গুলোকে এতো নতুন পদ্ধতিতে পেশ করা হয়েছে, যার বিস্তারিত বর্ণনা আমি ইতিপূর্বে পেশ করেছি। যাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা কেতাব নাযিল করেছেন সে সব আহলে কেতাব, দাওয়াতের বিভিন্ন স্তরের মোনাফেক ও মোশরেকদের আকীদা বিশ্বাসকে অসাড় প্রতিপন্ন করে এই ধ্যান-ধারণার সত্যতাকে উদ্ভাসিত করা হয়েছে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে জান ও মালের ওপর আসা কষ্টগুলোকে মোকাবেলা করে নিজেদের ওপর আরোপিত দায়িত্বসমূহ কিভাবে পালন করতে হবে একথা বর্ণনা করা হয়েছে। সুখ-দুঃখের কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং এই জীবনবিধানের জন্যে নিজেদের জান ও মাল কোরবান করে সামনে এগুতে হবে তাও এখানে বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলো ইতিপূর্বে এই তাফসীরের আগের দু'খন্ডে আমি বর্ণনা করেছি।

এরপর আসছে একটি গভীর সত্যের আলোচনা। আর তা হচ্ছে এই যে, এই সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে তার স্থানে নিজস্ব জায়গায় একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ। এর সব কিছুই ঈমানের প্রমাণাদি ও তার নিশানাসমূহ বহন করছে। এর সৃষ্টিরহস্যের পেছনে যে নিশ্চয়ই কোনো কুশলী হাত কাজ করছে তার প্রমাণও এই পুস্তক পেশ করছে। সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, এর পেছনে আরেকটি জগত আছে, যার নাম পরকাল। এ দুনিয়া নিতান্ত এক অস্থায়ী জায়গা মাত্র। তারপর সে আখেরাতের জগতে হিসাব কিতাব পেশ করা হবে এবং এর যথাযথ পুরস্কারও তখন দেয়া হবে। এই উন্মুক্ত গ্রন্থের কাছ থেকে দলীলপত্র সংগ্রহ করে তার বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করে যখন 'মানুষের মধ্য থেকে জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা' তা পড়ে এবং তার আভ্যন্তরীন রহস্যসমূহ অনুধাবন করে তখন তারা এই সমগ্র সৃষ্টি জগতের কাছ থেকে চোখ বন্ধ করে চলতে পারে না। বরং এর প্রতিটি পর্যায়েই তারা এর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে থাকে।

আর এ গভীর চিন্তাভাবনার পর তার সামনে এই সত্যও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, এই সৃষ্টিলোকের সাথে মানবীয় প্রকৃতির একটা গভীর সাদৃশ্য রয়েছে, এদের উভয়ের মাঝে একটা গভীর সম্পর্কও বিরাজমান রয়েছে। সৃষ্টিজগতের সব কিছু যেন এক এক করে সেই 'জ্ঞানের অধিকারী' ব্যক্তিটিকে সৃষ্টিকর্তাকেই দেখিয়ে দিতে থাকে। সেই সত্যটাকেও সে বলে দেয় যে, এর পরিচালনা কার হাতে এবং কোন্ কুশলী কোন্ উদ্দেশ্যে এর পরিচালনা করে চলছেন। এই মহান সৃষ্টিজগতের মাঝে মানুষের অবস্থান, তার সাথে সৃষ্টিলোকের সম্পর্ক, সর্বোপরি সৃষ্টিলোকের সাথে তার স্রষ্টার সম্পর্কও তাকে সুনিশ্চিত করে, যা এই সৃষ্টিরহস্যের অন্যতম উদ্দেশ্য বটে। এই একই কারণে এই 'সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি'রা আল্লাহর দিকে ধাবমান থাকে, তারা সৃষ্টিলোকের এই উন্মুক্ত গ্রন্থ নিয়ে ব্যাপক চিন্তা-গবেষণা করে, আল্লাহর আয়াতের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার কাজে ব্রতী হয়, বিশ্ব চরাচরে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণাদির ভিত্তিতে নিজ কর্মতৎপরতায় এগিয়ে আসে, সর্বোপরি এর বিরোধী সব কিছুকে নির্মূল করে দেয়ার জন্যে সে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ঈমানের পথে সব ধরনের কষ্ট স্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত হয় না এবং ঈমানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে দুনিয়ার ওপর হামেশাই আখেরাতের প্রাধান্য দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। পরিশেষে ইসলামী জামায়াতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর পথে এ সংগ্রামী দলে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখতে চান, যথাযথ অর্জনের ওপরই এ দলের সদস্যদের মুক্তি ও নাজাত নির্ভর করে।

জ্ঞানীরাই সৃষ্টির মাঝে তার স্রষ্টাকে খুঁজে পায়

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ....।

এই আয়াতটি দিয়ে সূরাটিকে শেষ করার মাধ্যমে এই আয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে গোটা সূরাটির কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের একাত্মতা সাধিত হয়ে গেলো।

আসমান-যমীনের সৃষ্টির মাঝে ও রাত-দিনের ক্রমবির্তনের মাঝে এমন কি কি নিদর্শনরাজি রয়েছে যার মধ্য দিয়ে 'জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা' চিন্তাভাবনা করছেন, সে সব নিদর্শনগুলো কী, যা দেখে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি তার স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং এক পর্যায়ে তারা দাঁড়িয়ে-বসে-শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকেই স্মরণ করতে থাকে। পরে তাদের এই গভীর চিন্তাভাবনা তাদের কিভাবে একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর ভীতিতে কাতর হয়ে তার দরবারে দোয়ার হাত উঠাতে উদ্বুদ্ধ করে, যেখানে সে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে বলে ওঠে,

'হে আমাদের মালিক, এই মহান সৃষ্টিরাজির কিছুই তুমি অর্থহীন করে সৃষ্টি করোনি, তুমি অনেক পবিত্র। তুমি শেষ আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।'

উপরোল্লেখিত এ বক্তব্যের মাঝে একথাটা বোঝা গেলো যে, একজন সুস্থমস্তিষ্কের ব্যক্তি কিভাবে প্রাকৃতিক সৃষ্টিরহস্যের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলে, সৃষ্টিজগতের সৌন্দর্যমন্ডিত হাজার রকমের সৃষ্টিরহস্য থেকে এর স্রষ্টাকে ও তাঁরই একমাত্র স্রষ্টা হওয়ার এই মূল সত্যটাকে বের করে আনে। যতোই এই মহান সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে সে ভাবে, ততোই তার মনে এই অনুভূতি মযবুত হতে থাকে যে, এই বিশাল সৃষ্টির কোনোটাই উদ্দেশ্যবিহীন নয়, এই গোটা সৃষ্টিলোককে তার স্রষ্টা কখনো নিরর্থক করে পয়দা করেননি।

কোরআন মানুষের অন্তর ও তার দৃষ্টিশক্তিকে সম্বোধন করে, তাকে বারবার এই সৃষ্টজগত সম্পর্কে ভাবতে বলে, সুস্থ ও সুষ্ঠ মানবীয় মনকে সে আহ্বান জানায়– চিন্তার দিকে অনুশীলনের দিকে। উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে সে বলে, তুমি এসো, তাকিয়ে দেখো আসমান-যমীনের উন্মুক্ত গ্রন্থের দিকে, তাকিয়ে দেখো এর সৃষ্টি-কৌশলের দিকে। কোরআনের এই আহ্বানের ফলে সুস্থ চিন্তাধারার মানুষ সৃষ্টিজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন উপকরণ ও প্রমাণাদি থেকে মূল সত্যকে বের করে আনতে চেষ্টা করে। তার দৃষ্টি মেলে ধরে সে এই উন্মুক্ত গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় এবং সৃষ্টির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা এসব প্রমাণাদি থেকে সে মূল সত্য পর্যন্ত পৌঁছুতে চেষ্টা করে এবং সে সত্য হচ্ছে এই যে, এ সমগ্র সৃষ্টিজগতের পেছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিহিত আছে এবং অবশ্যই এর একজন স্রষ্টা আছেন এবং এই ভাবনার মাঝেই তার অন্তর ও তার প্রতিটি অনুভূতির সাথে সৃষ্টিজগতের একটা গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। সে তখন এই সৃষ্টি-কৌশলের স্রষ্টাকে ওঠা-বসা-শোয়া এ সব অবস্থায় স্মরণ করতে থাকে। তার চোখ খুলে যায়, তার অন্তর জেগে ওঠে। এক এক করে সে মৌলিক সত্যের কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম হয় এবং এভাবে তার অন্তর ও সৃষ্টিজগতের মাঝে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়।

যদি আমরা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে বিবেচনা করি, বিবেকবোধকে জাগ্রত করি, তাহলে আমরা এই সৃষ্টিলোকে এমন এক সামঞ্জস্য বিরাজমান দেখতে পাই যে, তা অবলোকন করে আমাদের মনই বলে ওঠে যে, এই সামঞ্জস্য ও সুষম সম্পর্ক বিন্যাস করার একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। তখন এমন একটি ব্যবস্থাপনা আমাদের চোখের সামনে এসে হাযির হয়, যা দেখে মনে হয় একে নিসন্দেহে কোনো কুশলী নিপুন জ্ঞানকৌশল দিয়ে পরিচালনা করে যাচ্ছেন। আমরা আরো দেখতে পাই যে, এই সৃষ্টির ব্যবস্থাপনায় এমন কতোগুলো বিধান কার্যকর রয়েছে, যা কখনো পরিবর্তন হয় না। এসব যতোই আমরা পর্যালোচনা করবো ততোই আমাদের অচেতন মন বলে উঠবে যে, এই সমগ্র ব্যবস্থাপনা কিছুই অর্থহীন নয়। এগুলো কোনো উদ্দেশ্যহীন পরিকল্পনার অংশও নয়। সৃষ্টিজগত সম্পর্কে আমাদের এই প্রতিক্রিয়া কখনো বিজ্ঞানের কথিত এই ধরনের বক্তব্যের ফলে বিঘ্নিত হয়নি যে, সূর্যের সামনে পৃথিবীর এক একবার প্রদক্ষিণের ফলেই রাত-দিনের সৃষ্টি ও সমাপ্তি ঘটে এবং আসমান-যমীনের আরো সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য এই কারণেই বিরাজমান যে, এদের একের সাথে অপরের রয়েছে এক ধরনের আকর্ষণশক্তি, যার কারণে এগুলো এভাবে স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানের উপস্থাপিত এই প্রস্তাবনা ঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। কিন্তু এ উভয় অবস্থায়ই গ্রহ-নক্ষত্রের মহাকাশে ঘুরে বেড়ানোর মাঝে কোনো রকম তারতম্য সৃষ্টি হচ্ছে না, যার মাধ্যমে একটি ব্যাপক ও নির্ভুল বিধি-বিধান তার সমগ্র সৃষ্টিমালাকে এক কঠোর বাঁধনে ধরে রেখেছে।

মূলত আসমান-যমীনের সৃষ্টি, রাত ও দিনের বিবর্তনসহ এই প্রাকৃতিক বিধি-বিধান ও এর সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম-নীতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা, তাঁর শক্তি-সামর্থ তাঁর একত্ববাদেরই প্রমাণ বহন করছে। কোরআনের বর্ণনাধারা আমাদের সামনে একথা পেশ করছে যে, সৃষ্টিজগতের এই দৃশ্যাবলী যখন কেউ পর্যবেক্ষণ করে, তখন তার মধ্যে কি ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিশেষ করে দিন-রাতের বিবর্তনের ফলে একজন 'জ্ঞানের অধিকারী' ব্যক্তির মন কিভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সৃষ্টি জগতের এই উন্মুক্ত গ্রন্থ তাকে এর স্রষ্টা পর্যন্ত পৌঁছে দেয় এবং এভাবেই একজন মোমেনের সাথে-সৃষ্টি জগত ও তার স্রষ্টার সাথে একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অতপর অনুসন্ধিৎসু ও জ্ঞান মন এই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ধাবিত হয়ে পড়ে এবং তার মন উঠতে-বসতে আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। একবার যখন সে এই আসমান-যমীন ও তার সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মন এই সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহর এবাদাতের দিকেও ঝুঁকে পড়ে।

জ্ঞান যেমন কল্যাণ বয়ে আনে তেমন চরম ধ্বংসও ডেকে আনে

এই সমগ্র আলোচনার ফলে দু'টো সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথম সত্যটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর সৃষ্টি, এই সৃষ্টির উন্মুক্ত গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো কর্মতৎপর আল্লাহর নিদর্শনসমূহ, সমগ্র বিশ্ব চরাচরে মওজুদ যাবতীয় উপায়-উপকরণ মানুষকে আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত করে। যদি বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান, সৃষ্টিলোকের সব শক্তি-সামর্থ এবং যাবতীয় রহস্যকে একবার এর একক স্রষ্টা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া যায়, তাহলে সৃষ্টিলোক সম্পর্কিত এই 'গবেষণাই' আল্লাহর এবাদাতে পরিণত হয়ে যায় এবং গোটা জীবন আস্তে আস্তে এই এবাদাতের দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়।

অপরদিকে এই সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের পর্যালোচনা ও তার ওপর গবেষণাকে যদি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের ওপর দাঁড় করানো হয় তাহলে তা শুধু মানুষকে আল্লাহর একক ক্ষমতার দিকে ধাবিত করতে বাধা প্রদান করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং মানুষের সাথে প্রকৃতির অকৃত্রিম বন্ধনকেও তা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমতাবস্থায় জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার যা মানুষের জন্যে ছিলো আল্লাহর এক অনুপম দান, তাই হয়ে পড়ে মানুষের ওপর এক মারাত্মক অভিশাপ। এই অভিশাপ ধীরে ধীরে তাকে অজ্ঞানতার এক নিকষ আঁধারে নিক্ষেপ করে এবং পরিণামে সে বিদ্রোহী শয়তানে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় সত্যটি হচ্ছে এই সৃষ্টিজগতে মওজুদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখে যারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে, তাদের হৃদয়েই কথাগুলো প্রভাব বিস্তার করে বেশী, আর একবার তার হৃদয়কে এগুলো প্রভাবিত করার পর সে অনুগত বান্দা উঠতে-বসতে সব সময়ই আল্লাহর স্মরণে মত্ত থাকে এবং তার সর্ম্পক স্থাপিত হয়ে যায় আল্লাহর সাথে, যার প্রভাব সৃষ্টিলোকের সর্বত্রই বিরাজমান এবং যার মধ্যে বিশ্বের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত থাকে।

অপরদিকে যারা এর বিপরীত দুনিয়ার বস্তুবাদী উপায়-উপকরণকেই বেশী গুরুত্ব দেয় এবং এর ওপরই বেশী ব্যস্ত থাকে, তারা মূল স্রষ্টা আল্লাহকে বাদ দিয়েই সৃষ্টিসংক্রান্ত সত্যে উপনীত হতে চায়। এতে করে তারা পৃথিবীর ধ্বংস ও বরবাদই বয়ে আনে। শুধু তাই নয়, তারা মানবীয় জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে এবং এভাবেই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর আযাবে পরিবেষ্টিত করে নেয়।

কোরআনের পরিভাষায়-'জ্ঞানের অধিকারী' ব্যক্তিদের সামনে এ দু'টো বিপরীতমুখী পন্থাই খুলে ধরা হয়েছে।

এ হচ্ছে এমন এক পর্যায় যেখানে অন্তরের বিশুদ্ধিকরণের সাথে অন্তরের পরিতৃপ্তিও রয়েছে। সত্যকে অনুসরণের পাশাপাশি এতে এই প্রেরণাও রয়েছে। একদিকে যেমন এতে রয়েছে প্রতিক্রিয়া ও অপরদিকে রয়েছে এর ওপর টিকে থাকার প্রতিশ্রুতি। যখন আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক জোড়ার ব্যাপারে অন্তরের মাঝে সৃষ্টি রহস্যের যাবতীয় সত্য উদ্ভাসিত হয়ে যায়, তখন আসমান-যমীন, এর মাঝের সকল সৃষ্টির মাঝ দিয়ে তার জীবন সরাসরি এ সত্যে উপনীত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা এই বিশাল সৃষ্টিজগতকে নিরর্থক করে পয়দা করেননি।

মালিকের দরবারে একজন সত্যিকার জ্ঞানীর আকুতি

'হে আমদের মালিক, তুমি এই সৃষ্টিকে অযথা বানিয়ে রাখোনি।'

এই সৃষ্টিজগতের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ– হে মালিক, তুমি বিনা প্রয়োজনে তৈরী করোনি, বরং তুমি একে সৃষ্টি করেছো এক মহান 'সত্যের জন্যে' এবং তা সে সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। এর চারিদিকে সেই সত্যই একমাত্র চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে। এর যাবতীয় নিয়ম-নীতিও সেই সত্যের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। এর সমগ্র অস্তিত্বই হচ্ছে এক 'খাটি সত্য'। এটা কোনো নিছক বিলুপ্তি কিংবা অনুপস্থিত কিছু নয়, যেমনটি ধারণা করে কিছু স্থূলবুদ্ধির বস্তুবাদী দার্শনিকরা। এমনও নয় যে, এই সৃষ্টিজগত দৈবক্রমে অস্তিত্ব লাভ করেছে; বরং সত্য কথা হচ্ছে, এর অস্তিত্ব, এর স্থিতি, এর প্রতিটি তৎপরতা, এর প্রতিটি লক্ষ্যের সাথে রয়েছে 'সত্যে'র অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এর কোথাও বাতিলের কোনো রকম সংমিশ্রণ নেই।

এ হচ্ছে সেই প্রাথমিক স্তর, যেখানে আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও রাত-দিনের বিবর্তনের রহস্য নিয়ে ভেবে মাঝে জ্ঞানী ব্যক্তিরা সময় অতিবাহিত করে। এরপর দ্বিতীয় স্তরে তার মনে আল্লাহর ভীতি সঞ্চারিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তখন সে বলে ওঠে,

'হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের জাহান্নামের কঠিন আগুন থেকে বাঁচাও, হে আমাদের মালিক, তুমি যাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করেছো, তাকে তুমি অপমানিত করেছো আর যালেমদের জন্যে কোনোই সাহায্যকারী নেই।'

এই আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও রাত-দিনের বিবর্তনের বিষয়টির সত্যতার সাথে মোমেন হৃদয়ের আকুতি-জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি চাওয়ার সম্পর্ক কতোটুকু– তা একটু ভেবে দেখা দরকার। মূলত এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি-কৌশল ও তার মাঝে যে সব প্রমাণাদি লুকায়িত আছে, তার ব্যাপারে 'জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিদের' ধারণা হচ্ছে, এর একটি সুনির্দিষ্ট রহস্য আছে, আছে তার পেছনে প্রতিনিয়ত এক কর্মতৎপর হাতের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ। তার পেছনে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। মানবীয় জীবন সম্পূর্ণ ইনসাফ ও ন্যায়-বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মানবীয় জীবনে মানুষ ন্যায় পরায়ন হয়ে কিংবা অন্যায়ের বশবর্তী হয়ে যতো কিছুই কাজ করবে, তার জন্যে শেষ বিচারের দিন তাকে জবাব দিতে হবে। এটা হচ্ছে একটি অপরিহার্য পরিণাম। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিই এর সপক্ষে সাক্ষ্য দান করে। মানুষের সুষ্ঠ জ্ঞানবুদ্ধিও একে সমর্থন করে। তাই এই 'হক' ও ইনসাফের স্বাভাবিক দাবীর ফলেই জ্ঞানী ব্যাক্তির অন্তর জাহান্নামের আগুনের ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং এই পর্যায়ে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবতে থাকে– এমন তো হবে না যে, তার কাজকর্মের বিনিময়ে তাকে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। তাই তার

মুখে ভীতির সাথে এই দোয়া বেরিয়ে আসে, যার মধ্যে একজন ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষের আকুতি যেমনিভাবে থাকে, তেমনিভাবে এতে আশার আলোও থাকে। এর মধ্যে যেমন সূরের ঝংকার থাকে, তেমনিভাবে একটি ভীত হৃদয়ের কম্পমান অবস্থাও। এতে প্রাথমিকভাবে অপমানজনক অবস্থার আশংকা থাকে– শেষ বিচারের দিন নিযুত কোটি মানুষের সামনে লজ্জা ও অপমান জাহান্নামের আযাব সইতে হবে না তো! বিশেষ করে যখন সেদিন তাকে সাহায্য করার মতো কেউ থাকবে না।

এরপর তার মুখে আরো দীর্ঘ দোয়া আসে,

· 'হে আমাদের মালিক, আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, যে ডাকছে যে, তোমরা ঈমান আনো। ডাক শুনে সাথে সাথেই আমরা ঈমান এনেছি ....।

এই হচ্ছে কতিপয় উন্মুক্ত ও খোলা মনের ফরিয়াদ। এই মনের অধিকারী 'জ্ঞানী লোকেরা' যখনই বিশ্ব চরাচরের এই মৌলিক সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারে যে, এ সৃষ্টিলোকের একজন স্রষ্টা রয়েছেন, এর কোনো কিছুই নিরর্থক করে বিনা উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়নি, তখন তার মনে এক প্রচন্ড অনুভূতি জেগে ওঠে, সাথে সাথে সে নিজের মালিকের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

নিজের ভুলক্রটি ও গুনাহখাতার কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে আকুতি করে, নিজের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে দোয়া করে, বার বার প্রার্থনা জানায়,

হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের দোষক্রটি ও গুণাহসমূহ মুছে দাও এবং সবশেষে নেক বান্দাদের সাথে আমাদের মৃত্যু দাও।

দোয়ার এই দিকটি এখানে এসে গোটা সূরার কেন্দ্রীয় লক্ষ্যের সথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই সূরার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিচ্ছন্নকরণ ও আল্লাহর কাছে গুনাহখাতার ক্ষমা প্রার্থনা করা। এটা বিশেষ করে সেই যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে মানুষের 'নফসের' আনুগত্য করতে গিয়ে কিছু গুনাহ, কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়। তাই এখানে সেজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার বিষয়টি বলা হয়েছে। যারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারা যেন নিজেদের কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয় এবং এটা জেনে নেয় যে, যাবতীয় সফলতা, আল্লাহ তায়ালা ও মোমেনের দুশমনের মোকাবেলায় সাফল্য লাভ করা সর্বত্র ও সর্বকালে আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার ওপরই নির্ভরশীল, গোটা সূরায় যেন সেই একই কথা ধ্বনিত হচ্ছে।

এরপর দোয়ার শেষাংশে এসে কিছুটা প্রত্যাশা, কিছুটা চাওয়া, আল্লাহর কাছ থেকে কিছুটা পাওয়া, প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সাহায্য চাওয়া ও তাঁর ওপরই ভরসা রাখার কথা বলা হয়েছে।

'হে আমাদের মালিক, তুমি আমাদের দান করো....।

এখানে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, যুগে যুগে নবী-রসূলরা তোমার যে প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে পৌঁছে আসছিলো, তা তুমি আমাদেরকে দান করো। কেননা তোমার তো কোনো প্রতিশ্রুতিই ভংগ হয় না। শেষ বিচারের দিন তুমি আমাদের অপমানের হাত থেকে বাঁচাও। দোয়ার এই শেষের দিক থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, 'জ্ঞানী ব্যক্তির' হৃদয়ে আল্লাহর ভয় কি পরিমাণ থাকে। দোয়ায় বারবার আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর কাছে প্রার্থনা জানানোর মাধ্যমে তা আরো বিদ্যমান আকার ধারণ করে। এটাও জানা যায়, তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয়ের অনুভূতি কতো প্রখর! তাদের অন্তর কতো পরিষ্কার!

সামগ্রিকভাবে এটি হচ্ছে সৃষ্টিজগতের কাছ থেকে পাওয়া সত্যসমূহের গভীর ও সঠিকতম জবাব। সৃষ্টিজগতের এই আহ্বান কিভাবে একজন 'জ্ঞানী ব্যক্তির' মনের দুয়ারে উন্মুক্ত গ্রন্থের আকারে এসে হাযির হয় তাও এর মাধ্যমে জানা যায়। এই দোয়ার ব্যাপারে একটি কথা অবশ্যই বলে দেয়া প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে এর ভাষা ও শিল্পগত সৌন্দর্য!

কোরআনের প্রতিটি সূরার কিছু সংখ্যক আয়াতে একটি বিশেষ ধরনের ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোরআনে ব্যবহৃত এ বিশেষ ছন্দ, কবিতার ছন্দের ন্যায় শুধু অক্ষরের মিলের ওপর স্থাপন করা হয়নি, বরং একে বসানো হয়েছে সুর ও স্বরের ঝংকারের সামঞ্জস্যের ওপর, যেমন কোরআনের কতিপয় শব্দ।'

ক) বাসীর, হাকীম, মুবীন এবং মুজীব

খ) আলবাব, আবসার, আন্নার, ক্বারার

গ) খাফিয়্যান, শাফিয়ান, শাবকিয়্যান, শাইয়ান।(২৬)

এর প্রথম পর্যায়ের ছন্দগুলো এসেছে কোনো কিছুর বর্ণনা দেয়ার জন্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের ছন্দগুলো এসেছে দোয়ার ভাষা ব্যবহারের জন্যে। আবার তৃতীয় পর্যায়ের ছন্দগুলো পেশ করা হয়েছে ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যে।

সূরা আলে ইমরানের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম পর্যায়ের ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাত্র দুটো জায়গায় এ ছন্দ ব্যবহারে ব্যতিক্রম আছে এবং তার উভয়টাই হচ্ছে 'দোয়া সম্পর্কিত' বিষয়। একটি পেশ করা হয়েছে সূরার প্রথম দিকে, দ্বিতীয়টি সূরার এই শেষের দিকে। এটা সত্যিই কোরআন করীমের এক অবিস্মরণীয় ভাষা ও ছন্দের সামঞ্জস্য। এর আওয়ায, এর সুরের মধুরতা এর হাতছানি এতোই আকর্ষণীয় যে, মানুষকে এই সুরেলা দোয়া আল্লাহর দিকে সহজেই নিবিষ্ট করে দেয়।

এর পাশাপাশি আরো একটি জিনিস এখানে লক্ষণীয় এবং তা এই যে, আসমান-যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কিত প্রভাব বিস্তারকারী এই আলোচনা স্বভাবত দাবী করে যে, তার প্রসংগে আসা দোয়ার ভাষায়ও ছন্দে ভীতি ও সন্ত্রস্ততা থাকবে, তাতে সুর, বিভিন্ন ধরনের সুরের লয় ও সুরের সম্মোহনী ঝংকার থাকবে। একমাত্র এই উপায়েই এই দোয়া মানুষের অনুভূতি ও তার শ্রবণশক্তির ওপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং যে কোনো ব্যক্তিই এই সম্মোহনী সুরের ঝংকার শুনে নেহায়াত বিনয় ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে নত হয়ে আকুতি জানাতে থাকবে। এই কারণেই এই দৃশ্যের বর্ণনার ভাষা একটু দীর্ঘ আকারে পেশ করা হয়েছে। সুরের লয়ও একটু বেশী, যাতে করে কোরআনের শিল্পগত সৌন্দর্য পরিষ্কার হয়ে ভেসে ওঠে এবং এই বাক্যসমূহ শোনার সাথে সাথে দেহ, মন ও শ্রবণশক্তির ওপর তা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন

এবার মোমেনদের দোয়ার প্রতি-উত্তর আসছে,

অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের দোয়া কবুল করলেন।

(২৬) এ আলোচনায় আরবী শব্দের বাহ্যিক আকার ও এর সুরটাই প্রধান বিবেচ্য হওয়ার এর অর্থ এখানে পেশ করা হয়নি।

এটি হচ্ছে বিস্তারিত একটি জবাব, কোরআনের সুবিন্যস্ত লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যার একটি শিল্পগত বৈশিষ্ট্য, যা পারিপার্শ্বিকতা, মনস্তাত্ত্বিক ও অনুভূতির চাহিদার সাথে একান্তভাবে সামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া আল্লাহর সিদ্ধান্ত তার বৈশিষ্টের সাথেও এই জবাব গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

এরা হচ্ছে 'জ্ঞানের অনুসারী ব্যক্তি'। এরা আসমান-যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করে, রাত-দিনের বিবর্তনের মাঝে চিন্তা-গবেষণা করে। এভাবেই সৃষ্টিলোকের এই উম্মুক্ত গ্রন্থের সাথে তার নিত্যদিনের সাক্ষাৎকার ঘটে। পরে এক পর্যায়ে তাদের প্রকৃতিই আল্লাহর কাছে দোয়া চায়, আল্লাহ তায়ালাও তাদের এই দোয়ার প্রতি উত্তর দেন। কি বলেন আল্লাহ তায়ালা এই সময়?

অতপর তাদের মালিক তাদের ডাকে সাড়া দিলেন। ....'

এটা শুধু আল্লাহর ভয় বিনয় ও তাঁর সমীপে গুনাহখাতা ক্ষমা চাওয়ার নামই নয়, এটা শুধু পরকালের অপমান থেকে নিস্তার পাওয়ার নামই নয়, বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 'হাঁ' বোধক জবাব, যা এ বিশ্ব চরাচরের গৃহীত অনুভূতির মধ্যেই নিহিত ছিলো। এটা হচ্ছে সে ধরনের 'আমল', ইসলামের পরিভাষায় যার নাম হচ্ছে এবাদাত। বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণাই হচ্ছে এই এবাদাত এবং এই সৃষ্টিলোকের মালিকের স্মরণ করা ও তাঁর কাছে ভুল-ক্রটির ক্ষমা-প্রার্থনা করা, আশার হাত নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকাই হচ্ছে এবাদাত।

আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি মানুষের-সে পুরুষ হোক কিংবা নারী, তার বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে তার 'আমল' গ্রহণ করেন এবং দুনিয়ায় প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর কাছে একই সমান। সেখানে বংশ-গোত্র নারী-পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই।

এরপর আসে 'আমল' সংক্রান্ত বিবরণ। একথা এখানে পরিষ্কার করে বলা হয় যে, ইসলামের এই আকীদা-বিশ্বাস জান-মালের ওপর কি কি দায়িত্ব আরোপ করে এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্যে ইসলাম কোন ধরনের 'প্রকৃতি' ধারণ করতে বলে এবং এসব কাজ বাস্তবায়িত করতে গেলে একজন ব্যক্তিকে কি কি ধরনের সমস্যা ও বিপদ মুসীবতের সম্মুখীন হতে হয়, সর্বোপরি এ পথের চলার জন্যে কি ধরনের কোরবানী ও ত্যাগ স্বীকারের জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়– তারও বিবরণ এখানে পেশ করা হয়েছে। এই সত্য কথাগুলোকে এভাবে বলা হয়েছে,

'যারা আমার জন্যে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে হিজরত করে ....'

যে চিত্র এখানে আঁকা হয়েছে, এটা হচ্ছে দাওয়াতের প্রথম দিককার ব্যক্তিদের যাদের উদ্দেশ্য করে এটা বলা হয়েছে। এই পুণ্যবান মানুষগুলো আল্লাহর জন্যেই মক্কার বাড়িঘর ছেড়ে হিজরত করলেন, অনেক অত্যাচার সইলেন। আল্লাহর জন্যে যুদ্ধ করে নিজেরা শহীদ হলেন।

যদিও এ আয়াতে কথাগুলো তাদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতের সম্বোধন সর্বকালের সর্বস্তরের মানুষের জন্যে যারা সমকালিন জাহেলিয়াতকে নির্মূল করে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করার জন্যে ময়দানে এসে হাযির হয়েছে, যারা প্রচলিত জাহেলী ব্যবস্থার অধীনে বহুতরো নির্যাতন ও যুলুম সহ্য করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নেন। তারপর স্বাভাবিকভাবেই সেই আন্দোলন হাজারো ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে এক সময় দুশনদের মোকাবেলায় সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরে আসে যুদ্ধ-বিগ্রহের পালা। সেখানেও তারা হয় বিজয়ী, না হয় শহীদ। এই সময়ের কষ্ট, যুলুম ও চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দোষ-ক্রটি পরিষ্কার করে তাদের 'খাটি' মানুষে পরিণত করা হয়। তাদের গুনাহ খাতা মুছে দেয়া হয়। তাদের 'আমল নামায়' তখন বহু নেকী লেখা হতে থাকে।

এই হচ্ছে আল্লাহর খাটি মোমেন রূপে প্রবর্তিত নিজস্ব পদ্ধতি। মানুষ একে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে একাধারে চেষ্টা সাধনা করবে, এই চেষ্টার মাধ্যমে মোমেনরা আল্লাহর ইপ্সিত কল্যাণ লাভ করতে পারে, আল্লাহর সন্তুষ্টিও তখন তারা অর্জন করতে পারে। এটা হচ্ছে মোমেনদের তৈরী করার এক পদ্ধতি। সৃষ্টিসম্পর্কিত চিন্তা ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের এক বাস্তব পরীক্ষাগার। তাকে মোমেনরা জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

বৈষয়িক প্রাচুর্যের ব্যাপারে মোমেনের দৃষ্টিভংগী

অতপর আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডাবাহী এই দলটিকে সে সব প্রাচুর্য সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে, যা আল্লাহ তায়ালা এ দুনিয়ার বুকে কাফের ও অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের জন্যে ফাঁদস্বরূপ বিছিয়ে রেখেছেন, মোমেনরা এগুলোর গুরুত্ব ততোটুকুই দেবে যতোটুকু দেয়ার দরকার, যাতে করে কোনো অবস্থায়ই এই প্রাচুর্য মোমেনদের বিভ্রান্তিতে ফেলতে না পারে। যেন এসব জৌলুস ও প্রাচুর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে জীবনের আসল উদ্দেশ্যই সে ভুলে না বসে।

'হে নবী, কাফেরদের নগরে বন্দরে ....।'

মোমেনরা নানা ধরনের কষ্ট ও মুসীবত স্বীকার করে, আল্লাহর পথে জেহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করে দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। অপরদিকে এ সত্যবিরোধী বৈষয়িক স্বার্থের অধিকারী লোকগুলো দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আছে। তাদের এই বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্য দেখে দুর্বল ঈমানের অধিকারী সাধারণ মুসলমানরাও প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে। কারণ, তারা একদিকে দেখতে পাচ্ছে, সত্য পথের অনুসারীরা সর্বদা এখানে কষ্টই ভোগ করছে, নানা ধরনের অর্থনৈতিক যন্ত্রণা ও সামাজিক যুলুমই তারা ভোগ করছে। অপরদিকে যারা দুনিয়ায় মিথ্যের বেসাতি করছে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের হেদায়াতের সাথে তামাশা করে চলেছে, তাদের আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্যের সীমা নেই। এসব দেখে সমাজের সাধারণ মুসলমানরা অনেকটা বিভ্রান্ত ও কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যেতে পারে। কথাটাকে এভাবে এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

'হে নবী! কাফেরদের এই দেশে ঘুরে বেড়ানো যেন কোনোভাবেই বিভ্রান্ত না করে।'

এই সামান্য ও হীন বৈষয়িক দুনিয়ার এতোটুকু মাল সম্পদ– এর সবই হচ্ছে অস্থায়ী ও ঠুনকো। বিশেষ করে যার পরিণাম হবে জাহান্নামের কঠোর আযাব। পক্ষান্তরে মোমেনদের জন্যে রয়েছে এক স্থায়ী ও অমোঘ কল্যাণ, বেহেশতের স্থায়ী বাগিচাসমূহ যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে যারা যাবে তারা প্রত্যেকেই সেখানে অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে, যার কোনো শেষ নেই। উপরন্তু তারা সেখানে আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে পাওয়া প্রচুর সম্মানে ভূষিত হবে। এটা জানা কথাই এ অবস্থায় কোনো জ্ঞানী লোকেরই এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, এই অস্থায়ী ও ঠুনকো সম্পদের বিনিময়ে পাওয়া এই মহান নেয়ামতসমূহ নেককার ও পরহেযগার লোকদের জন্যে অনেক উত্তম। দুনিয়ার কোনো পরিচ্ছন্ন জ্ঞানের অধিকারী মানুষেরই এ ব্যাপারে দ্বিধা থাকার কথা নয়, মহান ও স্থায়ী নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়জনদের জন্যে রেখেছেন, তা কতো মূল্যবান এবং তা পাওয়ার চেষ্টা করতে পারাটা তাদের জন্যে কতো বেশী জরুরী।

এই গোটা পরিচ্ছেদটাই হচ্ছে শুদ্ধিকরণ কর্মসূচীর অন্তর্গত– মোমেনদের জন্যে ট্রেনিং এর পর্যায়। তাই এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের কথা বলা হয়নি, দুনিয়ার বুকে কাফেরদের

মোকাবেলায় তাদের বিজয়ের সুখবরও দেয়া হয়নি। এখানে শুধু বলা হয়েছে এমন পুরস্কার ও শান্তির কথা, যা শুধু পরকালের সাথেই সম্পৃক্ত। এটা এ কারণেই বলা হয়েছে যেন মোমেনদের দৃষ্টি একমাত্র পরকালের ওপরই নিবিষ্ট হতে পারে এবং তাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা যেন আখেরাতকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহের সাথে লড়াই করবে, দুনিয়ার কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়।

মোমেনদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে পরকালের ওপর। তাদের জেহাদ-সংগ্রামে আর দ্বিতীয় কোনো বিষয়ই প্রাধান্য পাবে না। এমনকি যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় লাভ করার প্রতিও তাদের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে যদি বিজয় আসেই তবে তা হবে মোমেনের অতিরিক্ত পাওনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সে বিজয় কিন্তু কোনো দিনই আল্লাহর সাথে সম্পাদিত মূল চুক্তিনামায় শামিল বলে মনে করা যাবে না।

আল্লাহর সাথে সম্পাদিত আসল চুক্তির শর্ত একটাই এবং তা হলো মোমেন এই দুনিয়ায় তার কার্যাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শুধু তাঁরই সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা করবে।

রসূলে আকরাম (স.)-এর মক্কার জীবনে তাঁর প্রথম সময়ের সংগ্রামী সাথীদের সাথে আল্লাহর এই ছিলো চুক্তি। সেই সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের তাঁর সাহায্য ও বিজয় কিংবা নেতৃত্বের আসন– কোনোটারই প্রতিশ্রুতি দেননি। তাদের তখন বলা হয়েছিলো, শুধু আল্লাহর দ্বীনের জন্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টির খাতিরেই তারা লড়বে। এটাই ছিলো আল্লাহর সাথে মোমেনদের চুক্তিনামার একক এবং একমাত্র শর্ত।

এ হাদীসটির বর্ণনাকারী মোহাম্মদ ইবনে কাব সহ অন্যরা বলছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বর্ণনা করেছেন বাইয়াতে আকাবার সময় আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা রসূলের হাতে বাইয়াত করছিলো, তখন আমি আল্লাহর রসূলকে বললাম– আপনি আপনার মালিকের পক্ষ থেকে ও আপনার পক্ষ থেকে চুক্তিনামায় শামিল করার জন্যে যে কোনো শর্তই চান যোগ করতে পারেন। তখন তিনি বললেন, আমার মালিকের পক্ষ থেকে শর্ত হচ্ছে তোমরা তাঁর এবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আমার পক্ষ থেকে শর্ত হচ্ছে, তোমরা তোমাদের নিজেদের জান ও মালকে যেসব অনিষ্ঠ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করো, আমাকেও সেসব থেকে রক্ষা করতে তোমরা সব সময় বদ্ধপরিকর থাকবে। আমি রসূলকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা এই চুক্তি মেনে নিলে এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো। তখন তিনি বললেন-'জান্নাত'। একথা শুনে আমাদের সাথীরা সবাই বললো, আমাদের এই ব্যবসাটা খুবই লাভজনক হয়েছে। আমরা সম্পাদিত এই চুক্তিতে কোনো রকম বেশ কম করবো না।

এই হাদীসে তিনি শুধু জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, কোনো রকম মর্যাদা, সম্মান কিংবা নেতৃত্বের কথা বলেননি। জীবনযাত্রার সব কিছুর সহজলভ্যতা, মাল দৌলতের সমারোহ ইত্যাদির ওয়াদাও তাদের সাথে করা হয়নি। এই সমস্ত জিনিসগুলোকে কোনো সময়েই চুক্তিনামায় শামিল করা হয়নি এবং এ ভাবেই মোমেনরা এ চুক্তির শর্ত মেনে নিয়েছে এবং তারা এই ওয়াদার শর্ত মেনে চলেছে এবং রসূলের সাথে সম্পাদিত চুক্তিনামাকে সত্য প্রমাণ করেছে।

এই ভাবেই ইসলামী দলের হাতে দুনিয়ার নেতৃত্বের চাবিকাঠি ও অন্যান্য দায়িত্বের বোঝা সোপর্দ করার আগে আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে চুক্তি করে নিয়েছেন যে, তারা সব ধরনের লোভ-লালসা, ইচ্ছা আকাংখা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এককভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই আঁকড়ে ধরবে। তাদের এখানে এই পদ্ধতি বলে দেয়া হচ্ছে যেন তারা দাওয়াতে দ্বীনের দায়িত্ব পালন

করতে গিয়ে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এভাবেই মোমেনদের প্রথম দলটিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনের ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করেছেন। কারণ, বিশ্ব-জনমানুষের নেতৃত্বের সেই বিশাল বোঝা একমাত্র সেই সব পুণ্যাত্মা মানুষরাই বহন করতে পারে, যাদের অন্তর যাবতীয় লোভ-লালসা, ইচ্ছা-আকাংখা থেকে মুক্ত হবে। যাদের সামনে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না।

আহলে কেতাবদের দুটো শ্রেণী

সূরা শেষ করার আগে আবার এর সম্বোধন দিকটি পালটে যাচ্ছে। এবারের সম্বোধন আবার আহলে কেতাবদের লক্ষ্য করে। তবে এই আহলে কেতাবরা একটু ভিন্ন ধরনের। বলা হচ্ছে, এদের ভেতর একদল লোক আছে যারা মুসলমানদের মতোই ঈমান আনে এবং এভাবেই এরা মোমেনদের দলে শামিল হয়ে যায়, পরিণামে তাদের সাথে সেই পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছে যা প্রাথমিক সময়ের মুসলমানদের দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

'আহলে কেতাবদরে মাঝে এমন কিছু সংখ্যক লোকও আছে ....'

এটা হচ্ছে আহলে কেতাবদের সাথে পরকালীন বিচার-আচারের ব্যাপার। আল্লাহ তায়ালা এই সূরার বিভিন্ন জায়গায় এদের বিভিন্ন দল-উপদল সম্পর্কে অনেক কিছুই বর্ণনা করেছেন। এদের ভেতর যারা সঠিক পথে ছিলো এরা মোহাম্মদ (স.) এবং তাঁর আনীত কেতাবের ওপর পূর্ণাংগভাবে ঈমান এনেছিলো। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের হুকুম-আহকামের বরখেলাপ করেনি। আবার রসূলদের মাঝেও একের সাথে অন্যের কোনো ফারাক করেনি। আগে পরে যা কিছুই আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের ওপর নাযিল করেছেন তার ওপর ঈমান এনেছে।

মূলত এ হচ্ছে ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য, এরা আল্লাহর সমগ্র হেদায়াতকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে এবং এভাবেই তারা সেই পরকালীন নেয়ামতের অংশীদার হয়ে যায়।

অপরদিকে আরেক ধরনের আহলে কেতাব রয়েছে যারা মুসলমানদের মতো করে ঈমান আনে না, তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শরম লজ্জার তোয়াক্কা না করা, গোঁড়ামি ও গোয়ার্তুমি করতে থাকা। আল্লাহর আয়াতকে উল্টাপাল্টা করে এমনভাবে পেশ করা, যার বিনিময়ে কিছু বৈষয়িক ফায়দা হাসিল করা যায়।

একদিকে যেমন আল্লাহ তায়ালা সঠিক পথের অনুসারী আহলে কেতাব ও মোমেনদের জন্যে অনেক পুরষ্কারের ওয়াদা করেছেন, অপরদিকে যারা এ ধরনের অজুহাত খোঁজে, তাদের জন্যে ওয়াদা করা হয়েছে মহা শাস্তির। আল্লাহ তায়ালা কখনো এদের ক্ষমা করবেন।

'আর আল্লাহ তায়ালা খুবই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী'।

ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশনা

এবার সূরা শেষ হয়ে আসছে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমেনদের কাছে একটি আহ্বান জানানো, মোমেনদের দায়িত্বসমূহের সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করা এবং এই পথের শর্তসমূহের একটি কাঠামো পেশ করার মাধ্যমে সূরার বর্ণনা শেষ করা হচ্ছে।

'হে ঈমানদার ব্যক্তিরা .....।'

'হে ঈমানদার ব্যক্তি' বলে মোমেনদের ডাক দেয়া হয়েছে। উপরওয়ালার এ ডাকের মাঝে তাদের জন্যে সম্মানের ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। দায়িত্ব পালনের জন্যে তাদের যোগ্য করে

তোলার ডাক দেয়া হয়েছে, যাবতীয় কঠিন পরিস্থিতির সামনে ধৈর্যধারণ করা, ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় সাহস ও ধৈর্যের সাথে অটল থাকা, সব ধরনের জেহাদ ও মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত থাকা, সর্বোপরি আল্লাহর ভয়কে সদা ধারণ করতে তাদের আদেশ দেয়া হচ্ছে।

এ সূরায় একাধিক জায়গায় 'সবর' ও তাকওয়ার' কথা বলা হয়েছে। কোথাও একত্রে, কোথাও বা আলাদাভাবে। বিপদ-আপদে তোমরা 'সবর' করো, আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো। প্রতিটি অন্যায় ও ধোকা প্রতারণাকে নির্মূল করার জন্যে সদা সচেষ্ট থাকো। শত্রুদের কোনো রকম প্রতারণামূলক কাজকেই সফল হতে দিয়ো না।

এ সূত্রে সূরার শেষ ভাষণটি একইভাবে 'সবর', 'মোসাবেরা', 'মোরাবেতা' ও 'তাকওয়া' দিয়ে শেষ করা হচ্ছে।

সবর হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর একমাত্র পাথেয়। কারণ এই পথের প্রতি পদে পদে বহু বিপদ-আপদ আসে, প্রতিটি স্তরে একটি নতুন মুসীবত এসে পথ আগলে ধরে। নফসের ইচ্ছা-আকাংখার ওপর ধৈর্যধারণ করা, তার বহুবিধ লোভ-লালসার ওপর ধৈর্যধারণ করা, তার অসংখ্য দুর্বলতা, অপূর্ণতা ও তাড়াহুড়ো করার মানষিকতার ওপরও ধৈর্যধারণ করতে হয়।

মানুষের অজ্ঞানতা, মিথ্যে ধ্যান-ধারণা, তাদের মনের সংকীর্ণতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, তাদের অহংকারবোধ, সত্যকে এড়িয়ে চলার ব্যাপারে তাদের নানা ধরনের মিথ্যে অজুহাত ইত্যাদির ওপরও ধৈর্য ধারণ করতে হয়। আরো ধৈর্যধারণ করতে হয়, অন্যায় ও বাতিলকে শক্তিশালী হতে দেখার ওপর, ক্ষেত্র বিশেষে নেককার লোকদের সহায় সম্বলহীন হওয়া ও তাদের চলার পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর হওয়ার ওপর। যাবতীয় সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় শয়তানের সব ধরনের প্ররোচনার ওপরও তাকে সবর করতে হয়।

সর্বোপরি দুঃখ কষ্ট, রোগ শোক, ক্রোধ হিংসা, আশা ও নিরাশ হওয়ার মতো নানা ধরনের মানসিক রোগের ওপর, সুসময়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না হারিয়ে মাবুদের কৃতজ্ঞতা আদায় করার ওপর ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালার ওপর সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর ওপর ভরসা করা এবং সর্বাবস্থায় তাকে ভয় করার ব্যাপারেও ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে।

একজন আল্লাহর পথের খাটি সৈনিকের সামনে আসা সব কয়টি অবস্থার ওপর সবর করতে হবে, যার মূলত কোনো শেষ নেই, না তার কষ্টকর ও তিক্ত অভিজ্ঞতাসমূহকে কোনো শব্দ দিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব। এটা মূলত আল্লাহর পথের সেই মোজাহেদই উপলব্ধি করে যে তার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে, যার জীবনে এর বাস্তব অভিজ্ঞতা ঘটেছে। এ কারণেই ব্যক্তি মোমেনকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, কারণ সবরের যতোগুলো দিক ও বিভাগ থাকতে পারে, তার সব কয়টি বিষয়কে অনুধাবন করে সে-ই নিজের জীবনকে এর জন্যে প্রস্তুত করতে পারে। সেই এটা বেশী অন্যদের চাইতে অনুধাবন করতে পারবে। কেননা, চিন্তা ও কর্মের উভয় ক্ষেত্রেই সে এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করে এসেছে। এই অবস্থার সে-ই সম্মুখীন হয়েছে একমাত্র তার পক্ষেই এটা অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছে যে, সত্যিকার সবরের অর্থ কি তা অনুধাবন করেছে?

আরবী শব্দ 'মোসাবারাহ' সবরের ব্যাপারে প্রতিযোগিতার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে ওপরে বর্ণিত সবরের সব কয়টি ধরনের অনুভূতির প্রকারভেদ বোঝানো হয়েছে। ইসলামবিরোধী সব ধরনের তৎপরতা, চাই তা মানুষের ভেতর লুকানো প্রকৃতিপূজা, নফসের দাসত্ব হোক অথবা বাইরের পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করার সব ধরনের দুশমন হোক,

যারা ইসলামের আলোকে নিভিয়ে দেয়ার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। তারা দ্বীনের এই বাতিকে নির্বাপিত করে তার স্থলে জাহেলিয়াতের অন্ধকারকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের মোকাবেলায় সত্যপন্থী লোকেরা কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে দ্বীনের ঝান্ডা বুলন্দ করতে এগিয়ে আসবে, অর্থাৎ মোমেন ও কাফেরদের মাঝে এক চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা এখানে লেগেই থাকবে। এই অবস্থায় মোমেনরা কাফেরদের যুলুমের মোকাবেলায় যে ধৈর্য ধরবে, প্রতিরক্ষার মোকাবেলা প্রতিরক্ষা করবে, চেষ্টা ও সাধনার মোকাবেলায় চেষ্টা সাধনা করবে, স্বীয় পথের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে সংগ্রাম করবে। একইভাবে অটল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কাফেরদের সাথে প্রতিযোগিতায় মোমেন যে পরিমাণ সবরের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মযবুত করতে পারবে, ততোই সত্য ও ন্যায়ের ঝান্ডা বুলন্দ হতে থাকবে এবং যতোই শত্রুপক্ষের কর্মতৎপরতা ও প্রতিশোধক্ষমতা বাড়তে থাকবে, ততোই ন্যায়-অন্যায়ের এই সংগ্রাম কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকবে।

'মোরাবাতা' শব্দটিও অনেকটা একই অর্থবোধক। এর অর্থ হচ্ছে জেহাদ ও প্রতিশোধের সময় কাতার বেঁধে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। দুর্গে অবস্থানকালে শত্রুদের মোকাবেলায় অটল ও অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। আমাদের ইতিহাসের প্রথম দিকে ঈমানদার ব্যক্তিরা সর্বদা এই যুদ্ধরত অবস্থায় অবস্থান করতেন। মুহূর্তের জন্যেও তারা শত্রুদের সামনে অবহেলা ও অবজ্ঞামূলক আচরণ করতেন না। নিমিষের জন্যেও তারা নিজেদের চোখের পাতা বন্ধ করতেন না। কখনো নিশ্চিন্ত মনে আরামে বসে থাকতেন না। কোনো পর্যায়েই তারা তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় সামান্যতম অবহেলাও প্রদর্শন করেননি। তারা দাওয়াতের প্রথম দিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একটি সর্বাত্মক জেহাদে সর্বদা লিপ্ত থাকতেন।

ইসলামের এই যে আহ্বান ও দাওয়াত– তা এমন একটি জীবনবিধান, যা জীবনের সব কয়টি দিক ও বিভাগের প্রতিই লক্ষ্য দেয়। একদিকে এ ব্যবস্থা যেমন মানুষের অন্তরের বিশুদ্ধি করণ করে, তাকে পরিশীলিত করে, তাকে ট্রেনিং দেয়, অপরদিকে এই জীবনবিধান মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করে। এই ব্যবস্থা মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির নিশ্চয়তা দেয় এবং এর সব ব্যবস্থাই 'সত্য ও ন্যায়ের' ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই কারণই সমাজের কুৎসিত ও জাহেলী ব্যবস্থা এই ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে না। বাতিল কোনো দিনই 'হক'কে স্বীকার করে না, বিদ্রোহী শক্তি কখনো এই কল্যাণমূলক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে চায় না। এ অবস্থায় যাবতীয় অন্যায় বাতিল ও বিদ্রোহী শক্তি একত্রিত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে সমাজের সে সব শক্তি এক হয়ে সত্যের মোকাবেলা করে, যারা অবৈধ স্বার্থান্বেষী মোনাফেকী মানসিকতা এবং দুনিয়ার সংকীর্ণ স্বার্থের মায়া ত্যাগ করতে পারে না। সমাজের সেসব লোক ইসলামের মোকাবেলায় সংঘবদ্ধ হয়, যারা গর্ব ও অহংকারের শিকার হয়ে কোনো অবস্থায়ই এই খোদাদ্রোহী প্রবণতা থেকে ফিরে আসতে চায় না। এদের সাথে ইসলামের বিরুদ্ধে আরো এসে হাযির হয় যারা দুনিয়ার সব ধরনের নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতাকে ভালোবাসে।

এখানে এসে ইসলামের জন্যে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় এই জাহেলী ও কুফরী শক্তির সাথে জেহাদ করা, আর এ সর্বাত্মক জেহাদের জন্যে প্রয়োজন মুসলমানদের সাধারণ শক্তি-সামর্থকে একত্রিত করা এবং 'ধৈর্য ধরে ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করা', সর্বোপরি হামেশা শত্রুর মোকাবেলায় সর্বাত্মক জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া– যতোদিন পর্যন্ত অন্যায় ও বাতিল সম্পূর্ণরূপে নির্মূল

হয়ে যায় এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালেমার বিজয় সূচিত না হয়। এই হচ্ছে এই দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ও এর সুস্পষ্ট কর্মসূচী। ইসলাম কখনো এটা চায় না যে, মানবতার ওপর অত্যাচার-অবিচার চলতে থাকুক, ইসলাম চায় আল্লাহর যমীনে আল্লাহর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। আল্লাহর বান্দারা আল্লাহরই প্রদর্শিত সঠিক পথে চলুক এবং এটা অবধারিত সত্য যে, বাতিলের অনুসারীরা এই ব্যবস্থার পথ আগলে ধরবে, তার প্রতিরোধ করবে, শক্তি-সামর্থ ও ধোকা-প্রতারণা দিয়ে তার গতিরোধ করতে চাইবে এবং এ ব্যবস্থা যাতে কোনোদিন কার্যকর হতে না পারে, তার জন্যে চক্রান্তের সব কয়টি জাল বিছিয়ে দেবে। কথা ও অন্তর দিয়ে, অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তার বিরোধিতা করবে। এই সংগ্রাম, এই যুদ্ধ থেকে মোমেনের নিস্তার নেই। এ লড়াই তাকে লড়তেই হবে। আর এ লড়াইয়ের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে মোমেন এক মুহূর্তের জন্যেও গাফেল হবে না, অবহেলা করবে না। অব্যাহত গতিতে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

আর 'তাকওয়া' হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং এই ভয়ের কারণে সদা-সতর্ক থাকা। এটা এই পথের এক মূল্যবান সম্বল।

তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের হেফাযতকারী। এটা কখনো মানুষের অন্তরকে গাফেল হতে দেয় না। তাকওয়া হচ্ছে মনের দুয়ারে এক জাগ্রত প্রহরী যা কখনো তাকে ঘুমুতে দেয় না। সত্যের পথের প্রতিটি সংগ্রামী মোসাফেরেরই এমন এক পাহারাদারের প্রয়োজন রয়েছে, যা পথের দুঃখ-কষ্ট দূর করে তাকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রতিকূল পরিবেশের সাথে মোকাবেলা করে অন্যান্য পথচারীর চলার পথকে সহজ করে দিতে পারে।

এক কথায়, এই সূরায় সত্যপথের অনুসারীদের দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে দেয়া হয়েছে। তার সব কয়টি দিককে একত্রিত করে এই পথের কষ্ট-মসীবতের কথাও তাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। পরিশেষে এই দীর্ঘ ও কষ্টকর সফরের পরিণাম এই বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কাজ যথাযথ আঞ্জাম দিলে।

'সম্ভবত তোমরা মুক্তি পাবে সফলকাম হবে।'

-o-